

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

ত্রয়োদশ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ - আষাঢ় ১৩৬৪

বিষয়সূচী

শ্রী অজিত ঘোষ		শ্রী জগন্নাথ গুপ্ত	
প্রাচীন গোষ্ঠীলীলার পট	১৫৭	গ্রন্থপরিচয়	২৭০
শ্রী অজিত দত্ত		শ্রী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	
কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস	৫২	ওষলুটার ডে লা মেয়ার	৬২
মিশ্রালের কবিতার অহুবাদ	২৪৭	শ্রী নন্দলাল বসু	
গ্রন্থপরিচয়	২৭০	'গোষ্ঠীলীলা'	১৫৬
শ্রী অনাদিকুমার দস্তিদার		শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত	
স্বরলিপি	৮৭	দেবজয় ও এসকিলস্	৩৫৮
শ্রী অমল হোম		শ্রী পরিমল গোস্বামী	
বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক	৪২	প্রাচীন মাহুঘের নৃতন বিপদ	১৫১
শ্রী অমিয় চক্রবর্তী		শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস	
কার্যবিষয়ের চিঠি	১৩৪	স্বরলিপি	৩৬৬
শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত		শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন	
মিশ্রালের কবিতার অহুবাদ	২৪৭	প্রিয়দর্শী অশোক	২২২
শ্রী অশোকবিজয় রাহা		গ্রন্থপরিচয়	৩৪৩
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩২	শ্রী প্রমথনাথ বিদী	
শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য		গ্রন্থপরিচয়	২৭৮
গ্রন্থপরিচয়	৮৫	শ্রী প্রিয়রঞ্জন সেন	
শ্রী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী		আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়	১৬৫
স্বরলিপি	১৮৫	শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র	
রবীন্দ্রস্মৃতি	১৮২, ২৮৪	জগদীশ গুপ্ত	৩৩২
শ্রী কানাই সামন্ত		শ্রী বিনয় ঘোষ	
কালীঘাটের পট	১৫৮	নবযুগের মাহুঘ বিভাগাগর	৩০
শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি		শ্রী বিমলচন্দ্র সিংহ	
ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ	৩৫২	গ্রন্থপরিচয়	৬৮, ১৮১
শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়		বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ	২৫
গ্রন্থপরিচয়	৮০	শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার	
গ্যাব্রিয়েলা মিশ্রাল	২৪২	আলোচনা	৬১
শ্রী জগদীন্দ্র ভৌমিক			
যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী	১৭৫		

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

কতুসংহার

শ্রীভবতোষ দত্ত

বহিমচন্দ্র ও বাংলায় ঈতিহাস

গ্রন্থপরিচয়

বহিমচন্দ্রের ভারতসংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

বিভাগাগার

মৃত্যুশোক

গান

শ্রীরাজেশ্বর মিত্র

কীর্তন ও গ্রন্থপদ

সংগীতমারসঃগ্রন্থ

শ্রীলীলা মজুমদার

গ্রন্থপরিচয়

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

শ্রীশশিনীকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি //

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপরিচয়

শ্রীসরোজ আচার্য

জর্জ বার্নার্ড শ

শ্রীশুকুমার সেন

মুহুম্বরাবের বেশভাষাকাল

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

যোদ্ধা দেশে

শ্রীশ্রবোধ ঘোষ

সাহিত্যের ভাষা

শ্রীশ্রীল রায়

যোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনকথা

অনির্মল বহু

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আলোচন।

শ্রীহিরণ্যকুমার সান্তাল

গ্রন্থপরিচয়

১, ৮২

২৫

১৮৭

২৮৩

১৭১

৩২৬

চিত্রসূচী

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিমাশ্রয়

কাকনজঙ্গল

শ্রীনন্দলাল বসু

বীণাবাদিনী

সাহিত্য-বাদক

শ্রীরামকিংকর

কোনারকের পথে

প্রতিকৃতি : আলোকচিত্র

ওমস্টার ডে লা মেয়ার

গ্যাব্রিয়েলা মিত্রাল

জগদীশ গুপ্ত

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

জর্জ বার্নার্ড শ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগেশচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীহিনিরাসেবী-সহ

লোকমাত্র টিলক

অনির্মল বহু

কালীঘাটের পট

শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন

শ্রীরাধার মানভঞ্জন

শ্রীরাধার মুরলী-শিক্ষা

ভক্ত-শাবিকা

শিকারী বিভ্রাল

হুগোবী

বাংলা পট

গোষ্ঠীলীলা

যোদ্ধা দেশ

ইকে। কর্ণেল ব্রেট, ওনি

ইফের ওনি

কাঠের কাজ

মুখশিল্প

শ্রীমুক্ত ওবাকফেমি আবোলোবোর নৃহে

পশ্চিম-নাইজিরিয়ার রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রী

ব্রজশিল্প

৬২

২৪৩

৩৩৪

৩৩৫

১৪৪

২৪২

১৬৮

৬৮, ২৮৩

২৮৮

৩২৩

৩২৩

২০২

২০২

২০০

২০৩

২০২, ৩২২



বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা আশ্বিন-আশ্বিন ১৩৬৩

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়সূচী

চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাহিত্যের ভাব। ✓	শ্রীহরোদ্র ঘোষ
✓ বহুমুখ ও বাংলার ইতিহাস ✓	শ্রীভবতোষ দত্ত
✓ বিদ্যাসাগর ✓	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
✓ নবযুগের মাহুঘ বিদ্যাসাগর ✓	শ্রীবিনয় ঘোষ
বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক	শ্রীঅমল হোম
কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস	শ্রীঅজিত দত্ত
আলোচনা ✓	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	শ্রীবিনয়বিহারী মজুমদার
গুপ্তলটার ডে লা বেয়ার	শ্রীবেব্রত মুখোপাধ্যায়
এষপত্রিক	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
	শ্রীভবতোষ দত্ত
	শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
	শ্রীঅনাদিকুমার বস্তুগার

স্বরলিপি : ও মোনাকি, কী স্থখে ওই

চিত্রসূচী

কোনারকের পথে	রামকিংকর	১
হিমালয়	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬
কাকনজঙ্গা	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭
লোকমাত্র টিলক		৪২
লোকমাত্র টিলক : ১২১৮		৪২
লোকমাত্র টিলক : ১২০৬		৪৩
গুপ্তলটার ডে লা বেয়ার		৬২
রবীন্দ্রনাথ : ১২০৭		৬৮

মূল্য এক টাকা।



চিঠিপত্র

শ্রীমদ্রোহী দেবীকে দিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়ায়

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। চিরদিনই আমার মনটা পথিক, এই পথিকবৃত্তিই হয়তো আমার স্বভাব। চলাতেই ধনি। বাণির বাধার ভিতর দিয়ে বাতাস যখন চলে তখন ধনি ভাগে, ভাটের সীমার মধ্য দিয়ে মল যখন চলে তখন তার কলগান— চিরদিন বাধার নাশপান দিয়ে আনাকে চলতে হয়েছে, সেই চলাতেই আমার স্বর। চলতে গিয়ে তুলও হয়, রাস্তা বাঘ বেঁকে, কড়ে আলো বাঘ নিবে, খরতাপে পথের পথ্য বাঘ ভকিয়ে। ধাক্কা যখন বাই, তাপ যখন অসহ্য হয় তখন খুঁজতে বেহই অস্বপ্নের মধ্যে, বাঘে বাঘে বেগা বাঘ সেখানে শুকতার মধ্যে অর আছে আরোগ্য আছে শান্তি আছে, সেই শান্তির মধ্যে নিবিষ্ট হতে হতে একসময় বাইরেরকার কুংলা পাকস্থ পঙ্খিলতা আর নাগাল পায় না। কিন্তু সেই না-এর কোঠায় গিয়েই বিশেষ লাভ নেই। নিজের ভিতরে যে অভিমান যে রাগদ্বয়ের চাকলা আছে সেটাকে অতিক্রম করে একটি সহজ আনন্দ আসে সেটা ত্রুতল মুক্তির নয়, সেটা সত্য উপলব্ধির। সেটা বিস্তৃত শ্রীতির। এইটেতে উত্তীর্ণ হয়ে এইখানেই স্থিতি পাওয়া হুসাধা। এইটেকেই যে চাইতে হবে পেতে হবে থেকে থেকে মন সেটা তুলেই যায়। পূর্বসংস্কার আচ্ছন্ন করে দেয় সাধনার লোকলকে। তাহলেও এটা নিশ্চিত জানতে পারাডেও শক্তি পাওয়া যায়— সেই জানটা হচ্ছে এই যে, অন্তরের শুকতার সঙ্গে বাইরের চলাকে বেলালে তবে সার্বকতা,— যেমন শুকতীপার সঙ্গে গতিশীল গানের সঙ্গ। আমার কাছ থেকে শক্তি পাবে এমন আশা করচ, কিন্তু সেই রকম ওকল অধিকার তো আমার নয়। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু কল্যাণ বিধান করব এমন ঐশ্বর্য কি আমার আছে? ইতি ৩ ডিসেম্বর ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়ায়

ইতিমধ্যে আমার কলকাতার বাবার কথা ছিল মনে করেছিলুম তখন তোমায় সঙ্গে বেগা হলে কিছু কথাবার্তা ক'ব। সে আর ঘটে উঠল না। বরোদায় শ্রীমই বেতে হবে অথচ শরীর কিছু অসুস্থ আছে—

এ অবস্থায় পরবর্ত্তার পরিমাণ ও ভূখণ্ড আর বাড়িতে সাহস হয় না। তোমার অল্প বয়স, সর্বদা নিজের মনটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা তোমার গণ্ডক স্বাভাবিক নয়। চারিদিকের সঙ্গে বেশ সহজভাবে যোগাযোগ করে নির্মল প্রগরতা নিয়ে দিন কাটানোর মতো সাধনা আর কী আছে। অশাস্ত্র কিছু একটার দ্বারা অপেক্ষা করা দুর্বলতা। নিজেই অন্যায়সে ও অব্যবহাতির শক্তিকে প্রতিদিনের সহজ সামান্য উপলক্ষ্যে নিজেই চর্চা করতে হবে। বাইরের সাধারণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যখন অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তি হয় তখনই বৃহত্তর পায়িত্ত্বের দিকে আমরা সজাগ হয়েছি। অস্বস্তিকারী কাটিয়ে ওঠার মত এমন দুই অবস্থায় আর কিছুই নেই—তাকেই ক্রমাগতই বাড়িয়ে তোলা আমাদের চিরায়ত্ত্ব—সবল কিছুতেই নানা আকারে সে নিজের দাবী উপস্থিত করে, অন্যায় বিনামে, সবসময়ে তাকে চিনতে পারি। তার একটু আঘাত একটু নিম্না একটু ক্ষতিতে চারিদিক আলোড়িত করে সে হুলা উড়িয়ে দেয়, তখন তাকে ভৎসনা করে তাকে ধমিয়ে দেবার কথা মনেই থাকে না, কেননা চিরকাল তাকে প্রভাব দিয়ে এসেছি। এতেই দৃঢ় অশান্তি দৃঢ় ভূগোণ ঘটে। যখন মনে করে কসে আছে এই দুর্বলটাকে নিরস্ত পরাহত করেছি এমন সময়ে কোথা থেকে সামান্য একটু নাড়া পেলেই সে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তুলে বাই নিজের পরাভব। তবু হাল ছাড়লে চলবে না—এই চকলটাকে বাইরে সরিয়ে নিজের থেকে এঁকে পৃথক করে দেখতে হবে। কামট। একেবারেই সহজ নয় অতএব ক্ষণে ক্ষণে পরাভব ঘটলে অবসাদগ্রস্ত হোয়ো না। একটি অভ্যাস নিত্যই করতে হবে, যার তোমার চারিদিকে আছে তাদের প্রতি সহিষ্ণু হোয়ো, প্রসন্ন হোয়ো—একটি প্রকৃতির আলোক তোমার অন্তর থেকে বিকীর্ণ হ'তে যাতে বাধা না পায় এইটি কোরো। তুমি আহ বলেই সঙ্গারে একটু মাধুর্য আছে, সঙ্গারবাহার কর্ণশব্দ একটু দূর হয়েছে। এর মতো সৌভাগ্য আর কিছু নেই। চারিদিকে দৃঢ়তাই তুমি আনিচ্ছিত করবে ততই আনন্দস্বরূপের আবির্ভাব তোমার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। নিরস্তর নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে নিজেকে স্নান কোরো না—হাসিমুখে সহজ আনন্দে দিনগুলিকে অস্বস্তি ব্রোডের নৌকার মতো ভাসিয়ে দিয়ে। বার বার মনকে বলিয়ে নিয়ে—

আনন্দ-পরমানন্দ-পরমস্বঃ পরমাত্মনিঃ

ইতি ৮ আশ্ব্যারি ১২৩০

ভক্তাঞ্জলী
ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহমেদাবাদ

কল্যাণীয়াহ

ইনহুয়েভার পড়েছি তাই দুর্বল। আশ্ব বরোদায় দাঁতি।

পথে ধামতে ধামতে কিরতে হবে। একটানা অস্তুর বেতে পারব না। হবত কেকদারির প্রথম সপ্তাহে পৌছব। তোমার দ্বন্দ্ব উত্তর রইলুম। শরীরকে স্বস্থ ও মনকে শান্ত রেখো।

সাহিত্যসমেলনের পূর্বে কেবা অনন্তব। বক্তৃতাটি লেখা হয়েছে—পাঠিয়ে দেব। ২৪ আশ্ব্যারি ১২৩০

ভক্তাঞ্জলী
ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

শরীর এখনো কাজের বার। কলকোণের গবাক্ষে চম্বে মেলে পর্যায় অক্লান্ত হয়ে নিষ্কণ্টক বসে আছি। এ অবস্থায় শীত এখন থেকে নড়চড় হবার সম্ভাবনা দেখিনে। মার্চ মাসে যুরোপ যাওয়ার একটা জনরব উঠেছে কিন্তু এখনো তার আয়োজন বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এহ আবার প্রতি অহংহ করেছিলেন—আমেরিকাবাসে পড়লুম রোগশয্যা—ডাক্তারের হাতে পড়ে সাহিত্যসম্মেলনের লগ পার হয়ে গেল—প্রত্যেকে ওষুধ খাচ্ছি পরোক্ষ গাল খাচ্ছি এইভাবে আমার শুভ মাধ্যম্য কর হয়ে এল। একেবারে নাড়ী না ছাড়লে বেপের লোক কমা করেন না, কিন্তু এখনি ভাগ্য, যমের দূত আসে তবু রথ আসে না—তাই অরুণসভার ধারা বিলাপ করতেন সাহিত্যসভায় তাঁরা কটুষ্টি করবেন।

তুমি দিল্লী চলেছ কিসের প্রত্যাশায় বৃত্তে পারলুম না। আবার আশীর্বাদ। ইতি ৮ ফেব্রুয়ারি ১২০০

শুভাকাজ্ঞী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যে অসৌজন্য অস্ত্রায় অবিচার প্রভ্রম পাঠে সাধারণভাবে তোমার কাব্যের ভূমিকার ভাষি উল্লেখ করেছে। এ ক্ষেত্রে তোমাকে যে কেউ কমা করবে এমন আশা করিনে—তবু বলা ভালো। বিশ্রাম সাধনায় ব্যস্ত আছি অতএব আর নহ। ইতি ১১ ফেব্রুয়ারি ১২০০

শুভাকাজ্ঞী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াহ

বৃন্দা একেবারেই নেই এই কথাটা এখন তোমার মন কোনোমতেই স্বীকার করতে চাচ্ছে না ওখন ভাঙে স্বীকার করবার ঘরকার কি? থাকা ব্যাপারটার কত বৈচিত্র্যই আছে। কখনো ঘুমিয়ে থাকি কখনো জেগে থাকি কখনো কাছে থাকি কখনো দূরে থাকি—কখনো দৃষ্ট কখনো অদৃষ্ট—তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করে দিতে সোম কি—অর্থাত্ কখনো এ লোক কখনো অজ লোক—কখনো বর্ত্য শরীরের অবস্থার কখনো এ শরীরের অতীত অবস্থায়। তুমি বলবে, নিশ্চিত জানিনে যে। সেই ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকেই বলবান না করে আকাক্ষার প্রমাণকেই তো মানা ভালো। পৃথিবীতে সব আকাক্ষার সার্থকতা ঘটে না একথা সত্য, তেমন একথাও সত্য, যে সব সত্যের হুস্তি আমাদের হাতে নেই, তাই যাকে নিশ্চিত বলে জানি সেও ভ্রান্ত হতে পারে। বৃত্তাকে বিলম্ব বলে মনে করুচি খুবই সম্ভব তার কারণ এই যে, সে যে বিলাপ নয় তার প্রমাণগুলো আমাদের হাতের কাছে নেই—হয়তো কেবল কৃৎ বিলাপ করেই

মহি। মা পানের ঘরে গেলে শিশু যেমন মায়ের অবলম্বিত করল করে এও হয়তো তেমনি। আমি এই কথা বলি যখন স্বপ্নের মধ্যেই আছি তখন না-থের চেয়ে ই-কে মানাই ভালো। মৃত্যু যদি চরম সত্যই হয় তাহলে আবেগ করা বৃথা, যদি সত্য না হয় তাহলে ততোধিক বৃথা—অতএব মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক তার পরে হয় এপক্ষে নথ ওপক্ষে তর্কের সমাধান হবে—আমি নিজে শান্ত মনে তারি অপেক্ষা করছি এবং ততক্ষণ এই বিশ্বাস ধরে রেখেছি যে মৃত্যুর পর মুহূর্তেই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ হাকার নেই। ইতি ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১।

শ্রীভাষ্করী
শ্রীমদ্বীজনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

আমার এ বৎসে তুল করলে লোকে বুকে নেয় সেটা তুল। তোমাদের ঘাসে যদি তুল করতুম লোকে ধরে নিত সেটা অক্ষমত। অতএব আমার অহুকরণ কোনো না। সাবধানে লাইন শুনে অক্ষর মিলিয়ে কবিতা লিখো। আর ১ বছরে [বৈশাখে] রামানন্দাবাবুর লগ্ন ধরে যদি এখানে আসতে পারে। তবে করুন। কোনো না সেটা অভ্যস্ত হুঃসহ হবে। ইতি ২৮ চৈত্র ১৩৩৭

শ্রীভাষ্করী
শ্রীমদ্বীজনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

অন্যদিনের উপসব ব্রহ্মস্পর্শ হয়ে গেছে খবর বোধহয় শুনেচ। আর সমস্তই ভালো কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে সহজ হয় নি। আশাও তার উপসংহার ভাগে হবেই হাকামা মনে উঠেচ। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছি।

তোমরা আসতে পারলে খুবই খুশি হতুম। তোমাদের প্রদত্ত উপহার ঠিক সময়ে ঠিক আদায় এসে পৌঁছেছে। ভালো লাগল। আমার আশীর্বাদ। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীভাষ্করী
শ্রীমদ্বীজনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াহ

তোমার চিঠিতে যে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তাতে আমি অভ্যস্ত পীড়া বোধ করলুম। স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গারের যদি অসামঞ্জস্য ঘটে তবে সেটা সহজে সহ করে ধীরে ধীরে স্বয়ং বেধে তোলা তোমার স্বপ্নে ও তোমার অভিজ্ঞতার সম্মত হয়ে ওঠে না। তোমাকে কি পরামর্শ দেব ভেবে পাইনে। নিজের অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে—তীর দুপথে যখন দিনগুলো কটকিত হয়ে উঠেছিল তখন কোনো মতে সেগুলো উত্তীর্ণ হয়ে থাবার রাস্তা পাইনি, মনে করেছিলুম অন্তহীন এই দুর্গবতা। কিন্তু স্বীকৃতির

চিঠিপত্র

পরিণতি একান্ত বিবর্তিত ভিতর দিয়ে নয়, দিনে দিনে বেননাকে বোধনায় মধ্যে নিয়ে গিয়ে কঠোরকে লজিতে অন্নভাকে মাধুর্যে পরিণত করে তোলাই হচ্ছে পরিণতি। তোমার যে তা ঘটবে না তা আমি মনে করিনে— কেননা তোমার কল্পনাশক্তি আছে, এই শক্তি যষ্টিশক্তি। অবস্থার হাতে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি থাকতে পারবে না— নিজেকে পূর্ণতর করে তুমি যষ্টি করতে পারবে। আমি জানি আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে উন্নয়ন শক্তিতে আত্মবিকাশ সহ্য নয়— বাইরের দিকে প্রস্রবতার ক্ষেত্র তাদের অবরুদ্ধ— অন্তরলোককে প্রবেশের যে সাধনা সে সহজেও আহুত্ব্য তাদের পক্ষে তুল্য। তবু তুমি হতাশ হোয়ো না— নিজের উপর শ্রদ্ধা রেখো— চারিদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেই গভীর নিষ্ঠুরে নিজেকে স্তম্ভ কর যেখানে তোমার মহিমা তোমার ভাগ্যকেও অতিক্রম করে। তোমার পীড়িত চিত্তকে যদি সাধনা সেবার শক্তি আবার থাকত তাহলে চেষ্টা করতুন— কিন্তু একান্ত মনে তোমার স্তম্ভকামনা করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। যদি বাইরের কোনো ক্ষুদ্রতা তোমাকে পীড়ন করে থাকে তবে তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করো। ইতি ১৪ শ্রাবণ ১৩৩৮

সেহস্রত

ঈরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীদাস

সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে আমাকে খুব সম্ভবত কলকাতায় যেতেই হবে। বঙ্গাঙ্গীভিৎসের সাহায্যকরে কিছু করা চাই। এই বস্ত্রায় আমরাতাও নিঃস্ব অতএব একটা কোনো অভিনয় আশ্রয় করে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করতে হবে— নতুবা বৃত্তি প্রজাদের আর কোনো উপায়ে বাচাতে পারব না। এখান থেকে কিছু কিছু অর্থ আমরা সংগ্রহ করেছি। তোমার বাবাকে এই সংবাদ দিখো। তিনি সেপ্টেম্বরের আরম্ভে অভিনয়ের দিনগুলো বাধ দিয়ে কোনো একদিন যদি আমাকে আমন্ত্রণ করেন তাহলে অহুবিধা হবে না।

এই কাজের ভার গ্রহণ করার উপযুক্ত দরীর আমার নয় কিন্তু উপায় নেই। সম্ভ্রতি কোমনে ব্যাধা হবে আমার সেহটাকে আরো অচলতর করেছে। আজ এখানে বর্ষাঋতু হব, তার কোনো কোনো অংশে আমাকেও যোগ দিতে হবে।

তোমার সেহমন স্নহ আছে এই আশা করি। ইতি ৬ ভাদ্র ১৩৩৮

সেহস্রত

ঈরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীদাস

ঐক কবে রাষ্ট্রধানীতে পদার্পণ করব নিশ্চিত বলতে ভরসা পাচ্চিনে। অল্প বয়সে মনের উপর নির্ভর করা ক্রুশাধা ছিল এখন সেহটাকে বিশ্বাস করা চলে না। তার মন্ত্রণা না নিয়েই কর্তব্য সাধনের চেষ্টা করি কিন্তু সময়ে সময়ে সে এমনতর কড়া বন্ধের “সত্যগ্রহ” করে বলে যে তাকে লঙ্ঘন করতে পারিনে।

আপাতত ঠিক করেছি সেপ্টেম্বরের মাসিকাক্ষিকি কথা তার কিঞ্চিৎ পূর্বেই এখান থেকে নড়বে। তোমার বাবাকে বোলো এই বেলা মালা চন্দন, "শাদু লবিফ্রাডিত" ছন্দ এবং অহঃখর বিলগের আয়োজন করে তেবে দিন। ইতি ১০ ভাদ্র ১৩৬৩

সেহরত

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Glen Eden/Darjeeling

কল্যাণীয়াহ

কলকাতায় এসে দুঃখনিবহ যোগে তোমাদের সন্ধান করেছিলুম প্রত্যুত্তর না পেয়ে মনে করলুম আত্মপর্যবর্তনের প্রত্যাপায় বাতুপরিবর্তনে বেরিয়েছি। আমিও সেই সংকল্পে অনেক কথা সবেও দাখিলিং এসেছি। শান্তিত পৃথিবীর অস্তভেদী ঐক্যতা আমি পছন্দ করি নে। তার চেয়ে অব্যাহত আকাশের তলে তার সাদৃশ্য গ্রহিপাত আমার মনকে মুগ্ধ করে। মনে করেছিলুম ছুটির হাসটায় শান্তিনিকেতনে শেকাদিগুপ্তি শুভ্র শরতের নির্মল প্রসাদ নির্ঝনে উপভোগ করব। কিন্তু শরীর এবার শান্তিতারে অভিকৃত ডাই গিরিরাজের আতিথ্যে শুক্ল কামনা করে এখানে এসেছি। স্বাস্থ্য সংগ্রহ করে যদি নিজে যেতে পারি তবে বহুর পথে কর্তব্যের বোকা আরো কিছুদিন টেনে বেড়াতে পারব।

কলকাতা থেকে হুতে গেছ ভালই করেছ— ঘুরে যাওয়া অবগাহন মানের মত; নিকটের ধূলি ঘুরে ঘেঁষে এবং সজ্জিত তাগ দ্ব করে। যে অবকাশে মন আপনাকে প্রশান্ত করতে পারে অজাত সংসার তাকে নানাবিক্রে অবরুদ্ধ করে কলে। সংসার কর্তৃক সেই একান্ত অবরোধের মধ্যে সংসারের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ পীড়িত বিকৃত হয়। মুক্তির ক্ষেত্রে এসে তবেই সেই সম্বন্ধকে আমরা বিত্ত্ব করে নিতে পারি।

এই সার্কভৌম কবির কথা তোমার বাবাকে অরণ করিয়ে দিহো এবং তোমরা সকলে আমার বিজ্ঞায় আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি বিজ্ঞা দশমী ১৩৬৩

সেহরত

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

আমি তো আপাতত এইখানেই বসে আছি যে পর্যন্ত না স্বস্তির হুতরা আমাকে জ্বরবন্তি করে ধরে নিয়ে যায়। ছিলেম দাখিলিং-এ শরীরটা ভালোই ছিল। এখানে নেমে এসে নানাবিক্রম কালের চক্রে পাক বেয়ে ময়তি— মুহূর্তকাল সময় পাচ্চি।

যে ছবিটা পাঠিয়েছ তার ছুতুড়ে গোছের চেহারা। কোথা কোন্ প্রেতলোক থেকে সংগ্রহ করেছ। সময় পেলে তদ্রূপে কিছু লিখে দেবার চেষ্টা করব— কিন্তু আরতিটা সেবে কবিত্বের প্রেরণা মনে আসছে না। ২৪ নভেম্বর ১৩৬৩

সেহরত

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

কোনো কোনো জিটির লক্ষ্যক্ষেপে হঠাৎ দুর্ভাগ্যের দৃষ্টি পড়ে। ভোমার বাবার চিঠি পেয়েই তার মনোবল লিখতে বসেছিলেন। এক পাড়া শেষ হতে না হতে বাখার উপর বাধা। কিছুদিন থেকে আমি নানা প্রকার কাণ্ডে অকালে এতবেশি বিভ্রান্তি যে ভাতে কাজও এগোয় না বিশ্রামও চাপা পড়ে। ছোট পাটো জরুরী বৈধবিক কথ— বৈধবিক বলতে আমার সম্পত্তি রক্ষণের কথা কল্পনা। কোনোনা— যে কাজ আমার ঘাড়ে চেপেছে তারি ঘাড়ে বসে কিছু দায় চেপে বসেছে, থেকে থেকে এক একবার তাগা আমাকে ব্যস্ত করে তোলে— বিশেষতঃ এখন অস্বাভাব ঘটে। সেই দুঃসময় এসেছে। তার উপরে একটা অভিনয়ের উদ্ভোগপর্ব— সেটা মনোমোহন একটা বিরট পর্বেই আনুষ্ঠানিক।

যাহোক অকপণারমির মতো সেই অসমাপ্ত পত্র পর্যাণ্টা চিরকাল অসম্পূর্ণ হয়েই থাকবে না। কোনো একটা অবকাশে সেটার উপর হস্তক্ষেপ করব।

কলকাতায় এখন বাওয়া ঘটেবে না। মনোমোহন সমস্ত আশা করি বাওয়া সম্ভব হবে।

ভোমার বাবাকে আমার সবিস্তার নমস্কার জানিয়ে পরোক্ষরূপে অন্তিম অপরাধের কথা সংগ্রহ করে নিবো। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

স্বৈরভ

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াহ

বৈশেষী, চিত্রশালায় বিভিন্ন জীবের উপস্থিতি হঠাৎ শরীরটা ভেঙে পড়ল। তাই উর্দ্ধশ্বাসে সৌদ মারতে হল। টেবিলের উপর একগ্রাফ অটোগ্রাফ বই জমেছিল। তাড়াতাড়ি নাম লই করেই রথ চড়ে বসলাম। কোন্টা কার তা বাছাই করা অসাধ্য— নাম প্রায়ই নেই। বা হোক চিত্রশালাধ্যক্ষের হাতে পেগুলো পড়ে আছে বলে আশা করি। ভোমার সোদরা ছবিরও বইখানা সেইখানেই বিশ্রাম করচে। মুহুর্তকে লিখে দেব। আনিয়ে নিয়ো। আমার কাছে কোনো জিনিষ ফেলে রাখা নিরাপত্ত নয়। আমি অপকণ্য ভাবে নিজের জিনিষও হারিয়ে থাকি। হারানোর খুঁজে খুঁজে আমার দিনের অনেক অংশ কাটে। পায়ত্ত থাবার আয়োজন চলচে। ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৮

স্বৈরভ

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের ভাষা

ত্ৰিভুবোধ বোধ

বাগ্‌বৈদ্য প্রধানেবশি রস এবাও জীবিতম্, বাগ্‌বৈদ্য প্রধান হয়ে উঠলেও রস এখানে জীবিত আছে— অগ্নিপুত্রানের এই উক্তি শুনে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, বাগ্‌বৈদ্য হবে কি রসের জীবিতম্ কহে করে? বোকা যায় না, বাগ্‌বৈদ্য অর্থে কি বুকেছেন অগ্নিপুত্রাণ। রসের সৃষ্টির সহায়ক হল না, এমন বাক্-কীর্তিকে বৈদ্য বলে আখ্যাত না করাই উচিত। অলহারা বেদের ঘটায় মতো সে বাক্-কীর্তি শুধু একটা ঘটনা, বাগ্‌বৈদ্যই মাত্র।

বাগ্‌বৈদ্যকে বাস দিয়ে যদি রসের সৃষ্টি সম্বন্ধ হত, তবে না হয় অগ্নিপুত্রানের অল্পরূপ ধারণা বীকার করে নিয়ে উভয়ের মধ্যে গুণগৌরবের একটা প্রভেদ মেনে নেবার যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু বাগ্‌বৈদ্য নেই অথচ বক্তব্য রসাত্মক হয়েছে, এমন সাহিত্যের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। বাগ্‌বৈদ্য আছে, এবং বাক্য রসাত্মক হয় নি, এমন অসাহিত্য খুঁজলেই পাওয়া যায়।

দশট ভুল মনে করেন, যে-অলংকার রসের পোষক নয়, সে-অলংকার অলংকারই নয়, উক্তি-বৈচিত্র্য মাত্র। সূত্রক ও তাঁর 'বক্তোক্তি'র অনেক রহস্য বোঝাবার শেষ পর্যন্ত তাঁর খিওরিকে নিজেই যেন একটু সতর্ক করে দিয়েছেন। বক্তোক্তি, অর্থাৎ উক্তির চাকতা ও চমৎকারিতাই রসবস্তির হেতু, সূত্রক তাঁর এই ধারণাকেই আবার বিচার করে বলেছেন যে, যে-উক্তির চাকতা ও চমৎকারিতা রস সৃষ্টি করতে পারে, সেই উক্তিতেই হল প্রকৃত বক্তোক্তি। অগ্নিপুত্রানের ধারণাকেও এইভাবে সংশোধন করে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, রসবস্তির হেতু হয়ে থাকে যে বাগ্‌বৈদ্য, তাই হল প্রকৃত বাগ্‌বৈদ্য। বাগ্‌বৈদ্যের কারণেই বক্তব্য রসাত্মক হয়।

বাগ্‌বৈদ্য অর্থে নিশ্চয়ই নিছক শব্দসমাহারই অথবা অক্ষর-গুণের ভাষার ঘট। বোঝাবার না। কবি রামপ্রসাদ ধনন বলেন, 'আবার জাগা ঘরে হয় চুরি', তখন তিনি অত্যন্ত বাগ্‌বৈদ্যেরই পরিচয় প্রদান করেন, কারণ বাক্য এখানে শব্দের অভিধা অভিধ্বন্য ক'রে ভিন্ন একটি বাচন্যাভিধান গরিমা লাভ করেছে, অথচ বাক্যের উপাদান হল ছোট ছোট শব্দাঙ্গগুলোর মত অনাড়ম্বর কয়েকটি কথা। বাগ্‌বৈদ্য অর্থে ভাষার সেই রূপ ও প্রকৃতির নির্বাণ বোঝায়, যার ক্ষমতা ভাষা রসবস্তির হেতু হয়ে থাকে। বলতে পারা যায়, ভাষাই একটি সাহিত্যোচিত অথবা সাহিত্যসম্বন্ধ রূপ আছে।

ভাষার 'হুই ব্যবহার' নিয়ে অনেকদিন থেকেই একটা আলোচনার এবং সেই সঙ্গে হুই বাদ-প্রতিবাদেরও আন্দোলন চলে আসছে। সম্ভ্রান্তি পান্ডাক্তার সাহিত্যের আসার এই আলোচনার প্রেক্ষাপে নতুন করে এবং বেশ একটু উত্তেজনা নিয়ে যুগ্ম হয়ে উঠেছে। বাংলারও কোনো কোনো সাহিত্যপত্রিকাতে মাঝে মাঝে ভাষার ব্যবহার-নীতি নিয়ে সম্মেলন এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভাষা সংগঠন বাহক, ভাষা উন্নতির পথে এগিয়ে চলুক, এই রকমই একটা সমীক্ষার আন্দোলন; কিন্তু গাবির রকম মেখে সন্বেহ করতে হয় যে, এ বেন ভাষাকে শাসন করবার ক্ষমতা নানা যুক্তি আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আন্দোলন।

সাহিত্যের ভাষা

আধুনিক কালো ডাডাইস্ট ঐতিহ্যের বাহক বিশেষ একটি লেখক-গোষ্ঠী ভাষাকে বাস্তবায়িত করার আগেই এমন নাবিও করে থাকেন যে, সাহিত্যোচিত ভাষার আদর্শ হবে বাস্তবের ভাষা। যে-দব শব্দ 'প্রাচীন সাহিত্যের আতিথাতিক ঐতিহ্যের' দৃষ্ট, সেগুলিকে পরিহার করতে পারলেই ভাষা বেশি চৌকস ও বাস্তব হয়ে উঠবে; এই রকমই একটি ধারণার ব্যাকুলতা এই অভিনেতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এদের ধারণার মধ্যে আসল তুল এই যে, তাঁরা শব্দরূপের রহস্য এবং ভাষারূপের রহস্যকে একই ব্যাপার বলে মনে করেছেন। বাস্তবী ভাষা-নীতি অহুসরণ ক'রে কখনোই সাহিত্যসম্মত ভাষা রূপ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবী ভাষার প্রচলিত শব্দ ইতিমধ্যে উপমা ও প্রবাসের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। প্রয়োগ-বীতির স্তরে যে-কোনো শব্দ, সে শব্দ যতই অস্বাভাবিক হোক-না কেন, সাহিত্যোচিত ভাষার গঠনে স্থান পেতে পারে।

ভাষার 'দুই ব্যবহার' নিয়ে বিতর্কের প্রশ্ন নতুন ক'রে উত্থাপন করেছেন আর এক শ্রেণীর মনবী। বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনচরিতের মধ্যে সাহিত্যোচিত ভাষার অহুসরণ কেন? এই প্রশ্ন হল তাঁদেরই আক্ষেপের প্রশ্ন, ধারা ভয় করেন যে, সাহিত্যোচিত ভাষার ব্যবহারে বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনচরিতের তথ্যিক সত্যতা বিপর্যাস না হয়ে পারে না।

বৈজ্ঞানিক বস্তু পর্যায়ভেদে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন, ঐতিহাসিক বস্তু ঘটনার বিবরণ প্রদান করেন, তখন তাঁর ভাষা খুবই সাধারণে বিশেষ একটি নিষ্ঠার অধীনতা যেনে নিয়ে তাঁর বক্তব্য রূপায়িত করে। ভাষার এই রূপ নিষ্ঠাতাই বাস্তবায়ন রূপ। ভাষার মধ্যে কোনো অব্যবহার রহস্যের সূচক থাকে না। এই ভাষা তথ্যিকের ভাষা; নিরাস্তর্য বক্তব্য যেন একটা গাণিতিক সূত্রের মতো ধারণ করে থাকে। তথ্যকে জ্ঞানগোচর করার স্তর এই সাধারণীভাব সাহিত্যিক রূপের ভাষা নিয়ে কাছ চালানো যায়। এই ভাষা কেবলো কথা নিয়ে গড়া ভাষা। বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনচরিতের তথ্যিক সত্যটুকুই যেখানে চিন্তার অধিগত করা প্রয়োজন, সেখানে অবশ্যই এই কেবলো ভাষা তথ্য বাস্তবায়ন রূপের ভাষা প্রয়োজন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক কি অস্বীকার করতে পারেন যে, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের তথ্যিক রূপ ছাড়া আর একটি রূপ আছে, যেটা হল ভাবরূপ? ঠিকই, আকাশের মেঘে বিদ্যুতের চমক বিশেষ একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মেই নিশ্চিত হয়। সেই নিয়মের তথ্যিক সত্যটুকু জানা ছাড়া আর কোনো সত্য কি অহুসরণ করার নেই? ঐ বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যেই কি আনন্দ ভয় বিশ্বাস ও বিরুদ্ধতার একটি ভাবময় সত্য নেই? ঘটনা তথ্য ও নিয়মের এই ভাবময় সত্য কিংবা ভাবরূপের সত্যতা প্রকাশ করতে হলে বাস্তবায়ন কেবলো ভাষার সে উদ্দেশ্য দৃষ্ট হবার নয়, তার স্তর মরকার সাহিত্যোচিত ভাষা। বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনচরিতের রচনা সাহিত্যোচিত ভাষার অহুসরণ সেবে সূচক হবার ও উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। বরং বৃথতে হবে যে, বিজ্ঞান ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবনের তথ্যগত সত্যকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্য তার রসের রাজ্যকেই বিস্তারিত করেছে। সাহিত্যের পরিধি প্রসারিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের ও ইতিহাসের ভাবরূপের স্পর্শে ঘনি অহুসরণ সঞ্চিত হয় তবে সেটা যে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের তথ্যিক জ্ঞান-ধারণা লাভের সম্ভাব্য হবে, এমন আশঙ্কারও হেতু নেই। বরং এর ফলে উপলব্ধির পূর্ণতাই লক্ষ্য হয়। জুলিয়াস সৌজর বলতেন, আশার সৈনিকেরা স্বয়ংসিদ্ধ পরিচ্ছন্ন ব্যবহার করে বলেই ভালো যুদ্ধ করতে পারে।

যেমন অতীতে দেখা গিয়েছে তেমনই আধুনিক কালেও দেখতে পাওয়া যায় যে, সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে আর-এক ধরনের খবরদারী মতবাদ মার্কস বাস্তব হয়ে ওঠে, এবং এই মতবাদ বস্তুত সাহিত্যেরই সত্যকে

বিপর্যয় করবার দাবি। সাহিত্যের ভাষার রূপ হবে হিমছান, কাটাছাঁট। ও সামান্যতা; বক্তব্যকে সোচ্চারিত ক'রে বলে দিতে হবে; এই হল দাবি। অতীতে এই রকমই একটা দাবি নিয়ে বড় বেশি নাত্যমাস্তি করেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সর, এবং আমাদের আধুনিক বাংলার সাহিত্যপত্রিকার নিবন্ধেও মাঝে মাঝে ভাষার রূপ সম্বন্ধে সেই পুরানো স্পেন্সরের উল্লেখের পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্য ও কাহিনীর ভাষারূপের উপর রাগ করেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সর। কাব্যিকের ও কাহিনীকারের ভাষা হল সত্যের অপলপ, এই ছিল তাঁর অভিযোগ। নায়েগ্রা সম্বন্ধে এক কবিতা পাঠ করে তিনি কবিকে লিখেছিলেন যে, ঐ কবিতায় নায়েগ্রার রূপের বর্ধার পরিচয় অভিব্যক্ত হয় নি। মলমলার মস্ত আবেগ, ফেনিল উজ্জ্বল, প্রবল কলহর্ষ আর নৃত্যময় তরঙ্গ হিমোল, যত সব কল্পিত অসত্যের কংকার। নায়েগ্রার প্রকৃত রূপের পরিচয় তিনি নিজেই বর্ণনা করে কবিকে জানিয়েছিলেন যে, নায়েগ্রা হল এক শ' বাট ছুট উঁচু একটি মলমলপাত, যার মলমলবাহ্যের ভেলোসিটি হল প্রতি সেকেন্ডে একশত ছুট, ক্লাবোর্ডের বুকন বিশ ছুট পুঙ্খ, এবং প্রতি সেকেন্ডে সাতাশ হাজার টন মল প্রবাহিত হয়ে যায়।

হার্বার্ট স্পেন্সরের নায়েগ্রা নিকটই মিথ্যা নায়েগ্রা নহে। কিন্তু তথ্যভিত্তিকের এই বর্ণনিত বর্ণনার মধ্যে নায়েগ্রার রূপের সব সত্যতা অভিব্যক্ত হয়েছে বলে কেউ স্বীকার করবেন না। তিনি শুধু একটি তথ্যভিত্তিক রূপের সত্যকে পাঠকের জ্ঞানগোচর করেছেন, সেই ভাবরূপের সত্যকে নয়। কবির কাছ থেকে প্রত্যুত্তর পেয়েও স্পেন্সর তাঁর ধারণার সংশোধন করতে পারেন নি। কি লাভ হবে 'ভাবরূপের সত্য'কে প্রকাশ ক'রে, সেটা যে সত্যের একটা ইলিউশন মাত্র? কবি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, সত্যের ইলিউশন সৃষ্টি করাই যে সাহিত্যের সার্থকতা; সত্যের একটা মারিক রূপ প্রকাশ করতে পারে বলেই তো সাহিত্যোচিত ভাষার এক শক্তি।

সাহিত্যোচিত ভাষার বিকল্পে চলনার অভিযোগ এনেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সর। কিন্তু রূপের শিল্পী ও সাহিত্যিক মানেন যে, স্পেন্সর যাকে চলনা বলেছেন সেটাই হল সত্যের নবরূপাংগ, দ্বিতীয় সৃষ্টি। হার্বার্ট তাঁর ভ্রমালে লিখেছেন যে, গ্যালিলিও যদি তাঁর বিগড়িকে তথ্যনিষ্ঠ সরল গম্ভে না লিখে কবিতায় লিগতেন, তবে বোম্বের ডাকে ইনস্ট্রুমেন্টের কবলে পড়তে হত না। হার্বার্ট বোম্বের বলতে চান, সাহিত্যোচিত ভাষার সেই রহস্যময় শক্তি আছে, যার মস্ত তথ্যভিত্তিক সত্যেরই রূপ বিশেষ একটি মারিক আবরণ গ্রহণ করে হুম্বর হয়ে ওঠে এবং সত্যকে বিকল্পবাদীও তার অব্যাহিত তথ্যকে হেরেসি বলে মনে করতে পারে না।

ওকটার ডি লা মেয়ার তাঁর 'এল অন প্রোজ' নামক ছোট গ্রন্থটিতে সাহিত্যের ভাষারূপ সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে গম্ভের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করেছেন। তিনি গম্ভের ছুটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন। একটি হল বৈজ্ঞানিকের ও ঐতিহাসিকের 'ম্যাটার অব ফ্যাক্ট' গম্ভ। অপরটি হল কথাসিদ্ধির ব্যবহৃত 'ম্যাটার অব ট্রু' গম্ভ। অর্থাৎ বর্ণনিত গম্ভ এবং সত্যনিত গম্ভ। ডি লা মেয়ারের শিদ্ধান্ত, এই সত্যনিত গম্ভই হল সাহিত্যের গম্ভ। তিনি সেই গম্ভকেই ম্যাটার অব ট্রু গম্ভ বলেছেন, যে গম্ভ রচয়িতার অহুত্বের উপনয়ন হতে চবিত্ত নান। কুলের মালকের মত রঙীন শোভার ও সৌরভে আয়োজিত। সাহিত্যের বাক্য কতগুলি কেসো কথার পর্যন্ত নয়। সাহিত্যের শব্দ অভিধার বহুনে বন্দী প্রতীক মাত্র নয়। সাহিত্যের ভাষা ধ্বনিবৎ বাস্তবের জ্ঞাপনাও নয়।

সাহিত্যের ভাষা

বস্তু ও বাস্তবের বৈজ্ঞানিক সত্যতা হ'ল কবির হতে পারে না। এক্ষেত্রে উপাশেষকের ভাষা সামান্য অবাস্তবের ছোঁয়াচও ব্যতীত চলতে চায়। এখানে ঝাংঝাংটাই হল ভাষার পক্ষে সবচেয়ে বড় ভয়। কিন্তু বস্তু ও বাস্তবের ভাবরূপের অস্ত্র নেই। কথাসিদ্ধি ও কাহিনীকার বস্তু ও বাস্তবের ভাবরূপ প্রতিচ্ছবিত করেন। এখানে অবাস্তবের, অতুলিত্তির ও বহুতুলিত্তির অল্প অল্প আছে। কথাসিদ্ধির ভাষার শব্দের সত্যতা ও অভিধার বসির হতে নিরঙ্কুশ নূরু ক'রে লক্ষণ। ও বাস্তবের নূতন সিদ্ধিলাভ করে। সামান্য একটি উপমার স্পর্শে বস্তু ও বাস্তবের রূপ এবং তাৎপর্যও নূতন সম্যকতা পায়। অল্পপ্রাণ একটা শাবক কংকর হয়েও ভাব এবং অর্থের নূতন জ্ঞাপনা প্রণীত করে। সামান্যকথন পত্রিকালেককের গল্পসিদ্ধি হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে অতিকথনই হল স্বাভাবিক সীমা। সাহিত্যের ভাষায় বাহ্যলোচন সীমিত স্থান আছে। সাধারণত নিম্নার্শেই বলা হয় যে, সহজ কথাটা ইনিচ্ছে-বিনিচ্ছে বলা হয়েছে। 'ইনিচ্ছে-বিনিচ্ছে' কথাটাকে কটুক্তির পরিভাষা বলে যদি মনে না করা হয়, তবে এই সত্যই স্বীকার করতে হবে যে, বিশেষ সব বেশের সাহিত্যোচিত ভাষাই হল ইনিচ্ছে-বিনিচ্ছে সীমার স্রষ্টা। নিগূর্ণের সব হৃদয়তার সংস্রব প্রকাশের মধ্যে ইনিচ্ছে-বিনিচ্ছে সীমারই শাশন লক্ষ্য করা যায়। গ্রামছাড়া এ রাজ্য মাটির পদ ইনিচ্ছে-বিনিচ্ছে এগিয়ে গিয়েছে, তার গতির মধ্যে শোভা সংকল্পিত শরৎ ঋতুতা নেই। প্রকৃতির রূপের ছবি ও গতির মধ্যে সরল রেখার প্রকাশ নেই। ঋতুতা জানী গাণিতিকের আবিস্কৃত একটা তাত্ত্বিক সত্য। এ বনের লতা আর জলের তেঁউ— প্রাকৃতিক শোভার সব ছাঁইই যে হিমোলিত আকাংক্ষা; দেগার কান্দি। কারিগরও তাঁর মেশিনের স্রষ্টা নানা সামগ্রীর রূপের মধ্যে স্ট্রিমলাইনের ভিন্নতা বলয়িত করতে ভালোবাসেন। অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, এবং সফল ও অসফল কি হ্রস্ব ও বহুর প্রাণ স্রষ্টা করায় কল্প রচিত কল্পই ইনানো-বিনানো ঘটিত আত্মবোধের আল, অথবা বৈচিত্র্যসম্পন্ন বহুরতার ইচ্ছাশাল ?

অভিযোজিত অসংস্কারের প্রাণবহুত, প্রাচীন মনট ভেঙে এই অভিনতকে আধুনিক কালের সাহিত্য-সমালোচক রিচার্ডস-এর অভিমতেও বহন প্রতিরনিত হতে দেখি, তখন মনে হয় ভাষার রূপ সংস্কৃত বুধাই এই নতুন অধৈতবাদ প্রবল হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। রিচার্ডস তাঁর 'প্রিন্সিপাল্‌স অব লিটারারি ক্রিটিকিজম' গ্রন্থে লিখে করেছেন : "বহু আর্টের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে তার রূপনা ও বর্ণনায় অল্প ও অতি প্রচুর আলংকারিক এইরূপ থাকবে। অত্যন্ত স্পষ্টার্থক সামান্যকথন ও রূপভাষার বর্ণনায় যে বিপর্যাস আছে, অতিকথনের মধ্যে তার চেয়ে কম বিপর্যাস আছে। আসল প্রশ্ন এই যে, অপ্রচোদন ও অবাস্তবের বর্ণনা বক্তব্যের বাস্তবাসিদ্ধির অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে কি না ? যদি না হয়ে থাকে, তবে বস্তুতে হবে যে অতিকথনের দ্বারা বহু সমগ্র রচনার উৎসর্গ সাধিত হয়েছে ; সমগ্রত এই কারণে যে, সেই অতিকথনের ফলে বক্তব্যের রূপ অতিরিক্ত একটি বলিষ্ঠ সৌন্দর্য লাভ করতে পেরেছে।"

রিচার্ডসও ভাষার দুই বাহ্যিক রূপ স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক ব্যবহার, যেখানে ভাষা বস্তু-পরিচয়ের বিশুদ্ধ বেকোরেণ মাত্র। এবং ইমোটিভ তথ্য ভাবজোতক ব্যবহার, যার ফলে পাঠক অথবা শ্রোতার মনে বস্তু ও বাস্তবের রূপ সংক্ষেপে বিশেষ একটি আবেগপ্রবণ অহুত্বিত সঞ্চারিত হয়। এই ভাষাই সাহিত্যের ভাষা। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকের 'ম্যাটার অব ফ্যাক্ট' ভাষা যে অভিলাষের স্রষ্টা, তার মধ্যে বৈচিত্র্য আহরণের বিশেষ কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। অপর পক্ষে সাহিত্যিকের 'ম্যাটার অব ট্রুথ' ভাষা অস্বভাবের এবং নিজস্ব নূতন রূপ ও বৈচিত্র্যের এইরূপ নিজে আত্মপ্রকাশ করে। এই বৈচিত্র্যের হেতু কি ?

হেতু হল সাহিত্যরচয়িতার ব্যক্তিক মন। সাহিত্যের ভাষা সৃষ্টি করে রচয়িতার অন্তরে নিহিত সৃষ্টিপ্রবাসী ও স্বপ্নময় একটি অংশ। কবির একটি উক্তিঃ এই ধারণার পক্ষে পাড় করিয়ে বলা যায়, সাহিত্যের ভাষাও রচয়িতার 'স্বপ্ন মনের মাধুরী বিশায়ে' ভাববস্তুর একটি রূপাঙ্কিত সৃষ্টি। বাহ্যিকের কাব্য সত্ত্বেও আলোচনা করতে গিয়ে দেখলে প্রসঙ্গত লিখেছেন যে, বাস্তব জীবনের আচরণে ব্যক্তিক অহমিকা খুবই অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক অহমিকাই হল স্টাইল, বৈচিত্র্যের হেতু। আধুনিক নিউম্যানও বলেন, সাহিত্যের ভাষা হল 'পার্সোনাল এক্সপ্রেসাইজ', ব্যক্তিক অহমীলন। এই ভাষা ঠিক বাইরে থেকে আহরণ করা যায় না। 'অন্তর হতে আহরি বচন আনন্দলোক করি বিহরন'—বাইরের বস্তু ও বাস্তবের অভিজ্ঞতা অন্তরগতের ঘারিত হয়ে নতুন একটি অভিজ্ঞতার পরিণত হয়। এই নতুন অভিজ্ঞতারই রূপ সাহিত্যের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। স্মৃত্যং অস্বীকার করা যায় না যে, সাহিত্যের ভাষা রচয়িতার একটি স্বপ্নের ব্যক্তিক অহমিকার সৃষ্টি। 'মাটার অব টুথ' ভাষা তাই শুধু 'মাটার অব ফ্যাক্ট' ভাষা থেকে রূপে গুণে ও প্রকৃতিতে পৃথক নয়, এই ভাষায় নিজেরই প্রকাশ সহস্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিক অহমিকার সঙ্গে রচনা হয় বলেই রূপের সহস্র বৈচিত্র্য গ্রহণ করে।

স্ববেষ্টিত তাঁর শিল্প যোগ্যতাকে এই উপবেশ দিয়েছিলেন যে—'বক্তব্যের কোনো বস্তুর রূপ প্রকাশ করবার উপযোগী মাত্র একটি কথাই আছে; সেই বস্তুর গতির রূপ প্রকাশ করবার উপযোগী মাত্র একটি ক্রিয়াপদই আছে; এবং তার গুণ বোঝাবার মাত্র মাত্র একটি বিশেষণই আছে।' মাত্র একটি, বিভীষিক কোনো স্থান নেই। সাহিত্যের ভাষারূপ সত্ত্বেও স্ববেষ্টিতের এই উক্তিও এক ধরনের অঐক্যবোধ, বটে। সাহিত্যের ভাষার উপর মনুষ্যগতের ঘোষণার মত একটি মতবাদ। বৈজ্ঞানিকের মাটার-অব-ফ্যাক্ট ভাষায় এই নীতি খাটে, যেখানে বস্তু ও বাস্তবের নিছক একটি তথ্যগত রূপের পরিচয় ব্যক্ত করা হয় লক্ষ্য। কিন্তু সাহিত্য বস্তু ও বাস্তবের ভাবরূপ অভিযান্ত্রিক করে—এবং সেই ভাবরূপের অন্ত নেই। সেই ভাবরূপ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক। স্মৃত্যং একই বক্তব্যের সাহিত্যোচিত প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দবৈচিত্র্য গ্রহণ করবেই। স্ববেষ্টিতের ধারণা যদি নিতুল হয় তবে বলতে হবে যে, সাহিত্যও স্ববিশেষের মত একটি খাতি বিজ্ঞান।

সাহিত্যের ভাষা লেখকের 'পার্সোনাল এক্সপ্রেসাইজ' তথা ব্যক্তিক অহমীলন বলেই এমন ধারণাকে প্রমুখ দেবার যুক্তি নেই যে, লেখকের ব্যবহৃত ভাষার রূপ হবে একটা সাংকেতিক শব্দ-সমবায়ের রূপের মত। পার্সোনাল বটে, কিন্তু প্রাইভেট নয়। ভাষাকে ব্যক্তিগত কোড করে তুলবার অধিকার কোনো কবি বা কথাসিদ্ধির থাকতে পারে না; কারণ কবিতা ও কথা গুণে স্বপ্নময়ের মত শুধু রচয়িতারই ব্যক্তিগত নিবিধ্যাসিতব্য বস্তু নয়। অপরের মনের ঘরে প্রবেশ করবার উপযোগী ক্ষতি হীপ্তি ও প্রসঙ্গে অল্পপ্রাপ্তি হয়ে ভাষাকে সেই সংবেদনা লাভ করতে হয়, যাকে টলস্টয় বলেছেন ইনফেকশন, অপরের অহুতবে সকারিত হবার যোগ্যতা।

ভাষাবিজ্ঞানীদের শাস্ত্রে বাউ-আউ নামে একটা শির্গরি আছে। এই শির্গরি বলে, মানুষের প্রথম ভাষা হল প্রাকৃতিক শব্দগুলির ভঙ্গী অহুকরণ করে কঠোরের নানা ধরনের অভিযান্ত্রিক। বাউ-আউ বস্তুনিষ্ঠ ভাষার আধিন উপাধরণ। এর চেয়ে শব্দগুণে অনবাস্তব প্রাঙ্গল ও সরল ভাষা আর কি হতে পারে? ভাষার চাক্কা, চমৎকারিতা, অলংকার, অহুপ্রাঙ্গ ও অন্ত্যস্ত বাহ্যেস্তর সাজ বর্জন করলে ভাষার সেই

সাহিত্যের ভাষা

আদমি বাউ-আউকে হয়তো ফিরে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যকে আর পেতে হবে না। বহু কোটি বছর আগের গাছের রূপ বড় সরল ও সংকীর্ণ ছিল। না ছিল ফুল, না ছিল ভালপালা আর সবুজ পাতা ও কিশলয়ের সন্মিলন। তার তুলনায় আজকের বনস্পতি খুবই জটিল। কিন্তু যুদ্ধের নয় কি? ভাষাও বাউ-আউ নামক গেই সরল ও সংকীর্ণ এবং রিক্ত ও নিরাতরঙ্গ প্রতীকধারার হীনতা অতিক্রম করে নানা ভঙ্গী, বিভাগের, অভিলেখের ও কর্মের সমারোহ গ্রহণ করে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠতে পেরেছে। অগজেনের বৈদিক ইংরেজীর গাড়ে আট শতটি শব্দ নিয়ে বস্তুর বস্তুত্ব পরিচয় প্রকাশ করা বদ্বিই বা সম্ভব হয়, সাহিত্যের সৃষ্টি নিতানুই অসম্ভব। ভাষার উন্নতির ইতিহাস হল অল্প শব্দ-বাহন্য সৃষ্টির ইতিহাস। প্রাচীন স্পার্টার লাকোনিক আদর্শের মধ্যেও সেই ছল ছিল না, যেটা আজকের সাহিত্যের এক ধরনের ভাষাগত আদর্শের দাবির মধ্যে সুবর হয়ে উঠতে দেখা যায়—কাটাছাঁটা, ছিমছাম লামানো ভাষার দাবি। খুব কম কথা বলাই ছিল লাকোনিকের জীবনের নীতি। যুক্তি ছিল যে, অল্পভাষিতা তথা সামান্যতম মাছকে বলিষ্ঠ পোষণ দান করে, যার ফলে সে বর্জবর্জ হয়ে ওঠে। অল্পভাষিতা শিল্পবনমূলক আচরণ এবং সেটা সাহিত্যেরই উন্নতির জন্য দরকার, এমন দাবি করে নি প্রাচীন লাকোনিক। বহুবৃত্ত শৈলিক তৈরী করার জন্য অল্পভাষিতার দরকার হয়েছিল, বহুবৃত্ত সাহিত্য তৈরী করার জন্য নয়।

সাহিত্যোচিত ভাষার গন্ধেও ছন্দ থাকে। বৈজ্ঞানিকের ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট গন্ধে এই গতিরূপের বলাই নেই, এবং না থাকলেও চলে। সেটসবেরি ইংরেজী গল্পসাহিত্যের ভাষার থেকে অল্প উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত সাহিত্যোচিত গল্প ছন্দোময় না হয়ে পারে না। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি সাহিত্যোচিত ভাষার অনীকৃত হতে পারে নি। কারণ নিচুই এই যে, এইসব পারিভাষিক শব্দ জ্ঞানীদের ভাষিক আধিকার, কৃত্রিম প্রতীক মাত্র। যেগুলি গল্পের ছন্দের পক্ষে হানিকর। সাহিত্যের ভাষায় সেইসব শব্দ এবং সমার্থক প্রতিশব্দও টাই পায়, যেগুলি বস্তুত স্বয়ং এক-একটি বীজ, ভাবনাময় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি এবং গল্পের সঙ্গে সহজে ছন্দোবদ্ধ হয়। জায়েনহফের রচিত এম্পেরাটো বিব্রাভা হয়ে উঠবার স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু কি শোচনীয় ভাষা পরিণাম! ঐ কৃত্রিম ভাষায় দশ হাজারেরও বেশি তথ্য-গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য রচনার চেষ্ঠায় সে ভাষাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে হয়েছে।

কাটাছাঁটা ছিমছাম লামানো ভাষা, এবং বক্তব্য সোজা সরল করে বলে দেবার রীতি সাহিত্যের পক্ষে তার স্বভাববিরোধী কৃত্রিম রীতি। অগভীরের রূপকথার মতো—রমণীয়ার্হপ্রতিপারক্য: লক্ষ্য: কাব্যম্। সাহিত্যোচিত ভাষাকে রমণীয়ার্হপ্রতিপারক্য হতেই হবে। হুতরাং সাহিত্য চিরকালই বহুনিষ্ঠ ভাষিক ভাষাকে পরিহার করে চলেবে। সাহিত্য চিরকালই তার বক্তব্যকে একটু ছুঁয়ে, একটু বাড়িয়ে, কিছুটা রঙীন করে এবং কোথাও বা সংস্কার দিয়ে বলবে। মাঝে মাঝে মাঝামাঝি ইলিউশনও সৃষ্টি করবে সাহিত্যের ভাষা। বস্তুর বাস্তবের খাতি ভাষিক সত্য বিবৃত করবে তদন্ত করিটির রিপোর্ট এবং দায়রা আশলজের মাঝামাঝি বিবরণী। সে বিবরণী অত্যন্ত বাস্তবায়ন হয়েও সাহিত্য হয় না। সে ভাষা সাহিত্যোচিত ভাষাও নয়। সাহিত্যের ভাষা বাস্তব সত্যের ভাবরূপ প্রকাশ করে, এবং সেই হেতু সাহিত্যের ভাষা বহু বৈচিত্র্যে ভ্রমণ হয়ে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস

ঐতিবৃত্ত্যের দর্শন

বাংলা দেশের ইতিহাস যিনি রচনা করতে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি উক্তিন্যস্তিতে স্মরণ করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন নি বটে, কিন্তু বাংলার অতীত সম্বন্ধে তাঁর কৌতুহলের সীমা ছিল না। এ-কৌতুহল বৈজ্ঞানিকের নিশ্চয় অঙ্গুণাঙ্গিত্ব থেকেই শুধু আগে নি, এর ফলে ছিল দেশপ্রেমিকের নিবিড় অঙ্গুরাগ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রাণচেতন। দেশের অতীতকে অবগতন করে প্রকাশ পেয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই চেতনাকে সাহিত্যিক কল্পনায় ভাষা মিলেন। তাঁর একখানি ছাড়া সবগুলি উপক্ৰমই বাংলার অতীত অথবা সমসাময়িক সমাজের চুনিকায় রচিত। বাংলায় প্রাতি গভীর অধ্যবশত তিনি বহুবর্ণন নাম দিয়ে মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। তাকে ঘিরে সৃষ্টি হল বাংলার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি আলোচনার আবর্ত। (বাংলা দেশকে জননী করনা করে মাতৃময় উচ্চারণ করলেন আনন্দমঠে আর মাতৃস্নেহের অঙ্গু উদ্বাহনা বেনারস হয়ে উঠেছে কমলাকান্তের অস্থিরতার আর তার স্বপ্নদর্পনে।)

কবে কেনন করে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বঙ্গপ্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো স্থলিত সম্পূর্ণ জীবনী নেই। তাঁর শিক্ষাকালের সব কাহিনীও আমাদের জানা নেই। বাংলা দেশের ইতিহাস না হলেও সাধারণভাবে ঐতিহাসিক চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালেই নবপ্রবৃত্ত বাঙালীর মনে বেধা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত মনের পরিচয়। বাঙালী যে মানবসমাজ এবং মানবমাত্রি সম্পর্কে গুংগুকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে, এটা আধুনিক মনের একটি পরন কল্যাণকর লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র যখন শিশু, তখন ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল সাধারণ জ্ঞানোপাধিক। সভা। এই সভার সভা ছিলেন হিন্দু কলেজের একজন তরুণ ছাত্র বাঘের বলা হত 'ইয়ং বেঙ্গল' অথবা ইয়ং ক্যালকাটা। প্রাচীন সাংগার মোচনের চেতনা এরা প্রথম জীবনে কিছু উজ্জ্বলভাই করে কেলসেছিলেন; কিন্তু এঁদের এই দিকটাকেই একমাত্র না দেখে নবত্ব রচনায় এঁদের উজ্জ্বলতার পদ্যক স্বকলিতুইই আর বিচার করা প্রয়োজন। সাধারণ জ্ঞানোপাধিক। সভাতেই সর্বপ্রথম তাঁদের সম্বত চিন্তপ্রকর্ষের বিকাশ হল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনবী যুবকেরা এই সভায় কেলব বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করতেন, বাংলার সমাজ এবং দৃষ্টি সেসবের দ্বারাই অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল। জ্ঞানোপাধিক। সভার কিছু কিছু প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়ে সংকলিত হয়েছিল। অনেক পাঠক এইরূপ একটি প্রবন্ধসংগ্রহের সমালোচনা-গ্রন্থে ক্রেও অব ইতিয়া পত্রি দ্রুতি প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত On the Nature and Importance of the Study of History, অপরটি প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত The State of Hindoostan under the Hindoos. এই গ্রন্থটি সম্পর্কে পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্যও^১ প্রাধান্যবোধ্য :

১ The Friend of India, November 5, 1840.

২ The Friend of India, December 3, 1840.

বঙ্গিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস

The greater number of these Essays are either historical or topographical. There is one besides on general knowledge, another on the cultivation of the vernacular language of Bengal, one on Poetry, one on the condition of Hindu women and the last of the volume is on civil and social Reform among the Educated Hindoos. The of these topics will show the practical character of the Society's discussions and not less their patriotic and human aspirations.

এর থেকে বুঝতে পারা যায় নবশিক্ষিতদের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা কী ভাবে প্রসূত হয়ে উঠছিল। এদের ভিতর থেকেই যোগে উঠছে নতুন জীবনের আভাস। দেশ এবং জাতির সম্পর্কেও গঠনমূলক চিন্তা দেখা দিতে শুরু করেছে। বলা যেতে পারে নবায়ত্ত বঙ্গ টেমপলও তরুণ বয়সে দেশের বর্তমান এবং অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা অসুপ্রাণিত করেন। কৃষক মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার ইতিহাসে' লিখেছেন চারটি বিষয়ে টেমপল তাঁদের অঙ্গপ্রস্থান। প্রথমতঃ সকলকেই একবাচ্যে দেশের মূল সাধনে বহুবান্ হতে হবে; দ্বিতীয়তঃ দেশের প্রাচীন ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা উত্তমরূপে জানা প্রয়োজন; তৃতীয়তঃ গবর্নমেন্টের প্রত্যাশিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিনব প্রকাশ; চতুর্থতঃ ইংরেজের স্বায়ত্তশাসন বিষয় রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রসূত হওয়া। 'স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে দেশের ভাগ্য বিচারখুঁজিকে বৈশ্বাসিক কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে কল্যাণকর সংগঠনকার্যে নিযুক্ত করতে চেরেছিলেন টেমপল। টেমপলের শিকার স্বফল ফলেছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কালকাতা রিভিউ পত্রিকা প্রকাশিত প্যারীচাঁদের 'The Zemindar and the Ryot' প্রবন্ধটি টেমপলের অভিপ্রায়ে চরিতার্থ করেছিল। এতে ছিল দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার তথ্যসংগ্ৰহ এবং দেশের মূলসাধনে স্বাধীন বিচারণা। বঙ্গিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক এবং রমণচন্দ্র দত্তের 'The Peasantry of Bengal' পরবর্তী কালে এই আদর্শকেই অঙ্গগ্রহণ করেছিল।

১৮৫০-র পূর্বে একমাত্র সংবাদপ্রকাশকের মাধ্যম ছাড়া কলকাতার বিখ্যাসমাজের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল না। তবে জানা যায়, বাল্যকাল থেকেই ইতিহাসে বঙ্গিমচন্দ্রের অঙ্গগ্রহণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অপেক্ষাকৃত প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়ে তিনি সেকালের শিক্ষিত জনসমাজের ইতিহাসচর্চা পরিচর পেয়েছিলেন বলে অঙ্গগ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ করে বাংলা দেশের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কোনো সন্দেহই আমাদের জানা নেই। স্বয়ং লক্ষ্য করা যায় যে রামবোহন রায় বাঙালীর যে মনোভঙ্গি আগাতে চেয়েছিলেন, তা ছিল ভারতমুখী। প্রাচীন শাসন ইত্যাদির অঙ্গগ্রহণ দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নবরূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সেবেঙ্গ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে, তত্ত্বাবধিনী পত্রিকাও প্রধানত সেই নির্দেশকেই অঙ্গগ্রহণ করেছিল। ১৮৩২ সালে এদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণীতে পাঠ্য হতে থাকে।^১ সেবেঙ্গ্রনাথের তত্ত্বাবধিনী পাঠ্যশালাতেও সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল History of Bengal—সম্ভবতঃ মার্ম্যানের। এই

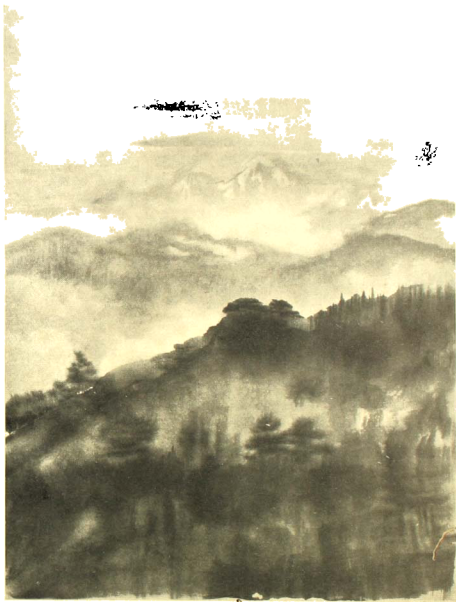
১ বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ (প্রকাশের একশ ১২০০), দ্বিতীয় অধ্যায়

২ এবেঙ্গ্রচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস-সাক্ষ্য (১৯০০), পৃ ১০১

শিকানোভির ক্ষতই বহিমচন্দ্র ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়র সেকশনে বসেতিহাস পড়েছিলেন। বসেতিহাস বিশেষ কোনো বইয়ের নাম না-ও হতে পারে। সেকালে এডুকেশন কাউন্সিলের শিকানোভিতে বাংলায় ইতিহাস পাঠ নিরস্ত্রপীতেই সমাপ্ত হত। স্বতরাং সমগ্রভাবে ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঐচ্ছিক্য প্রকাশ না করে শুধু বাংলা দেশের ইতিহাসে বহিমচন্দ্র কেন আগ্রহী হয়ে উঠলেন তার বিশেষ কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। বহিমচন্দ্র যখন প্রথম বাংলার উপভাস লিখলেন, তখনই দেখতে পাই বাংলার অত্যন্ত তরুণ বহিমকে আচ্ছন্ন করেছে। আচ্ছন্নের বিষয়, তখনও পর্যন্ত বাংলার এমন ইতিহাস প্রকাশিত হয় নি যা বহিমের প্রকা আকর্ষণ করে থাকতে পারে। পরবর্তী কালে যখন তিনি বাংলার ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন, তখনও তিনি স্টুয়ার্ট এবং মার্ম্যানের বাংলার ইতিহাসের প্রশংসা করতে পারেন নি। স্বতরাং এই ইতিহাস দুটি থেকে তিনি বাংলা দেশের গৌরব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মনে হয় না। জুনিয়র সেকশনে তিনি যে বসেতিহাস পড়েছিলেন, সেটা কার রচনা জানা যায় না। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মার্ম্যানের বইয়ের তিনখানি অংশই প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে গবেষণার এবং গোবিন্দচন্দ্র সেনের বই মার্ম্যানকে সমগ্রভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। বিদ্যালয়পর মহাশয়ের বাংলায় ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগে, মার্ম্যানের বইয়ের শেষাংশের অংশগ্রহণ। মনে রাখা দরকার স্টুয়ার্টের বইতে (১৮১০) তুর্কি বিজয়ের পূর্বের বাংলা দেশের ইতিহাস দেওয়া হয় নি; মার্ম্যানের বইতেও (১৮৩২) সেই ইতিহাস একটি মাত্র পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। বাংলাকাল থেকেই বহিমচন্দ্রের মনে বনি বাংলার হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল ভোগে থাকে, তবে তার স্থানাধিগেছিল, এমন কোনো বইয়ের সংবাদ আবারে জানা নেই, একমাত্র গোবিন্দচন্দ্র সেনের অংশগ্রহণে মার্ম্যানের বই ছাড়া। অথচ পরবর্তী কালে বহিমচন্দ্র মার্ম্যানের বই সম্বন্ধে অকরণ দ্বন্দ্ব্য ভো করেছিলেনই, গোবিন্দচন্দ্র সেনের বইয়ের নামও তিনি কোথাও করেন নি।

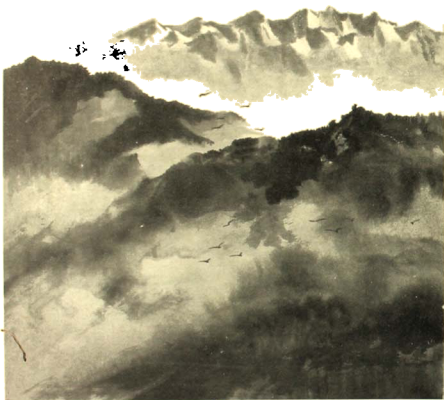
বহিমচন্দ্রের বসনেশপ্রীতির মূল নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থের অংশগ্রহণ না থাকলেও তাঁর এ বিষয়ে অহঙ্ক
মনোভাব গড়ে উঠবার পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের প্রভাব অস্বাভাবিক হতে পারে না। লক্ষ্য করা যেতে পারে সেকালে সুপ্রচারিত সমাচারদর্পণ পত্রিকাকে বহিমচন্দ্র তাঁর কবিতাপ্রকাশের আশ্রয়রূপে গ্রহণ না করে সংবাদপ্রভাকরকেই বরণ করেছিলেন। সমাচারদর্পণ ছিল মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত। এই পত্রিকা বেশী দ্রুতির বিরোধী বলে ঈশ্বর গুপ্ত একে বহুবার সমালোচনা করেছিলেন। সংবাদপ্রভাকর সে যুগে বাংলা দেশ ও সমগ্র সম্পর্কে একটি স্থূলষ্ট মনোভাব অবলম্বন করে দেশপ্রীতির আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলছিল; সে যুগে এটা ঠিক স্থূল ছিল না। বহিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে কবির ষাটী বাঙালী মানসিকতার যে বিশদ আলোচনা করেছিলেন, এ-প্রসঙ্গে তাও স্মরণীয়। এ কথা ঠিক ঈশ্বর গুপ্ত বহুপ্রীতিতে অগ্রপ্রাণিত থাকলেও সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। সংবাদ-প্রভাকরের সংবাদগুলি পর্যালোচনা করলে এ কথা বুঝতে পারা যায়। ‘জননী ভারতকুনি’ নামে যে কবিতাটি তাঁর কাব্যগ্রন্থেই রয়েছে, সেটি আসলে যমেশ্বরের বিবরণ একটি বক্তৃতার উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল।^১ এসব সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ ভাবে বাংলা দেশ এবং সমাজের ক্ষতই তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে নিয়োজিত

১. সংবাদপ্রভাকর; ১লা বৈশাখ, ১২৪৪। গোবিন্দচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে “দ্বিতীয় বঙ্গ বাহন গঠনকর্ম” এবং দ্বিতীয় সংবাদপর সম্পাদক সভাকে এই সভার কলকাতার উপাচার এবং সভাপতি অধ্যাপকসং-এর সভার ইশ্বরচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন।



হিমালয়
গম্বনেজনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী উমাদেবীর সৌজতে



কামনাভঙ্গা
নগরোত্তরাংশ চিত্র

ইন্দী উদ্যোগের সৌন্দর্য

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস

করেছিলেন। বাংলার অতীত নিয়ে সংবাদপ্রভাকর সে রকম ঐতিহাসিক গবেষণা করে নি যদিও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কবিগোষ্ঠাসমূহের দ্বীপনী সংগ্রহ করে এবং ভারতচন্দ্রের দ্বীপনবৃত্তান্ত রচনা করে ঈশ্বর গুপ্ত ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট কোনো সাম্প্রদায়িক আদর্শবাদিতার সকার না করলেও সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় বাঙালী জাতীয় জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে যে মনোবোধ ছুটে উঠেছিল, তরুণ বঙ্গের কঠোর নিষ্পৃহ যুক্তিবাদিতার পর সাধারণ পাঠককে খড়াবতাই তার আন্তরিকতাকে স্পর্শ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রত্নশাল, হেমচন্দ্র এবং অন্যান্য ধারা সংবাদপ্রভাকরের লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই একটি সাধারণ বাঙালী মনোভাবে উদ্ভূত ছিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যদের তুলনায় এসব এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হওয়া স্বাভাবিক। ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক চিন্তাবিদ মনোবী ছিলেন না বলেই বাংলা দেশ সম্পর্কে তাঁর মনস্বত্ব ঠিক ঐতিহাসিক যুক্তিভিত্তিক উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এই অপূর্ণতাই বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

A (বিবিধ প্রবন্ধ, তৃতীয় ভাগের জমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম বাংলার ঐতিহাসিক ভবের অহুসন্ধান করিয়া একখানি বাংলার ইতিহাস লিখিব। অবশেষে অভাবে এবং অন্তের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্তরে প্রবৃত্ত করিবার মন্ত্র মনোবর্শনে বাংলার ইতিহাস লম্বকে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। ব্রহ্মসম্মানের দ্বারা স্বাধীনসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টার সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম।" বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি মিলিয়ে বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু এরই ভিতর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানের বাংলাকে যেটামুটি বৃত্ততে পাতা হয়ে। তিনি বাংলার যে অতীতকে দেখেছেন সে অতীত কীভাবে উজ্জল, প্রাণের আবেগে স্পন্দিত। এ দেখা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের ভাষাসংগ্রহে যার পর্ববসিত করতে তিনি চান নি, যদিও তাকে তিনি ইতিহাস উদ্ভারে প্রাথমিক প্রয়োজন বলেই মনে করেছেন। তাঁর মতে "কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হ্রস্বকম করা চাই।" এই 'ধ্যান' কথাটি দিয়ে তিনি বাংলা দেশের একটি দ্বীপস্থ সমগ্র মূর্তি-কল্পনাকেই বৃত্ততে চেপেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ কল্পনার অভাবে ইতিহাস অনেক সময়েই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় যাত্র পরিণত হয়—পূর্ণরূপ নিয়ে চোখের সম্মুখে সম্মী বহু হয়ে ওঠে না। তবে এটাও ঠিক যে উপাধান সংগৃহীত না হলে মূর্তি-কল্পনা সম্ভব হয় না। বঙ্কিমের সময় পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের উপাধান-সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নি এবং এক রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিকা বাংলার ইতিহাস (১৮৩৪) ছাড়া আর কোনো বই তাকে তৃপ্ত করে নি। তার কারণ আর কোনো লেখকই বাংলা দেশের মৃত্তিকে ধ্যানে আগ্রহ করতে পারেন নি। স্টুয়ার্ট, বার্ম্যান, লেখক—কেউই বাঙালী ছিলেন না। গোবিন্দচন্দ্র সেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে ইতিহাস রচনা করেন নি। বঙ্কিমের ইতিহাসকে যিনি অহুসাগের সঙ্গে সঙ্গতিতে বৃত্ততে চাইবেন, এমন ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎ তিনি তখনও পান নি। এ বিষয়ে রামেন্দ্রলাল মিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল। পুরাত্ত্ব আলোচনার রামেন্দ্রলালকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাথমিক ধরেছেন; কিন্তু আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন, "বাবু রামেন্দ্রলাল নিজ মনে কবির মতো পুরাত্ত্বের উদ্ধার করিতে

পারিভেনে কিছু এক্ষেপে তিনি যে এ পত্রিকায় স্বীকার করিবেন, আমরা এক ভরসা করিতে পারি না।”^১ যদ্যেপন্থে বহুতর বাংলায় ইতিহাস (১৮২২) তখনও প্রকাশিত হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বাংলায় ইতিহাসে রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি রক্ষিত হলেও লোকবৃত্তও তাঁর প্রথম লক্ষ্য ছিল। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটিতে কৃষকসমাজের অত্যন্ত অবস্থা ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যালোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় বঙ্কিম তিন দিক দিয়েই অহুসঙ্কানের সূচনা করেছিলেন—নৃত্য, রাজবৃত্ত এবং লোকবৃত্ত। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্গের ব্রাহ্মণাধিকার (বঙ্গবর্নন, ভাদ্র ১২৮০, অগ্রহায়ণ ১২৮২) এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি (বঙ্গবর্নন পৌষ ১২৮৭ চৈত্র ১২৮৮); দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালার ইতিহাস (বঙ্গবর্নন, মাঘ ১২৮১), বাঙ্গালার কলক (প্রচার, শ্রাবণ ১২২১), বাঙ্গালার ইতিহাসের ভাষ্য (বঙ্গবর্নন, চৈত্র ১২৮২); তৃতীয় শ্রেণীতে, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (বঙ্গবর্নন অগ্রহায়ণ ১২৮৭), বঙ্গদেশের কৃষক (বঙ্গবর্নন, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৭০)। সর্বশেষে উল্লিখিত রচনাটিকে ঠিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলা না গেলেও এতে প্রথম ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় আছে। এই রচনাটি আসলে সর্বপ্রথমে লিখিত হয়েছিল। এই কয়টি প্রবন্ধ ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, যেগুলি ঠিক ইতিহাস-বিষয়ক নয় বটে কিন্তু দেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় লেখা অহুসংগৃহীত। বাঙ্গালির বাহুবল (বঙ্গবর্নন, শ্রাবণ ১২৮১), বাহুবল ও বাক্যবল (বঙ্গবর্নন, চৈত্র ১২৮৪ ও ভাদ্র ১২৮৪) ছটির নাম করা যেতে পারে।

লোকবৃত্তকে জানবার জন্যই তিনি আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস সন্ধান করেছেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্য, কার্ঘ্য—এই প্রধান তিনটি সামাজিক বিভাগ ছাড়াও বাংলা দেশে বহু জাতি রয়েছে, বাঙালীর গোষ্ঠী-নির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের লক্ষ্যকেই দ্রব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যগ্রহসন্ধান ব্যাঘাৎ হয় নি। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত কোলকাক সাহেবের Enumeration of Indian Classes প্রবন্ধটির পর মোটামুটি তাঁরই বিরোধ-পদ্ধতি সমগ্র উনিবিংশ শতাব্দীতে অহুসংগৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করে আশ্রয় করা হয়েছে পুরাণ তত্ত্ব নয় প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য। কুকনোহন বন্দোপাধ্যায় রচিত Hindu Caste প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।^২ বাঙালীর সমাজ-বিভাগ সম্পর্কে একটা ধারণা এতে জন্মালেও ইতিহাস-নির্ণয়ে এই পদ্ধতিতে নির্ণেয় বলা চলে না। লালমোহন বিদ্যানিধির লব্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থটিও এই কারণেই ইতিহাস হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গের ব্রাহ্মণাধিকার’ এই গ্রন্থখানি অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। আধুনিক গবেষণার ফলে এর অনেক সিদ্ধান্তই আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। উনিবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে আর্থ-গৌরব-বোধ দেখা দিয়েছিল আজ দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য তার অহুসংগৃহীত নয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রসিদ্ধানযোগ্য এই জন্ত যে তাঁর মধ্যে যেমন আর্থ-গৌরব-বোধ ছিল, তেমনি আর একদিকে ছিল সমগ্রভাবে বাঙালী সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছেন, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা দেশে আর্থ ছিল না। একাদশ শতাব্দীতেও আর্থ ব্রাহ্মণ এসেছে ছিল বিরল। এতে আমাদের প্রাচীনত্বের কিছু হানি হলেও “আমরা সেই প্রাচীন আর্থপ্রতি সন্তুষ্টই রহিলাম— বাঙ্গালার ধন আসি না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্থ। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্থগণ বাঙ্গালার ভাবু

১ বাঙ্গালার ইতিহাস

২ Calcutta Review, January-June, 1851.

বন্ধিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস

কিছু মহৎ কীর্তি রাখি। যান নাই—আর্থকীতিক্রমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা হইতেছে যে আমরা সে কীর্তি ও বশেরও উত্তরাধিকারী।

“আমাদের আর একটি কলয়ের লাভ হইতেছে। বঙ্গালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গভ্রম করেন। তখন বঙ্গীয় আর্থগণের সংখ্যা অধিক সম্ভব নহে, ইহা অসম্ভব। তখনও তাঁহারা এ দেশে ঔপনিবেশিক ন্যায়। স্বতন্ত্রাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর কৰ্ত্তৃক বঙ্গভ্রমের যে কলক, তাহা আর্থগণের কিছু কমিতেছে বটে।”^{১৯} বাংলার ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাটুকু বন্ধিমচন্দ্রের। এই ব্যাখ্যাতে ভুলে উঠেছে গভীর সোনারবোধের আভাস। বন্ধিমচন্দ্র বাংলার যে ইতিহাস চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে বেশপ্রমের ব্যগ্র ব্যাঙ্গলভট্টই থাকবে এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। বন্ধিমচন্দ্রের সদস্যময়িক কালে বাংলা দেশে যে আর্থ-গর্ভ-বোধ স্ফুট হইয়াছিল, বন্ধিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যাটুকু তারই একটা প্রকাশ বলে দর। যেতে পারে। যদিও এক দিকে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিলে তথাপি উত্তর-ভারতীয় আর্থকেই আমাদের পূর্ণগুরুত্ব কল্পনা করে নতুন জাতিগঠনের আকাঙ্ক্ষা ধারণিত হইয়াছিল। বঙ্গের আর্থগণিকার প্রবণের উপলব্ধিতে সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু সে যুগে বাংলার ইতিহাস কল্পনায় বন্ধিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙালী জাতি বলতে তিনি শুধু উচ্চ বর্ণকেই ধরেন নি যদিও এ বিখ্যাত তাঁর ছিল যে উপরের স্তরে প্রায় কেবলই অর্থ, নিম্নস্তরে রয়েছে বাঙালী অনাথ বা মিশ্রিত আর্থ এবং বাঙালী মুসলমান। “এই স্তর দুই হইতে দেখিতে বাঙালী জাতি অমিশ্রিত আর্থগাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙালার ইতিহাস এক আর্থবিশেষ জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।”^{২০} স্বতন্ত্রাৎ বাংলার ইতিহাস অর্থ যেমন শুধু রাজকাহিনী নয়, তেমনই শুধু উচ্চবর্ণের কীর্তির ইতিহাসও নয়। সাময়িক ইতিহাস রচনার প্রেরণাতেই যেমন তিনি এক দিকে বঙ্গের আর্থগণিকার, বাঙালীর উৎপত্তি এবং ইংরেজীতে Origin of Hindu Festival রচনা করেছিলেন, তেমনিই বঙ্গবৈষ্ণবের কৃষ্ণ প্রবন্ধেও অর্থনৈতিক লোকবৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বাংলার ইতিহাস রচনার রাজকাহিনীকে মাত্র একক প্রাধান্য দেওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনি রাজবৃত্তকে একবারে বহিষ্কৃত করলেও ইতিহাস রচনা বাধা খুঁজে পাবে। আমাদের লোকজীবন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আপাতসৃষ্টিতে অচঞ্চল বলে মনে হতে পারে কিন্তু সংঘাত সেখানেও এসেছে; কোনোবার সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে প্রধান, কোনোবার অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষণীয়। নতুন ধর্মের উদ্ভব, সাহিত্যের নতুন বিকাশ, সাধারণ জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন— বাংলার ইতিহাস বিচার করলে এ সবই লক্ষ্য করা যাবে। পাল, সেন, পাঠান অথবা মোগল রাজবৈষ্ণবের সামাজিক জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবর্তন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। স্বতন্ত্রাৎ লোকবৃত্ত ইতিহাস রচনার প্রধান হলেও রাজবৃত্তের কাঠামোটিকে অঙ্গস্বরূপ না করলে চলে না। বন্ধিমচন্দ্রের অভীত আলোচনায় বাংলার ইতিহাসের এই দিকটির সম্পর্কেও ইঙ্গিত আছে। মনে হয়, তাঁর কল্পিত বাংলার ইতিহাসে চারটি স্তরভাগের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম, তুর্কী বিজয় পর্যন্ত; দ্বিতীয়, মোগল বিজয় পর্যন্ত; তৃতীয়, ইংরেজ বিজয় পর্যন্ত;

১৯ বঙ্গের আর্থগণিকার

২০ বাঙালীর উৎপত্তি, সপ্তম পরিচ্ছেদ

চতুর্থ, ইংরেজ বিদ্রোহের পর। অবশ্য ইংরেজ বিদ্রোহের পর বাংলা দেশের ইতিহাস রচনা করবার সময় আগে নি। ইংরেজ রাষ্ট্রে বাংলা এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস কি রকম পাড়াতে পারে, তার ইচ্ছিত অবস্থা তাঁর রচনার আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, এক রাজসিংহ ছাড়া তাঁর সব উপন্যাসই বাংলা দেশের ভূমিকায় রচিত। এর মধ্যেও আবার কোকুহলের বিষয়, ইতিহাসের প্রধান ধূগসন্ধিগুলি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের কাল-পরিবেশ রচনা করেছে। তুর্কী বিষয় নিয়ে মুগালিনী, মোগল বিষয় নিয়ে দুর্গেশনন্দিনী, ইংরেজ বিদ্রোহ নিয়ে আনন্দবঠ। মোগল-পতনের ধূগান্তর কালের উপন্যাস সীতারাম। বলা বাহুল্য, উপন্যাস-রচনা ইতিহাসের ধারাবাহিক কালক্রম ধরে হয় নি। দুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাসকে শুধু কাহিনী বিগাষেই নেওয়া হয়েছে; তাতে লেখকের কোনো অভিপ্রায় এসে দৃষ্ট হয় নি। মুগালিনীতে সচেতন ইতিহাস-মিত্রাণার সঙ্গে দৃষ্ট হয়েছে দেশপ্রেম। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে বিশেষত সীতারাম এবং আনন্দবঠে ইতিহাস যেমন উজ্জল, দেশপ্রেমও ততখানি গভীর ভাবেই আভাসিত।

মুগালিনী (১৮৬২) রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন ইতিহাস-সম্বাদী মন মেগে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষণাবতী বিষয় বর্ণনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি: “যদি বঙ্গের পরে দ্বন্দ্ব ইতিহাস-লেখক দিনহাটউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? বঙ্গ-মহত্ত্বের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাক্রান্ত, মহত্ত্ব সিংহের অপমানকর্তা স্বল্প চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্ত চিত্রকলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মহত্ত্ব মুদিকত্বা প্রভীতমান হইত সম্ভব নাই।”^{১১} ঠিক এই উক্তিরই প্রতিফলন পাই বহু পরের রচনায়: “নীতিকথা বাংলাকালে পড়া আছে, এক মহত্ত্ব এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে মহত্ত্ব সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মহত্ত্ব এক সিংহকে ডাকিয়। সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা স্বধনও ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।”^{১২} মুগালিনীতেই লক্ষণাবতী বিষয়ের পর মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে যে কথা বলেছিলেন, সেটাও বঙ্কিমেরই কথা—“বঙ্গেরা নবদীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদীপ তো পৌড় নহে।”^{১৩} এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে “উত্তর বাঙ্গালা, দক্ষিণ বাঙ্গালা কোন অংশই বখতিয়ার বিলিঙ্গি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্ব প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার বিলিঙ্গি সমস্ত পৈত্ব লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সম্ভবন অসমারোহী লইয়া বখতিয়ার বিলিঙ্গি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে সে তুল্যভার।”^{১৪} বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি বে নৈহাত দেশপ্ৰীতির অঙ্কতা থেকেই উচ্চারিত হয়েছে তা বলা ঠিক নয়। কারণ পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকেরাও বানহাটউদ্দীনের উক্তিতে সম্ভব প্রকাশ করেছেন।^{১৫}

১৫. ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ মোগলদের দ্বারা অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত বাংলার পাঠান রাজত্বকাল সম্পর্কে

১১. মুগালিনী ৪ খণ্ড, ৪ পরিচ্ছেদ

১২. বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১৩. মুগালিনী ৪ খণ্ড, ১২ পরিচ্ছেদ

১৪. বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১৫. বঙ্গচন্দ্র বসুদ্বার, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৫২) পৃ ১২-১৩

বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ছিল সন্ত্রস্ত। পাঠান এবং মোগল সাম্রাজ্যের তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন পাঠানেরা স্বদেশ বলে এদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু মোগলরা এ দেশ ভয় করেছিল বটে, কিন্তু বঙ্গভূমিকে স্বদেশ বলে কখনোই গ্রহণ করে নি। পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্যের তুলনার এই ইঙ্গিত তিনি সাম্রাজ্যিক মুখোপাধায্যের বই থেকে পেয়েছিলেন মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙালীর মানসিক ক্ষোভটি পাঠান রাজত্বকালের মত আর কখনোই হয় নি। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ে বাংলা সাহিত্যের উজ্জীবন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চৈতন্যের আবির্ভাব হল এই সময়ে। তাঁরই প্রেরণায় কৃন্দাবনের বড়গোবাবা বিভিন্ন বৈষ্ণব নিবন্ধ রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপন করে গেলেন, বৈষ্ণব পদকর্তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল পদাবলীর গান; ব্রজবুলির সৃষ্টি হল এক নতুন কাব্যভাষারূপে। রামায়ণ মহাভারতের অমূল্য ইতিপূর্বেই শুক হয়ে গিয়েছিল, এবার ভাগবতের অমূল্য ব্যাপকভাবে হতে লাগল। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় বৃকতে পারা যায়, নব্যভাষ্য প্রভৃতি বিস্তৃত জ্ঞানের চর্চা বেশে প্রকাশ লাভ করেছে। বহুনাথ শিরোনিধি এলেন আর স্বর্গে বহুদেব প্রাচীন হিন্দু সমাজকে নতুন বাবুদ্বায় বেঁধে দিলেন। এক কথায় বলতে গেলে সেই প্রাচীন উক্তি—কাব্যোপাধি কোমলদ্বিধা বহুদেব নান্তে, তর্কোপাধি কোমলদ্বিধা বহুদেব নান্তে—সার্থক হয়েছিল মোগল শাসন বেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্বেই। মোগল শাসনের পূর্ববর্তী এই উজ্জীবন সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্যীয় এই যে, এতে অহঙ্করণের চেয়ে নৌলিকতাই ছিল বেশি। উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জীবনের সঙ্গে এর পার্থক্য এইখানেই। আধুনিক নব্যভাগ্যের ধানিকট। বিশেষতঃ সংস্কৃতির অহঙ্করণ ছিল এবং এর সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘অহঙ্করণ’ নামে প্রবন্ধটি লিখতে হয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর উজ্জ্বল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জাতির স্বতন্ত্র থেকেই এসেছিল।

এই প্রাণনিধা মোগল শাসনকালে অহঙ্করণ হয়ে এল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস প্রবন্ধে লিখেছেন, “যে আকবর বাদশাহের আনন্ড শতমুখে প্রকাশ্য করিয়া থাকি, তিনিই বাংলার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাংলার ঐশ্বর্যনির আদম্ব। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের বন্ধু। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত একখানি ভাল এম বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাংলা দূর্বল হইল, সেই দিন হইতে বাংলার ধন আর বাংলার রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার বায়নির্বাছ্য প্রেরিত হইতে লাগিল।” বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সারবস্তা আমরা বৃকতে পারি যখন ভেবে দেখি মোগল শাসনে সত্যি বাঙালীর মনের ক্ষেত্রে কোনো নবীন শক্ত জন্মে নি; শুধু পূর্বে উদ্ভাবিত শক্তের থেকেই বীজ বপন করে যাওয়া হয়েছে মাত্র। পূর্ববর্তী কাব্যের আদর্শকে অহঙ্করণে বহিঃপাতিপাটে মনোহরণ করে বঙ্গ কাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্যের দুই ধারা চলে আসে। ধর্মের দিক দিয়েও বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভীর্ণা ত্রিভিত হয়ে শাক্তধর্মের প্রাচ্যের পথ হারায়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মোহাঙ্কদের দাবী এবং বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস রচনার সঙ্গে পদাবলী-সংকলনও হতে থাকে। এগুলি ঠিক নৌলিক নয়, নৌলিক স্তরের সালতামাযী। মোগল শাসনে একখানি ‘ভাল এম’র অভাব বলতে বঙ্কিমচন্দ্র

বোম্ব হই পূর্ববর্তী যুগের প্রতিভার স্বাভাবিক উৎসারকেই স্বরণ করেছিলেন। পাঠানকে যে বহিঃরাজ্য বাংলার মিত্র বলে আখ্যাত করেছেন, তার কারণ পাঠানরা ভিত্তিমাতীয়ে হলেও বাংলাকেই যশস্বত্বপে গ্রহণ করেছিলেন। পরন্তু বোম্ব রাজারা নিরী থেকে স্বাধিকারের সহায়তায় শাসন করতেন বলে বাংলাদেশ তাদের করবারাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বহিঃরাজ্যের এই অভিযোগ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সমর্থন করবেন : "Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. The viceroys and officers came and went without taking any real interest in the life of the province. A considerable part of the resources of the land was drained away to Upper India in the form of presents or cash tributes."^{১০}

বোম্ব শাসনের এই বৈদেশিক প্রকৃতির মধ্যে স্বফলও ছিল, বহিঃরাজ্য তাকে সম্বরণচিন্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। পাঠান শাসনকালে বাংলা দেশ আপন গভীতে সংকুচিত হই পড়েছিল। বোম্ব শাসনেই বাংলা বাইরের উত্তর-ভারতীয় জীবনধারার পথে এসে পড়িল। শুধু তাই নয়, আকবরের শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে অনেকটা শান্তি ও শৃঙ্খলা এনে দিল। আকবরের বন্দোবস্ত জয়ের পর নতুনতর শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সেই সঙ্গে জোড়রমলের রাজস্ব-বন্দোবস্ত বিন্ধুলার মধ্যে শৃঙ্খলা এনে দিল। বোম্ব রাজস্বের প্ররোচনে জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব; কর সংগ্রহের ক্ষত্র এদের সৃষ্টি। রাজার রাজস্ব আদায় করে দায় বত বেশি লাভ থাকত, সে ততই ধনী হই উঠত। স্বতন্ত্রাঃ এদের বলা যেতে পারে করসংগ্রহের কনট্রাকটর। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে, বোম্ব রাজস্বের পূর্ব থেকেই বাংলা দেশে জমিদার-জাতীয় কয়েকটি রাজপরিবার ছিল, কিন্তু এটাও ঠিক যে, বোম্ব যুগে রাজস্বব্যবস্থার ক্ষত্র ছোটোবড়ো অংশা জমিদার দেশে এক নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করে। 'করসংগ্রহের কনট্রাকটর' কথাটি বহিঃরাজ্য সম্বন্ধে ওয়েস্টল্যান্ডকে অমুসরণ করেই প্রয়োগ করেন। জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের প্রজাপীড়ন সম্পর্কে বোম্ব শাসনকে দোষারোপ করে বহিঃরাজ্য 'বন্দোবস্তের কৃষক' প্রবন্ধে যে অভিনব প্রকাশ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ঠাৱই যত মনে করলে ভুল হবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের পুঁথোজিবিভ প্রবন্ধেও এই তথ্যটিই বোঝানো হয়েছে—

"The word Zemindar, although an indefinite term, has no reference, like other Persian words of similar termination to ownership of land. This innovation in name was followed by another of a more radical nature. And it arose from a love of exaction. Several districts were incorporated into one great fiscal division and committed to the charge of individuals who were designated Talukdar or Zemindar-Talukdar. This Talukdari or farming system on an extensive scale— was vigorously carried on in Bengal by Jaffer Khan alias Murshidkuly Khan, in consequence of his having found the ancient Zemindars reluctant to submit to his extortions. The Zemindar-

বন্ধিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস

Talukdars were neither the actual collectors, nor did they in any way bring themselves in contact with the people. They were averse to this trouble and they farmed the revenue to others between whom and the Government they stood as middlemen.^{১৭}

ইংরেজরা এ দেশে এল মোগল সাম্রাজ্যের উন্নয়নশীল। জমিদারেরা তখন প্রবল হয়ে দিল্লীর শাসন লক্ষ্য করতে গাহনো হয়ে উঠেছে। এই সময়কে দৃষ্টপট করে বন্ধিমচন্দ্র একাধিক উপভাগ লিখেছেন। সীতারাম, বেবীচৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, আনন্দনন্দ— এই চারখানি উপভাগ মোগল রাজত্বের পতন এবং ইংরেজ শাসনের অধ্যায়ের মাঝামাঝি সময়ের ইতিহাস আশ্রয় করে রচিত। কেন্দ্রের শাসন বন্ধন শিথিল, তখন সেই বিন্দুখলার যুগেই সীতারামের মতো রাজার উদ্ভব। তারপর দেশব্যাপী অরাজকতা এবং বিন্দুখলার স্বযোগে ইংরেজ ভারতভূমিতে সাম্রাজ্য বিস্তার করল। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্র ইতিহাসের এই যুগসন্ধির কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। কেন ইংরেজ বাংলা দেশকেই সাম্রাজ্য স্থাপনের পাদপীঠরূপে ব্যবহার করতে পেরেছিল, সে প্রশ্নের উত্তর বন্ধিম-সাহিত্যে নেই।

ইংরেজরা দেশের শাসনভার গ্রহণের পূর্ণ মাঘিহ বীকার করবার পূর্বে মধ্যস্থর ইত্যাদি যে বিপদগ্রস্ত হয়েছিল, আনন্দমঠে তারই পটভূমিতে লেখা। অবশ্য আনন্দমঠে সমাদ্রী-বিশ্রোহের ঐতিহাসিকতা তিনি রক্ষা করেন নি। উপভাগ বলেই আমরা এখ থেকে ইতিহাস-চিত্রাটিক প্রত্যাশা করি না। এই বিক্রোহ বন্ধিমচন্দ্রের কল্পনাকে মহোচ্চল রাগে রঞ্জিত করেছে। আনন্দমঠে বন্ধিমচন্দ্র অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে পথক্ষেপ করেছেন। ভবিষ্যৎ বাঙালীর অস্তবিস্ময় ও বিবিধবিধক জ্ঞানের স্থলভাগ সমৃদ্ধির তিনি স্বপ্ন দেখছেন। আনন্দমঠে ইতিহাসের অতীতচারণ মুখ্য নয়, ভবিষ্যতের প্রত্যাশাই মুখ্য। এই যুগটি নিয়ে বন্ধিমচন্দ্রের কোনো প্রবন্ধ নেই, শুধু বঙ্গদেশের কৃষকে এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। শ্রীযুক্ত দত্তনাথ সরকার এই যুগটি সম্বন্ধে বলেছেন, “বেবীচৌধুরাণীতে বর্ণিত যুগে ইংরেজেরা জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত করতেন, মিলামে সর্বোচ্চ ধরে এক এক বৎসরের জন্য (পরে একবার ৫ বৎসরের জন্য) জমিদারীগুলি ইজারা দেওয়া হইত। ইতিহাস-পাঠক সর্বমুখেই দেখিয়াছেন যে এই কুপ্রথাই কল ভীষণ প্রজাণীড়ন, চাষের হ্রাস, জমিদারের সর্বনাশ এবং রাজ্যের নিরক্ষর বাদিক আয়ে দ্রুত অবনতি। দেশের এই দুর্দশার চির বন্ধি ঠিক আঁকিয়াছেন, ইহার কোনো অংশ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আর বাহাই কক্কর না কেন, অনেক বৎসর পরিত্রা মফঃস্বলে শান্তি, প্রজার সুখ এবং রাজত্বের নিরীকতা আনিয়া দেয়।”^{১৮} বন্ধিমচন্দ্র অবশ্য কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করতে পারেন নি। তাঁর মতে এতে উৎপীড়ন ঠিকই চলল, শুধু জমিদারেরা উৎপীড়ন করার চিরস্থায়ী অধিকার পেলে।^{১৯} এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র ভিন্ন মত পোষণ করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বন্ধিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা তাঁর চিন্তার অগ্রগামিতার পরিচয় দেয়।^{২০}

১৭ Calcutta Review, 1846, No. XII, Vol. VI. The Zemindar and the Ryot.

১৮ বেবীচৌধুরাণী, বন্দার সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কুলা।

১৯ বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

২০ বিদ্যাসরী পরিচয়, বৈষ্ণব-আখ্য, ১৯০৬ সংখ্যার অধ্যাপক তথ্যোৎসব বস্ত্র দিবস ‘রমেশচন্দ্র বসু ও তারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস’ প্রবন্ধ উল্লেখ।

ইংরেজ রাজত্বের মহালোচনা বহিঃমুখ্য করুন নি। পাক্ষাত্য সভ্যতাকেও তিনি কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজ শাসনকেই চেয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে ইংরেজরা যে অধ্যায় রচনা করতে এসেছিল, সেই অধ্যায়কে উনবিংশ শতাব্দীর কোনো মনীষীই লম্বু করে দেখতে পারেন নি। সে যুগের মনীষীদের মধ্যে এক দিকে প্রথম দেশপ্রেমী আর একদিকে ইংরেজপ্রেমী অনেককেই বিভ্রান্ত করে। কিন্তু এটাই ছিল ইতিহাসের শিক্ষা। রামমোহনের যৌবনীতেও কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, "In his youth he was violently opposed to the English Government. But as he saw more of it, and learnt to compare it with the Mahommedan Government his strong aversion was converted into a warm admiration for its general character. He considered the conquest of this country by the English nation as a providential interposition calculated to answer important ends in the economy of the moral world. Though he was fully cognizant of the complex organization of the Government and of all wrongs and grievances inseparable from its operation, yet he cheerfully and gratefully admitted the manifold blessings it conferred on his country; and was strongly of opinion that the English were better fitted to govern it than the natives themselves."⁴³ রামমোহন সম্পর্কে প্রযুক্ত এই কথাগুলি সেকালের প্রায় সকল মনীষী ব্যক্তিরই কথা বলে ধরা যেতে পারে। তাঁরা বঙ্গভূমির ইতিহাসকে ধূসর অতীত থেকে হৃদয় ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনার প্রসারিত দেখতে পেয়েছিলেন। এক সময়ে তার গৌরব-দীপ জ্বলে উঠেছে, এক সময়ে দুশাসনে বিপর্যয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছে। একটি দুর্বল বলিষ্ঠ সভ্যতার রক্ত আঘাতে সেই মৃতপ্রায় দেহটিকে যদি সজীবিত করে তোলা যায় তবে বিদেশী বলেই তাকে পরিহাস করা অস্বাভাবিক। বাংলা দেশের আধুনিক ইতিহাসে বহিঃমুখ্য সেই আশাই পেয়েছিলেন।

সুকন্যার

বিভাগসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে বিভাগসাগর মহাশয়ের স্মরণ-সভা বছর বছর হয় কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিভাগসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহৎগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দর্শন-মার্কিন্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিভাগসাগরের যেটি লক্ষ্যের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীর তিরস্করণের দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতেন।

এর থেকে একটি কথাই প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বন্ধ হয়ে আছেন বিভাগসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জয়গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জয় দ্বারা মধ্য আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না।) যে গল্প বলে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু জোবা আছে; বহমান গল্প তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গল্পকেই বলি আধুনিক। বহমান কাগলগার সঙ্গেই বিভাগসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিভাগসাগর ছিলেন আধুনিক।

বিভাগসাগর ত্রাণ পত্রিকার বংশে জয়গ্রহণ করেন, তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন।— এমন দেশে তাঁর জয় হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানুষের সংসারকে নিরন্তর অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের অভিমুখে নিয়ে যেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকেরা বিচল করে নি, এবং তাকে বিপ্লবজনক মনে করে তার পথে সহস্র বাধা বেঁধে শত্রুরা তাকে নিরাসন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৎসবে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। এতেই তাঁর চরিত্রের অনাম্যভাৱে ব্যক্তি হয়েছিল। দীর্ঘ প্রকৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু চরিত্রবল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। দ্বারা সর্বলচরিত্র, বাবের চরিত্রবল কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিগত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধিগত, সেই প্রবলের অতীতের বিমিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশেষে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন না। তাঁদের বুদ্ধির চরিত্রবল প্রথার বিচারহীন অস্থাপনকে শাস্তিগত হয়ে মানতে পারে না। মানসিক চরিত্রবলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। দ্বারা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পথ শাখিকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পারিঃ-শ্রদ্ধা, বিভাগসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমরা মনে এই সভ্যটি সব-চেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।

বর্তমানকাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্ দিকে ঘুর ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার জিনিস। দ্বারা বর্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে শিখর দিকেই ফিরে থাকে তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্তী হবার পথ বিধা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিরন্তর দেখে ব'লে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে থাকতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে সভ্য হ্রদ অতীতের

মধ্যেই তার সমস্ত কলম ফিলিয়ে শেষ করে ফেলেছে; তার। বলে যে তাদের ধর্ম-কর্ম বিষয়-ব্যাপারের ধাক্কা উভয় ভাষা-ভাষা থেকে পরিপূর্ণ আকারে উঠতে হবে চিরকালের জন্য তবু হতে গেছে, তার। প্রাণের নিচম অঙ্গাঙ্গীকে ক্রম বিকশিত লাভ করে নি, স্বতন্ত্র তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বলে ছিনিসটাটা তাদের নয়।

এইরূপে, স্বপ্ন-পূর্ণ প্ৰত্যেক মধ্য, অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিন্তকে অবলম্বন করে তার মধ্যে বিস্তার করা আমাদের দেশের লোকের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্যগোচর হয়, এমন-কি আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যেও এর সমর্থন পোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নতুন করে ঘাটাই করে নেওয়া, সংসারকে নতুন পথে বহন করে নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ ধারা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অহঙ্কৃত্য করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে নেবে।

সত্য যুগে যুগে নতুন করে আবিষ্কার করা যেবার সত্য যুবকদের মনোহর আহ্বান করেন। সেই-সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের-ছব-বর্ণনা-পাঠী পুরাতন মিথ্যা পরিত্যক্ত হয়। সব-চেয়ে ক্রোধের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকরা এই আহ্বানকে অব্যবহার করেছে। সকল-প্রকার প্রত্যাহসকে চিরন্তন বলে কল্পনা করে কোনো হককে শাস্তিতে ও আরামে বনকে অলস করে রাখতে তাদের মনের মধ্যে গীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এইটাই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেইজন্যেই আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রাহ্মণ পরিভ্রমের ঘরে ভ্রমগ্রহণ করেও এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের ভেদ, কর্তব্যের সাহস অহঙ্কৃত্য ক'রে ধর্মবুদ্ধিকে অধীকৃত্যের সত্যে গাড়িয়ে-ছিলেন। এখানেই তাঁর ধর্মার্থ রহস্য। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণতন্ত্রকে ক্রটিপূর্ণ আঘাত ও অপমান করেছিল তার ইতিহাস আজকার দিনে জান হয়ে গেছে, কিন্তু ধারা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে তিনি কত বড় সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের স্রোতে গাড়িয়েছিলেন। তিনি মরা হয়েছিলেন বলে গোরব করতে পারি নে। কারণ, সত্যের মধ্যে দুই প্রতিফল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকার প্রকার। কিন্তু ধর্মবুদ্ধি ধারা ব্যতিরেকে পরলব পান তাঁরাও অন্তরে মরা হন, এই কথাটি কেনে আর আমরা তাঁর অধীকৃত্য করব।

বিশ্বাস্যপূর্ণ আচারের দ্বারা আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাকাতা ও প্রাণ বিস্তার মধ্যে সঞ্জিলনের সঙ্কট-স্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির উদ্যোগ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বা-কিছু পাকাতা তাকে সন্তোষ বলে অপমান করেন নি। তিনি জানতেন, বিস্তার মধ্যে পূর্ণ-পশ্চিমের দিগ্বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংকটভাষ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অতএব তিনি বর্তমান দুর্ভাগ্যের বিস্তার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রগতি করবার প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টার পাকাতা বিস্তার আদর্শ করেছিলেন।

এই বিশ্বাসবিশ্বাসের তার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যার বাইরের ব্যবহার বেশ কৃত্য। প্রাচীন, কিন্তু গীর অন্তর চিরনবীন। অসম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করে তিনি বিশেষের বিভাগকে আভিষেক বরণ করতে পেরেছিলেন এইটাই বড় বড়ীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশি বয়সে বিশেষ বিজ্ঞান প্রবেশলাভ করেন এবং তাঁর পুত্র বালাকালে ও পুত্রবাহুব্রজে সংস্কৃতবিজ্ঞানই চর্চা হয়েছে। অতএব তিনি কোনো বিলম্ব বনোভাব না নিয়ে অতি প্রগতিতে পাকাতা বিভাগে গ্রহণ করেছিলেন।



বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিব্যক্তি লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্তত করে গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্ছে এইভাবে বাধা অপসারিত করে ভাবী যুগে যাত্রা করবার পথকে মুক্ত করে দেওয়া। তাঁরা মাহুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাণ্য ঘোচন করে দেন। কিন্তু বাধাই যে দেশের বেবতা সে দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান করতে জানে না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে থাকবে। এই ব্রাহ্মসভায় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র ঘেঁষে মনোবৃত্তন কর্তন, তা হলে অন্যায়সে আত্মত্যাগ তিনি অবতারের পর পেয়ে বসতেন এবং যে নৈরাশ্রের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে লম্বা করতে হত না। কিন্তু ঠাণ্ডা বড়, জনসাধারণের চাটুযুক্তি করবার ক্ষমতা সংসারে তাঁদের কম নয়। এইজন্যে জনসাধারণও সকল সময়ে স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাঁদের বিদায় করে না।

এ কথা মনেও হইবে যে, বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেগনা বহন করেছিলেন। তিনি নৈরাশ্রগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে অধ্যাত্ম লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে যে বেগানে তাঁর বেগনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শাস্তি পান নি। তিনি যদিও ত্যাগ কর্তব্যমুগ্ধ হন নি তবুও তাঁর জীবন যে বিবাসে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড় তপস্ভার দিকে যশোবীরে কাছে অভ্যর্থনা পান নি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ায় মৌরবের ঝারাই ক্লিষ্ট হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাপা সাধনা করতে সংসারে পাঠান তাঁরা সেই দেবদত্ত সৌভাগ্য ঝারাই অস্ত্রের মতো সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টিকাকেই উজ্জ্বল করে তোলে—অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।

এই উপলক্ষে আর-এক জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে, যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অপর যুগের, গম্বিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রাইও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আত্মক হয়ে থাকতে পারতেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন—নির্ভীক এই সাহসের জন্য তিনি ধর্ম। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য মাহুষ নতুন নতুন দেশে নিরন্তর ক'রে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনিই মানবলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রধায় আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে নব নব পথে দাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্রমহিমার দুঃসহ কঠকে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন। আনন্ডা অনুভব করতে পারি না যে এঁরা এঁদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র জনসংখ্যকে ছাড়িয়ে কত উপেক্ষা বিবাক করেন। ঝার। ছোট বড় বড়কেই তারা সকলের চেয়ে বড় অপরাধ বলে গণ্য করে। এই কারণেই ছোটরা আঘাতই বড় পক্ষে পূজার অর্থা।

যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভাঁড়ারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্যে তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের কবিদের ঝারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মতো সংস্কৃত ভাষার পুঁথির স্নোকে গলিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি

হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তম্ভ হয়ে বলে কখনোই সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনাতঃ উত্তমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে বা অজ্ঞাত, বা অলঙ্কার, তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়; কহুলা পাবর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অগ্রদাগ নেই। যে আতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তম্ভ হয়ে গেছে, সে আতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিরীন ও নিফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই আতির মহাপুরুষের মহৎসাধনার স্বার্থ প্রমাণ হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, যুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল-ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অত্র দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য ও প্রভাপ এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আশ কেন সে অত্র যুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্বগৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবলম্ব, তাই তার চিত্তশাসনের উদ্বোধন হয় নি। তারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে গ্রহণনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হান্ধকর দুঃখকর লক্ষ্যাকর ব'লে মনে করে, তারা জীবনমুগ্ধ আতি। তাই ব'লে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো আতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু সাহসকে আনুতঃ হবে যে, অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পাথেই তাকে অঙ্গুর কব্বার মস্ত। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সাহসের পা'কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সাহসের পা'কে পিছনে টেনে রাখত তা হলে তার চেয়ে খোঁড়া পা স্ত্রের হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ করে দিয়ে সাহসের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষে আতির সঙ্গে আতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয়, যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। আমরা এইরূপে উজ্জ্বল কালের মধ্যে একটি অন্তলম্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গম্ভীরে ডুবিয়ে দিয়ে বলেছি। এক দিকে আমরা ভাবীকালে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস হতে পারছি না, অত্র দিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়ে থাকতেও পারছি না। তাই আমরা এক দিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে আনবায়াত্রার নিত্যসহচর্য করেছি; আবার অত্র দিকে বগুহি, বিজ্ঞান যে আমাদের সর্বনাশ করুল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞা আমাদের সহীবে না। তাই আমরা, না আগ, না পিছে, কোনো দিকেই নিঃশব্দের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারছি না। আমাদের এই ষোড়ানার কারণ হচ্ছে যে, আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আঘাতের অতীত করে রাখতে চাচ্ছি— তাই আমাদের দুর্গতির অস্ত্র নেই।

আমরা আমরা বলব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত সম্পর্কে রূপের ধনের মতো মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালেও মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিসাধন করিতে উত্তমশীল হয়েছেন, তারাই চিরস্বরীয়; কারণ তারাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক। তাঁদের সকলেই যে বাইরের সম্পত্তা পেয়েছেন তা নয়; কারণ আমি বলেছি যে, তাঁদের কর্মক্ষেত্র-অগ্রদাগে সার্বকর্তার তারতমা হয়েছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে, আমাদের দেশেও এদের মতো লোকের অস্ত্র হয়।

আম্রকাল আমরা দেশে প্রাচ্য বিজ্ঞার যে সমান করছি তা কতকটা সেনাতিমানবলতঃ। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা-বলতঃ প্রাচীন বিজ্ঞাকে সর্বমানবের সম্পদ করবার অস্ত্র ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ত্রুটি হয়েছিলেন

আমাদের বাংলার হামমোহন রায় এবং তার স্ত্রী অনেকবার তাঁর প্রাণশয্যে পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। 'আমি আমার তাঁর সাধনার বল ভোগ করছি, কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করতে সক্ষম হই নি।' তবু আমি আমার তাঁকে নব্বার করি।

বিদ্যালগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে জব্বহীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিড়ে মেরেছে, হস্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে ধ্বংস বলে মানেন নি— তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলবেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র ছিল; তিনি অস্ত্রের বেননার যে ছুঁতে হয়েছিলেন সে ভেদে শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদ্যবে মাহুথকে মাহুথরূপে অহুত্ব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেন নি। তিনি কতকালের পুরীকৃত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিঃস্বপ্ন আচারকে নব্বার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেন নি, জব্বের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন।

আমি আমাদের মূগের কথাই তাঁদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে, এমন এক দিন আসবে যেদিন আমরাও সমুখের পাথে চলতে গৌরব বোধ করব, কৃতজ্ঞতা হবে শাস্ত্রমুখ্যদের বোকার পক্ষ হবে পিছনে পড়ে থাকবে না, যেদিন 'যুদ্ধং মেহি' বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে সক্ষম হব না। সেই যোতির্ময় জ্বলন্ত অজ্ঞানতার করে আনবার স্ত্রে গারা প্রভাবেই আগ্রহ হয়েছিলেন তাঁদের বলব, 'দত্ত তোমরা, তোমাদের তপস্বী বার্ষ হয় নি, তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে পাড়তে পেরেছিলেন বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিন্ন দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিশ্চল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই বার্ষতার অন্তরালে তোমাদের কীতি অক্ষয়রূপ ধারণ করছিল।'।

সত্যপথের পথিকরূপে, সম্মানীকরণে নবজীবনের সাধনার প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে এক তালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বলতে পারব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের জনের মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

১৭ শ্রাবণ ১৩২৩



বিদ্যালগর-বঙ্গসত্যের বঙ্গসত্যের মর্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।

ঈশ্বরোক্তকৃত্যের সেন্ত্রণ কর্তৃক অনুমোদিত।

অবাসী। দণ্ডভারত। তার ১৩২৩

নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর

ত্রিভিনয় বোর্ড

আমাদের এই রাষ্ট্রের সমাজে, সেবতার চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ মানুষ। তপস্বী করে জীবনে সেবতার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যিনি মানুষের মতন মানুষ। মানুষের পক্ষে এ সমাজে সেবতার রূপায়িত হওয়া বড় সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয়। আজও আমাদের সমাজে, বৈজ্ঞানিক যুগের যিগ্রহরকালে, অতিমানুষ ও মানবসেবতার মধ্যে সেবকের বিকাশ বড় সমস্যাসে হব, সামাজিক মানুষের মধ্যে নহুত্বের বিকাশ আমরা সেভাবে হয় না। আর থেকে শতাব্দিক বছর আগে, আমাদেরই এই সমাজে তাই এখন দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষ পর্বতের মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, কোনো অতিমানবিক অলৌকিক শক্তির জোরে নয়, সম্পূর্ণ নিজের মানবিক শক্তির জোরে—তখন বিশ্বের অভিকৃত হারে বেতে হব।

অনেক মানুষের দৈহিক গড়ন-প্রীর মধ্যে একটা বাতাবিক আকর্ষণ থাকে। তার সঙ্গে প্রতিভা ও কর্মগৌরব বিশেষ, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণকে আরো বেশি দুর্লভ করে তোলে। বিদ্যাসাগর এই বাতাবিক সম্পদটুকু থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। স্বর্ণবস্ত্রের উপর উত্তললাট প্রকাণ্ড একটি মাথা ছিল বলে, ছাত্রজীবনে তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে ‘ঘড়য়ে কৈ’ বলে ঠাট্টা করতেন। অতিমরিচ পরিবারে, বোটাচালের ভাত খেয়ে মানুষ হয়েছেন তিনি, তাঁর বেহ থেকে লাভা বা কাক্তির দ্রুতি বিদ্ভূত হবার কথা নয়, হতও না। পরবর্তীকালে এখন বিদ্যাসাগর অন্যমনস্ক পুঙ্খ হয়েছিলেন, তখনও তাঁর দর্শনপ্রাবীরা প্রায় সকলেই তাঁকে চোখে দেখে হতান হতেন।

এ সমাজে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। মনোমোহন গাঙ্গুলির স্মৃতিকথা থেকে সংগৃহীত। মনোমোহন গাঙ্গুলির পিতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বিদ্যাসাগরের ছাত্র ছিলেন। একদিন রবিবার সকালে বাহুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ি গিয়ে দেখেন, তিনি বাগানে ঘাস নিড়ছেন। নগেন্দ্রনাথকে দেখে বলেন, ‘বা, উপর গিয়ে বসে যা, বাড়ি’ এমন সময় সেদিনীপুর থেকে চারজন ভ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ঘাস নিড়তে গেছে তাঁরা নিঃসঙ্গেই তাঁকে বাগানের বালি মনে করে ভ্রলসা করেন, ‘ওহে, বিদ্যাসাগর মশায় বাড়ি আছেন কি?’ নিড়ানি হাতে করাই তিনি উত্তর দেন, ‘আজ্ঞে হ্যা, আছেন—আপনারা বহন, তিনি একটু কামে ব্যস্ত আছেন, একটু পরেই আসবেন।’ কিছুক্ষণ বসবার পর তাঁরা বললেন, ‘ওহে, একটু ভাষাক খাওয়াতে পার?’ ‘আজ্ঞে হ্যা পারি’ বলে, বিদ্যাসাগর মশায় চারটি হাঁকো চারজনকে ভাষাক সেবে এনে দেন। ভ্রলোকদের ভাষাক খাওয়া শেষ হবার পর, বিদ্যাসাগর ঘরে ঢুকে বলেন, ‘এবারে কি বরকার, অহুগ্রহ করে বসুন?’ তাঁরা একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দেন, ‘দরকারটা তোমাকে বলে কি হবে, তুমি একবার তাঁকে বর দাও না।’ তখন বিদ্যাসাগর নিকপায় হয়ে বললেন, ‘আজ্ঞে আমিই বিদ্যাসাগর।’ চারজনই হাঁকো কেশে শাকিয়ে উঠে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে বললেন, ‘আজ্ঞে হ্যা, তাই তো হবে, বিদ্যাসাগরই বটে, তা না হলে কি এরকমটি হয়!’

নবযুগের মানুষ বিভাগাগর

কাহিনীটি লোকমুখে অতিরঞ্জিত হতে পারে। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সত্যটুকুই যথেষ্ট। ব্যক্তির জীবনের বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে ধরেই জনসমাজে এই ধরনের কাহিনী প্রসারিত হয়ে ওঠে। বিভাগাগরকে স্বাক্ষর বেগেছেন এবং তাঁর মেট্রোপোলিটান ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন, এরকম দু-একজন অতিবৃদ্ধ ধারা এখনও জীবিত আছেন, তাদের মুখে শুনেছি, একসময় গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে ধারা আসতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে দক্ষিণ-কলকাতায় কালীঘাটের কালীদর্শন করে, উত্তর-কলকাতায় বিভাগাগরকে দর্শন করতে যেতেন। বিভাগাগর যদি শাখ হতেন, যোগী বা সিদ্ধপুরুষ হতেন, অথবা সমাজের ধর্মগুরু কর্তব্য করতেন, তাহলে তাঁর এই আকর্ষণীয়তাকে আশ্চর্য হবার মতন কিছু থাকত না। কিন্তু এসবের কোনোটাই তিনি ছিলেন না। তাঁর মৌলিক আকর্ষণ তেজ ছিলই না, অতিভ্রান্ত বংশের বংশধর বলেও কোনো সামাজিক আকর্ষণ ছিল না। এমনকি তাঁর স্বভাবমূলক জড়তার জন্য তিনি সভ্যসমাজে লোকচক্ষুর সাধনে উপস্থিত হতেন না, বহুতাপে মিতেন না। লোকের সংসারপথে তখনকার সমাজ-নেতাদের আকর্ষণের মতন আশ্রয়প্রচারেরও প্রয়োগ ছিল না। তা সত্ত্বেও, কি কারণে বিভাগাগর-চরিত্রে এই দুনিয়ার আকর্ষণীয়তার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, তেবে সেটা দরকার। যে-সমাজে মানুষের চেতনার আকাশ অতিপ্রাকৃতলোকের স্থাপত্য আচ্ছন্ন ছিল, সেই সমাজের মানসপটে বিভাগাগরের মতন এক মানবলব্ধ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হল কি করে? এক কথায় এর উত্তর সেজ্ঞা দায়, যুগের পরিবর্তন হয়েছিল বলে। তাঁর কালের আরো দুইজন শতাব্দী আগে মরালে বিভাগাগর হতো। নতুন ধর্মপ্রবর্তক হতেন, সাধারণ মানুষের কাছেও অবলীলাক্রমে সেবতার আগনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু সমাজ-জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, কেবল মানুষকেই অণু-তপ-খান-জ্ঞান করে, তিনি বহুমানুষের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষ হতে পারতেন না। এই মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যানধারণাই নবযুগের অত্যন্ত ঐতিহাসিক লক্ষণ। এই চিন্তার অগ্রই নবযুগ 'রিনেসান্সের যুগ', নবজাগরণের যুগ। বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই ঐতিহাসিক লক্ষণ সবচেয়ে বেশি পরিচূট হয়ে উঠেছিল বিভাগাগর-চরিত্রে।

মানবচিন্তার এই আদর্শকেই ইতিহাসে 'হিউম্যানিজম' বলা হয়। অপার্থিব থেকে পার্থিবের প্রতি, স্বর্গলোকের সেবা থেকে মর্ত্যালোকের মানুষের প্রতি, অদৃষ্ট অশৌকিক অগ্ন থেকে দৃষ্টমান বহির্ভগতের প্রতি মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করাই 'হিউম্যানিস্ট'-এর আদর্শ। এই আদর্শই বিভাগাগরকে সামাজীবন তাঁর দ্ব্যুদয়লিক সমাজকল্যাণমুখে উৎসাহ করেছে। নবযুগের বাংলার আদর্শ 'হিউম্যানিস্ট' বিভাগাগর। 'হিউম্যানিজম' আর 'হিউম্যানিটেরিয়ানিজম'-এর অর্থ এক নয়। শুধু মানবপ্রেমও হিউম্যানিজম নয়। ঐশ্বরচিন্তায় বহু ব্যক্তিও মানবপ্রেমিক হতে পারেন। হিউম্যানিজম হল মানবকেন্দ্রিকতা। বিভাগাগর এই অর্থে হিউম্যানিস্ট। অসহায় নিপীড়িতের সমাজে স্বভাবতই তিনি 'দয়ার সাগর' বিভাগাগর রূপে স্বর্গীয় হয়ে আছেন। কিন্তু দয়াশিক্ষা, বলাভ্যতা, মহাহৃদয়তা, মানবত্ব, সব কটি মানবচরিত্রের মহৎ গুণ হলেও, ব্যক্তির জীবনের উপাদান হিসেবে তার বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। 'ঐতিহাসিক মূল্য' কথায় উপর দোর দিয়ে বলাছি। যুগে যুগে বহু মানুষের মধ্যে এইগুণ বহু গুণের সমাবেশ হয়েছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সব সময় এইসব গুণের প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকায়, তাঁদের সেইসব গুণের সমাদর হয় না। কেবল এই গুণগুলির সমাবেশের জন্য বিভাগাগরের মতন ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয় নি। তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হল এই হিউম্যানিজম, এই

মানবতন্ত্রদত্তা, এই মানবাজ্ঞর চেতনা। মানব-অতীত ও মানব-ব্যতীত সমস্ত চেতনার উপরে ছিল তাঁর মানবচেতনা। এই চেতনাই ঐতিহাসিক।

মাহুঘের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে এই চেতনা ওজ্রাজ্জর ছিল। প্রাচীন যুগে মাহুঘের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক যখন অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ ছিল, বৈষম্যের বিষ যখন সমাজের অন্তর্ভুক্ত পর্বত জর্জরিত করে তোলে নি, তখন মাহুঘের আচরিত ধর্মের সঙ্গে যাপিত জীবনের সংযোগও একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পরলোকের চিন্তা করেও মাহুঘ তখন ইহলোকের কথা ভুলে যেত না, দেবতা ও নিয়তির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেও, মাহুঘ নিজের শক্তির উপর আস্থা একেবারে হারিয়ে ফেলে নি। তার পর, হুবিদ্যুর্গের বিভিন্ন পর্বে মাহুঘ ক্রমে ক্রমে এমন স্থিতিশীল ও সুপমওক হয়ে উঠল, ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন মাহুঘের মন ও বুদ্ধিকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল যে, নিজের সত্তার চৈতন্য পর্বত তার প্রায় সোপ পেরে গেল। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, সামাজিক স্ফূর্তির ঘোর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তিতরের ও বাইরের নৃতন-উন্মেষিত শক্তির আঘাতে সেই স্থিতির ঘোর কেটে যায়, মাহুঘ ও সমাজ আবার এগিয়ে চলে। ইতিহাসের ধর্মই তাই। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষেপে ইয়োরোপে যে নৃতন সামাজিক শক্তির অত্যাশ্রয় হয়, তারই আঘাতে মাহুঘের এই স্থিতির ঘোর কাটতে থাকে। বহিষ্কৃত ধনিক-বণিক-শ্রেণী নিজেদেরই অগ্রগতির স্বার্থে মাহুঘের মন ও বুদ্ধিকে সংভারমুক্ত করতে সচেষ্ট হন। তার স্রষ্টা তাঁদের একটি 'মডেল'এর প্রয়োজন হয়। পুনঃস্থাপন করে এই 'মডেল' তারা ইতিহাসের প্রাচীন যুগে আবিষ্কার করেন। মানববিজ্ঞা ও মানবজ্ঞানের বনন করাই মাহুঘের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়। মাহুঘের চিন্তার রাশ্মি, নির্বাণিত মাহুঘ ও পৃথিবী প্রত্যাবর্তন করে। মাহুঘের এই নবচেতনাকেই ইতিহাসে বলা হয় নবজাগরণ বা রিনেসান্স। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী মার্টিন বলেছেন :

... the typological importance of the Renaissance is that it marks the first cultural and social breach between the Middle ages and Modern times.

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদকে বলা হয় 'রিনেসান্স'—আধুনিক যুগের পৈশবকাল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইটালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে, প্রথম এই যুগবিচ্ছেদের লক্ষণগুলি পরিদৃষ্ট হয়ে ওঠে। তাই ফ্লোরেন্সকে বলা হয় আধুনিক ইয়োরোপের 'মডেল' বা 'প্রোটোটাইপ'। দুইশ শো বছর পরে, ষোড়শ-উনবিংশ শতাব্দীতে, ইয়োরোপের সংস্পর্শে এসে, বাংলার সমাজে রিনেসান্সের এই লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। কেবল হিউম্যানিজমের আদর্শে উদ্ভূত হয়ে নয়, antiquityকে model করে রামমোহন ও বিভাগ্যর সমাজসংস্কারের আন্দোলনে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রকেই তাঁরা সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। এও নব্যযুগেরই অন্ততম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগের প্রধান জীবনকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র ছিল গ্রাম ও গ্রামসমাজ। এই জীবনকেন্দ্র আধুনিক যুগে নগরে ও শহরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। বাংলায় নব্যযুগের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা শহর। ফ্লোরেন্স যদি আধুনিক মধ্যযুগের ইয়োরোপের 'প্রোটোটাইপ' হয়, তা হলে বাংলায় নব্যযুগের কলকাতা শহরকেও নিঃসন্দেহে নব্যযুগের ভারতের ফ্লোরেন্স বলা যেতে পারে। আট বছরের বালক বিভাগ্যর, ১৮২৮ সালে, যখন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস ও পাঠশালায় গুরুদেব কালীকান্তের সঙ্গে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে

পারে হেঁটে, মাইলস্টোন গুনতে গুনতে এসেছিলেন, তখন তিনি নবযুগের শেরেমেই এসেছিলেন, মধ্যযুগের জর্জনগরে বা বন্দর-পত্তনে আসেন নি। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ জীবনকেন্দ্র থেকে আধুনিক যুগের গতিশীল ও পরিবর্তনশীল জীবনকেন্দ্রে এসেছিলেন তিনি—একটির পর একটি নিশ্চল শাস্ত্রের অহুশাসনের পাপুণে মাইলস্টোন অতিক্রম করে। শহরে এসে, দীর্ঘ বাস্তো বছরের ছাত্রজীবনে তিনি নবযুগের ব্যক্তিগততার বিভিন্ন প্রকাশ স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে, ডিরোজিওর শিল্প, হিন্দু কলেজের ছাত্র, ইং বেকল দলের মধ্যে এই আশ্চর্য্যচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের যে নির্বিচার প্রকাশ হয়েছিল, খুব কাছাকাছি থেকে তিনি তা দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। এখানেতে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ গোপন নয়। নবযুগের রিনেসাঁসের সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বোধ হয় এই individuality, এই ব্যক্তিবোধ। আগে মানুষের ব্যক্তি হিসেবে কোনো চেতনা ছিল না। বংশ, গোত্র-গোষ্ঠী, সংঘ-সমাজ-ভাতি ইত্যাদি সাধারণ categoryর সঙ্গে তার সত্তা অভিন্ন ছিল। চেতনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই স্বাতন্ত্র্যবোধই গোষ্ঠীচেতনা ও দলচেতনা নিরন্তরের চেতনা। মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষেপে মানুষের মধ্যে এখন এই স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগল, তখন তার অবলম্বন মনুষ্যত্বের পূর্ববিকাশের পথ খুলে দেল চারি দিকে। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলাসাহিত্য, সর্বকক্ষে মানুষের আত্মনির্ভর দুঃশাহসিক অভিযান শুরু হল। রিনেসাঁসের ইতিহাস-রচয়িতা বার্থট বলেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে ফ্লোরেন্স শহরে এই স্বাতন্ত্র্যচেতনার এমন চরম প্রকাশ হয়েছিল যে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্যাশান বলে শহরে তখন কিছু ছিল না। প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র পোশাকের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করতে চাইত। বাংলাদেশে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, ইং বেকল দল ও কতকটা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। প্রত্যেকেই তার unique individual হতে চেয়েছিলেন, আচার-ব্যবহারে তো বটেই, পোশাকের দিক থেকেও। ১৮৭২ সালেও, লালবিহারী মৈত্র Bengal Magazine লিখেছেন :

Young Bengal, with his fantastic and ever-varying dress, might have furnished them [the leaders of fashion in London], in his own person, parts of the national costumes of all countries of the world.

ইং বেকলের এই পোশাক-বৈচিত্র্য তাঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধেরই প্রকাশ। কিন্তু, ইং বেকলের এই আত্মজ্ঞাতিক পোশাক-প্রদর্শনের মধ্যে চোখনি কল্যাণ ও সাদা চামর পায়ে, ভালতলার চট্টিছতো পায়ে বিভাঙ্গাগরের গুহ্মভূক্তি এখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখনই বোঝা যায়, দুটি ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের বাহ্য প্রেরণা অভিন্ন হলেও, তাঁদের বনিহান ভিন্ন।

যা কিছু চিরাচরিত, যা কিছু গভীরগতিক, তার বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করে, ইং বেকল তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এমন-কি, নিরপেক্ষের জাতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেও তাঁদের মধ্যে অনেকে সজ্জিত হন নি। স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল প্রকাশ হলেও, ইতিহাসের উপায়দৃষ্টিতে এ উজ্জ্বলতা মার্জনীয় হত, যদি না তারা বিদেশীয় অর্থ অগ্রকরণ করতেন এবং স্বর্থ ত্যাগ করে পরধর্মের আশ্রয় নিতেন। অবশ্য সকলে তা করেন নি। ইং বেকলের মধ্যেও দুটি দল ও দুটি ধারা ছিল দেখা যায়। কিন্তু তা হলেও, নির্বিচার অহুচিকীর্ণ কতখানি তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততখানিই তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক স্মৃতি ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে হয়। বিদেশীয় অধীনতাও তার অন্য অনেকটা

দারী ছিল। কলকাতা শহর আর ফোরেনের মধ্যে এই দিক থেকে পার্থক্য ছিল বিরাট। পরাধীন পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণবিকাশ যে কতখানি খর্ব হতে পারে, ইহা বেল্লের ডায়ামিক বিকাশ ও পরিণাম তার কল্পনুগম্য। রেভারেন্ড রুকমোহনের মতন দু-একজন শক্তিমূল পুঙ্খ, যারা নিবেদের প্রতিভার ভায়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কেবল এই খণ্ডিত ব্যক্তিরে জ্ঞাত তাঁরাও বৃহত্তর জনগণের, তাঁদের ক্ষমতার অহুপাতে, ব্যাপক নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। উনিশ শতকের বাংলার নবমাগরণের ইতিহাসে একমাত্র বিভাগাগরই ছিলেন এর বিশ্বকর ব্যক্তিত্ব। জীবনের প্রত্যেকটি কাঙ্ক্ষার মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্বই সব সময় ঘুটে উঠত, সেই বিশেষত্ব হল individuality, ব্যক্তিত্বাত্মক। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যকে তিনি খণ্ডিত করেন নি। আধুনিক ইয়োরোপের বীজমন্ত্রটি তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলে, বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদে বা আচার-ব্যবহারে তা তিনি কোনোদিন প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। প্রকাশ করেছেন তাঁর চরিত্রে। ইংরেজি কেতাবেরই ইং বেল্ল দল ছিলেন অল্পের বাঙালি, চরিত্রে বাঙালি, বাইরে ইয়োরোপীয়। ভাবপ্রবণতা, উজ্জ্বল ও আবেগসর্বস্বতাই ছিল তাঁদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভাগাগর ছিলেন মনেপ্রাণে আধুনিক ইয়োরোপীয় এবং তার জন্ত বাইরের বাঙালিরাই তিনি বর্ধন করেন নি। বাঙালি থেকেও তিনি পরিপূর্ণরূপে ইয়োরোপীয় ব্যক্তিত্বকে নিজের সত্যার মধ্যে বিলীন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিরে মধ্যে আর কেউ বোধ হয় আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাবধারাকে নিজের চরিত্রে এমনভাবে আত্মসাৎ করতে পারেন নি। এইখানেই বিভাগাগর-চরিত্রের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

কবি হেমচন্দ্র বিভাগাগর সম্বন্ধে বলেছেন :

উৎসাহ গানের শিখা, দাড়াই শালকড়ি।

আত্মসম্মান মতন উৎসাহ অনেকের চরিত্রে দেখা যায়, বিশেষ করে বাঙালির চরিত্রে—যেমন দণ্ড করে জলে গুঁতে, যেমন দণ্ড করে নিবে যায়। কিন্তু গ্যাসের শিখার মতন উৎসাহ সমানভাবে অনিবার্য থাকে ক'জনের চরিত্রে? বিভাগাগরের স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর সমসাময়িক যে-কোনো আত্মসচেতন ব্যক্তির চেয়েও উগ্রতর ছিল। হেমচন্দ্রের ভাষায়, তিনি ছিলেন—

যাক্সো পেরুলকীটা, পরিমিত ভ্রাণে।

কর্মজীবনে যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই মর্মে মর্মে এই পেরুলকীটার ধ্বংস অহুত্ব করেছেন। এই উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্তই তিনি বড় বড় সামাজিক আন্দোলনের নেতা হয়েও, কোনোদিন কোনো দল বা সমাজ-ভুক্ত হতে পারেন নি। ইং বেল্ল ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংস্কার-আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকেও, তিনি কোনোদিন তাঁদের দলভুক্ত একজন হন নি। একমাত্র প্রত্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেই তিনি সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ করতেন। নির্দিষ্ট কোনো কাজের মাধ্যমেই বিভিন্ন দলের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হত। কাজ ছাড়া যেন বাইরের সমাজের সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। জনসভাতে তো নয়ই, সমসাময়িক বিখ্য-সভার সঙ্গে পর্বতু তাঁর সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ। বেপুন সোসাইটির মতন বিখ্য-সভার অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা হয়েও, তিনি তার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যে অংশ গ্রহণ করতেন তা মনে হয় না। সর্বত্রই ঐ পেরুলকীটাই ছিল অস্ত্রায়।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে এই প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধের আভাস পাওয়া যেত। তাঁর পিতামহ তাঁকে

পরিহাল করে এড়ে বাছুর বলতেন। বড় বয়স বাড়তে লাগল, দেখা গেল যে পিতামহের কথাই ঠিক। বর্ণপরিচয়ে গোপাল ও রাগাল নামে যে দুটি বালকচরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে গোপালের চেয়ে রাগালের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল বেশি। পিতা বা বলতেন, তিনি প্রায়ই ঠিক তার উল্টো করতেন। তার ক্ষত তিনি পিতার কাছে বখেই গ্রহণও পেয়েছেন। শেষকালে উল্টো কথা বলে তাঁকে দিয়ে সোজা কাজটি করাতে হত। তাঁর বাল্যকালের এই একগুঁয়েনি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

নিরীহ বালাদেশে গোপালের মতো দুবোষ ছেলের অভাব নাই। এই কীণতর বেশ রাগাল এবং তার দ্বীবীলম্বক প্রকচলের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাগালি জাতির ষড়চিরিত্রের অন্তর্য্য বৃষ্টিয়া বাইতে পারে। দুবোষ ছেলেগুলি শাপ করিয়া তাল চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর শলাক করে মাথের নাই, কিন্তু দুই অবাধা অনাথ ছেলেগুলি তাহা কলসের মত অনেক কাণা করা যায়।

ছেলেবেলা থেকে ধীর মনো স্বাতন্ত্র্যবোধ এত সন্নিগ ছিল, নিজের কাজকর্মের স্বাধীনতাও যিনি অত্যন্ত সন্মানিত হস্তক্ষেপ পর্যন্ত সহ করতে পারতেন না, তিনি যে বৌবনে ও পবিত্রত বয়সে স্বাতন্ত্র্যে শ্রেয়স্কাণ্ডী ছবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ'এর এক ভাষণায় বলেছেন যে সাহেবদের কাছে বিভাগাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলে, তিনি স্বদেশবাসীর কাছে অত পাত্তির পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন :

সাহেবদের বিকট পলায় লম্বাইবার চোঁটা যে তিনি কখনও করিয়ারলেন, এ কথা আমি বলিতেছি না; তবে গাধার বিদ্যোদ্যেব সাহেব সম্বন্ধে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অনুরূপ হাবিয়ার মত সাধেই ছিলেন।

বিভাগাগরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, কৃষ্ণকমলের মতন বুদ্ধিমান পণ্ডিতও তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, সাহেব সমাজে বিভাগাগরের যে প্রতিপত্তি ছিল তা বৈদগ্ধ্য-মুগ্ধবুদ্ধির প্রতিপত্তি নয়, শিরোপাধারী রাজ্যমহারাজাদেরও প্রতিপত্তি নয়। অর্থে বল বা বিভাগার বলে, সে প্রতিপত্তি তিনি লাভ করেন নি। এ সমাজে শাসকশ্রেণীর কাছে তাঁরই বাস্তবিক পান হারা বিস্তারিত। বিভাগাগর বিস্তারিত ছিলেন না। বিভাগা তাঁর ছিল, কিন্তু সে বিভাগা আরো অনেকের ছিল, 'বিভাগাগর' উপাধিও একাধিক পণ্ডিতের ছিল। সাহেবদের কাছে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল তাঁর চরিত্রের ক্ষত। নিজেদের চরিত্রের ঘা-কিছু মং-গুণ, তাঁর সবগুলি তাঁরা একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরিত্রে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই, সাহেবরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। বিভাগাগরের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা থেকে স্বস্ত্য এইটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ইংরেজ শাসকদের প্রগাঢ়লোভী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

আখানের বেশে আর অনেকই নিজের এক ক্ষমতার স্বীকার নষ্ট করিয়া ইংরেজের অঙ্গপ্রস্থ লাভ করেন। বিভাগাগর সাহেবের হস্ত হইতে নিরোপ লইবার প্রস্ত করনা থাং বত করেন নাই; তিনি আখানের বেশে ইংরেজশাসকগণিত সাহেবাস্বামীবাদের মতো আত্মসম্মাননার সুতো বিস্তীর্ণ সমান ব্রহ্ম করিতে চেষ্টা করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। বিভাগাগরের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত তীব্র ছিল যে, কর্মক্ষেত্রে সাহেব স্বায়ত্বপূর্ণ বা কর্মচারীদের সঙ্গে যখনই জঁর সংঘাত হত তখনই তাঁদের প্রতিবাদ করতে তিনি বিদ্য করতেন না। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করেছেন। সন্দেহই জানেন, কার সাহেব একদিন টেবিলের উপর ছুতো-হস্ত পা তুলে দিয়ে বলে, পাইপ খেতে খেতে, বিভাগাগরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। প্রতিবাদে বিভাগাগরও একদিন তাঁর সঙ্গে অস্বস্ত্য ব্যবহার করেছিলেন। শিকার কোলিশের সেক্রেটারি কৈফিয়ত চাইলে তিনি উত্তরে যা জানান, তার মর্ম এই :

“আমি চেয়েছিলাম আমরা এসেই নেতিব, অশুভ— উল্লেখ্য-ভবাতা জানি না। সেদিন কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকেই এই আচরণ শিখেছি। একজন হুজুর ইংরেজীপাঠের এই আচরণ যে অনিষ্ট হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। আমি ভাবলাম, এই বোধ হয় আপনারদের অভ্যর্থনার রীতি। তাই আমি এসেই রীতিতে তাঁকে অভ্যর্থনা না করে, তাঁরই কাছ থেকে দেখা রীতি অধ্যয়নী সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করেছি। যদি অস্ত্রায় হয়ে থাকে, তাঁর অস্ত্র আমি দেখা নই।”

স্বাভাবের মধ্যে তাঁর স্নেহের স্বাক্ষর লক্ষ্যীয়— বিভাগাগরী বাগুদ্বয় একটা বিশিষ্ট রীতি। প্রতিবাদ্য করবার সময় তিনি নিঃস্বের স্বাক্ষরের পেশ্বকটীটি নির্মমভাবে প্রতিপক্ষের বেহে বিধিয়ে দিতেন। বিশেষ করে বিদেশীদের। সুস্থিয়ে দিতেন যে পৃথিবীর যে-কোনো লম্বাচওড়া সাহেবের তুলনায়, তিনি একজন শ্রীকায় বাজলি শ্রাবণ পণ্ডিত হয়েও, বড় ছাড়া ছোট নন।

কার সাহেবের গল্পটি অনেকই জানেন। আর-একটি দৃষ্টান্ত মিচ্ছি। ১৮৭৪ সালের ঘটনা। বিভাগাগর একদিন কান্টার এক পণ্ডিতের সঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর পরনে চুত্চামার আর পায়ে চুত্চুতো ছিল। সোসাইটির বিভিন্ন এ তখন মিউজিয়ামও ছিল। ভিতরে ঢোকায় লম্বা দরওয়ান তাঁকে চুত্চুতো রাখতে, অথবা হাতে করে নিয়ে যেতে বলে। বিভাগাগর কোনো কথা না বলে বাড়ি ফিরে আসেন। মিউজিয়ামের ট্রাস্টি বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন তখন রানফোর্ড। তাঁর কাছে তিনি চিঠি লেখেন এই মর্মে : “সেদিন সোসাইটির প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখলাম, এসেই লোক ধারা দেখে ছুতো পরে গেছেন, তাঁদের ছুতো খুলিয়ে হাতে করে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে— আর থার চোগাচাপকান আর বিলিতি ছুতো পরে গেছেন, তাঁরা ছুতো পায়ে দিয়েই ভিতরে ঢুকছেন। ছুতোর ব্যাপারে এই অধিকারের পার্থক্য কেন, বুঝতে পারলাম না।” এসিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের কাছে তিনি চিঠি লেখেন। চুত্চুতোর বর্ণনা নিয়ে সোসাইটির মতন বিষয়-সভাতেও আলোচনা হয়। *Englishman* পত্রিকা পর্বত লিখতে বাধ্য হন :

If the leaving the shoes behind is a mark of respect, it matters little whether the shoes are of European or the native pattern. But if there is a mark of respect attached to the leather, it is immaterial as to what form the leather may take. We hope the Council of the Asiatic Society and the Trustees of the Museum will have the good sense not to make native gentlemen feel that to enter their room is to court insult.

হিন্দু প্যাটিট্ট মন্তব্য করেন :

The great shoe question has turned up in quite an unexpected quarter—we mean in the rooms of the Asiatic Society.

“The Great Shoe Question” ই বটে, বিশেষ করে যখন বিভাগাগরের দেখা ছুতো !

বিভাগাগর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন : “ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, বাহার নাকে এই চুত্চুতোহস্ত পায়ে টুকু করিয়া লাগি না মারিতে পারি।” শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন :

আমি ভুল অহুত করিয়াছিল, এবং এখনও অহুত করিতেছি যে, তিনি বাহা ধরিয়াছিলেন, তাহা নহা। তাঁহার চরিত্রের ভেদ এখনই দিল যে, তাঁহার দিকট লক্ষ্যপাতী রাজায়াও মঙ্গল্য হয়।

নব্যযুগের মানব বিজ্ঞানাগার

রক্তবন্থিততা বা গতাহুগতিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানাগরের চটির কোনো স্বপ্ন সম্পর্কও নেই। বিজ্ঞানাগরের চটি তাঁর তাঁর individualityই প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। যে ব্যক্তি তাঁর নিজের লাইব্রেরির জন্ম লব করে বিশেষ থেকে বই বন্দিরে আনতেন, ভাই-প্রিন্টেড খান ও নারের কার্ড ব্যবহার করতেন, তিনি যে কারও চেয়ে কম শৌখিন ছিলেন তা মনে হয় না এবং কেবল বাইরে সারল্যপ্রকাশের জন্ম তিনি চটিজ্ঞতো ব্যবহার করতেন না। কোনো ডিলেমি বা স্বভাববৈশিষ্ট্যের প্রকাশও তাঁর পোশাকের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত না। কৃষ্ণকমল বলেছেন, “বিজ্ঞানাগর বরাবর চেয়ারে বসতেন; কখনও কখনো বিছানায় বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।” তিনি চেয়ারে ছাড়া, ফরাশে বসে গল্পগম্ব পঠিত করতেন না, তিনি যে ডিলেমি বা লোক-বেখানো সারল্যের জন্ম গায়ে একটা কুতুহা ও চানর এবং পায়ে তালতলার চটি পরতেন, তা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

স্বাতন্ত্র্যের নামে সমাজের মধ্যে যে উৎক্রেস্ততার স্ফোটার এসেছিল, বিজ্ঞানাগর তাঁর কুতুহা চানর ও চটিজ্ঞতো দিয়ে সেই স্ফোটার প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চটিজ্ঞতোকে তিনি এমন প্রাপ্যত দিয়েছিলেন যে একসময় কলকাতা শহরে তা রীতিমত চাকলোর সৃষ্টি করেছিল। চটিজ্ঞতোর সমস্ত রাজনীতির রঙে পৰ্ণিত রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। Renaissanceএর individualityর সত্যিকার প্রতীক ছিল বিজ্ঞানাগরের তালতলার চটি। ইহং বেকলের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিজ্ঞানাগরের এই স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য অনেক। একটি স্বাতন্ত্র্য পরগাছার ফুল, আর একটি স্বাতন্ত্র্য এ দেশেরই বনজ সম্পদ, নতুন পরিবেশের আলোবাভাসে পৰিচ্ছট।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে, বিজ্ঞানাগরের আগে, এই অথও স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব আর কারো মধ্যে ভেদনভাবে প্রকাশ পায় নি, একমাত্র রানবোহন রায় ছাড়া। রানবোহন রায়ের বিশেষ-দ্বাত্রা ও দ্বাত্রার পর, ইহং বেকল দলই নব্যযুগের জীবনমতের প্রধান মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। নতুন সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করে তোলার ঐতিহাসিক গুরুতার তাঁদের উপরেই পড়ে। তাঁদের মধ্যে প্রতিভাবান্ ও শক্তিবান্ পুরুষের অভাব ছিল না। অভাব ছিল এই অথও ব্যক্তিত্বের, দায় বিকাশ একমাত্র দেশের মটিভেই সম্ভবপর। উনিশ শতকের তৃতীদ ও চতুর্থ দশকে প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্তা, প্রধানতঃ ইহং বেকল ও ব্রাহ্মসমাজের স্ফোটার, সর্বসাধারণের চিন্তার ও আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বিববাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, মাতৃভাষা শিক্ষা ইত্যাদি এমন কোনো বিষয় ছিল না, যা নিয়ে তখন আলোচনা হয় নি। বিজ্ঞানাগর নিজে তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা বা উপলব্ধি থেকে কোনো সমস্তা আবিষ্কার করেন নি। হঠাৎ কোনো রহস্তময় উৎস থেকে তিনি এই সব সমস্তা সমাধানের প্রেরণাও পান নি। বহু সমাধনচেতন ব্যক্তির মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। বহুজনের সঙ্গে তিনিও এইসব বিতর্ক ও আলোচনার ধোরাক জুগিয়েছিলেন। ইতিহাসে কোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আবস্তকতা-বোধ কখনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। সমাজচেতনায় তা ভরসায়িত হতে থাকে, তবেই সমাজচেতন কোনো ব্যক্তির পক্ষে সে সময়ে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপমান করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানাগরও টিক তাই করেছিলেন। এই সমাজচেতনা যদি সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়, তা হলে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, এই সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের সংযোগস্থলে “ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের” উদ্ভব হয়। উনিশ শতকের

সমাজগণে, বিভাগাগর-চরিত্রে এই সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার সংযোগের ফলে, নবযুগের বাংলার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তিনিই প্রথম সেই সমাজচেতনাকে, প্রত্যক্ষ সামাজিক জিন্দার ভিতর দিয়ে, social reality-তে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। তার মত বাইরের সামাজিক অবস্থাও তখন অনেকটা তৈরি হয়েছিল।

বিভাগাগরের যুগ ছিল ডালহৌসির যুগ। ডালহৌসির যুগকে বলা হয়, conquest, consolidation ও development-এর যুগ। রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নির্মাণ, দু'পন্যায় জাকবাবস্থার প্রবর্তন, নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন, সবই কিন্তু নতুন গতিশক্তির উপকরণ। ১৮৫৩ সালে ডালহৌসি তাঁর বিখ্যাত 'রেলপথ প্রত্যাব' বণ্ডা করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে হাজার হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়ে যায় এক কোটি কোটি পাউণ্ড বৃত্তি মূলধন এ বেশে খাটতে থাকে। ১৮৫৭ সালেও যে পাবলিক ওয়ার্কস্‌ খাতে দায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড গবর্নমেন্ট ব্যয় করতেন, ১৮৫৬ সালের মধ্যে সেই পাবলিক ওয়ার্কস্‌ খাতে বায়বরাদ্ হয় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দশগুণ। এই পাবলিক ইনভেস্টমেন্টের ফলে দেশের income ও employment অনেকগুণ বেড়ে যায় (বিদেশীর মুনাফা আয়লাভ সংহত), এবং সমাজ-জীবনে তার প্রকাশ হয় চাহুরিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কল্যাণকরীভূতিতে। ১৮৫৬-৫৭ সালের মধ্যেই প্রায় বিশ লক্ষ বাক্সি রেলপথে যাত্রাভোগ করে। চলমান লোকের সংখ্যা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি চলার গতিও বাড়ে। পায়ে হেটে চলা, গোবানে চলা, পানিতে চলা, নৌকায় চলা, আর রেলপথে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রবল বেগে চলার মধ্যে যুগান্তকারী পার্থক্য আছে। বাংলার সমাজ-জীবনে যে সময় এই নতুন গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়, নতুন চলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রকাশ হয়, ঠিক সেই সময় বিভাগাগর তাঁর প্রত্যক্ষ সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। আগ্র তার শতবর্ষ পূর্ণ হল। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এ দেশে প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ সেন বিভাগাগর, কলকাতা শহরে। ১৮৫৬-৫৭ সালে তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে স্থাপন করতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। সমাজ-জীবনের চারি দিকে যে নতুন গতিশীলতার বিভিন্ন প্রকাশ হয়, বিভাগাগর সেই গতিশীলতার প্রতিমূর্তি হয়ে কর্মজীবনে অগ্রসর হন। বিভাগাগর-চরিত্রের আর-এক বৈশিষ্ট্য হল এই dynamism, এই গতিশীলতা।

সামাজিক দিক ছাড়াও, আরও অসংখ্য দিক থেকে বিভাগাগর-চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তার মধ্যে 'ধর্ম' হল একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাঁর চরিত্রের আর কোনো দিক বোধ হয় এরকম দুর্ভেদ্য রহস্যময় বিস্তার করতে পারে নি। এত পুরস্কার-বিরোধী জঘন্য-কলন্যও হয় নি তাঁর জীবনের আর কোনো দিক নিয়ে। ধর্ম তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বর-বিষয়ে তাঁর গভীর সন্তোষ বিমুগ্ধ হয়ে গেছেন, তার তল স্পর্শ করতে পারেন নি। তাই কেউ বলেছেন তাঁকে নাস্তিক, আবার কেউ বলেছেন সংশয়বাদী। কি যে তিনি তা শেষ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেন নি। বিভাগাগর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কি না, করলেও কি দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেন? ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল কি না, থাকলেও সে ধর্মের স্বরূপ কি ছিল? বিভাগাগরের জীবনের এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত জটিল এবং এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন হলেও,

নব্যযুগের মানু্য বিজ্ঞানাগর

সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন অবশ্যস্বাভাবী বলে, তার সামাজিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর পর্যন্ত এগব প্রস্রের কোনো সত্যোর্থজনক উত্তর কেউ মেন নি।

বিজ্ঞানাগরের ধর্মবিব্রাণ প্রসঙ্গে কৃষ্ণকবল বলেছেন :

বিজ্ঞানাগর নাস্তিক মিলেন এ কথা যোগ হয় তোমরা জান না; গঁহোরা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিবর নইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাগদ্বাণে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রাঙ্কা বাক্যবোধন রাসের জেঠপুত্র বাধ্যমলাব রাসের বৌহিও লগিত চাটুয্যের সহিত তিনি পদকালন্তর নইয়া হান্তপরিহাণ করিতেন; লগিত সে সময় যেন কতকটা যোষদাধনপদে মগনপর হইতাহেন, এইরূপ মোকো বলাবলি করিত। বিজ্ঞানাগর তাঁহাকে দ্বিজানা করিতেন: "হাঁরে লগিত, আনারও পরকাল আছে নাকি?" লগিত উত্তর দিতেন: "নাহ্রৈ যৈকি! আপনার এত গান, এত বহা, আপনার পরকাল থাকবে না তো, থাকবে কার?" বিজ্ঞানাগর হাসিতেন।

বিজ্ঞানাগর পরলোকে বিব্রাণ করতেন না বলে কৃষ্ণকবল কেন তাঁকে নাস্তিক বলেছেন জানি না। পরলোকে বিব্রাণ না করলেই যে নাস্তিক হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিজ্ঞানাগর অবশ্য ইহলোকেই বিব্রাণ করতেন, পরলোক নানতেন না। তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও কাহিনী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। কাহিনীটি শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে সংকলিত। একবার বিশেষ কোনো কারণে বিজ্ঞানাগরকে প্রত্যাহ তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে দাওয়াত করতে হয়। সেই বাড়ির বাইরের বাগানখান একদিন তাঁর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। বন্ধুর কারকর্ম গেরে তিনি বারান্দায় বসে, মুড়ি পেতে পেতে, তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন। বিজ্ঞানাগর সভা-লম্বিতিতে বেতে পারতেন না বটে, কিন্তু মানুষ পেলে চমৎকার আশর জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। বালকদের সঙ্গেও। তিনি বলে গল্প করতেন, এমন সময় এক বাঙালি পুটান পাত্রি সেখানে দিয়ে থাকছিলেন। তিনি বালকদের লক্ষ্য করে salivation সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন এবং বীত ভঙ্গলে কি ভাবে যে salivation সম্ভব, তাও বোঝাতে লাগেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনার পর, বিজ্ঞানাগর তাঁকে বলেন, "ওদের ছেড়ে দিন, আমার কাছে আস্থান। ওরা নিতান্ত বালক, ওদের salivation-এর কথা চিন্তা করার এখনও অনেক সময় আছে। আমি বুড়ে হয়েছি, আজ বাবে কাল মরব, আমাকে পরলোক ও salivation-এর কথা বোঝান, কাজ হবে।" বৃদ্ধ হলো, একজন ভারী convert পাওয়া গেছে জেবে, বাঙালি পাত্রি সাহেব সোৎসাহে বিজ্ঞানাগরের কাছে লেকচার দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজ্ঞানাগরের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি অভিশাপ দিতে দিতে চলে যান।

দর্শনলোক, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে এই ধরনের কঠোর বোধোক্তি বিজ্ঞানাগর কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে করতেন। তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে তিনি ইহলোক ছাড়া আর কোনো 'লোকে' বিব্রাণ করতেন না। কিন্তু তাতেও তাঁর নাস্তিকতা প্রমাণ হয় না। শারাদ্বীবন তিনি চিঠিপত্রের শিরোনামায় "ঈশ্রী ব্রূর্ণা শরণং", "ঈশ্রী হরি শরণং" লিখেছেন। নিতান্ত লোকাচারের দাগ হয়ে, তিনি তাঁর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে এ কথা লিখেছেন, তা মনে হয় না। হুতরাং তাঁকে নাস্তিক বলা যায় না। তা হলে তিনি কি?

ইটালীয় রিনেস্সান্সের নূতন মানুষের ধর্মভাব প্রসঙ্গে বার্থট লিখেছেন

These modern men . . were born with the same religious instincts as other Mediaeval Europeans. But their powerful individuality made them in religion, as in other matters, altogether subjective.

বিভাগ্যগরের ধর্মভাব সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়। (তার ধর্ম, তার ঈশ্বর, তার ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। বাইরের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, তিনি তার ধর্ম ও ঈশ্বরচেতনাকে নিজের ব্যক্তিগত অঙ্গভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে গঠিত করে রেখেছিলেন। বাইরের সমাজে যখন ধর্মের নামে অন্ধবৈরাণ্য বসে বসেছিল, তখন ধর্ম নিয়ে সামাজিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া তিনি নিবৃত্তি দিল বলে মনে করেছিলেন। ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ আন্দোলন করে মানুষকে যে ধর্মের দোহমুক্ত করা যায় না, এ সভ্য বাংলার বিভাগ্যগর এ যুগের অগ্রভঙ্গ বিশ্রবী ধার্মিক কার্য যাক্ষের সমসাময়িককালে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জীবনে একটিবারের জন্তও তিনি ধর্মবিষয়ে প্রকৃষ্ট আলোচনা করেন নি। ঘরোয়া বৈঠকেও না। নবযুগের শক্তিবান্ মাছবের মতন তার চিন্তাধারা ছিল ইহজগৎ-কেন্দ্রিক ও মানবকেন্দ্রিক। বালকদের বোধশক্তির বিকাশের জন্ত যখন তিনি “বোধোদয়” লিখেছিলেন, তখন প্রথম কয়েক সংস্করণে তার মধ্যে ‘ঈশ্বর’ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তিনি করেন নি। পরে ঈশ্বর-প্রদত্ত বোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর “নিরাকার চৈতন্যরূপ”। বালকদের সাধা নেই এই সংজ্ঞা বোঝে। সেইজন্তই যে তিনি প্রথমে বোধোদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-ব্যাখ্যান করতে চান নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু যখন করলেন তখনও সেখানে, বোধোদয়ের প্রথমে “পদার্থ” বা “Matter”, তার পরে “ঈশ্বর”। এই ইহজাগতিক মনোভাবের দিক থেকেও বিভাগ্যগরকে স্নেহজনক-যুগের অমিতীয় মানুষ বলা যায়।)

মধ্যযুগের মানুষের কুলকৌশল ও স্বাবের সম্পত্তির বদলে, নবযুগের মানুষের দুটি প্রধান অবলম্বন হল— “Money” ও “Intellect”— বিত্ত ও বিজ্ঞা। বিভাগ্যগরের বিজ্ঞা ছিল, বিত্ত ছিল না। বিজ্ঞা যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সহায় হল এবং নবযুগের সমাজে যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দ্বারা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব হল (যা মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না), তখন বিজ্ঞার বাণিজ্যিক বিনিময়েও সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে বিভাগ্যগর কুণ্ঠিত হন নি। বিজ্ঞার বাণিজ্যিক বিনিময় বলতে তার চাকরির কথা বলাই না, ছাপাগানা ও বইয়ের ব্যবসায়ের কথা বলাই। তখন ব্যবসায়বুদ্ধি প্রায় প্রত্যেক কীর্তিবান্ পুরুষের মধ্যেই প্রবল ছিল। রামবোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাগান চক্রবর্তী, রামগোপাল বোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, সকলে ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে বাণিজ্যবুদ্ধি ও বিজ্ঞাবুদ্ধির এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল। নবযুগের ঐতিহাসিক ধর্ম অমুদারীই ঘটেছিল, এবং এই দিক দিয়ে তারা সত্যিকারের নবযুগের মানুষ ছিলেন। বিভাগ্যগরের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হল, তিনি বিজ্ঞা ছাড়া আর কোনো পণ্যের ব্যবসা করেন নি। পণ্যপ্রাপ্ত যুগে, প্রাণধারণ ও প্রতিষ্ঠার জন্ত, তিনি বিজ্ঞাকেই পণ্য করেছিলেন। বিভাগ্যগর ছিলেন নবযুগের প্রকৃত “intellectual entrepreneur.” সংস্কৃত গ্রেস ও গ্রেস-ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, স্বাধীনভাবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার পরিচালনার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিবরণটি এই :

দ্বিাদশ্যং মহাশয় খুব পারজন করিতে পারিতেন, তাহার অসেকজন্মই বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রথম দিকে লেখিতেন এবং সর্বদাই উহার বাংলা পরিবর্তন করিতেন। ...তিনি প্রেসের কাজ বেশ আনিতেন— বুদ্ধিতেন। যতদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের দালিক ছিলেন।— তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংস্কৃতের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই হাপ হইল, বিক্রয় করিল কে? তাহার লক্ষ সংস্কৃত প্রেস ত্রিপুরাটাই দায় দিয়া এক বইয়ের সোফান পুসিতেন। উহা একত্রক বইয়ের আড়ত। বই লিখিল, দ্বাদশ্যই, মোকৎ ওদ্যেই আনিল। দিলে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কনিশন সহীদ প্রযুক্তরকে সমস্ত টাকা দিয়া

নবযুগের মানুষ বিভাগাগর

নিবেন। এই নাক্ত্র এল ডিপলিটারী তাঁহার হাতে হইতে চলিয়া বিদ্যায়; ইহা এখনও বর্তমান আছে;— কিন্তু তাঁহার হিশাব বাখার বিষয় খুব অস্বাভাবিক, বখবই বাও, আসের বাগ পণ্ডিত হই বিন্ধ্য হইগাছে তাঁহার হিশাব পাইবে এবং চাহিলেই তোমার বা পাওনা তাই দিয়া দিবে।

১৮৪৮ সালে বিভাগাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন, তখন যে তিনি আদৌ বিচলিত হন নি তাঁর কারণ, তখন তাঁর বই বিক্রির ব্যাবসা থেকে মাসিক আয় ছিল তিন-চার হাজার টাকা। তিনি জানতেন, অর্থগর্ভ এই সমাজে অর্থের জোর না থাকলে, স্বাভাবিক বা আত্মমর্গাদা রক্ষা করা কঠিন। তাই ১৮৪৭ সাল থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যাবসা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম বাস্তবচেতনা ও ব্যক্তিবোধ থেকেই এই আধুনিক-মুণ-মূলত আণ্ডিতিক বুদ্ধির বিকাশ হয়েছিল। ব্যক্তিবোধ এই material স্তরটিকে মজবুত রাখবার জন্যই কোনোদিন তিনি মধ্যযুগীয় বৈরাগ্য বা সাংসারিক উদাসীনতাকে প্রগ্রহ দেন নি। এ ক্ষেত্রেও বিভাগাগর টিপিক্যাল 'নবযুগের মানুষ' ছিলেন।

বিভাগাগরের দ্বায়াক্ষিপ্য, যেহে জড়িত প্রীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো কথা আমি বলি নি, কারণ নবযুগের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার-প্রসঙ্গে তা বলবার প্রয়োজন নেই। (মাইকেল মধুসূদন একবার তাঁকে বিশেষ থেকে চিঠিতে লিখেছিলেন—“বাঙালি মায়ের মতন আপনার অন্তঃকরণ”। কিন্তু কেবল মায়ের মতন অন্তঃকরণ নিয়ে বিভাগাগর “বিভাগাগর” হতে পারতেন না, যদি-না মধুসূদন-কবিতা আছে। দুটি স্তব তাঁর থাকত—“the genius and wisdom of an ancient Sage” এবং “the energy of an Englishman.” কেবল প্রাচীন ঋষিদের নতুন জ্ঞান ও ইংরেজের নতুন কর্মশক্তি নিয়েও বিভাগাগর নবযুগের অধিতীয় মানুষ হতে পারতেন না, যদি-না তাঁর চরিত্রে মূগ্ধমূলত প্রথম স্বাভাবিকবোধ, আত্মমর্গাদাবোধ, মানববোধ, সমাজ-চেতনা ও আণ্ডিতিক চেতনা প্রকাশ পেত। নবজাগরণের যুগের এই সমস্ত মূল্য গুণের সমাবেশ বিভাগাগরচরিত্রে হয়েছিল বলেই, বিভাগাগর বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের আসন অধিকার করতে পেরেছেন।)

বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক

১৮৪৫ - ১৯২০

শ্রীঅমল হোম

লোকমাত্র টিলকের জন্মের পর একশত বৎসর পূর্ণ হইল। তাঁহার মৃত্যুর পরও ছত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই দুঃস্বপ্নের ব্যবধানে তাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক রাগবিরাগ হইতে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা একান্ত সম্ভব না হইলেও নিতান্ত অসম্ভব নহে। অল্পস্ব স্বর্গ ও অবস্থা নিম্না দুইই তাঁহার জীবনকালে ও পরে দূত্রির স্বচ্ছতাতে আবিল করিয়াছে। আশ্ব কিন্তু তাঁহার বিরাট মূর্তির পাদপীঠে ঠাড়াইয়া উর্ধ্বে তাকাইয়া দেখি, কালের কটীপাথরে তাঁহার ধারণা-ভাবনা, তাঁহার কর্মকৃতি নানা মিশ্রণেও যে সোনার রেখা টানিয়াছে, শতাব্দীর প্রান্তেও তাহা দেখা পায়মান এবং ভাবীকালেও তাহার দীপ্তি দান হইবার সম্ভাবনা অল্পই। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার জীবনের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের সত্য মূল্যায়ন এখনও অপেক্ষা করিতেছে বটে, তবুও এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে।

টিলক সম্বন্ধে ধর্মার্থ ধারণার কিছুটাও করিতে গেলে সকলের আগে মনে না আসিয়া পারে না— তাঁহার সহিত তাঁহার জন্মস্থানের একান্ততা। পৃথিবীতে এমন একাধিক বড়লোক জন্মিয়াছেন যাহাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে তাঁহাদের জন্মস্থানের ছাপ বাহা ছিল, তাহা তাঁহাদের কোনও-কিছুই ছাপাইয়া উঠে নাই— সব-কিছুর মধ্যে মিশিয়া-মিশিয়াই ছিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না যে, তাঁহারা আর কোথাও জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু টিলকের জন্ম মহারাষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভব ছিল না। না কাঠিবাড়ের শান্ত সমাবেশে, না বাংলায় কোদল-কান্ত পরিবেশে টিলকের আবির্ভাব কল্পনীয়। মহাদ্বারি শিখরে গিরিবন্ধে, তার উপত্যকার মলহীন ফলহীন কঙ্করখচিত বিরলশ্রবণক্ষেত্রে, তার কঠোর-জীবন পরীপ্রান্তরে মহারাষ্ট্রের যে অতিক্রান্ত, আত্মনির্ভরতা, ভেদবিস্তা ও অকৃতোভবতা ভারত-ইতিহাসে তাহাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে— চরিত্রে, বাক্যে ও কর্মে টিলক ছিলেন তাহারই প্রতীমূর্তি। যে-বার্চা মারাঠাকে কর্মঠ করিয়াছে, যে-কর্মহুশলতা তাহাকে ভাবানুভূতি হইতে মুক্তি দিয়াছে, যে-চিন্তাশক্তি তাহার বুদ্ধিকে বহল পরিমাণে মোহমুক্ত রাখিয়াছে, যে-নিষ্ঠা তাহার চরিত্রে বশীভূত আনিয়াছে— সে-সমস্তেরই প্রতীক ছিলেন টিলক। টিলককে বুদ্ধিতে হইলে মারাঠা চরিত্রের সর্বলতা দুর্বলতা দুইই ধামিত হইবে, বুদ্ধিতে হইবে। মহারাষ্ট্র-রাষ্ট্রনীতিতে তাহার সর্বশেষ প্রকাশ। মহারাষ্ট্র-শাসনাত্মক ইতিহাসের আলোচনার স্থান এখানে নয়— কিন্তু সে-শাসনাত্মক উত্থান-পতনের মধ্যেই যে নীতি ও পরিণতি দেখিতে পাই, তাহাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে মারাঠা-চরিত্রের বিশিষ্টতা। সে-চরিত্রে বেগ আছে— আবেগ নাই; আদর্শের দৃঢ়তা আছে— ভাববাহী দুর্বলতা নাই; চাতুর্য আছে— 'চতুরালি' নাই; বিচার আছে— 'চুলচেরা' তর্ক নাই; সংগ্রাম আছে— উদ্বেগ ও উপায়ের ঘন নাই। যেমন মহারাষ্ট্রের শৈল-কাঙ্করের কাঠিক, তেমনি চিংপাবন ব্রাহ্মণের অনবদীয়তা, মারাঠা-চরিত্রের সমৃদ্ধ বিশেষত্বই ছিল টিলকের মধ্যে স্থপরিদৃষ্ট। টিলকের দেহে-মনে, ভাবে-কর্মে, ভাব্যে-ভঙ্গীতে ছিল তাহার অনবদ্য প্রকাশ। তাঁহার মধ্যে একাধারে ছিল নিম্ন-অপবাসে অটল আদর্শবাস ও সর্বসংসারমুক্ত





উপনিষ্ট. বাম হইতে ডক্টর : গালা বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু
 গালা বাবুজী বাবু : গালা বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু, বাবুজী বাবু

অঙ্গ কর্ণকল্প। মারাঠার বীর তাঁহাকে গান করিয়াছিল বিপক্ষে খেঁৰ, প্রত্যক্ষ নিশ্চলতার মধ্যেও অসাধারণ কৰ্মোৎসাহ, অনন্তসাধারণ চিত্তশক্তি ও সংযম। এই শক্তিই টিলককে আধুনিক ভারতের অদ্বিতীয় গণমানস-বোকা জননেতার আগনে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল। বলিতে গেলে, তিনিই দক্ষিণাত্যে সর্বপ্রথম জনমনে পরাধীনতার অপমানসানিবোধ করাইয়া অনাস্বাদিত স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিলেন। ভারতের গণজাগরণে তিনি যে-শক্তির স্বষ্টি করেন, ভাবীকালে গান্ধীজী তাঁহারই উত্তরাধিকারে সাক্ষ্য অর্জন করিয়াছিলেন, এই কথা বলিলে অতুক্তি হয় বলিয়া মনে করি না। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে টিলক যে-বীর বপন করিয়াছিলেন—তাঁহার ফল-উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও দিক্‌তে গান্ধীজীর দৃষ্টি তাঁহার যে প্রভেদ-পার্থক্যই থাকুক-না কেন—সেই বপনক্ষেত্রচরার প্রথম এবং প্রধান কৃতিত্ব টিলকেরই। তাঁহার সমগ্র জীবনের আরাধনা-সাধনা সেই প্রচেষ্টায় আরম্ভ ও সমাপ্ত।

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামকে একটা ঐতিহাসিক বোধের জিহ্বার উপর প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প বাংলাদেশে হয়েছিলেন ও মহারাষ্ট্রে টিলক সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হয়েছিলেন যেনন বিত্তীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াঃ কলিকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালী ছাত্রসমাজে আপন অশৌকিক বাক্‌বিত্তিসংগ্রামের ঘুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাগ কাহিনী, ম্যাট্রিনির নহং আদর্শবাব ও গ্যারিভিন্ডির অদ্ভুত কর্ণপ্রচেষ্টা, 'ইংল্যান্ড ইটালী' ও 'নিউ অয়ারল্যান্ড'-এর বশেষ-উদ্ধারকল্পে আত্মোৎসর্গের কথার মাধ্যমে এক অভিনব ও উন্নাদিনী চেতনা জাগ্রত করিয়া, কংগ্রেসের জন্মের দশ বৎসর পূর্বেই, প্রথমে বাংলাদেশে ও পরে উত্তর-ভারতে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশাভিমান সঞ্চারিত করেন—টিলকও তেননি মহারাষ্ট্রে, কংগ্রেসের অত্মত্যাগের দশ বৎসর পরে, নবজাগ্রত সামৈশিকভাবে—নবীন ঘুরোপের ইতিহাসের দৃষ্টান্তে নয়, পুরাতন মারাঠা-ইতিহাসের অম্লপ্ররূপে—কেবল ধনী বা মধ্যবিত্ত সমাজে নয়, কৃষক অধিক বণিক আপানসংস্কারের মধ্যে অশুভ প্রতিষ্ঠা ও নূতন অর্থ গান করেন।

ভারতবর্ষে শিবাজীর হিন্দু-প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টার মূলে যে স্বাধীনতাসংগ্রাম বিদ্যমান ছিল, মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের সেই উদীপনা টিলকের 'শিবাজী-উৎসব'-প্রবর্তনে গুপ্ত শতাব্দীর নবম-দশক-প্রান্তে ভারতের নব-উদ্বুদ্ধ সামৈশিকভাবে বহল পরিমাণে প্রাণবন্ত করিয়াছিল। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, শিবাজীপ্রতিষ্ঠিত মারাঠাশক্তি জীর্ঘীর্ণ যোগলমহিমাকে ধূলিপাত করিয়া, দেশের শাসনভার প্রায় করতলতল করিয়াই আনিয়াছিল এবং ইংরেজ এ দেশে না আসিলে দ্বিতীয় বাহাদুরকে আপন জীভাপুঞ্জলিক্রমে ব্যবহারবাবধা একথা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের ওপড়-ওড়ন আপনাই অধিকার করিয়া বলিত। কিন্তু হিন্দুপদপাদসাহীর সে-বধ টিলকের মনে ছিল, এ কথা গাহার মনে কগেন তাঁহার তাঁহার ঐতিহাসিকবোধ ও রাজনৈতিক দৃষ্টি উভয় সম্বন্ধেই অনবগত—ইংরেজশাসকসম্রাটেরপ্রতিষ্ঠিত ইতিবৃত্তকথার 'মিথ্যানবী' প্রচারে বিভ্রান্ত। ভ্যালেন্টাইন চিরল, ডার্ন লডেট—বিশেষভাবে চিরল—টিলকের যে-আলোবা তাঁহারের কেতাবের পটে আকিয়াছেন, তাঁহার মতামত ও কর্ণপদ্ধতির যে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ, এমন কি এ দেশেও, টিলকের অপবাদীরা, বিশেষভাবে পতনপথ্যাত্রী পেপন। দসবাদের ঐতিহ্যপন্থী পুণ্যর দীর্ঘপঙ্খিল বড়মসংকুল রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ, তাঁহার সম্বন্ধে নান। সভাতিথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে

টিলক বৃষ্টি সত্যই শিবাজী-সংকল্পিত হিন্দুসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাঁহার কর্মপথ। নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। মহারাষ্ট্রে টিলকের 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্তনের মূলে সেক্ষণ কোনো মনোভাব বা মতবাদ কাজ করে নাই। প্রায় অট্টোত্রিশ বৎসর পূর্বে পুণায় টিলকের বিশিষ্ট সহকর্মী পরলোকগত নরসিংহ চিত্তাবন কেশবরের সহিত প্রবন্ধ-লেখকের এই প্রশংসা আলোচনার স্বযোগ ঘটয়াছিল। তিনি বলেন যে, বহু বৎসর আগে, কংগ্রেসের আদিমুখে, সৈয়দ বন্ধুদীন তৈয়বভী টিলককে প্রশংসা করিতে টিলক স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে বলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও হিন্দুসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা তাঁহার (টিলকের) নিকট আরো সমার্থক নয়। ১৯১৬ সনে লক্ষৌ কংগ্রেসের অধিবেশনকালে মামুদাবাদের রাজাবাহাদুরের কৈলহবাগ প্রাসাদে এক ঘরোয়া বৈঠকে পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার চন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মহম্মদ আলি জিন্না, মোতিলাল নেহরু, আবদুল রহুল, সৈয়দ নবীউল্লাহ, মির্জা সাঈদুল্লাহ বেগের উপস্থিতিতে টিলককে ধন্য এই একই প্রশংসা হয় তখন তিনি বলেন যে, আজ যদি স্বয়ং বাজীরাও সে-উদ্দেশ্যে পুণায় আবির্ভূত হন, তবে তিনিই সর্বপ্রথমে তাঁহাকে বাধা দিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন— "The Peshwa's role and rule are both ended and can never be revived. It will be mad and bad to think of it." সেখানে, বিপিনচন্দ্র পাল মহাপ্রভুর অহুচররূপে, টিলকের মূখে এই কথাগুলি শুনিবার স্বযোগ লেখকের ঘটয়াছিল।

'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্তনে টিলকের মনে একটি বৃহৎ আশাই কাজ করিয়াছিল। সে-দাব্যকাল দেশে সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন—রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টা—মুক্তির উচ্চ ও ন্যায়বিষয় শিকড়সম্পন্নভাবে উপরেই আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, দেশের আপাদমস্তকসমস্তের চিত্ত কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা হইতে মুক্তি দিয়া সে-প্রশ্নগতকে গণমানসের বৃহত্তর ভূমিতে স্থাপিত করিতে না পারিলে যে ইংরেজের বহুশ্রুতি হইতে কোনো অধিকারই বিচ্যূত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, টিলক নর্থ বর্নে তাহা অহুচর করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই demos বা গণবেবতার উদ্বোধন-অভিপ্রায়ে, জাতির রাষ্ট্রিক আশা-মাকাক্ষর প্রতীকরূপে, শিবাজী-মহারাষ্ট্রকে তিনি সিংহগড়ের ভর দুর্গকোণ হইতে পুণার মুক্ত প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচলিত 'গণপতি উৎসব'ও সেই একই ভাবনার ফল। কোনো একান্ত ধর্মগ্রন্থত সমাবেশে কোনো নৃতন ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্বথা তাহাকে ধর্মের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সে-ভাব সে-সমন্বয়ের মর্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই কথাটি টিলক তাঁহার জনমানসজাত অস্থাবরশক্তিতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই গণপতি বা শিবাজী-পূজার মধ্য দিয়া তিনি বাদেশিক উকীলানা আগ্রহ করিয়া গণচিত্তে এক নৃতন ভাবের ও শক্তির সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হিন্দু বা হিন্দুসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য গুহাঘাত ছিল এমন কথা বলা চলে না। তিনি পৌরাণিক গণপতি ও ঐতিহাসিক ছত্রপতি উভয়ের সংযোগে জাতীয় ভাবের নব প্রতীক রচনাপূর্বক গণমন্দিরে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশেষ শাণনের বিরুদ্ধে দেশীয় সংগ্রামের নৃতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই কথার উক্তরে শোনা যায়—মূলতান যে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে যোগদান করে নাই তাহা এই কারণেই; হিন্দুর ভগবৎ-প্রতীক পূজা-প্রকরণকে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্থান দিয়া একান্তভাবে হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে বৈ-রাজনৈতিক কর্মধারার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহারই প্রতিফলিতরূপে মূলতানকে আদরা শেষ পর্যন্ত আদায়ের স্বরাজ-সাধনা পাঁই নাই। প্রত্যক্ষের ধর্মি বলা হয় যে, মূলতানের একান্ত ধর্মীয় ব্যাপার তুর্কীর হুলতানের

বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক

'খালিফ'-নিরোধে বজাধর রাবার আন্দোলনে হিন্দু সর্বস্বপণ যোগদানে ধর্মের সহিত যখন রাজনীতির বিভিন্ন সম্মিশ্রণ ঘটানো ছিল, তখন তাহার প্রতিবাদে কোনো মুসলমানের মুখে কোনোদিন একটি কথাও শোনা যায় নাই, তাহা হইলেই বিবাদ বাধে। কিন্তু সে তর্ক থাকে। টিলক-প্রসঙ্গে শুধু যেন এই কথাটি মনে রাখি যে, তাঁহার নিজস্বমুখগামী চিন্তা পন্থাতি বা শিবাজীকে অবলম্বন করিয়াই চলে নাই—সে-বেলা, সে-উৎসবকে আশ্রয় করিয়া তিনি 'হোম-রুল লীগ' আন্দোলনে (১৯১৪-১৫) বা লন্ডো কংগ্রেসে (১৯১৬) হিন্দুসুপদিন সোলোনার্থা সম্মানন করেন নাই; বৃন্দধর্মের ও রাজনৈতিক অগ্রগতির সহিত তিনি তাঁহার কর্মপন্থার সবতা ঘোষনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। টিলক-চরিত্রের এই বিশিষ্টতা বিশেষভাবেই অত্যাধুনিকযোগ্য।

এই প্রসঙ্গেই টিলকের চরিত্রের ও তাঁহার ধারণা-ভাবনার আর-একটি বিস্ময় আলোচনা আসিয়া পড়ে। রাজনৈতিক বাগানে টিলক 'চরমপন্থী' হইয়া সামাজিক কার্যকলাপে রক্ষণশীলতা গ্রহণ করিলেন কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি যে, টিলক রক্ষণশীল (conservative) হইলেও কোনো-মিনই সনাতনী (orthodox) ছিলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রে 'অস্বাভ'-শ্রেণী সংঘে সামাজিক বিধিব্যবহার বিরুদ্ধে বহু বার আপনার অভিমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত চিরদিন ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়াছেন। গোঁড়ামি কোথাও টিলকের ধারণা দিয়া যায় নাই। হিন্দুধর্মের 'লৌকিকচাচাঃ মনসার্থপি ন লভয়েৎ' উপদেশ তিনি জীবনে কোনোদিন পালন করিয়াছেন কি না সম্ভেহ। পুণ্যায় তাঁহার 'গাইকবাড় গুয়াটা' ভবনে লেখক বিশিনচন্দ্র পাল মহাপন্থের সঙ্গে তাঁহার পানে বসিয়া আহার করিয়াছেন; তাঁহার পরিবারের মহিলাগণ আহার্য পরিবেশন করিয়াছেন; তিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন; ত্রিহ বর্ণের হস্তে প্রস্তুত আহার্য গ্রহণ করিতেও থিমা বোধ করেন নাই; অধিক কি, ইংরেজের গৃহে চা-পান করিয়া মহারাষ্ট্রের নামস্নান। সমাজসংস্কারক, বাংলার ব্রাহ্মসমাজের নেতার বোম্বাইয়ের প্রারম্ভ-সমাজের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা, মহাদেব গোবিন্দ রাগড়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' করিয়া 'মাত্রে উঠিলে'ও, টিলক ইংরেজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গোবিন্দচরণে সম্মত হন নাই—জাতিচ্যুত হইবার আশঙ্কাত্তেও নয়। তাঁহার প্রথম-জীবনের একান্ত-আপন সংস্কর্ষী বহু আগরকার, তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ রাগড়ে ও বিষ্ণু শাস্ত্রী চিলপার প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের সমাজসংস্কারকদের সহিত তাঁহার মতভেদের কারণ অত্যাধুনিক কবিলে দেখা যাইবে যে, তিনি এ-বিষয়ে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ বন্দোপাধ্যায়, আভ্যন্তরীণ মুখোপাধ্যায় মহাপন্থের দ্বারা ভাবিতেন ও মানিতেন যে, সমাজের অবস্থা-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রীতিনীতিও পরিবর্তনযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যুগোপযোগী সামাজিক সংস্কার-সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও বিবেচনী-শাসিত রাষ্ট্রের আত্মকূপে তাঁহার কৈহে তাহা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই টিলক লক্ষ্যসাধনমতি আইনে মত দিতে পারেন নাই, কিন্তু আপন পরিবারে গোঁড়ানান বা গ্রহণও করেন নাই। আভ্যন্তরীণ মুখোপাধ্যায় মহাপন্থ যেমন সম্ভবত বিধবা-বিবাহ-আইনের বিশেষ সমর্থক না হইয়াও আপন বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ টিলকও নাকি তাঁহার স্বজন-পরিবারের মধ্যেই ঐক্সপ কোনো একটি বিবাহে আপত্তি করেন নাই। গুরুত্বপূর্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাপন্থের দ্বারা টিলকও মনে করিতেন, অত্মকরণপ্রণালী সমাজের অস্থায়ী-প্রভৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা পরমর্ষ হইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নিরূপণচেষ্টা না করিয়াও একথা স্বীকার করা যায় না যে, আমায়ের বেগের একাধিক সমাজসংস্কারক কেবলমাত্র বিশেষের সমাজের বহিঃস্থ-প্রভাবের বদলে প্রাণমোহিতপ্রবাহিত রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন এবং

তাহাদের সে-সংস্কারচেষ্টার সহিত দেশের অন্তরের কোনো যোগ ছিল না বলিয়াই—তাহা শুধু আপামর-সাধারণের সহিত অকারণেই তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে।

ভারত-ভয়ে ও দর্শনে টিলকের গবেষণায় কি চিন্তাধারা তাহার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। কোনো গভী-গতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রগতিশীল মতবাদের আশ্রয় তিনি সে-ক্ষেত্রে কোথাও গ্রহণ করেন নাই। স্বেচ্ছাচরিত্রবাদের আকাংক্ষাপরিক্রমের অঙ্গপাতে তিনি বৈদ্যবিরোধীদের যে আশ্রয় বাগ্‌ডুমি উত্তরবেরূতে নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক গৃহীত না হইলেও, সে-গবেষণার অজীব মৌলিকতা সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছিল। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সমিলার তাহার পাণ্ডিত্যের প্রতি অস্বাভাবিক, ১৮৯৮ সনে যখন রাজকোম্পানির টিলকের প্রথম কারাগার হয়, তখন বিলাতে, তাহার বন্ধুদের সম্মুখে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন জানাইয়া তাহার শরীর মুক্তিলাভে সহায়তা করেন। শ্রীতার ‘অনাগতি’র ব্যাখ্যায় তিনি লোকশ্রেয়কেই একমাত্র নিদান কর্তব্য বলিয়া যে dynamic মানবধর্মকে শুদ্ধমাত্র আত্মমুহূর্তের উপরে আসন দিলেন, তাহা তাহার স্বাধীন চিন্তায় বলিষ্ঠ। তাহার তেজস্বী মনোবৃত্তি তাহার “শ্রীতারহস্তে” দীপ্যমান। যখন মনে হয় যে, পঞ্চাশোৎ নিঃশব্দ এই মহোৎসব বন্ধন-পরিবন্ধন হইতে বহু দূরে, ম্যাক্সমিলার কারাগারীদের অন্তরালে বসিয়া তাহার অপূর্ণ শ্রীতাত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহার ধারে কাছে না ছিল কোনো এলাগার, না ছিল এমন একজনও কেহ তাহার সহিত আলাপ-আলোচনা বিষয়-বস্তুর উপর কোনো আলোকপাত করে—তখন বিশ্বযে অভিজুত হইতে হয়। মনে হয়, শ্রীতার যোগক্ষেপ তাহারই মধ্যে মূর্ত হইয়াছিল।

এই স্বিতপ্রভতা টিলকের জন্মাবধি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থাতেই তাহার চরিত্রমহিমার সাক্ষ্য বারংবার বহন করিয়াছে। বন্ধন পীড়ন ছাড়া অগম্য স্থানে কিছুই তাঁহাকে কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, কোনোদিন তাঁহার উন্নত ললাটে “ভয় লেখে নাই লেখা, হাস্যের খুলি ঝাঁকে নাই কলহভিলক।” ১৮৯৭ সনে রাজকোম্পানি-অভিযোগে যখন তিনি বিচারার্থী, তখন তিনি যদি তাঁহার ‘অপরাধ’ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে মামলা তুলিয়া লওয়া হইবে, এ প্রস্তাব তুলিয়া টিলক বলিয়াছিলেন—
“I am not prepared to do so. My position amongst the people depends upon my character; and if I am cowed down by the prosecution, I think, living in Maharashtra is as good as living in the Andamans. We are all servants of the people. I shall be betraying them if I show a lamentable want of courage at a critical period.”

এই অকৃতোভহতাই টিলককে জনগণের হৃদয়ে অসামান্য আসন দিয়াছিল। গান্ধীজীর বহুপূর্বেই তিনি ছিলেন “People’s man”—গণের বাহুব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যথার্থই বলিয়াছিলেন—“Tilak rose out of the people, lived their life and was the embodiment of their genius. ... Essentially democratic, a divination of the mind and spirit of his people and their needs—these were the keynotes of Tilak’s political genius.” বহু বৎসরের নিঃস্বার্থ লোকসেবা টিলকের জ্ঞাত মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের হৃদয়বন্দিরে অক্ষয় স্বর্গসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দেশের সমস্ত যখন পুরাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেহুয়ানী বহু বিখ্যাত ব্যক্তি যোগবিভাবিকায় শহর ছাড়িয়া পালাইলেন, তখন টিলক তাঁহার স্বৈচ্ছাসেবকত্ব লইয়া গৃহে গৃহে

বলবন্ত গান্ধার টিলক

রোগার্ভের ঐক্য-পরা এবং শুভ্রতার ব্যবস্থা দিনের পর দিন অসমসাহসে করিয়া চলিলেন—তাহার পত্নীর কাতর অহ্নয়েও তিনি তাহার সন্তানদম্পতিদের পবিত্র পুণ্যের বাহিরে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। বহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট টিলক কেবলমাত্র ভারতবিশ্বাস জননাথক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন না, তাহারাই তাঁহাকে অসংখ্য বক্তৃতা, ছবিদের সহায় এবং হৃৎকণ্ঠে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানিত। পুণ্যের তাহার বহিরাগতির দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। প্রাতে স্নানান্তে চন্দনচর্চিত-লগ্নাট অনাবৃত-উত্তমাস টিলক তাহার বিরলসঙ্গ কক্ষটিতে একটি 'সাঁংয়ের' চাত্রপায়ার উপর উপবিষ্ট—আর্ড-শরণাগতে, প্রার্থী-প্রত্যাশীতে সেখানে তিলার্চ স্থান নাই। শত বকরের শত আবেরন, পরামর্শ-প্রার্থনা; অসংগত অমুরোধেরও অভাব নাই। স্মিতহাস্ত লোকসম্মত অহুজ্জ্বল সকলের কথা অনিতেছেন, সকলকেই বখাণোগ্য হুক্তি ও উপদেশ, আশ্বাস ও সাহস দিতেছেন—মাঝে মাঝে তাহার সেই দীপ্ত চকু শিবের তৃতীয় নেত্রের ন্যায় ক্ষণ দরক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে—“two black diamonds pierced by flashes of gold; eyes to see through walls and hearts, to subdue animals—the eyes of a leader, a conqueror!”^১ ঋতেন্দ্রিয় নিম্পুং নিরলস নিয়তিমান কর্মযোগী টিলক, লোকহিতৈষী টিলক, দরিদ্রের হৃদয় টিলক, রাষ্ট্রসাংগে ও স্বদেশে চিরবাস্তব টিলক সংক্ষেপে ভ্যালেন্টাইন চিরল পঞ্চম লিখিয়াছেন: “Tilak's indefatigable activity... his philanthropy, his accessibility to high and low, his many acts of genuine kindness, the personal magnetism which...he exerted upon most of them who came in contact with him...combined to equip him more fully than any other Indian politician for the leadership of a revolutionary movement.” —“Indian Unrest”, London, 1910

চিরল শুধু একটি ভুল করিয়াছেন—অবশ্য সে ভুল ইচ্ছাকৃত। টিলক *revolutionary* ছিলেন না। বেগবন্ত চিত্তরঞ্জন তাহার সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন—“He was by temperament incapable of a big jump. A spirit that would take what it gets and fight for the rest, cannot harbour that restlessness, that impatience which is at once the habit and instinct of a born revolutionary”—এবং ভারত-রক্ষাকে যিনি সত্যই বিশ্বদীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, টিলকের সেই হৃদয় ও সহকর্মী ঐশ্বরবিন এই প্রসঙ্গে যে কথা লিখিয়াছেন—“Not revolutionary methods or revolutionary idealism, but the clear sight and the direct propaganda and action of the patriotic political leader, insisting on the one thing needful and the straightway to drive at it, had been the seuse of Lokamanya Tilak's political career”—তাঁহা একান্ত প্রদীপমানযোগ্য। Responsive Co-operation-এর মন্ত্রণাবাদ ও ব্যাখ্যাভার পক্ষে *revolutionary* হওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না।

টিলক-প্রসঙ্গে কোনো লেখা দত্ত অদম্পূর্বি হউক-না কেন—বাংলার সহিত তাহার সম্বন্ধ-সম্পর্কের

১ ফরাসী কবি ও কথাসাহিত্যিক Theophile Gautier কবীরা উপন্যাসিক Balzac-এর চরিত্র সংক্ষেপে এই কথা লিখিয়াছেন। —লেখক।

কথা কিছু না বলিলে তাহাতে বড় অসংগতি থাকিয়া যায়। প্রথমেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলি। সংবাদপত্রগুণ্ডে শিশিরকুমার বোধ মহাশয়ের তিন সতাই গুরুর দ্বারা যেখানে এবং লব বাপায়েই তাঁহার পরামর্শ-উপদেশ গ্রহণ করিতেন। বহুবীর তিনি বাংলাদেশে আসিয়াছেন কিন্তু একমাত্র শিশির-কুমারের গৃহ—“অমৃতবাজার পত্রিকা”—তখন—বাতীত আর কোনো বাড়ালীর গৃহে তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে দেখিরাছি বা শুনিরাছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রতি তাঁহার অহুসারের স্রষ্টা ছিল না। তিনি তিরদিন তাঁহাকে আপন সহোদরের দ্বারা দেখিয়াছেন। বহুদিন তিনি বিপিনচন্দ্রের অপেক্ষা দুই বঙ্গরের বড় ছিলেন। ১৯১৮ সনে যখন টিলক হোম রুল লীগ ডেপুটেশনের নেতৃত্ব লইয়া বিলাতে যান, তখন বিপিনচন্দ্রকে তাহাতে যোগদান করিবার স্রষ্টা তিনি যে পত্র লেখেন, তাহার দু-তিনটি পংক্তি আদ্যর মনে আছে—“and as regards outfit and out of pocket expenses you will, of course, need a little more than the rest of us. It will be arranged for.” এই কথটি কথার মধ্যে যে কৌতুকহাস্যোজ্জ্বল শ্রীতি স্রিয়া পড়িয়াছে তাহা স্মরণযোগ্য। আশ্চর্যতদুপপ্রতি বিপিনচন্দ্রের সহিত রাজনীতিকক্ষে টিলকের একাধিকবার মতান্তর ঘটয়াছে, কিন্তু কোনোদিন মতান্তর হয় নাই। উপাধায় ব্রহ্মবাহুর সহিত তাঁহার কতকগুলি বিষয় সমঝিমিত্তা থাকায় তাঁহাদের দুইজনের প্রগাঢ় সৌহার্দ্য ছিল। “সভা”র ও “কেশরী”র মূল-মন্ত্রক-বোধগম্য ঘরোয়া লিখনভরীতে, ধর্মীয় প্রতীক ও উৎসব-অনুষ্ঠানের সহায়তায় জাতীয় ভাব উদ্বোধনব্যাপারে টিলক ও ব্রহ্মবাহুর সমভাবের ভাবুক ছিলেন। ঐশ্বরবিশ্বের সহিত টিলকের আত্মিক যোগের গভীরতা সমসাময়িক কালের ইতিহাসে প্রকাশিত নাই, বাক ও অস্বাক ভাবে তাহা বহু চিত্তাধারা পৃথি করিয়াছে। কর্মক্ষেত্রে তাঁহার সহচর হইয়াও একাধিক বাপারে এক-পার্থী ছিলেন না—কিন্তু ভাবের স্রগতে বিপ্লবী অরবিন্দ ও বিদ্রোহী টিলকের যে একাত্মতা ছিল, গাভীর সহিত টিলকের বা ঐশ্বরবিশ্বের তাহা কোনোদিনই ছিল না। টিলকের প্রতি ঐশ্বরবিশ্বের কী অপরিমিত স্রদ্ধা ও অহুসার ছিল তাহার একটি পৃষ্ঠান্ত দিবার মতো। ১৯২০ সনে টিলক যখন দেহরক্ষা করেন, লেখক তখন এলাহাবাদে বোভিলাল দেহক-প্রতিষ্ঠিত ও তৎকালে বিপিনচন্দ্র পাল-সম্পাদিত “Independent” পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। বিপিনবাবু অহুস হইয়া কলিকাতায় গিয়াছেন—এমন সময় টিলকের বৃত্তাসংবাদ আসিল। স্বাগতের টিলকের স্বাধাযোগ্য তর্পণ করিবে কে? সহসা মনে হইল ঐশ্বরবিশ্বকে অহুসার করিলে কেমন হয়? তৎকাল্য পতিচেরীতে তাঁহাকে অহুসার জানানো হইল, যদি তিনি তারযোগে টিলক স্রদ্ধে দধা স্রিয়া কিছু লিখিয়া পাঠান। ছয় ঘটায় মধ্যে একটি অহুসার রচনা “Independent”—আপিসে আসিয়া পৌছাইল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত টিলকের যোগাযোগ খুব বেশি না থাকিলেও, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের অস্রুতিন স্রদ্ধা ও অহুসার ছিল। ১৮৯১-সনে টিলক যখন প্রথম রাজপ্রোহাণগমনে অভিযুক্ত, বোম্বাই হাইকোর্টে তখন তাঁহার পক্ষ-সমর্থনের স্রষ্টা কৌমুদী পাণ্ডা ব্রহ্ম হইল—উকিল-মহলেও এখনি আতঙ্ক। টিলক কলিকাতায় শিশিরকুমার বোধ-মহাশয়ের নিকট অবস্থা জানাইলেন। কলিকাতা হইতে কৌমুদী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার স্রষ্টা “অমৃতবাজার পত্রিকা”—আপিসে পরামর্শমিত্তা আহুত হইল। আশ্রিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। মতিলাল বোধ-মহাশয়ের নিকট শুনিরাছি, সভাকক্ষে স্রষ্টা-উত্তরীয় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন—লগাটে তাঁহার ব্রহ্মভিলাক! টিলকের স্রষ্টা কলিকাতার কৌমুদী-নিয়োগের বারনিবাহার্থ চান। তুলিবার

বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক

কাজে রবীন্দ্রনাথ সাংঘর্ষে যোগদান করিলেন। তাঁহার নিকট অনিচ্ছা, তাঁহার অল্প ভয়জনক পাণ্ডিত্যে আশ্চর্য্যে চৌধুরী মহাপ্রবোধের অহরোধ রক্ষা না করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট গিয়া এক হাজার টাকা আদায় করেন। প্রায় সাতঘণ্টা হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় দুই জন বিখ্যাত ইংরাজ ব্যারিস্টার—পিউ ও গার্ব সাহেবকে বোঝাইয়ে পাঠানো হয়; তাঁহাদের ‘ছুনিয়’-হিসাবে যান আশ্চর্য্যে চৌধুরী ভ্রাতা ও স্বরেজ্ঞানধের জামাতা ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। “কেশরী”র বিরুদ্ধে রাহুলদেবের মামলা দীর্ঘকাল চলিবার পর টিলকের দুই বৎসর সঙ্গম কারাগার হইল (১৮৮৮)। এই ব্যাপারে সমস্ত সেননব যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা গভর্নমেন্ট দ্বারা চাহিয়াছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত; নিকে নিকে প্রবল অসন্তোষ নানা ভাবে ছড়াইয়া পড়িল; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নূতন আইন রচিত হইল। এই আইন—Sedition Bill, 1898—পাশ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার টাউন হলের প্রতিবাস-সভায় রবীন্দ্রনাথ “কণ্ঠরোগ” নামে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা “রোগ-রক্ত গভর্নমেন্ট...পূন। শহরের বক্তের উপর রাহুলদেবের যে অঙ্গুল পাথর চাপাইয়া দিলেন,” তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে।

মাথাটা ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতা রচনা করিলেন। শিবাজী সঙ্ঘে তিনি কিছু লেখেন নাই বলিয়া সম্ভারাম গণেশ বেউর মহাপ্রবোধ কবিকে অহরোধ জানান যে, তিনি যেন কলিকাতায় শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে একটি ছত্রপতি-প্রশস্তি রচনা করেন।^১ ১০১১ (১৯০৭) সনে রচিত ‘শিবাজী-উৎসব’ কবিতাটি, যতদূর মনে পড়ে, টাউন হলের সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। কবির নিকট অনিচ্ছা যে, কবিতাটি বেউর-মহাপ্রবোধ যোগদানে তর্জমা করিয়া টিলককে পাঠাইলে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে তাঁহার কবিতাই “বঙ্গ-মাথাটারে এক করি দিবে বিনা রূপে।”^২ ১০১৩ (১৯০৮) সনে শিবাজী-উৎসবে যোগদানের অল্প টিলক যখন কলিকাতায় আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সেশা না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সে-বৎসর উৎসব-মণ্ডপে, ব্রহ্মাঙ্কব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল মহাপ্রবোধের উদ্যোগে, ভবানীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা হয়।

১ এই মারাসি আক্ষর বাংলা ভাষায় একজন মূললেখ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ “সেনের কথা” একতলে ইংরেজের পোষণনীতি উপলব্ধি লোকশাস্ত্র হইয়াছিল। বাংলা মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার গ্রন্থ রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি কিছুকাল “হিতবাদী” পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন।—লেখক।

২ কবিতাটি এখানে বেউর মহাপ্রবোধের ‘শিবাজীর দীক্ষা’ (তার ১০১১) পুস্তিকার অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতঃপর মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গবর্ধন-এর ১০১১ আদিন সংখ্যায়।—লেখক।

৩ ‘শিবাজী-উৎসব’ কবিতার ছত্রপতির যে ভাবমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছিলেন, তাঁহার পরমর্ভা রচনা তাহার রূপগ্রন্থ গঠিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন (১০১১)—“শিবাজী যে কিছু শব্দকে যোগ্য-আচরণের বিরুদ্ধে মনুষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজেরই একবারে দুসের জিনিস। সেই বিভাগমূলক ধর্মদামকেই তিনি সমস্ত ভারতকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বাণীর বাণ বাণ, ইহাই অসামান্য শাসন। শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দুশাসনের মূলগত দ্বিগুণিতিক পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে।—অসম্মতি: এই মূল্যত মর্ম্মদিক্তি বলিয়া জান করিয়া সেই শতাব্দীর বর্ণনাময়ের দ্বারা এই প্রবৃত্তি ভাবতর্ককে বাপন করী কোনো মামুদেই মাধ্যমত মনে।—“ইতিহাস”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ১০১-১০২। টিলক রবীন্দ্রনাথের এই বঙ্গ-সম্প্রতিবে গ্রন্থ না করিলেও অশ্রুত গুরু করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি মাধ্যম কারাশ্রমীয়েব বাহিনী আনিয়াই (১০১৩) ভারতের রাষ্ট্রনীতিকের মূলমন্ত্রের একান্ত সহযোগিতা গ্রহণ করিয়াই করেন নাই, সেজন্য সর্ব্বভাষায় সন্তোষ হইয়াছিলেন এ কথা মনে করিবার কারণ আছে।—লেখক।

১৯১৭ সনে মিসেস বেগাটের সভাপতিত্বে যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোড়াশাকোর 'বিচিত্রা'-তখনে "ভাঙ্কর" অভিনয় সেবিবার মত করেকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতাকে নিবরণ করেন। সে-অভিনয়ে টিলক, মিসেস বেগাট, গাঙ্গুলী ও মালবীয়ারী উপস্থিত ছিলেন।^১ অভিনয়ান্তে গাঙ্গুলী ও মালবীয়ারী চলিয়া গেলে পর, টিলক ও মিসেস বেগাট 'বিচিত্রা'র হল-ঘরের পাণের একটি প্রেক্ষাগৃহে বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। মনে আছে, বিদায়কালে টিলক রবীন্দ্রনাথের অভিযান-বৃত্তকর তাঁহার হাত দুইবারির মধ্যে লইয়া কপালে ঠেকাইলেন।

যেহা কল লীগ ডেপুটেশন লইয়া টিলক যখন বিলাত-বাজার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ যেন সে-সময়ে যুরোপে থাকেন। সে-সময়ে কবি তাঁহার "পশ্চিমবঙ্গীর জয়ারি"তে লিখিয়াছেন—

"...তখন লোকমাত্র টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক নৃত্যের যোগে আমাকে পকাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে যুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন-কোম-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে, কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললাম, 'রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কারণে যোগ দিয়ে আমি যুরোপে যেতে পারব না।' তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিমতবিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে-বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী যখন করাই আমার পক্ষে সত্য কথ, এবং সেই সত্য কথের স্বাগ্রাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম, জনসাধারণ টিলককে পোলিটিকাল নেতৃত্বগ্ৰহণেই বরণ করেছিল এবং সেই কারণেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পকাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে যোগ্রাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার সেবা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজে থেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাম, হুতরাং দেশের কাম করতে পারবেন— এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করি নি।' আমি বুঝতে পারলাম, টিলক যে স্বীকার ভাঙ করেছিলেন সে কথের অধিকার তাঁর ছিল— সেই অধিকার মহৎ অধিকার। ...হাকিম-বাক সাহায্য, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।"

বাংলার মনোবীরের সহিত টিলকের এই সব সংযোগ-সংস্পর্কের মূলে ছিল বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সহিত তাঁহার ভাব ও কর্ম-যোগ। সেই আন্দোলনে বঙ্গগোম্বীরিনিঃসৃত যে নব জাতীয়তার ধারা সারা ভারতবর্ষকে প্রাবিত করিয়া হুঃস্থ আন্তিকে আগ্রস্ত করিয়াছিল, সেই স্বাধীনপ্রবাহের সঙ্গে আপনায় অপূর্ণ সংগঠনপ্রতিষ্ঠার টিলক বৃত্ত করিয়াছিলেন— মহারাষ্ট্রের কর্মধারাকে। টিলকের স্বর্ধন-সহযোগিতা ভিন্ন বাংলার অরবিন্দ-রবীন্দ্র-বিনয়চন্দ্রের ভাবপূই নব জাতীয়তাবোধ কখনোই ভারতে প্রতিষ্ঠা পাইত না।

১ অভিনয়কালে লোক রবীন্দ্রনাথের নির্ধে টিলক ও মালবীয়ারী থাকতেন বসিয়াছিলেন। তাঁহার উপর তার দিন যে অভিনয়মণ্ডলে তাঁহার কিছু জানিতে চাহিলে যেন তাহার উত্তর দেওয়া হয়। পরস্পরকর্ত ভক্তার কিম্বদন্তি যৈ যৈ য়াংয়ের উপর তার ছিল গাঙ্গুলী ও মিসেস বেগাট কিছু এর করিলে তাহার উত্তর দেওয়া। মালবীয়ারী, মনে পড়ে, শেষের দিকে ভাঙ্ক-বিপদিত হইয়াছিলেন; ওঁহার চকু লগ্ন হইয়াছিল। টিলক নিবাসনিবন্ধ এলীপের মতো— পুষ্টি অভিনয়কর্মের উপর নিয়ন্ত্রিত। মিসেস বেগাট অর্থাৎ আত্মর অভিনয় সেবিয়াছিলেন। শেষ নৃত্য হইয়া যখন লইয়া আসিয়া যলিল—'অবশ্যক কোনো দ্বন্দ্ব তাকে তোলে নি, তখন মিসেস বেগাট তাঁহার বৈয়াক দ্বিভাষা করিলেন, "What did she say?" কিম্বদন্তি উত্তর দিলে মিসেস বেগাট বলিলেন, "You have exactly the same idea in Browning's 'Evelyn Hope'." গাঙ্গুলী মনোযোগ-সহকারে অভিনয় সেবিয়াছিলেন— কোনো কথা বলেন নাই।—লেখক।

বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক

লোকনায়ক টিলক, বেহজ গীতাযাখাতা টিলক, সাত্ততাপী নিকাম কর্দোণী টিলক, শ্রীতিপরাধণ বহু টিলক, আদর্শ গৃহী টিলক—কিন্তু তাঁহার যে-মূর্তিটি লোকের চক্ষুর সম্মুখে বারংবার উদ্ভাসিত হয়, তাহার বর্ণনা রাখিবার দিবাছেন বিখ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক হেনরী মেডিনসন তাঁহার মূর্তিটি কংগ্রেসের দক্ষিণ-বর্ণনাঘ (১৯০৭)—

“On the next day when Congress met and Tilak was refused permission to move his amendment, he rose from the platform and with folded arms faced the audience. On either side of him, young Moderates sprang to their feet ; violently gesticulating vengeance, shaking their fists and yelling to the air, they clambered to hurl him down the steps of the platform. Behind him, Dr. Ghosh mounted the table and ringing an unheard bell harangued the storm in shrill, agitated, unintelligible denunciation. Restraining the rage of Moderates.....Gokhale stood beside his old opponent, flinging out both arms to protect him from the threatened onset. But Tilak asked for no protection. He stood there with folded arms, defiant, calling on violence to do its worst, calling on violence to move him, for he would move for nothing else in hell or heaven. In front, the white clad audience roared like a tumultuous sea”. —“The New Spirit in India”, London, 1908.

শ্রীঅজিত দত্ত

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার সঙ্গে আধুনিক বাঙালি পাঠকের খুব বেশি পরিচয় ঘটে নি। অথচ তাঁকে উল্লেখযোগ্য কবিরূপে গণনা করা চলে। কতকগুলি বিষয়ে এর রচনা অনগ্রসাধারণ। স্বভাবত কাব্যপ্রিয় বাঙালি পাঠকসমাজে এই কবির স্বল্প পরিচয় তাই বিষম দ্বন্দ্বায়। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এতদূর হওয়ার ঘণ্টে কারণ আছে। ঢাকা জেলার ভাওয়াল-গ্রাম-নিবাসী এই কবি বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে বহু দূরে থেকে যে কাব্যরচনা করেছিলেন, তা সহজে ও স্বাভাবিকভাবে কলকাতার রমণ্য পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করবার অর্থ। রসিক পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোনো সুযোগ পায় নি। দ্বিতীয়ত, তাঁর কবিতা আদিকের দিক থেকে অভ্যস্ত সেকেলে। ভাষার আধুনিকতা ছন্দ ও বিশেষ বৈচিত্র্য বা নৃতনর তাঁর কবিতায় দুপ্রাপ্য—একবারে নেই বললেও চলে। বহিরঙ্গের দিক থেকে বধ্যমূগের বাংলা কবিতার সঙ্গেই তাঁর রচনার সামুদ্রিক ঘোষা যায়। মিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে গতানুগতিক, কর্ণভঙ্গিমাধক্য মোটেই নয়। এক-একটি দীর্ঘ কবিতায় একই মিল আগাগোড়া ব্যবহৃত হয়েছে, যা অননুগন্ধিঃ পাঠককে প্রথমাই বিরূত করে। দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রমণ্য পাঠক ভিন্ন অন্তের পক্ষে গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার রসাস্বাদন সহজ নয়।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার পাঠকগোষ্ঠী সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল সত্য, কিন্তু সেই গতির মধ্যে তাঁর অহুরাগী পাঠকসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। এর প্রায় সকল বইয়েরই একাধিক সংস্করণ হয়েছিল, কয়েকটি বইয়ের তিনটি করে সংস্করণও হয়েছিল। নিতান্ত বিশেষত্ব-বঞ্চিত হলে এ-রচনাবলীর এতদূর সমাদর হওয়া সম্ভব ছিল না। কবি এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ও অহুরাগী পাঠকসমাজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার কাব্যরঙ্গ থেকে গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী এখন আর পাওয়া যায় না। দু-একটি পাঠ্যপুস্তকে, প্রায়ই খণ্ডিত আকারে, দু-একটি কবিতা তাঁর রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় বজায় রেখেছে, কিন্তু এ-দর উদ্ধৃত থেকে তাঁর কবিতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না।^১

২

গোবিন্দচন্দ্র দাস রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং অগ্রদূত। বাংলা কাব্যে আধুনিক ভাষা ভাব রচনা ও চিন্তার প্রবল অনুপ্রাণের সেই যুগে গোবিন্দচন্দ্র দাস তৎকালীন আধুনিকতা থেকে দূরে ছিলেন। তাঁর ভাষা প্রায় বধ্যমূগী, আর রচনা তাই—উভয়ক্ষেত্রেই দীর্ঘর ভণ্ডের প্রভাব ল্পট। গোবিন্দ দাস যে আধুনিকতা-আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে দূরে ছিলেন, শুধু তাই নয় একমাত্র কারণ নয়; আরো এক বড় কারণ এই যে তিনি 'উচ্চশিক্ষিত' ছিলেন না। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অধিকার ছিল না বললেই হয়, এবং সে

১. কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'গোবিন্দচন্দ্র দাস' নামে একখানি সংকলনগ্রন্থ এই অভাব কিছু পরিমাণে দূর করেছে।

কারণে সাধারণ অশিক্ষিত বা অধাশিক্ষিত লোকের মত পাকাত্য ভাবভঙ্গি ও চালচলনের প্রতি একটা বিরাগই তাঁর ছিল। পাকাত্য আদর্শ ও ভাবধারা তিনি ছদ্ম-গম করেন' নি বলে ইংরেজি প্রভাব বলতে তিনি সাহেবিয়ানা বৃত্তভেদ। নানা কবিতায় ছড়ানো ইংরেজি বৃহ্নির ছিটেফোটা দেখলেই এঁর বহুবিশ্ভার পরিচয় পাওয়া যায়। পাকাত্য প্রভাবিত হালচাল বা পাকাত্য সংস্কৃতি কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে নি, বরং বিচ্ছিন্নাভীর প্রতি যে তাঁর বিরাগ ছিল, সাহেবিয়ানা ও মেমলাহেবিয়ানার প্রতি অগ্রস্ত বিজ্ঞপোক্তিতে কবি নিজেই তা প্রকাশ করেছেন। 'হুদুম' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতে পাকাত্য প্রভাবের প্রতি কবির মনোভাবের পরিচয় স্পষ্ট।

কে আর তোমারে ভালবাসিবে হুদুম ?

আপা, চিত্তা, হৃৎ— সব, বত কিছু— অভিনব,

যেদম নৃতনের ঘর-স্থল !

যাহার পুরানো বস, লকলেই বেদন,

নাহি ছার আসেকার সে ভারত-স্থল !

তোমারে সে দিন নাই, কপালে পড়ছে হাই,

কাছিনী কোঁতুকে পরে 'কানেকা' হুদুম !

গেতেওয়ার ব্যাকেলার, হুইট্‌ ব্রায়ার ওয়াটার,

পাউডার এসেগের বহা! ঘরঘর !

কে আর তোমারে ধোঁয়ে ? প্রমত্ত আউ-ডি-রোয়ে,

পারফিটের সেপে পড়িগারে হুৎ !

সর্বদা বিচ্ছিন্না পক্ষ, ভারত করেছে অন্ধ,

কে আর তোমারে ভালবাসিবে হুদুম ?

৩

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় ইতস্তত ছড়ানো হু-চারটি ইংরেজি শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব তাঁর কাব্যে কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তেঁা ছিলই না, এমন কি পাকাত্য সাহিত্য, আদর্শ, ভাব ও ভঙ্গি যাত্রা প্রভাবিত সমসাময়িক কবিগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল না। তাঁর কাব্যপ্রবণার উৎস ছিল দুটি। প্রথমত, তাঁর দুর্দমনীয় আবেগ— যে আবেগ শিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শে মারিত বা সংযত হবার স্বযোগ পায় নি, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর সূত্র অভিজ্ঞতার গতির মধ্যে আবদ্ধ ছোট-বড় সামাজিক, সাংসারিক ও পারিবারিক নানা ঘটনা, যা তাঁর মনকে সাময়িক-ভাবে আলোড়িত করেছিল। কবিতায় সমসাময়িক ঘটনাবর্ণনে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দাসের শানুস্ত লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, রামকীর ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ-সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষই প্রথম দেখায়। আজ শিখের হুম্ভ, কাল পৌষপার্বণ, আজ বিধব্রি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রত্যক্ষই প্রথম দেখায়।" গোবিন্দ দাস যে অস্বরূপ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ও সামাজিক ঘটনা থেকেই অবিকাশ কবিতার বিষয় সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁর কবিতার নামগুলির থেকেই প্রতীয়মান

হবে। যেন, বিবাহোপহার (একাধিক), নববধ (একাধিক), রক্তদাস পাল, সেব-নিবাস (কোনো সম্রাট বাছকের বাস-ভবন অবলম্বনে), পরিমল বসু (নামকরণোপলক্ষে), মধুপুর, বহিরচন্দ্র, কার্তিকপূজা, টীন-জাপান-যুদ্ধ, জোলাবাধু ঘুম যায়, বিরূপপুরে বসন্ত, ডাওলাল-রাজহুঁহিতা প্রভৃতি। যে-সব কবিতায় নাম থেকে বিষয়বস্তু প্রকট নয়, তারও অধিকাংশই কোনো সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে লেখা। দৃষ্টান্ত হিসেবে, তাঁর বিখ্যাত কবিতা অতুল, সায়রা ও প্রেমবা প্রভৃতি কবিতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বহিঃচন্দ্র যে অর্থে সমসাময়িক ঘটনাকে 'রঙ্গময়ী রচনার বিষয়' করে নেওয়ার কথা ঈশ্বর গুপ্ত সঙ্ক্ষে বলেছেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস সঙ্ক্ষে অব্যক্ত সে কথা খাটে না। ঈশ্বরচন্দ্রকে পারিপার্শ্বিক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা জুগিয়েছে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের উপকরণ। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাসের মধ্যে সেই অসুস্থ্যাহীন তীব্র রঙ্গরসবোধ ছিল না, আবার শুধু রঙ্গবোধকে আশ্রয় করে কণিকের অহুত্বকে কাব্যের বিষয় করে তোলাবার আধুনিক কৌশলও তাঁর জানা ছিল না। তাই পারিপার্শ্বিক ঘটনাকে আশ্রয় করেই তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে প্রয়াস পেরেছেন। কলে, যেখানে এই-সব বিষয়ের সঙ্গে তাঁর স্বকীয় অহুত্বের প্রেরণা সংঘ ও স্বাভাবিকভাবে ঘেঁষে নি, সেখানে তাঁর কবিতা গভীরগতিক অলংকারময় বৈশিষ্ট্যহীন পড়ে পর্যবেক্ষিত হয়েছে। যেন নামকরণ ও বিবাহোপলক্ষে লেখা বহু কবিতা তাঁর এঘে স্থান পেয়েছে যা অত্যন্ত সাধারণ। তবু গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বভাবতই আবেগপ্রবণ কবি বলে তাঁর কাব্যে কবিত্বের পরিচয় পদে পদেই পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সঙ্গে বহিরক্ষে তাঁর কবিতার মিল থাকলেও, এমিক থেকে বিচার করলে তিনি বৃহত্তর কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। ঈশ্বর গুপ্ত সঙ্ক্ষে বহিরচন্দ্র বলেছিলেন, "কোনল, গভীর, উগ্রত, অশ্রুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না।" এ দৃষ্টব্য গোবিন্দচন্দ্র দাস সঙ্ক্ষে খাটে না। তাঁর যশেই কবিতাগুলি এবং সমসাময়িক ঘটনার উপর লেখা বহু কবিতাভেদে তাঁর তাঁর অহুত্বের পরিচয় মেলে। অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি তাঁরই লেখা।

কলস কলস কর্ধ করে; এসে তোমার নঃ—

এই যদুনা পল্লবদী, তোমার ইহা হত যদি

পরের পদবা গোলা দৈত্যে লাহার কেন বঃ ?

কলস কলস কর্ধ করে, এসে তোমার নঃ,

এই যে লাহার, এই যে গাতি, এই যে পেকেল— এই যে গাতি

এই যে ধারা কেহেলবারা—এই বিচারাঙ্গ,

লাট বুল্লাট ভায়াই সন, লল ঘামিষ্টর ভায়াই সন,

চাকু খাবার খানু কেহল তোমরা সমুদ্র—

বাণুর্টি, বাবলাবা, আর, দেখর মসাঁপ !

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর তীব্র প্রেমাবেগ বা passion। এক্ষণে প্রেমাবেগ এ-মুগের কাব্যে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। গভীর আবেগে উৎসাহিত তাঁর প্রেমাহুত্ব নিম্নোক্ত প্রকাশিত হতে বাংলা কবিতায় খুব কমই দেখা গেছে। উনিশ শতাব্দীর কবিতায় সোমসাহসি

গোবিন্দচন্দ্র দাস

প্রেমের কবিতা— নিখুঁত গান বাব মিলে— প্রায় নেই বললেই হয়। ডিক্টোরীয় যুগের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত উনিশ শতাব্দীর কবিতার প্রেমাবেগের তীব্র ও অসংকোচ প্রকাশ সম্ভব ছিল কি না তাই সন্দেহ। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র ঝাং ছিলেন এ-প্রভাব মুক্ত। মনের কথা অসংকোচে, এমন কি যথেষ্টভাবে প্রকাশ করবার রীতি ঈশ্বর ওপুই প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এ যথেষ্টাচার প্রেমের কবিতায় তখনো সংক্রান্ত হয় নি। তখনকার উচ্চশিক্ষিত, উন্নতকৃষ্টি, অভিব্যক্তি সাহিত্যিকেরা প্রেমাবেগের নির্মল প্রকাশকে কচিবিগহিত বলে মনে করতেন। গোবিন্দচন্দ্র দাসের শিক্ষারীক্ষা, পরিবেশ বা সংস্কৃতি উচ্চতরের ছিল না। তাই আধুনিক যুগের কৃষ্টি ও শাসনতাবোধ তাঁর কাব্যে সংঘন ও সুখলা এনে দিতে পারে নি। আকারে বা আবেগে কোনোমিকেই তিনি তাঁর রচনাকে সংযত করতে আনতেন না। তাঁর অনেক কবিতাই বৈধে অত্যন্ত বড়— সংঘনই যে সাহিত্যের প্রাণ, এ সত্য তিনি শেখেননি। মনের সকল কথাই যে বলবার প্রয়োজন হয় না, কাব্যে যকবিত বাণী ইহিতে প্রকাশিত হয়েই যে রসজ্ঞ পাঠকচিহ্নকে বেশি আলোড়িত করে এ-ও তাঁর অজ্ঞাত ছিল। তাই আত্মকের বিচারে তাঁর অনেক কবিতাই কচিবিগহিত, অমার্জিত ও অসংযত বলে মনে হতে পারে। তবু তাঁর স্বতঃ-উৎসারিত প্রেমের কবিতার আবেগের আন্তরিকতা ও তীব্রতা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। আর এ কথাও মনে হয় যে, গভীর তীব্র তীক্ষ্ণ প্রেমাত্মক এমন স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠভাবে ও অসংকোচে প্রকাশ করতে খুব কম কবিই সক্ষম হয়েছেন। নীচের কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হবে বলে আশা করি। গোবিন্দচন্দ্র যে ধরনের কবি তাতে অপেক্ষাকৃত ধীর উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

আদি তারে ভালবাসি অহিবাঃসদয়,

অমৃত সকলি তার—বিলস বিরহ !

খুঁষি না আখ্যানিকতা,

বেহ ঝাড়া প্রেমকথা

কানুক স্পষ্ট তাই বা কহ তা কহ !

আদি মহাকান্ত পতি,

সরলা সে বহ্নিরতি,

হরিলে বধা নাই, নারিক বিরহ !

অনন্ত অনন্ত ছন্দ

সদা থাকে এক সঙ্গে,

সে আমার আদি তার মহা বলসহ !

আদি তারে ভালবাসি অহিবাঃসদয় :

আজো তার ভয় ছাই •

কুক রেখে চুপা খাই,

আজো সে খামের গন্ধ বহে গন্ধহ !

আলো তার প্রতিফল
 বহিষ্কৃত করে
 কখনে আশ্রয় করে লগ্নী স্বপ্ন।
 —“আশ্রয় ভাসিলা”, কস্তুরী

মিলে যদি সব দেও বা অর্ধে তোমার
 যেও রূপ রস গন্ধ, কি বিধে কি আনন্দ,
 দেও তব হাসি অন্ধ শোক তার ;
 দেও হুল ঈশ দান, দেও আশা দেও প্রাণ,
 দেও হেই ভাগবাতা দুখা তিরহাট,
 যত নিশা যত রানি দেও মো সখ্য আনি,
 দেও মো কলঙ্ক কীতি বা আশ্রয় তোমার !
 দেও মো যৌবন জয়া পত্র কথা বাখা তারা,
 দেও পাণ অমৃতপাণ পুণ্য পুরবার ;
 দেও মো নরক বর্গ, জয় হুত্ব চতুর্দশ,
 দেও ভূত তর্কিত আলো অন্ধকার ;
 নীলগুপ্ত সিংহর মুখে, দেও ঢেলে শতমুখে,
 মিলে যদি হুখে হুখে দুকে দু'জবার !

সরলা, তোমারে কবি, জন্ম যদি আমি নহি,
 আমি যে করেছি পান নহে কিবিরি।
 আমি রাহ যারে প্রাণি, আমি যারে ভাসিলা
 শ্রীকৃষ্ণ যরণে দৃষ্টি মাহিক তাহার।
 —“বৃন্দা”, বৈষ্ণবদাস

উপরে উদ্ধৃত দুটি কবিতা ছাড়া উপর রমণী, সারদা ও প্রেমদা প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রেমের আত্মরিকতা পরিষ্কৃত হয়েছে। কবির দুই বিবাহ ছিল। সারদার মৃত্যুর সাত বৎসর পর কবি প্রেমদাস্বন্দরীকে বিবাহ করেন। এই দুই প্রেমের আকর্ষণ কবি অতি মর্মস্পর্শী আত্মরিকতায় ব্যক্ত করেছেন নিরোদ্ধৃত ‘সারদা ও প্রেমদা’ নামক কবিতায়।

সারদা পশ্চিমে ভবে, প্রেমদা উত্তরে পূবে
 জীবন গমন যথে আমি ঝড়ানি,
 অশ্রুৎ প্রেমদা উমা, অশ্রুৎ সন্ধ্যার ভূষা,
 পৃথিবীর দুই প্রান্ত উড়েছে মাঝিলা !

সারদা বাইতে ডাকে, প্রেমদা বহিরা রাখে,
 ঠেকেছি বিবর দার—বিবর মন্ডলে,
 কে হয় প্রেমদা মুনি, কারে যদি কারে তুনি,
 একদা দারুণ দার কংকো নাকি ফটে !

মেঘা পদ্মার কূলে কোকিল শেখাশি কূলে
করিয়া বাসর-পথ্যা ভাষিয়ে আশাও,
সারথা টিলাই জীরে, আশ কাঠ দিবে দিবে,
আচল বিহারে ভাকে চিতা-বিহায়ায় ।

নাহি নিশি নাহি দিন, হু'লনেই নিরাহীন,
হুই বিকে হুই শিখু গরিছে সন্ধ্যাবে,
পাখাপ-কল-বাধী, পানামা বোরক আদি,
বীরে বীরে জেঙ্গ নাহি হু'লবার বাণে ।

—“সারথা ও মেঘা”, বস্ত্রধী

গোবিন্দচন্দ্র দাসের অল্প অনেক কবিতায় যেমন, এখানেও উপযুক্ত শিক্ষার অভাব দু-একটি অযোগ্য শব্দের প্রবেশে পরিষ্কৃত হয়েছে এবং কাব্যের রূপকে ক্ষতি করেছে। উপরের পংক্তিগুলির মধ্যে ‘পানামা বোরক’ উপমার প্রয়োগ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয়, তাঁর আবেগে সে আত্মবিকৃত। ছিল, তাঁর ভাষা যদি তদুচ্ছবায়ী স্বশৃঙ্খল ও স্বাধীন হত, তবে তিনি প্রকৃতই উচ্চতরের কবি বলে পরিগণিত হতে পারতেন।

৫

এ কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে তাঁর প্রায় সব কবিতারই বিষয় কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার গতির মধ্যবর্তী কোনো পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে সংগৃহীত। গোবিন্দচন্দ্র দাসের এমন কবিতা খুঁজে পাওয়া কঠিন যার প্রেরণা কবির কিংবা কবির বন্ধুবান্ধবের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে খুব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান নয়। বজাবতই অস্বাভাবিক, কবির কল্পনাপ্রসঙ্গ খুব প্রখর ছিল না। এর কবিতার উপমাগুলি লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্ত আরো বলবৎ হয়।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের উপমা অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্যকর নতুন। যেখানেই কবি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত গভাভূগতিক উপমা ব্যবহার না করেছেন, সেখানেই তিনি এমন নতুন ও আধুনিক উপমা ব্যবহার করেছেন যা তাঁর পরিচিত পরিবেশ থেকে সংগৃহীত। সর্বত্র অবশ্য এ নতুন স্বপ্নের দৃষ্টি নি—যেমন উপরের ‘পানামা বোরক’-এ দেখা গেছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব উপমা কেবল অভিন্ন নয়, অপরূপ বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রেও কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতাই উপমার উপকরণ জুগিয়েছে এবং তাঁর কল্পনাপ্রসঙ্গ অভাব মিটিয়েছে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। আশেপাশের খুঁটিমাটি জিনিস লক্ষ্য করে তাকে কবিতার রূপান্তরিত করতে এ কবি প্রকৃতই দক্ষ ছিলেন। নীচের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে তাঁর ঘরোয়া এবং নিত্য চোখে দেখা জিনিসগুলিকে উপমা ব্যবহার করার অসুত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে।

উড়িছে কেবল কোলে বলাকা উজালা
জেরীর কাল অর্ধে মহাপ্রখরাসা ।

—“ক্যানো দিশান”, মেঘ ও কুল

একখানি ঘোঁট নাও বেয়ে যায় বীরে
আত্মলা মনবী বেয়ে গড়াইয়া তীরে,
সেইদর সে চাহনি সে বন্ধন যায়,
গাঁড়ের আঁখিতে যেন হিঁড়ে হিঁড়ে যায়।

হায়ে পোরে হায় সেই পোরে বিহার
গোবুন্দির কোল থেকে রনি অন্ত বার !
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে খেস খুশ
বলিন করিচা নার আশ্রয় খুশ !

একখানি গ্রাম ভাসে জলধর হাটে
গঙ্গা দৃষ্টিকার ঠোঁট। মাগর ললাটে।

—“অতুল”, কবিতা

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচনার মৌলিক উপন্যাস কমই আছে— অবিকালই গতাঃগতিঃ চিরাগত উপন্যাস। তার মধ্যে বিশেষত্ব খুব বেশি নেই। গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ তাঁর সহজ, অদ্ব্যকোচ তাঁর ভাবাবেগ প্রকাশ ক্ষমতার, ও অগ্ৰহ বর্ণনার। অসাধারণ বর্ণনাশক্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে ‘অতুল’ কবিতার ঘূরের বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য।

তরলতা ঘূষ যায়, ঘূষ যায় ফুল,
গলবের কোলে কোলে ঘূষায় ফুল।
আকাশে হেলান দিহা ঘূষায় পর্বত,
সমুদ্রে সমুদ্র পাভা মহাশয়্যাবৎ।
নিরাশার নিম্পেষিত মহা মল্লকুমে,
কত বন্ধ অবিচূর্ণ আছে ঘোর ঘূষে।
বাসে বাসে ঘূষ যায় কত অস্তরল,
সৈকতে পোকের বাস ঘূষতে বিহল।
দিকবন্ধ জাবাঠ অনিবন্ধ নীবি,
খলিত অকল অকল ঘূষায় পৃথিবী।
অবন্ত পাতির দ্বা তুলিতে সবাই,
একটি হাডের চোখে শুধু ঘূষ নাই।
চিরবাহ জাগরণ তার কুণ্ডে বিরা,
ঘূষ যায় চিত্তচুমি নির্বিজ্ঞ নির্বিজ্ঞ।

—“অতুল”, কবিতা

উদ্ধৃতি বর্ধ হইয়াছে, কিন্তু পাঠক-সাধারণের অপরিচয়ের জন্যই এই উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োজন।

সব চেয়ে ভালমাসি স্থানে রকম।
সে লাখ্য অতিশুক, পুণ্যকৃত অগ্নিকৃত,

চৌদ্দিক বেড়িয়া তার উঠে হবিলাদি !
 নাহি দিংশা নাহি শেখ, নাহি হুং হুং শেখ,
 নির্বাণিত প্রকৃতির প্রতিমা যেমনি ।
 অথবা তাহারি কাজে ত্রুণাও নিবিয়া আছে
 জাহ্নত পবন পাকি আছে একাকিনী ।
 বুক ভরা অশ্রুতপ যেন আদিত্যের পুণ
 দ্বিরাট বিশাল উজ্জ—পূর্ণে দিনব্যপ
 যেন দিয়ে ছুঁয়ায় সে বুক পেল না ভরা
 আদ্যো চাহে কোটি বিধ এমনি এমনি !

—“উলঙ্গ রকট”, কস্তুরী

সাক্ষরের শেষ দিন— কেবে অন্ধকার,
 বিনয়ান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ শেষ,
 দেবের পদাঙ্কে শেষ ছুটিয়ে আবার
 উলঙ্গ— এগারে চুল, হাতে নিয়ে মহাপুণ,
 বিকট তৈরব নামে ছাড়াইয়া ধংকার !
 নিরবি সে ভীমহায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কাগ,
 ভয়ে যেন ত্রুণপুত্র গেছে ঘনী হয়ে,
 আতঙ্কে কাপিতে বুক নাহি পাতি একটুক,
 তরল তুকান তার ছুটিয়ে চলয়ে ।
 আদ্যি ভায়। পশুর উর্দে নি পশন-পশর,
 পবন পেয়েছে ডর বরণের ভয়ে,
 এমনি ভীষণ বৃত্ত, সুখিবা ত্রুণাও বিথ,
 এমনি হইবে ধ্বংস মহান প্রলয় ।

—“স্বপ্নান নিশান”, শ্রেণ ও হুণ

গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁর কাব্যের সরল ভাবাবেগে তাঁর নিকটবর্তী পাঠকসমাজকে ভূপ্তি দিতে পেরেছিলেন, এও কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই পূর্ববঙ্গবাসী কবির রচনায় পূর্ববঙ্গের পল্লীপ্রকৃতি যেমন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, অত্র কোনো কবির রচনাতেই সেতপ দেখা যায় না। পূর্ববঙ্গের ভাষাও ইনি প্রচুর ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর রচনায় পূর্ববঙ্গেরও পল্লীসমাজেরও কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্র দাস বড় কবি বলে গণ্য হবেন না, কিন্তু স্ববীজ্যনাথের সম-
 সাময়িক কবিগণের মধ্যে তিনি যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। এককবির
 রচনার আবেগের তীব্রতা ছিল কিন্তু সংযম ছিল না; আন্তরিকতা ছিল কিন্তু সুখল। ছিল না, বলিষ্ঠতা
 ছিল কিন্তু সৌষ্টব ছিল না। সেইজন্য কবিপ্রতিভার অধিকৃত্যই হয়েও তিনি উচ্চতর কৃতিত্ব, মহত্তর
 সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। তা হলেও, শিক্ষা সংস্কৃতি ও উন্নততরিতর অভাব সত্ত্বেও তাঁর
 কবিতায় যে তিনি গভীরগতিক কবিতা থেকে অনেকটা ভিন্ন স্বাদ পরিবেশন করতে পেরেছিলেন—
 এও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

“‘ত্রিষ্কন্ধকীর্তনে’ ত্রিচৈতন্যলীলার ইঙ্গিত”

সন ১০৩২ সালের (ষাটশ বর্ষ প্রাথম সংখ্যা) শ্রাবণ-মাঘিন বিশ্বভারতী পত্রিকাঃ ডক্টর ত্রিবিমানবিহারী বহুবঙ্গার “‘ত্রিষ্কন্ধকীর্তনে’ ত্রিচৈতন্যলীলার ইঙ্গিত” নাম দিয়া একটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন। নিবন্ধের মধ্যে কোনো ভুলি নাই, এবং মনগড়া সিদ্ধান্ত আছে। অবশ্য পরলোকগত সম্পাদক মহাশয়ের নামে অপবাদ দিতে তিনি কোনো সংকোচ বোধ করেন নাই। লিখিয়াছেন—“এইরূপ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিলে পুত্রির প্রাচীনত্বের দাবি টেকে না। তাই এই ব্যাখ্যাকে উড়াইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে দ্ব্যর্থকটকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।”

তর্ঘ্যাহো চাহিয়া যবে না পাহ গোপালে।

তবেলি চাইছ গির্দা ভাগীরথী কুলে ॥

এই কবিতাটির বিবানবাবু স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিতেছেন—“ত্রিষ্কন্ধের কৃন্দাবনলীলার সঙ্গে ভাগীরথীকূলের কোনো সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য বনে হয় উদ্ধত অংশের রচয়িতা বলিতে চাহেন—‘নিত্যন্তই যদি ব্রহ্মবংশের কোথাও ত্রিষ্কন্ধের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে ত্রিষ্কন্ধের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানে খোঁজ কর। সেখানে না পাওয়া গেলে সাগরের কাছে সন্ধান করিও, কেননা ত্রিষ্কন্ধরূপী ত্রিচৈতন্য সাগরে প্রায়ই যান। আর সেখানেও না পাইলে সকল স্রোতের কাছে ভ্রাম্যমাণ করিও, তাহা হইলে ‘হৃদি পাইবে’, সন্ধান বা তত্ত্ব পাইবে যেখানে জগন্নাথ বাস করেন। এই ভোমাকে ভাগীরথীকূলের আদিলীলা ও জগন্নাথ ধানের অন্ত্যালীলা—‘আমি অস্ত্র কথা সব কহিল তোমাত্তে’ ॥”

এই ব্যাখ্যায় ‘বনে হব’ কথাটি লক্ষ্যকর। “হৃদি পাইবে” যেখানে জগন্নাথ বাস করেন” ইহা নিত্যন্তই কটকল্পনা, প্রকৃত অর্থ—সেই জগন্নাথের (সেই জগন্নাথ যেখানে আছেন তাহার) সন্ধান পাইবে। এই কবিতায় নাস্তিক মূর্খির সঙ্গে কানাইএর অবস্থিতির অল্পমান করা হইয়াছে। নাস্তিক মূর্খির সঙ্গে কৃন্দাবনলীলার সম্বন্ধ কি? “ভাগীরথীকূল” এখানে পবিত্র স্থান রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃন্দাবনের নানাগণসংগ হইতে পারে। “সাগরের ঘরে—সাগর গোয়ালের ঘরে” পরিভাষা লেখা, তাহার অর্থ সমুদ্রতীর কি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা?

ত্রিধাধার আবির্ভাব-প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

“তে কারণে পড়মা উদরে। উপজিলা সাগরের ঘরে।” ২৪ সং পৃ ৩

“আম্বো কস্তপ বধির কুঁহর তেজ্ঞে সাগর কৌরবী।” ২৪ সং পৃ ১৩০

সুতরাং সাগর গোয়ালই কবির অভিপ্রেত। সমুদ্রের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

জগন্নাথ ২, ১১, ৪২, ৪৬, ৬২, ৭৫ পৃষ্ঠায় আছে। জগন্নাথে ৬৮, ৮০, ৮১, ১০৩, ১০৮ পৃষ্ঠায় আছে। জগন্নাথের ১৬০ পৃষ্ঠায় আছে। জগন্নাথের নাম ৪৮, জগন্নাথ ৭৩, জগন্নাথ ১২৫ পৃষ্ঠায় আছে। এতগুলি পৃষ্ঠায় কোনো স্থানে পুত্রীর জগন্নাথের এতটুকু ইঙ্গিত মাত্র নাই। সর্বত্রই জগন্নাথ—জগন্নাথের নাম, জগন্নাথ

“ঐক্যকীর্তনে” ঐচ্ছিকলীলার ইঙ্গিত

এই অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। অকস্মাৎ নিম্নের গররে রাধাবিরহ খণ্ডের অগ্নিরাশি—পূরীর অগ্নিরাশি হইবেন কেন? এইরূপে টানিয়া বিনিয়া অর্থ করা কি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা?

তোমার কারণে অবতীর্ণ হইয়াছি, ঐক্যের এই উক্তি অর্থ্য। ‘নিবেষণে বৃণ্যমিতঃ চক্ষুঃ প্রাবৃণ্যমিতঃ’ এই রোকের দ্বারা ধরিয়া ঐক্যকীর্তনকে আধুনিক বলা নিতান্তই গণ্ডের ভেতরের কথা। প্রাচীনত্বের ছাপ ঐক্যকীর্তনের সর্বত্র। উপাখ্যান, ভাষা, ছন্দ, রচনাশৈলী ইত্যাদি যে-কোনো একটি বিষয়ে তাহার আলোচনা করিলে বৃষ্টিতে বিলম্ব হয় না যে গ্রন্থখানি ঐচ্ছিকভাষ্যের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। পুথির লিপিকাল তাহার শতাব্দিক বঙ্গের পরবর্তী। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। ঐক্যকীর্তনে ঐচ্ছিকলীলার কোনো ইঙ্গিত নাই।

ঐহরেক্ষ মুখোপাধ্যায়

মূল প্রবন্ধলেখকের উত্তর

“ভাগীরথীকূল” (ঐক্যকীর্তন, ১ম সং, পৃ ৩৪০) শব্দটি ঐক্যলীলার সঙ্গে একেবারেই বাপ খাব না। ঐক্যকীর্তনের সম্পাদক মহাশয় সেইসকল প্রথম সংস্করণের টীকা ‘কূল’কে ‘কুল’ ধরিয়া লিখিয়াছিলেন “ভাগীরথীনাথ (কোন) গোপগৃহে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে।” চতুর্থ সংস্করণের টীকা ‘ভাগীরথীকূল’কে তিনি গোবর্দনস্থ মানসগঙ্গার তীর ধরিয়াছিলেন। এখন স্রোত হরেক্ষকবানু ভাগীরথীকূলকে কেবলমাত্র একটি পবিত্র স্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। আলোচ্য পদটিতে রাধা বড়াইকে বাহুল্যের ঘরে, শোণাধার কোলে, ঘনুনার কূলে, ঘনুনার ঘাটে, ব্রহ্মাবনের তরুর উপরে, গোপগণের স্থানে ও সংকেতস্থলে ঐক্যের খোঁজ করিতে বলিয়াছেন। এইগুলির প্রত্যেকটিই ঐক্যলীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; কোনটিই হরেক্ষকবানুর মতামুখ্যায় ভাগীরথীকূলের মতন কেবলমাত্র সাধারণ অর্থে পবিত্র স্থান নহে। সেইসকল পদটির ভাবের পৌরাণিক রসের স্রষ্টা বলিতে হয় যে ঐক্য ঐচ্ছিকভাষ্যে গঙ্গাতীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই কবি রাধার মূখ দিয়া তাঁহাকে ভাগীরথীকূলে সন্ধান করিবার কথা বলিতেছেন।

ঐক্যকীর্তনের প্রথমেই (১ম সং পৃ ২) নারদের অবতারণা করা হইয়াছে; উহা অবশ্য হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের প্রথম অধ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১।৩৪ স্লোকের ভাব লইয়া। হরিবংশে যেখানে নারদকে “ভেজস্য অশ্বনাভাঃ বপুষা সর্ববর্ষলম্” বলিয়াছেন, ঐক্যকীর্তনের কবি সেখানে “নাচ এ নারদ ভেকের গতি, বিকৃতবদন উনমতম” বলিয়াছেন।

“অগ্নিরাশি” ও “সাগর” শব্দের অর্থ থাকিলেও, উহা প্রয়োগ করিয়া কবি ঐচ্ছিকলীলার ইশারা করিয়াছেন। মুখা অর্থ পরিহার করিয়া গোপার্শ্বে শব্দ প্রয়োগ কাব্যে ইঙ্গিতের বৈশিষ্ট্য।

ঐবিমানবিহারী মজুমদার

ওঅল্টার ডে লা মেয়ার

১৮৭৩ - ১৯০০

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

‘আমি’ (‘Me’) কবিতায় ডে লা মেয়ার একথা লিখেছিলেন :

বর্তদিন আমি আজ
আমি শুধু আমি হয়েই বাঁচব
আর কিছু নয়
কেবল আমি ।
সেবে একদিন আসবে
যখন এই দেহ ছেড়ে যাব
তার সব দুঃখের দ্বারে
আর তার অন্তরবাসী আত্মা
বিদায় নেবে ।

Till the day come ou
When I leave this body,
It's all then done,
And the spirit within it
Is gone.

সেদিন সন্ধ্যাই এল ১৯০৬এর বাইশে জুন । তিরিশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ।

প্রতিদিনের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়তো তাঁর সামান্যই বিচ্ছেদবেদনা বেবেছে, কারণ প্রতিদিনের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগ খুব নিবিড় ছিল না । তাঁর নিত্যবিহার ছিল কল্লোলকের তীরে তীরে, ধরা-অধরায় গোধূলি-আলোয় । যেখানে নিভৃত অরণ্যের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোয় পরীর দল হুয়াশার চাঁদের বিছিয়ে নামে, যেখানে লোকালয় থেকে বহুদূরে পোড়োবাড়ির মধ্যে বাতুড়েরা বাগা বাঁধে, যেখানে রান চাঁদের আলোয় অশরীরী আত্মার কারণে প্রতীকার দিন গেলে, সেই সব নির্জন নিদ্রমহলে রূপকথায় এক জগতে ছিল তাঁর বাস । এই বাস্তব জগৎটাকে খুব বেশি সীমাবদ্ধ করে তিনি কখনো দেখেন নি । যদিই এর থেকে কিছু তাঁর ভালো লেগে থাকে—কোনো-একটি বৃড়ো কৃষকের ময়র মূর্তি, কোনো-একটি খোঁড়া হুতুর, কিংবা গ্রামের পাথে ছাঁতমুখর কোনো শিশুর দল—তাদের তিনি রূপকথায় যন্ত্রণা রঙেই এঁকেছেন, বাস্তবের মোটা জুলিতে মোটা মোটা ধাগে নয় । অতি বেশি বিজ্ঞের চোখ নিয়ে জীবনকে দেখবার দৃষ্টি তিনি ছিলেন না । শিশুর মুখ সারল্যের মধ্যে যে পরর প্রবৃত্ততা আছে, তাঁর ছিল সেই জ্ঞান ।—

Now I know where the Rainbow ends
I know where there grows



শ্রীমন্তাৰ ডে লা মেৰাৰ

১৮৭০ - ১৯৪৯

ওঅলট্রা ডে লা মেয়ার

A Tree that's called the Tree of Life

I know where there flows

The River of All-Forgottenness

And where the Lotus blows.

আজ জানি জানি কোথায় গিয়ে রামধনুটি শেষ হয়েছে,

কোথায় জন্মেছে সেই গাছ, যাকে বলে জীবনকল,

কোথা গিয়ে রয়েছে বিশ্বরূপের নদী,

জানি কোথায় ফুটে ওঠে পদ্মফুলটি।

সেই সকল মানার পারে আজ তিনি পৌঁছেছেন হয়েছে।

কবিবন্ধু উইলিয়ম হেনরি ডেভিস বলতেন, ডে লা মেয়ারকে কোনো প্রব্র তপিয়ে লাভ নেই, ও সর্বকণ আপন দ্বিজাঙ্গিতেই নয়। কবিসের সত্যিই দ্বিজাঙ্গা করে লাভ নেই। বিশেষ করে তাঁদের নিঃস্বপনের সম্পর্কে। তাঁদের মনোভূমি তাঁদের বাইরের স্বাক্ষর সঙ্গে সব সময় বাপ খায় না। তবু কোনো কোনো কবির জীবনী আলোচনা হয়তো সার্থক, তাতে তাঁদের কাব্যরসাস্বাদনে হয়তো সাহায্য হয়। শেলি বায়রন বা উইলেক্স ওয়েন যেমন। কিন্তু ডে লা মেয়ারের জীবন বড়ই বাহ্যাবলম্বিত, তাঁর চেতনার স্বর্ণালীলার কোনো স্পন্দন নেই সেখানে। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। শেক্সপিয়ারের বেশাও তো তাই।

তবে সংক্ষেপে হয়তো বলা দরকার যে ওঅলট্রার জন ডে লা মেয়ার ইংল্যান্ডের কেট্ প্রদেশের চার্লটন গ্রামে জন্মেছিলেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল। পূর্বপুরুষ ছিলেন ফরাসী প্রটেস্ট্যান্ট বংশজাত, যা ছিলেন স্টল্যাওয়ার মেয়ে। সেট্ পদ্ম ক্যাথিড্রাল স্থলে পাঠ সাধ করে বোলো বছর বয়সে চাকরির খোঁজে তাঁকে বেরোতে হয়। সেবে কেরানির কাছ পেলেন আংলো-আমেরিকান ভেলের কোম্পানিতে, তাঁদের লগুন আপিলে। ছেলেবেলায় স্থলে থাকতেই সাহিত্যচর্চার নেশা তাঁকে ধরেছিল, স্থলের ছেলেদের নিয়ে এক মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। কেরানির কাছের যথেষ্ট সে নেশা তাঁকে ছাড়ল না। অল্পবয়সে গল্প কবিতা তিনি লিখে চললেন স্বনামে বনামে। 'দি ব্লেচ', 'পদ্ম গেম্বেট' প্রভৃতি পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশ পেতে লাগল মধ্য মতো। ১৯০২ সালে বেরোল প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সহস্ অচ্ চাইল্ডহুড' (শৈশবের গান)। দু বছর পরে একটি বড় গল্প প্রকাশিত হল—'হেনরি ব্রেকন'। এ দুটি বইয়ে তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'ওঅলট্রার রামাল'। এর পরে সে নাম আর তিনি ব্যবহার করেন নি।

১৯০৮ সালে ডে লা মেয়ার চাকরি ছেড়ে সাহিত্যসাধনায় একান্তভাবে মন দিলেন। সেই থেকে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে নানা স্বাক্ষর সৃষ্টি তাঁর হাতে হয়েছে। সংখ্যাও তা হয়তো খুব বেশি নয়—বংগার স্থলের মতো ছোট ছোট কবিতা, তিনটি উপন্যাস, ঠাট্টা বাটেক গল্প, কিন্তু সমালোচনা—কিন্তু যত শিল্পীর প্রতিভা তাঁদের প্রতিভাফলি রচনাতেই দীপ্তি দিয়েছে। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'প্রাইভেট ভিউ' সাহিত্যের সমালোচনা—১৯৫০ সালে বেরোয়। কয়েকবার আমেরিকায় গিয়ে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছে, তার

বেশি তিনি বাইরে বেরোন নি, ঘাসের শিসের ওপর শিশিরবিন্দু দেবেই তৃপ্তি পেয়েছেন। রচনাগুলিও তাঁর শিশিরবিন্দুরই মতো—সুন্দর কিন্তু উজ্জল, স্পষ্টিক হলেও চিরন্তনের বার্তা আনায়।

দ্বীপ তির্যশি বহরের এই সংক্ষিপ্ত আখ্যান নিকটই অস্বার্থক। যে স্বপ্নাকুর চিরনিদ্রুতচারী মাহুঘটকে তাঁর লেখার মধ্যে পাই, জীবনকাহিনীতে বুঝাই তাঁর লঙ্ঘন করা।

গার জীবন একান্ত ঠাই, ঘি তাঁর পাঠ্যকল্প তাঁর পৈতৃক, কৈশোর ও যৌবন সম্বন্ধে কোঁতুলক বোধ করবে, একবার তাঁরই অধিকার নিয়ে সে কোঁতুলক পরিচাল্য করবার।—করেন্ট, রীড

ডে লা বেয়ার কবিই। ছোটগল্প ও উপন্যাসগুলিতেও তাঁর কবিকল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে। অসুখ স্বপ্নমানচিত্র তাদের ভাষা, বোধ হয় একমাত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। কোথাও একটি অসুখ শব্দপ্রয়োগ নেই, সেই একটি বেহু। ডে লা বেয়ার নিপুণ ভাষাশিল্পী।

কিন্তু তাই বলে অনাবিল কোনো সৌন্দর্যবর্ণের মহিম। সেই গল্পগুলিতে। বরঞ্চ আছে দুঃখশোক-মুহুর ছায়া। অতিপ্রাকৃতের হোঁচখা তাদের ঘিরে রয়েছে, কবরখানার ছিন্ন হাওয়া বয়ে গিয়েছে তাদের উপর দিয়ে।

ভাতে ভয় বা আতঙ্ক আগায় না। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দি রিটান্' বা 'প্রত্যাবর্তন'—এর কাহিনীই ধরা থাক। তাঁর নায়ক আর্থার লকোর্ড, ভাবুকগোছের মাহুঘ। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সে এক গোরস্থানে এসে ঘুমিয়ে পড়ল এক সমাধির পাশে; সে সমাধি ঘর সে আশ্চর্য্য করে মরেছিল। এই স্বযোগে তাঁর বৃত্তি আত্মা এসে ঘুমন্ত লকোর্ডের উপর ভর করল। কিন্তু সবটুকু অধিকার করতে সে পারল না। লকোর্ড, মেয়ে উঠল, ঘরে ফিরে গেল। সেই থেকে তার মধ্যে সেখা দিল প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব—নিষেধের সঙ্গে অন্তরবাসী সেই প্রেতের। তাঁর দ্বী তাই বোন সবাই এক গভীর পরিবর্তন দেখতে পায় তাঁর চোখে ঘুমে, কিন্তু কেউ জানে না তাঁর বিকৃত অন্তরের কথা। অবশেষে প্রাণপণ চেষ্টায়, আর মেয়ে আলিসের স্নেহের জ্বায়েই লকোর্ড, জরী হয়, মৃত হয় সেই প্রেতঘোনির হাত থেকে। এ কাহিনী স্টীভেনসনের 'ডক্টর জীকিল্ অ্যান্ড মিটার হাইড'—এর কথা অরণ করিয়ে দেবে হয়তো। কিন্তু দুটির সাদৃশ্য আপাত। 'দি রিটান্'—এ অতিপ্রাকৃত অংশটুকু গৌণ। আসলে সকল মাহুঘের মধ্যেই এই চিরন্তন সংঘাত—'হু' এবং 'কু'—র টানা পোড়নে। কিন্তু ডে লা বেয়ার আরও দেখাতে চেয়েছেন যে, অতি সাধারণ দুর্বল মাহুঘও অবশ্যের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায়, এবং জরীও হতে পারে।

অন্য একটি উপন্যাস 'মেমোরিস্ অফ এ নিম্বেট' বা একটি বামনের স্মৃতি কথা একরকমি একটি মেয়ের আত্মজীবনী আকারে রচিত। মেয়েটি এক বিবত হয়েই রয়েল সাহা জীবন, আর বাড়তে পারল না। সংসারে সকলের সঙ্গে তাঁর সমান ঠাই হল না। লোকের তাকে কোঁতুলকের চোখেই দেখে গেল। তাঁরা তো বুঝল না যে তাঁরাও ঠিক ওরই মতো কোঁতুলকের বন্ধ। গার জীবনের শেষে মেয়েটি ভাবছে—

আমার কণ আবারে এও পিঙ্কি—আমি যেমন নির্দোষের মতো আবেশ করতাম আমার ছোট, কুন্দ দেহের হাতে, তা ঘন না করি। ছোট হু, ছোট আত্মা তাঁর চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ।

এ কাহিনীরও চার দিক ঘিরে রয়েছে অগুপ্ত ভাবের বুনন। অল্পবয়সে তার কিছুই তো মিলবে না। বেপানে যেহেঁটা গল্প শোনে, কোথায় বরঞ্চ ছাওয়া পাহাড়ি বেশে তাঁরই মতো ছোট হালকা মাহুঘেরা বাস।

করে, আর তাদের জীবন চির-অনন্দের বলে তাদের দেবতার কোনো নাম নেই; অথবা যেখানে জোরের আলোর পাখির গানের মধ্যে ব্রাক্ষর্ন গাছের নীচে ওঅল্টার পলক-এর সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয়! কিন্তু আত্ম এই যে, এই যোহনের পরিবেশের সঙ্গে বিশেষ আছে বিকলাঙ্গতা, আত্মহত্যা, কুহীনতার আভাস। পরীর সঙ্গে প্রেতের, জ্যোৎস্নার সঙ্গে মরণের মিলন ঘটেছে ডে লা মেয়োরের কল্পনায়। বিচিত্র তার রহস্য।

এই দিনরাত্রি-স্বপ্নময়্যার সংগম তাঁর ছোটগল্পগুলিরও পটভূমি। প্রগাঢ় শিশুদের মতো এগুলি লেখা। শিশুরা তাঁকে বুঝতে পারে, ভালোবাসে। বোধ হয় তাঁর কারণ তাদের চিত্তলোকও এই হিমকুহেলি দিয়ে ঘেরা, এবং জীবন-মরণের সীমানাও গাঢ়িয়ে তারা অবিচলিত, নির্ভর। সেই 'দি হিড্‌ল্' (দাঁখা) গল্পটিতে যেমন। সাতটি ছোট ছেলেমেয়ে তাদের বিদিশার সঙ্গে বাস করতে এল। বিদিশা তাদের অবাধ অধিকার মিলেন—যেখানে বৃষ্টি পেলা করে, বেড়াও। কেবল একটি বিনিময় মানা—কোণের বড় শোবার ঘরটিতে, যেটার ঐ ওর কাঠের মশ সিন্দুকটি রয়েছে, ওই ঘরে থেলা চলবে না। দিন যায়; ছেলেমেয়েগুলি মনের স্বপ্নে বেলা ক'রে বেড়িয়ে সময় কাটায়। কিন্তু তাদের কোঁহুল বাধা মানে না। নিষেধ অগ্রাহ্য করে তাদের এক-একজন কখনো কখনো সেই ঘরে যায়, সিন্দুকটার মধ্যে ঢোকে, আর চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়, আর ফিরে আসে না। এমনি ক'রে একে একে চলে যায় সাতটি শিশুই, আর তাদের বুড়ি দিশিনা বলে থাকেন—

স্বপ্নের দুঃখী নিরে—কত হাসি, অশ্রু, কত ছোট ছোট জ্বলজ্বল, আত্মবাস্য পুরানো হ'বে গেছে, কত বহুদূর আগমন, কত হৃদয় বিদায়—।

এখনকার মাঝালোকের স্পর্শ তাঁর সব গল্পে—তিনটি বীষরের কাহিনী 'দি থ্রী মুল্লা-বুল্‌গার্ল্', 'দি গ্রীন রুন' (সবুজ ঘর), 'ইন্ দি ফরেস্ট্' (অরণ্যে) অথবা 'দি আয়ও' ট্রি' (বাগাম গাছ)। শৈশব, জরা, পাগল কোনো বুড়ো: কোন বউ-চটা ছবি বা পোড়ো বাড়ি; বিগত দিনের আধো-তুলে-মাসা কোনো দুঃখ; এই-সব দিয়েই তিনি তাঁর আসর সাজিয়েছেন।

কবিতাগুলিতেও তাঁর এই একই স্বর। উড়ো কল্পনা যেখানে সেখানে গিয়ে ভর করেছে কবিতার ঘরে, আবার ডানা মেলে দিয়েছে অনন্ত আকাশে। কোথায় শুকনো পাতার উপর ভূবায়ের ক্ষুদ্রিক রসে রয়েছে, কোথায় রবিন্ পাখির ছোট চোখে অসীম বিশ্ব, কোথায় বুড়ো গাধা 'মিকলাস নাই' একমনে লেজ তুলিয়ে বাস আছে, আর কোথায় ছোট ছেলে ভাবছে—

If I were king of Tartary
Myself and me alone—

হতাব যদি তাতার দেশের রাজা
অমিই হতাম, নরকো অপর কেউ।^১

এ সব কিছুই মধ্যোই গভীর বিশ্বাসের গামগ্রী লুকিয়ে আছে, কারণ—

No man knows
Through what wild centuries
Roves back the rose.

১. দুশ্চেষ্টার চরিত্রী—কৃত অর্থহীন।

কেউ জানে না—

কত উন্মাদ নতানী ধরে

ফিরে ফিরে আসছে ঘোমাণ হুল।

আর তারই পাশাপাশি দেখতে পাই, জ্যোৎস্নারাজে নুড়ি মিসেস্ জিলের বাগানে পরীরা নেমে আসছে।
নুড়ি স্তম্ভ মারা গেছে, তাই নিয়ে তাদের ঠাট্টা—

Wont you look out of your window, Mrs. Gill ?
Quoth the Fairy, nidding, nodding in the garden ;
Cant you look out of your window, Mrs. Gill ?
Quoth the Fairy, laughing softly in the garden ;
But the air was still, the cherry boughs were still,
And the ivy-tod neath the empty sill
And never from her window looked out Mrs. Gill
On the Fairy, shrilly mocking in the garden.

জানাল পুসিরা তাকাবে না কি গো মিসেস্ জিল্ ?

বাগান হইতে মাথা দুলাইয়া কহিল পরী ;

জানাল পুসিরা তাকাতো পার না মিসেস্ জিল্ ?

কহিল সে পরী ত্রিভু হান্তিতে বাগান তরি ;

বাতাস বিধর, তেলিখাঞ্চলি ঝগে না আর

জানালার নীচে লতাজোপ, তাও পির বিশাড়

জানাল-বাহিরে তাকাল না আর মিসেস্ জিল্

বাগান তরিরা পরিহাস রাবি গেল সে পরী।

What have they done with you, you poor Mrs Gill ?
Quoth the Fairy, brightly glaucing in the garden ;
Where have they hidden you, you poor Mrs Gill ?
Quoth the Fairy, dancing lightly in the garden ;
But night's faint veil now wrapped the hill,
Stark' neath the stars stood the dead-still Mill,
And out of her cold cottage never answered Mrs Gill
The Fairy mimbling, mambing in the garden.

কী করেছে তারা, কী করেছে হাত, মিসেস্ জিল্ ?

হুলনে চাহি উজ্জল গোখে কহিল পরী।

কোথায় তোমারে লুকিয়ে রেখেছে মিসেস্ জিল্ ?

সেবের মতন লুপ্তপারে নাচি কহিল পরী

ওঅল্টার ডে লা মেয়ার

রাতের চাঁদরে ঢেকে বেশ বীরে পাহাড়তল
কালো কারখানা, উগরে উন্নত তারার দল,
হিমেন হুটাবে সাড়া নাহি বিল হিসেবু জিল
বাগান তরিতা চপলচপল নাচিল পটী ।’ ১

চেনার থেকে অচেনার, কাছের থেকে দূরের, অগ্রের থেকে বাস্তবের মতো আড়াল নেই কবির মনে ।
যাকে সজ্জা বলে মনে করি, তাও তো রূপকথা, তাও তো সেই পথ বেয়ে চলে গেছে—

The long road bleak and bare that fades away in Time
দীর্ঘ বিহীন রিক্ত যে পথ সময়ের বিস্মৃতি বিনীত
Beauty vanishes ; beauty passes ;
However rare—rare it be ;
And when I crumble, who will remember
This lady of the West Country ?

রূপ বিস্মিয়ে যায়, রূপ হারিয়ে যায়, বতাই সে হুলস্থল হোক ; আর আমি যখন ধূলিতে লিপ্য, কে মনে রাখবে এই পন্ডিত দেশের
দম্বরীকে ?

তবু শেষ পর্যন্ত সেই সৌন্দর্যই সার্বনা, প্রাণের অবলম্বন ।

Look thy last on all things lovely,
Every hour.

যা কিছু হুলস্থল আছে, শেষ দেখা বেগে নাও তাদের হুচোপ ড’রে । তোমার আগে কত যুগের কত
মাহুকের ভালোবাসার আভাসেই তো তারা হুলস্থল হয়ে উঠেছে ।

মাহুকের কাছে এই তাঁর পরম নির্দেশ ।

গ্রন্থপরিচয়

- ✓ রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা । প্রিউপেগ্রন্থাৎ ভট্টাচার্য । ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা । মূল্য দশ টাকা ।
- ✓ রবীন্দ্রবিচিত্রা । শ্রীপ্রবন্ধনাথ বসি । ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা । মূল্য চার টাকা ।
- ✓ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প । শ্রীপ্রবন্ধনাথ বসি । নিউ ও যোগ, কলিকাতা । মূল্য চার টাকা ।
- ✓ রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় । শ্রীসুধিরান দাস । পুথিঘর, কলিকাতা । মূল্য দশ টাকা ।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য । শ্রীমুদ্রসেব বহু । নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা । মূল্য সাড়ে তিন টাকা ।
- ✓ রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা । শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । শান্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা । মূল্য নয় টাকা ।
- ✓ কবিগুরু রক্তকরবী । শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । সাধনা-নন্দির, কলিকাতা । মূল্য তিন টাকা ।
- সোনার তরী । শ্রীনিধিরতন মুখোপাধ্যায় । শান্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা । মূল্য দুই টাকা ।
- রবীন্দ্রবর্নন । শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় । সাহিত্যসংগর, কলিকাতা । মূল্য দুই টাকা ।

কিছুদিন থেকে, দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। বোধ হয় তার একটা কারণ আছে। কথাটা বললে কেমন যেন পোনাধ, কিন্তু বোধ হয় বলা যায় যে, একালে রবীন্দ্রনাথ আলোচনার যেমন একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে তা বোধ হয় আগে ছিল না। এক হিসেবে বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সম্পূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে তো কোনোদিনই হবে না, কেননা তার বিরূপ ব্যাপ্তি এবং গভীরতা সম্পূর্ণরূপে আবাসন করতে গেলে আর-একটি রবীন্দ্রনাথ দরকার। রবীন্দ্রনাথ আলোকলতাও নয়, হঠাৎ বিদ্যামন্ডলও নয়— তিনি হলেন বিরূপ বনস্পতির মত। ছোট থেকে তিনি আস্তে আস্তে বড় হয়েছেন, নাটক রসে তিনি পুষ্ট এবং আকাশের আলোর তিনি সমীকৃত। সেই মানসের মূল নাটক গভীরে— যে মাটিতে উপনিবৃত্ত আছে, কালিদাস ও বৈষ্ণব কাব্য আছে, সারা ভারতবর্ষের মন আছে। অথচ সেই মানসের উর্ধ্বমুখ পত্রপ্রবাল ছুঁয়েছে আকাশের আলোকে, যে আলো পান্ড্যাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান হতে বিকিরিত হচ্ছে, যেখানে সাধাবিহীন মুক্ত চিত্তের মেলা। তা ছাড়া, সেই বনস্পতির দিকে দিকে অম্লশ শাখা, অম্লশ পত্রদল, তার প্রত্যেক দিকে কত-না আশ্রয়, কত-না শান্তি, কত-না বিচিহ্নতা। কাজেই এই বনস্পতির সম্পূর্ণ পরিচয় করাই দ্রুত, তার সম্পূর্ণ রূপ অহুতাবন ও আবাসন করা তো অনেক দ্রুতের ব্যাপার। কিন্তু সে অহুতাবন সব সময়ই আছে এবং থাকবে— কাজেই সে কথা ছেড়ে দিচ্ছি। এই কথা বার দিলে দেখা যাবে, হুয়েশ সমাজপতির আমলে একদল লোক যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধিতা করতেন সম্পূর্ণ সাহিত্যবহির্ভূত কারণে, তেমনি তখন তারা রবীন্দ্রসাহিত্যের অহুতাবন ছিলেন তাদের মধ্যে বিচারের চেয়ে উচ্ছাসটাই ছিল বেশি। পরের যুগে, যেমন কল্যাণ-যুগে, বেশব নতুন সাহিত্যিক উঠলেন তাঁদের অনেকের মানসিক আবহাওয়া এমনই একটা খাঁচা ছিল যে, তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যবিচার ঠিকমত করতে পারেন নি বলা অসম্ভব হবে না। এক দিকে যুক্তোত্তর কিছু পশ্চিমী সাহিত্যের চটকমার বুদ্ধিদীপ্তি, অন্য দিকে “দগ্ধগণে পথ কণি রয়েছে” রবীন্দ্র ঠাকুর

-গোছের একটা। মনোভরী—এই দুয়ের চাপে তাঁদের হৃদয় রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা বাহত হয়েছিল। তার পরের দশক, অর্থাৎ চল্লিশের দশক, বাঙালী-চিত্তের বিকৃতি হতাশা এবং বিপর্যয়ের যুগ। অবশ্য প্রত্যেক যুগেই অগণিত বাঙালী রবীন্দ্র-কাব্য ও সাহিত্য হতে সজীবনী স্বাধারণ করেছে, কিন্তু সে পরিবেশে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার অহঙ্কল ও ছিল না এ কথা সত্য। আর আমর এইসব চিত্তবিন্ম অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছি। সেইমতই এখন সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা হওয়া বাতাবিক। আর হচ্ছে ও তাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু সে অল্প বই বার হচ্ছে তাই নয়, তার মধ্যে অনেকগুলি ভালো ভালো বই বার হচ্ছে—এইটেই সবচেয়ে আনন্দের এবং লক্ষ্যের কথা।

সম্প্রতি রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি বই হাতে এসে পড়ল। তার মধ্যে একটি মনোহর বই শ্রীমত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিষ্কার'। মনোহরতার ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত নবাগত, কিন্তু তাঁর প্রথম বই 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিষ্কার' রবীন্দ্রসাহিত্যের গভীর আলোচনা এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। বর্তমান বইটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে তিনি আটটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা, ১. গীতিনাট্য—বান্দ্রিকি-প্রতিভা ও মায়াবী মেলা; ২. কাব্যনাট্য—চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারীর আবেদন ইত্যাদি; ৩. রোমান্টিক ট্রাজেডি—রাজা ও রানী, বিসর্জন ইত্যাদি; ৪. রূপক-সাংকেতিক নাটক—রাজা, অশ্বমেধভন, কান্দন, জাকবর, মুরুপারী, রক্তকরবী ইত্যাদি; ৫. সামাজিক নাটক—নীর পুত্র, চণ্ডালিকা ইত্যাদি; ৬. কৌতুকনাট্য—চিরস্থায়ী-লতা, বৈষ্ণবের খাতা ইত্যাদি; ৭. ঋতুনাট্য—শেষবর্ষ, বসন্ত ইত্যাদি; এবং ৮. নৃত্যনাট্য। কিন্তু বিষয়বস্তু হিসেবে বিভাগ করা ছাড়াও লেখক বিষয়বস্তু নিয়ে মনোহরতা করতে গিয়ে বলেছেন, আজকালকার নাটকে কেবল বস্তু বা আখ্যান নিয়েই মাজাচাড়া করা হয় না, খুল ভগতের প্রত্যক্ষ সত্য ছাড়াও যে বৃহত্তর সত্য অসীম পৌলারহস্ত তরঙ্গিত হচ্ছে সেই অতীন্দ্রিয় ভগতের দৃশ্য মাধ্যম আবেদন নিয়েও নাটকের কারবার হচ্ছে, তার মধ্যে অসীমকে গীমাঘ বাধবার চেষ্টা পরিমুখ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন একটা নিবিড় subjectivity বা বস্তুহতাই তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। সেইকর প্রথমে তিনি পাকাত্য রোমান্টিক ট্রাজেডির আদর্শে নাটক লিখলেও শেষকালে তিনি উপনীত হলেন ইচ্ছাক্রমে কার্যব্যবহারে অপূর্ণ নিদর্শন কাব্যনাট্যগুলিতে। তার মূল দৃষ্টি ভাবের দৃশ্য। রূপক-সাংকেতিক নাটকেও তাই। কবি ঠিক পাকাত্য রোমান্টিক ট্রাজেডির আদর্শে নাটক লিখেছেন কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তর্ক উঠবে। কারণ সে নাট্যধারার বিপুল ঘটনাসংঘাত এবং আকার-প্রকারের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে, যুগে যুগে তার চেহারা এবং উপকরণও এক নয়, কিন্তু এ সবই রবীন্দ্রপ্রতিভার সনানদ্বারা নয়। কাজেই থাকে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ট্রাজেডি বলা হয় তা পাকাত্য রোমান্টিক ট্রাজেডির সমধর্মী কি না সেবিষয়ে সখেই সম্বন্ধের অবসর থাকলেও লেখক তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি সম্বন্ধে বেশ কথ্য বলেছেন তা সত্যই গভীর এবং নবীন বাচনাময়। রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন ভাষ্যপর্বে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য বৃত্তিসিদ্ধ, ব্যাখ্যা নিপুণ, আলোচনা বহুনিষ্ঠ—আর সবচেয়ে যেটি ভালো লাগে সেটি হল এই যে, তিনি নিজের মনের কথা রবীন্দ্রনাথের উপর আরোপ করতে হান নি, রবীন্দ্রনাথেরই সমধর্মীক নানা রচনার সাহায্যে রবীন্দ্রবানসের ব্যাখ্যা করেছেন।

ঈদৃত প্রমথনাথ বিনী রবীন্দ্রনাথ-ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যপ্রতিঃ। তাঁর সশ্রুতি প্রকাশিত বই 'রবীন্দ্রবিচিত্রা' তাঁর স্রষ্টা বইগুলি হতে একটি বিশিষ্ট। রবীন্দ্রসাহিত্যের কতকগুলি স্বল্প-আলোচিত দিক নিয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হল "রবীন্দ্রকব্যের পাঠ্যভর"। বিখ্যাত খুবই কোহুললোচনগণ সম্মেদ নেই, কারণ এই আলোচনা হতে রবীন্দ্রনাথের পরিমণ্ডলই যে স্রষ্টা হয়ে ওঠে তাই নয়, সেই গণে রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টাপ্রক্রিয়ার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। বিনী মহাশয় এই কাম দুই দক্ষতার সঙ্গে করেছেন, কিন্তু আলোচনা বোধ হয় স্থানে স্থানে আরও গভীর হতে পারত। যেমন 'উত্তলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে' এই লাইনটিতে 'কলাপী'র বসলে, 'স্রষ্টা' শব্দটি যে অচল সে কথা বোঝাবার স্রষ্টা তিনি বলেছেন "নেঘসম্বর্ণনে স্রষ্টা স্রষ্টার বিচ্ছিন্নিত পৃষ্ঠের প্রতিই এখানে কবির সৃষ্টি নিবন্ধ, কাণ্ডেই অভিধান বাহাই বসুক, এখানে কবির ভাবপ্রকাশের একটি-মাত্র শব্দ বর্তমান, সেটি 'কলাপী'।" এ কথা তো সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় এ কথাটাই সত্য নয়। মহাকবি শুধু চিত্ররূপের নারকত কাল আদায় করেন নি, তার উপর শর পরনি এবং অহুপ্রাসের কাছ থেকেও কাল আদায় করেছেন। 'উত্তলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে'—এই পংক্তিতে অহুপ্রাসের এমন একটা স্রষ্টা স্রষ্টার কাছে যে, উল্লিখিত কলাপীর স্রষ্টার স্রষ্টাবগে বেন তার নয়া দিয়ে লক্ষ্যপ্রতি হয়ে ওঠে। কাণ্ডেই শব্দরূপ চিত্ররূপ ধনিরূপ—বহু দিক দিয়ে কাল নিয়েছেন কবি, এই অস্রুত স্রষ্টা মহাকবির পরিচায়ক। বাই হোক, এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কোহুললকর দিকটির সমুদ্র আলোচনার এই প্রবন্ধটি বিশিষ্ট। তেমনি আরও কতকগুলি প্রবন্ধ, যথা, "রবীন্দ্রনাথের গণোপভোগ", "রবীন্দ্রকব্যে একটি প্রতীক", "জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা" ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি পড়ে পাঠকেরা খুশী হবেন। কিন্তু "রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্ণাভাস" প্রবন্ধটি নিতাইই সর্বজনলানুসৃত হবে না, কারণ এটিতে তিনি এমন একটি ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যাতে বিতর্ক অবশ্যস্তাবী। প্রমথবানু লিখেছেন, "গান্ধীজীকে বনিষ্ঠভাবে আনিবার পরে এই স্রষ্টার আভাস রবীন্দ্রসাহিত্যে আর পাওয়া যায় না, কেননা বোঝা কঠিন নয়, আভাস তখন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাস্তবরূপে যে-সাহস্য তাঁরতবর্ষে বিচরণ করিতেছে কবির লেখনী তখন তাহাকে সেখাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি লাইয়াছে।" এই কথার বিরুদ্ধে সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কারণ প্রমথবানু কথ্য সত্য হলে রবীন্দ্রনাথের শেষ ভাষণ 'সত্যতার শকটে' পর্যন্ত 'ঐ মহামানব আসে' গানটি সংস্কৃত করার কোনো প্রয়োজন হত না। তা ছাড়া অসিদ্ধ চক্রবর্তীকে লিখিত 'কনগ্রুয়' শীর্ষক পত্র (ত্রিপুরার পত্র লেখা) হতে কয়েক লাইনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবি লিখেছেন, "সামনের যে ঘাট লক্ষ্য করে আজ কর্ণধার নৌকো চালিয়েছেন সেখিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। দূরপ্রসিদ্ধিহীন ভক্তদের মতো বলব না, তার উদ্দেশ্য আর ঘাট নেই। আরও আছে এবং তার স্রষ্টা আরও থাকিবে দরকার হবে।" এর পরও কি বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের মহামানব কেবল গান্ধীচরিত্রেরই পূর্ণাভাস এবং গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ হবার পর রবীন্দ্রনাথের লেখনী সেই মহামানবকে "সেখাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছে"? আমার মনে হয় গান্ধীচরিত্রে মহামানবের প্রতিফলন তো থাকবেই, গান্ধীজীই তো এ যুগের স্রষ্টা মানব, কিন্তু তা সবেও লেখক স্রষ্টাকে বেশি অর্থ পূর্ণিতে চেয়েছেন, যা ঠিক নয় বলে মনে হয়।

'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' নামক বইয়ে বিনী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ব্যাপক আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি মনোহর। লেখক ঠিকই লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের উপভোগগুলির ক্ষেত্র নাগরিক

গ্রন্থপরিচয়

জীবন, প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রাণ সকলেই নাগরিক নয়নারী। আর তাঁহার অধিকাংশ ছোটগল্পের ক্ষেত্র পরীক্ষাবন, প্রধান অগ্রদান প্রাণ সকলেই পরীক্ষাবনী। ...পরীক্ষাবনী ও তাঁহার ছোটগল্পের যথার্থ ক্ষেত্র।" বিবী মহাশয় সেই সত্যে একথাও ঠিক বলেছেন, "তাঁর ছোটগল্পে পাই প্রাকৃতিক স্পর্শ, আর কবিতায় পাই মানবিক স্পর্শ।" অবশ্য ছোটগল্পেও যে প্রকৃতি আর মানুষ মিলিয়ে একাকার হয়ে যায় নি তা নয়। তা ছাড়া লেখক রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভৌগোলিক পটভূমিকারও আলোচনা করে দেখিয়েছেন। অগচ্চ প্রমাণ করেছেন যে আঞ্চলিক পটভূমি প্রচুর থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। লেখক বলেছেন, "কেবল মানবিক সত্যের উপাদানে গল্পগুলি রচিত হইলে ইহাদের আর সর্বসত্ত্ব হইত, হয়তো বা অধিকতর জনপ্রিয়ও হইত। কিন্তু কবি সে সর্বস্ব পথ গ্রহণ করেন নাই; মানবিক সত্যের সহিত প্রাকৃতিক সত্যের মিশ্র দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বের সন্মত করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যুগপৎ কবি ও কাহিনীকারের যৌক্তিকসমে রচিত—ইহা এগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।" তা ছাড়া লেখক আরও একটা কথা ঠিকই মনে করিয়ে দিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁহার সাহিত্যে পাশাপাশি দুটি ধারা বর্তমান, একটি স্বপ্নঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, আর একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকে উপাণ্ড হইয়া বাইবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার সমকালীন কবিতা ও গল্প মিলাইয়া পড়িলে দেখা বাইবে যে, কবিতায় ঐ নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর, আবার গল্পে স্বপ্নঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর। এই মূল দ্বয়টি মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।"

এই মূল দ্বয় ধরে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প বিচার করা সম্ভব হলেও কতকগুলি গল্প এর ব্যতিক্রম। বিশেষতঃ তাঁর শেষজীবনের গল্পগুলি। যেমন 'সে'। এটির সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সে সময় ছবির সঙ্গে মগ্ন ছিলেন, এখানে লিখছিলেন বিশ্বপরিচয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ছবির নতই 'সে' কিছুত-রসঃপ্রিত শিল্প। রবীন্দ্রনাথের ছবির রস কিছুতরল কি না সেবিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যে ব্যাখ্যা করা সব চেয়ে কঠিন বোধ হয় 'তিন স্ত্রী'র গল্পগুলি। কারণ আমরা এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যে তো বটেই, এমন-কি গোটা রবীন্দ্রসাহিত্যেও যে ধারা পেয়ে আসছিলাম এই গল্পগুলি তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। লেখক বলেছেন, "কি ভাষার সাবলীল নমনীয়তাও এবং যথেষ্ট কার্যকারিতাও, কি ঘটনার হ্রস্বপূর্ণ সংঘটনসে, কি ভাবনার আকাশ-চক্রবাক্যকারী পক্ষপে, আর কি চরিত্রপরিচয়নার করাব্যাবিধির চঃসাহসিকতার লাবণ্যেরটি গল্পের বোনের পাওনা কঠিন। সমস্ত গল্পটি হইতে অন্তঃসংশয়ী হৃৎকের শেখরশিখরী বিস্তারিত হইয়া পাঠককে যেন বিভ্রান্ত করিয়া দেয়।" তিনি আরও বলেছেন, "সোহিনীর-দ্বিগলিজন অত্যন্ত পাকা।" এ কথা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথও নিজে বলেছেন। বিবী মহাশয়ের মতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে "সোহিনী আঞ্চলিক নয়, তাহার বীর্ণ পূর্বসূর আছে। ...রবীন্দ্র-সাহিত্যে সোহিনীর অস্পষ্ট পূর্বরূপ চিত্রাঙ্কনা ও সেবাধীন। অর্জুনের বিদায়কালে চিত্রাঙ্কনা গৃহীণীতে ও প্রেমদীপ্তে মিলাইয়া রমণীর একটি আদর্শ চিত্র অঙ্কন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গেও তাহার প্রেমদীপ্তগতিই প্রেমে ও লাবণ্যে উজ্জ্বল হইয়া দৃষ্টি। উঠিয়াছে। আবার সেবাধীনীর অপমানিত প্রেম পরাহত সপিণীর মনোরম ভীষণতায় বিভ্রান্ততাবৎ কচকে দংশন করিতে উদ্ভত হইয়াছে।" কিন্তু এইখানেই প্রশ্ন থাকে। সোহিনীর রূপ কি প্রেমদীপ্ত রূপ? তাঁর দ্বিগলিজনদের চেহারা কী? সে সর্বজনস্বীকৃত একথা সত্য। কিন্তু তার মধ্যে একটা আসা আছে, নিঃসৃত আছে, নির্বর্তা আছে, এমন-কি নির্লক্ষ্যতা আছে যা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, রবীন্দ্রসাহিত্যে ধার

বেশ কোথাও পাওয়া যায় না। সুদূরনিরূপে এর তুলনা চলে না। কেননা সুদূরনিরূপে হৃদয়ের সংঘাতে আশ্রয় নিয়েছিল সেসব নয়— বাইরে সে পাথর। সে জালায় ছটফট করে নি, সে নির্লক্ষ্যভাবে স্থূলক বিভার করে নি, তার টাইপই অস্ত। লেখকের মতে এখানে একটি ব্যতিক্রম ঘটেছে, “বোধ করি রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, সত্যের চেয়ে মহত্বের পূর্ণতার আদর্শ।” কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সোহিনী-চরিত্র একেছেন তা হতে তো তা মনে হয় না। কারণ সোহিনীকে তিনি মহত্বের পূর্ণত্বের প্রতিষ্ঠা করেন নি। বরং তার কোথাও পূর্ণপ্রতিষ্ঠা নেই, তাই এই চকলতা অস্থিরতা জালা। রবীন্দ্রনাথিত্যে এই অল্পত ব্যতিক্রম কেন ঘটল তার উত্তর সেও বোধ হয় সহজ নয়। বরং এই প্রশ্ন আরও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমার অনেকবার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মানসমণ্ডলের একটা সুদূরপ্রসারী এবং ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিকায় এ কথা আলোচনা হওয়া দরকার। কয়েকটি ছোট ছোট লক্ষণের উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা, পূর্বে, যেখানে অভ্যন্তর ভাবাবেগসমৃদ্ধ, সেখানেও প্রসার। কিন্তু শেষের দিকে, বিশেষতঃ চলতি ভাষা অবলম্বনের পর, তাঁর ভাষা অনেক বেশি পরিমাণে তিরিক্, এমন-কি তার মধ্যে বৈকল্যিক অনেক বেশি। কেন এই বদল? এ তো চলতি ভাষার টেকনিকের তাগিদে নয়, এ হল মনের তাগিদ। একালের সমাজের ভাঙন রবীন্দ্রনাথের মনে যে উত্তাপের সৃষ্টি করছিল, অথচ অন্তর্নিবেশে যে প্রেরণা শান্তি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্ররচনার বার বার জ্বলি হয়েছে—এই দুই শক্তির অঙ্গুষ্ঠ সংঘর্ষই কি শেষকালে এক-একবার রবীন্দ্রনাথের কলমে স্থূলক বর্ণন করেছে? কবিতায় তা কব। রবীন্দ্রপ্রকৃতিবিরুদ্ধ, সেইজন্যই কি তিনি শেষকালে ছোটগল্পের মাধ্যমে সেই জ্বালাকে উৎসারিত করেছেন? বরং: “তিন সন্ধ্যার সব কটি গল্পেই এই বিশিষ্টতা।

ঐহিক সুদূরনিরূপে দাসের বই ‘রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়’ পাঠিতাপূর্ণ বই—এর মধ্যে তিনি নানা কথা অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন (পৃ ২), “অতীত এবং বর্তমানের ধর্মের মধ্যেই কবিমানসের বহুপ-প্রতিষ্ঠা।” এ ধর্ম কি সব সময়েই হয়? সমাজ ও ব্যক্তির ধর্ম কি আরও একটা বিশিষ্ট নতি নয়? বরং: এই বইটি পড়তে পড়তে পাঠক বারবার মতবাদের হোচট খায়। “রোমান্টিক কল্পনাবিশ্বলতা”, “বিশিষ্ট-কল্পনাপ্রবী বিবাহবোধের ভিত্তি” ইত্যাদি কথার মতবাদের কথা যেমন প্রচারিত হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রক্রিয়া যেমন প্রাধান্য পায় নি। ‘উৎস’ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন এই কবিতায় “বিষ্ময়িত মিশ্রিত বিকার-বিশেষেরই ইঙ্গিত” কবি দিয়েছেন এবং বলেছেন, “এই অনিবার্য চেষ্টা কি বিশ্বাস্যভিত্তি অল্পত রস? তাও হতে পারে না, কারণ মানসস্বন্দীর রূপ পরিগ্রহ করে তা বহুল পরিমাণে আধিরসাস্রিত হয়ে পড়েছে।” এতে হরহাতে পণ্ডিতজন চিন্তার উপাদান পাবেন, কিন্তু রসিকেরা প্রতিহতই হবেন। বিস্তৃত আলংকারিক বিচারেও লেখকের কতকগুলি মত তর্ক তুলবে। যেমন, “হৃদয়ালের প্রার্থনা” কবিতাটির সম্বন্ধে লেখক লিখেছেন, “আদিরসের আলম্বন থেকে সৌন্দর্যবোধকে বিচ্ছিন্ন না করেও কবি ‘আদি’র বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান।” হৃদয়াল বোঝা যায়, ঐ সৌন্দর্যবোধ বার্থ্য রূপ প্রাপ্ত হয়েছে বলেই তা রতি বা বিশ্বয় বা অন্ত যে কোনো স্থায়ী ভাবের স্পর্শ থেকে মুক্ত হ’তে পেরেছে। অর্থাৎ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীনেরা রূপোলব্ধির অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন নির্বিশেষ আনন্দ-চৈতন্যে মানসের স্থিতি, তা কবির এই সৌন্দর্যবোধ থেকে প্রমাণিত হয়। কথাটা স্থিরায়ী। কারণ, প্রাচীনদের বলবার কথাই ছিল যে,

স্বাধীনতা যখন আলফন বা উদীপন বিভাবকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত তত্ত্ব গঠে সর্বশেষ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে সমস্ত লৌকিক সংস্কার পরিত্যাগ করে অ-লৌকিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সর্বস্বত্বীনতার প্রতিষ্ঠিত না হলে রূপ হবে কেন, তা সকল দ্বন্দ্বের সমবাদী হবে কেন, স্বাধীনতার ব্যক্তিগত প্রেম সর্বস্বত্বীন রূপ হয়ে উঠবে কেন? কারণেই আলফন ছাড়বেও না অথচ সে কাহিনী-নিবিশেষ আনন্দ-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হবে—এ ছই প্রক্রিয়া একশেষে চলে না। আর রবীন্দ্রনাথ যে আলফনকে ছাড়িয়ে বহু উপরে উঠে একটি সর্বস্বত্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন সে কথা কবিতাটি ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়। সমস্ত বইটিই এই রূপে বাধ্য। যেমন “গোধূলি পর্বাণের” আলোচনার লেখক বলেছেন, “আকাশপ্রতীপে” কবি এক দিকে যথাসম্ভব চিত্র অবলম্বন নিপুণ, আর-এক দিকে ‘রোমান্টিক কাব্যবিলাসী’ এ কথা বলা বর্ণেই হল না।” না ছই কথা যেনে নিলুম, কিন্তু ও ছুটির কি কোনো মিশ্রণ হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি হল না, ঐ বিপ্লবই হয়ে গেল? আর ‘রোমান্টিক কাব্যবিলাসী’ বলতে কি বুঝি? ঐ কথা রুটিতে তো শেলি ওয়ার্ডসওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বহু কবিকেই চিত্রিত করা যায়, কিন্তু তা বলে কি ঠাৱা সবই এক? এইসব চলতি কথা দিয়ে কি বরত: শেষ পর্যন্ত কোনো কবির বিশিষ্ট মানসটিকে ব্যাখ্যা করা যায়? তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে রানস্‌ক-বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাণীর তাগিদ আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার তাগিদের সমীকরণ করে লেখক বলেছেন, “অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙালি-জীবনের তৎকালীন ঐহিকতার মানির দ্বারা কলঙ্কিত, অথচ বহুকালাগত অধ্যাত্ম-সাধনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত”—এসব কথাই হোঁচট খেতে হয়। প্রস্তাবনার লেখক অষ্টাদশাব্দ বিশিষ্টাশ্রিত্যের স্বীকার ইত্যাদি নানা ভাবধারার প্রভাবের কথা অবতারণ করেছেন, অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার যে নাড়া নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্ষুরের অন্ততম উপাদান সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা—বেগনি ইত্যাদির উল্লেখ গবেও—আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত: রবীন্দ্রনাথ এই ছই ধারার দ্ব্যর্থপ্রতিবাদের বিষয়কর সৃষ্টি, তিনি কেবল উপনিষদ অষ্টাদশাব্দ বিশিষ্টাশ্রিত্য স্বীকারের উপর নিজস্ব পাণ্ডিত্য লাগিয়েছেন এবং কালিদাসের বৈদ্যবী রীতি, অমরদেবের কোমলকান্ত পদাবলী এবং ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টির ধারাকেই তিনি প্রসারিত করেছেন—এ কথা বলা চলে না।

শ্রীমত বুদ্ধদেব বহুর বই ‘রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য’ পূর্বের বইটির ভুলনাথ পাঠকের মনে ঠিক বিপরীত আশা এনে দেয়। বরষের ভাষায় লেখা উজ্জল বই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, শ্রীমত বহু প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বস্বত্বীনতার দিকে। একই মাটিতে বিবেক সজ্জার—প্রকৃতির মতোই অনিভবিত্ত প্রাচুর্য। কেমন ক’রে সম্ভব হল? বস্তুত: এইটাই তো। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সবচেয়ে বিশ্বকর প্রশ্ন। লেখক ঠিকই বলেছেন, যে-কোনো আশের চাইতে ঠাৱ সমগ্র রচনাটি বড়ো। শ্রীমত বহুও বলেছেন, “ঠাৱ কাব্য, কাব্যধর্মী নাট্য, এরা গাথি করে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকা, কিন্তু কথাসাহিত্যকে দেখতে হবে বাংলা সাহিত্যের, বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। তার প্রথম কারণ এই যে, কথাসাহিত্যে দেশকালের প্রভাব খুব প্রবল; তা ভূগোলনির্ভর, ইতিহাসে বিস্তৃত, সামাজিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য তার আবেশনের অন্তরায় হতে পারে। বিভিন্ন কারণ, নাত্ত্বনিতে কাব্য আর গদ্যসাহিত্যের ঐতিহ্যগত ব্যবধান।” এইভাবে লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যের বিশিষ্টতা, দ্রষ্টের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের অতি চমৎকার আলোচনা করেছেন। গল্পও লম্বা ঠাৱ আলোচনা গভীর

সাহিত্যিক আলোচনা। গোরা সম্বন্ধে তাঁর যত্নবা অত্যন্ত হৃদিত্তিত : “রবীন্দ্রনাথ প্রচারকার্যে নামেন নি, একটি শিল্পকর্ম সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই শিল্পকর্মের মধ্যেই বহন ক’রে নিয়েছেন বাংলাদেশের তৎকালীন ইতিহাস।” বইটি রবীন্দ্রসাহিত্যজিজ্ঞাসার অবশ্য পঠনীয়।

ঐহুত তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ‘রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা’ রবীন্দ্রসাহিত্যের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা। সোনার তরী হতে গীতালি পর্যন্ত এর পরিধি। বইখানি পড়ে সকলেই আনন্দ পাবেন। লেখক পূর্বে কতকগুলি বাধা ভাবের অবতারণা করে তাই দিয়ে বিচার করতে চান নি। বরং তিনি প্রকৃত সাহিত্য-সম্বন্ধে পণে অগ্রসর হয়ে বলেছেন, “জীবনের সত্য আত্মজীবনের বিষয় হইয়া উঠে তবরূপে নহে, কতকগুলি অক্ষুট আনন্দাচ্ছূতি এবং অনাবাসিতপূর্ব বেদনাবোধের মধ্য দিয়া চেতনায় বাধা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তবরূপে তাহাই নির্দিষ্ট হয়। ‘সোনার তরী’ কাব্যেও কতকগুলি আনন্দাচ্ছূতি ও বেদনাবোধের মধ্য দিয়া বাধা উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহাকে আমরা তবরূপে ততটা দেখি না, বরং তা রূপে দেখিতে পাই। তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্লেষণ করিবা রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় গ্রহণ করিতে গাইলে কবির কাব্যের প্রাণবন্ত তত্বালোচনার ঢাকা পড়িয়া গাইবে।” এই ভিত্তিহীন হতে অগ্রসর হয়ে তিনি ‘সোনার তরী’তে বহন আর অবস্থানের দৃশ্য দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন তা হতে কবির বৃহত্তর মানসাত্মিকার, কবির গভীর প্রেমের সুর, বিশ্বের সঙ্গে কবির একাধীনতা, এবং বিশ্বজীবনের কৃমিকার জীবনের সত্য দর্শন। সেই বিপুল প্রেম ও জীবনসত্যে ক্রমে বৃহত্তর বাধাকে উত্তরণ। ‘সোনার তরী’ হল সেই বৃহত্তর চেতনা তথা বিশ্ববোধ। এপারের ছোট ক্ষেত হল বাঁচার জীবন, এই একাক্ষি হল ব্যক্তির অহং-জীবনের একাক্ষি। এই অভিন্ন ব্যাধ্যায় লেখক রবীন্দ্রকাব্যের এই অংশের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তেমনি ‘চিত্রা’র সম্বন্ধেও তিনি ঠিকই লিখেছেন, উপনিষদের সোহম্য তত্ত্বকে কবি একটি লৌকিক কৃমিকার গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর অন্তরের দেবতাকে এক নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর মুক্তির বাণীও অভিন্ন অর্থ লাভ করেছে।

এই লেখকেরই আর-একটি বই ‘কবিশঙ্কর রক্তকরবী’। প্রথমেই তিনি আলংকারিক বিচারকে নিরস্ত করে রসবিচারের প্রবৃত্তি হয়েছেন। রক্তকরবীতে মানবজীবনের যশেরই প্রকাশ, যে যশের আঘাতে পুরুষ-জিন্তের বাসনা বিকশিত হয়— এই কথাটাই তাঁর প্রধান কথা। এ ছাড়া তিনি নাটকটির শিরভঙ্গী, কাহিনী, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেছেন। এ বইখানি লেখকের অপর বইটির তুলনায় রসোত্তীর্ণ না হলেও সার্বিক এবং নমনীয়।

অনেক সমালোচকই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য বা নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। অধ্যাপক ঐহুত অনিবার্যতন মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘সোনার তরী’ তার একটি চমৎকার ব্যতিক্রম। লেখক রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্য নিয়েই আলোচনা করেছেন। এই স্মৃতি ভাষায় অন্তরের বরদ দিয়ে লেখা বইটি বহু-সমালোচিত রবীন্দ্রকাব্যের উপরেও নতুন আলোকপাত করেছে। লেখকের আলোচনার বহু সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য নয়, কেবলমাত্র একটি রবীন্দ্রকাব্য— ‘সোনার তরী’। কিন্তু সেই ‘সোনার তরী’কে অবদমন করেই লেখক রবীন্দ্রমানসের একটি চমৎকার বাধা করতে সক্ষম হয়েছেন। লেখক বলেছেন, মানব-

গ্রন্থপরিচয়

জীবনের মূল তত্ত্বই 'সোনার তরী'র প্রতিপাদ্য বিষয়। "বিশেষ আমিটা মরবে, সে তো। মরবেই, তার ক্ষেত্রে তো দুঃখ নয়; দুঃখ হয় যদি বিশেষটির ক্ষেত্রেই কেবল মরি, আমাদের অস্থির অশ্রুতের সে-মহলটি রয়েছে প্রেমভাবে বেরনায়, জীবনক্ষেত্রে তার ফল কিছু না ফলাই।" সর্বজনের ক্ষেত্রে সোনার ফল ফলানোর অধিকার আছে আমাদের জীবনে, মহাকাল উদ্‌গীর হয়ে প্রতীক। করছেন বধ্যাধ্যায় সন্ধ্যানে সেগুলিকে সন্মানিত করার আকাঙ্ক্ষা। "মহাকাল 'স্বর্ধার' নবী' পার হয়ে তরী নিয়ে একবা আসবেন। সত্যকার বা ফল, সোনার ফল, সেবেন তুলে। ছোট-আমিটাকে, তার অহংবোধ ও দৃষ্টিকোণটাকে নেবেন না, কিন্তু সেবেন তুলে বা শ্রেয়, বা হৃদয়, মাংসপায়সের মহিমা বা মহৎ, বিশ্বদ্রাবনের প্রেম ও আনন্দের প্রয়োজন বা অপরিহার্য। মানবজীবনের তত্ত্বটাই এই। এবং—'সোনার তরী' কবিতারই শুধু নয়, সমগ্র কাব্যানুষ্ঠান-ই এই প্রতিপাদ্য।" এই হল লেখকের মূল কথা। এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কিতাবে বিকশিত হয়েছে তার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, কবির অসামান্য মন, সর্বদা এবং সর্বদা, মোহমুক্ত একটি জীবনধারার আশ্রয়ে উপনীত হতে চাইছেন অবিশ্রাম গতিতে। 'কবি-কাহিনী' থেকে 'কড়ি ও কোদাল' পর্যন্ত প্রাথমিক কাব্যাবলিতে অহং-বেরনার অমিতোজ্ঞাস আছে, জ্ঞান; আছে, ধর্ম; আছে, ব্যক্তিবিরহের সম্বোধন রূপমোহ এবং লক্ষ্যহীন হাফাকারও আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের আকস্মিক বিভ্রাম্যকর মত দিশাহারা মুক্তিবেরনার সম্ভাব্য চেতনোজ্জ্বলও আছে। 'মানসী' কাব্যে উপনীত হয়ে জীবনপ্রত্যয়ের একটি হৃৎপিঠ ধর্ম কবি আধিকার করেছেন। মানসী কাব্যেই কবি ক্রমশঃ বৃদ্ধিতে পারলেন, 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আদ্যা মানবের'। এর থেকে স্বভাবতই কবি এসে পৌঁছেছেন 'সোনার তরী'র মূল সুরটিতে। "মাছের মধ্যে বা 'সোনা'— বা শ্রেয়, বা হৃদয়, বা মানবিকতার মহিমা অহংম, কালের তরীতে তার ঠাঁই হয়, কবি জানলেন।" বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কথা বলেছেন। "মাছ সমস্ত জীবন ধরে ফল চাব করচে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু বীণের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে।—ধ্বন কাল ধনিরে আসচে, ধ্বন চারিদিকের ফল বেড়ে উঠচে, ধ্বন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তুলিয়ে থাকার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্ণের বা কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরঙ্গীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কথাও ফেলে দেবে না; কিন্তু ধ্বন মাছ বলে— ঐ সঙ্গে আমকেও মাও, তখন সংসার বলে—তোমার ক্ষেত্রে মাগণা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কি?—প্রত্যেক মাছ জীবনের কর্ণের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করচে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করচে, রক্ষা করচে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মাছ ধ্বন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেটা বৃথা হচ্ছে।" সেইরকমই কবি রাজসভায় মানের ফল শোনান, পুরস্কারের চেয়ে ফুলের মালা তার কাছে বেশি দামী। সেই কারণেই ছোট-আমি'র পান্নায় পড়ে বিশ্ববতী কিছুতেই মরী হতে পারল না।

এইভাবে লেখক 'সোনার তরী'র বিভিন্ন কবিতার ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। ব্যাখ্যা অতি চমৎকার, ভাষাটি মিষ্ট—সব মিলিয়ে সত্যকারের ভালো সমালোচনা।

মেটোর আদর্শ রাজ্যে কবির হান নেই, কিন্তু রাজা-দার্পনিক বা দার্পনিক-রাজার হান আছে। মেটো! এর কারণ হাই দিন- না কেন, সেকালের কি পরিবেশে তার এই দার্পন অন্বেষিত তা আমরা জানি

নে। কিন্তু একথা সত্য, মেটো ঘদি শ্রেষ্ঠ কবিসের কাব্যস্বা পান করতেন তাহলে হয়তো তাঁর মত বদল করতেন। কারণ মহত্তম কবিসের মধ্যে কাব্য শুধু অলংকার-ছন্দ-কাকাদের সমাহার নয়, তার চেয়ে অনেক গভীর। তা শুধু নানবস্তুদের গহনই প্রবেশ করে না, তার চেয়েও একটি বড় কাজ তার থাকে। এই মরকাতার মধ্যেই নান্ন-আবরণ-পিহিত মন ক্রমশঃ বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে বৃহত্তর সত্যের দিকে ঘাড়া করে—নহৎ কাব্যের এই হল চরম অম্বুধর। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবিষয়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গীয়ার সীমানা ছাড়িয়ে অগ্নিস্নেহ দিকে ঘাড়া, বন্ধন উত্তরণ করে অবন্ধনের আবাস, এই পৃথিবীতেই দাখত আনন্দের আবির্ভাব—রবীন্দ্রকাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মরণ করিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। মানবাত্মার এই মুক্তি, মানবমহিমার এই চরম অভ্যুদয়—যে অভ্যুদয়ে শুধু নরলোকেই ডকা বাধে না স্বরলোকেও পথ বেধে ওঠে, মানব-অভ্যুদয়ের এই মন্ত্র মহাকাশে ধনিত হতে থাকে—এক হিসেবে এই হল রবীন্দ্রমানসের চরম কথা। তাঁর অস্তিত্ব ভাষণ ‘সত্যতার সংকটে’ও কবি এই কথাই বলে গিয়েছেন। তাঁর এই মর্মনের কাব্যগত বিচার হয়েছে। পশ্চিমী মানবতাবাদের দিক থেকেও এসব কথা আবার আলোচনা করে থাকি। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিকোণ—বিশেষতঃ ভারতীয় মর্মনের দৃষ্টিকোণ—হতে এর বিচার বেশি হয় নি। কিন্তু এরকম বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রমানসের ঔপনিষদিক ভিত্তিভূমির কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। পশ্চিমী মানবতাবাদ দ্বারাও তাঁর বক্তব্যের পুরো বিচার সম্ভব নয়, কেননা কেবল মানুষ—এই যেনন মানুষটি আছে ঠিক তেননই মানুষ—রবীন্দ্রনাথের আধার ছিল না। এই মানুষকে তিনি অনেক বড় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন—সেইখানেই তাঁর সাধনা, সেইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য, সেইখানেই তাঁর নিম্নমূর্ণন।

এই দিক থেকে রবীন্দ্রমানসের বিশ্লেষণ শ্রীমুত বিরহর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্রমর্মন’ গ্রন্থে সুনিপুণতার সঙ্গে করেছেন। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হল। তাঁর আলোচনার দৃষ্টিকোণ কাব্যের নয়, পুরোপুরি মর্মনের। সেই দিক থেকে তিনি দেখিয়েছেন কবি যদিচ কবিত্ত্ববীকে পরিত্যাগ করে দার্শনিকভাৱী গ্রহণ করেন নি (সম্ভবতঃ হিবার্ট লেকচার ছাড়া), তাহলেও তাঁর রচনার মতোই তাঁর মর্মনের মূল কথাগুলি খুব স্পষ্ট ভাবেই ছড়ানো আছে। পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষমতা পাঠকবৃন্দ এই চরৎকার বইখানি পড়ে নেবেন। সংক্ষেপে শ্রীমুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথ শুকনো জ্ঞানমার্গের পক্ষে গায় মেন নি। জ্ঞান তো যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে পাণ্ডা চাই যে। সে পাণ্ডা তো কেবল জ্ঞানহৃৎ হতে পারে না। সেইজন্য চাই প্রেম। ঈশ্বরের সঙ্গে সান্নিধ্য। কিন্তু ভারতীয় মর্মনের বিভিন্ন ধারায় এই সান্নিধ্যের নানা ভূপ ও নানা উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যদি এক হয় তাহলে আত্মার সান্নিধ্য হয় কি করে? এই সমস্যা তো অবৈত-বাদের প্রতি এত বিমুখতা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচরাচরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, সে হিসেবে তিনিও সর্বেরবাদের সমর্থক। কিন্তু এইখানে তাঁর একটি নিম্নমূর্ণন কথা আছে, বা শ্রীমুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দার্শনিক চিন্তাধারায় একটি নিম্নমূর্ণন এবং অভিনব স্বর সংযোজন বলে যেনে নিতেই হয়। এইটিই হল তাঁর মতে রবীন্দ্রমর্মনের অভিনবত্ব। তাঁর কথায় “সর্বেরববাদে একটি অস্ববিধা এসে পড়ে এই যে, এই পরিকল্পনায ব্যক্তি বা ব্যক্তি যেন নিম্নমূর্ণিত হয়ে যায় সমগ্রের ব্যাপক বিশালতার মধ্যে। এ ব্যাপক দৃষ্ট-ভাবীতে আরও একটি অস্ববিধা এসে পড়ে। এমন অনেকে আছেন ঈশ্বরের স্বয়ংস্বত্তি বিশেষ পরিবর্তিত। তাঁরা পরম সত্যকে শুধা জানাতে, অর্থাৎ যিহে, পূজা করতে একটা ভীত আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন। তা না

গ্রন্থপরিচয়

হলে তাঁদের তৃপ্তি হয় না। এ ক্ষেত্রে পরম সত্যকে নিছক হতে বিস্ফট করে, তাঁকে একটি স্বতন্ত্র সত্য। আরোপ করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। থাকে আমরা একেশ্বরবাদ বলি তা এই ধরনের সেবা পূরার অহুঙ্কার দার্শনিক মত স্থাপন করে।" এক নতুন ভঙ্গীতে সর্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে পারাই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক অভিনবত্ব, তাই তিনি 'ভগবতের মাথো কত বিচিত্র তুমি হে' বলা দ্বারাও তাঁর পক্ষে প্রেম পূজা নিবেদন করার বাধা হয় নি। লেখকের মতে তাঁর সমাধান হল, এই স্বতন্ত্র বা ঐক্য-সত্যকে মানুষের মধ্যেই আবিষ্কার করি—কাজেই তিনি সর্বত্র বিরাজমান হয়েও সীমার মধ্যে ভাবনই ধরা দেয় যখন মানুষের মধ্যে সেই পরম সত্যের আবির্ভাবকে উপলব্ধি করি। হুতরাং যে মানবের মধ্যে সেই পরম সত্যের আবির্ভাব হয়েছে সেই মানবের সাধনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষের ধর্মের মধ্যে কবি তাই বলতে চেয়েছেন "সমগ্র মানবজাতির সেবার আত্মনিয়োগেই মানুষের উপযুক্ত ধর্ম।" শেষের দিকে, ত্র্যমূলি বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি পশ্চিমী দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী হতেও এই কথাটির বিচার লেখক করেছেন। বইটি মনোযোগ আকর্ষণ করে, কেননা সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের যে ধরনের ব্যাখ্যা করা হয় এ বইটিতে সম্পূর্ণ অল্প দিক থেকে তার ব্যাখ্যা এবং সমর্থন আছে। ভাবা স্মৃতি ও প্রাচল, আলোচনা ও স্মৃতি।

শ্রীবিদ্যাসচন্দ্র সিংহ

পরমরমণীয়। সম্পাদক শ্রীলাগরময় ঘোষ। ইতিহাস অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড। মূল্য চার টাকা।

কিছুকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার ব্যাপক চর্চা অনেকেরই কৌতূহল জাগিয়েছে। 'রম্যরচনা' নামটাও সম্পূর্ণ নতুন—একটি বিশেষ শব্দের অর্থবাদ। আমাদের সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনার বিশেষ নাম কিছু ছিল না। হয়তো পূর্বের সাহিত্যিক বা পাঠক কেউই এ-বিষয়ে অবহিত হবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। প্রবন্ধ বলতে তথ্যমূলক রচনার সঙ্গে এই জাতীয় রচনাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হত। ইদানীং বাংলা সাহিত্যে এই রচনা এখন-এক বিশিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে যে, এর মাধ্যমে নানকরণের তো বটেই, আলাদা গুরুত্ব-প্রদানের প্রয়োজন অহুঙ্কার হয়েছে। 'পরমরমণীয়'ই তার প্রমাণ।

কিছুকাল পূর্বের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামটি এই রচনাকেই বোঝাত। বলা বাহুল্য, এই নামটাও বিদেশী শব্দের অর্থবাদ। আমাদের দেশে এই সাহিত্য-কর্মটি নতুন বলে বিদেশী শব্দের অর্থবাদে কান চালাতে হচ্ছে, কিন্তু ও-সেলে এটা নতুন নয়। হ্যাঙ্গলিট তাঁর "The Periodical Essayist" নামক গ্রন্থে এই প্রবন্ধ-রীতিকে মনুটেন থেকে নির্ণয় করে কাউলি এবং উইলিয়াম টেম্পলের মাধ্যমে ট্যাটলার এবং স্কোটেটের বিবর্তিত হয়ে আসতে দেখেছেন। কেউ কেউ অবশ্য আরো আগে এর খুঁজা দেখেছেন। সিসেরোকে এর প্রথম প্রবর্তক বলে তাঁরা মনে করেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই হ্যাঙ্গলিটের মতো সমালোচক স্পষ্টভাবে এই সাহিত্যিক রীতিকে ("This mode of familiar essay writing, free from the trammels of the schools and the airs of professed authorship") গ্রহণ করে নিয়েছেন দেখে মনে হয়, ইংরেজি সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং স্বাভাবিকত্ব সম্ভবতঃ। পরের ইতিহাসে ল্যাসের স্থান কোথায়, সে কথা নতুন করে বলবার দরকার হয় না। বিংশ

শতাব্দীতে ম্যাক্স বীররবোম, চেম্‌টারটন, লিও প্রভৃতি প্রবন্ধকারেরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মেজাজের দিক দিয়ে অভিনবর আদর্শন। এঁদের হাতে গঠ যেমন গভিমান হয়েছিল লেখক-মনোভাবও তেমনি হালকা এবং বৈচিত্র্যবিধানী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রবন্ধ ব্যক্তিগত তো বটেই তবে ব্যক্তিমনের গভীরতাটাই এর একমাত্র লক্ষ্য থাকল না। চেতনার স্থিরতাহীন, বীধনহীন পলাতক ছাড়াছবিগুলো অস্তরঙ্গ ভুক্তিতে একে যেতে পারলেই প্রবন্ধের উৎকর্ষ লাভ করা গেল। তাই এর বথোপধুক্ত নতুন নামকরণের চেষ্টা হল, *belles-lettres*। বাংলায় রম্যরচনা। বিবহবস্তর দিক দিয়ে এর সম্ভাবনার অস্ত নেই। লঘু বিষয় তো বটেই, গুরু বিষয়কেও অনাথালে গ্রহণ করা যেতে পারে— শুধু চিন্তাটা বে গুরু, এটা যেন পাঠক বুঝতে না পারেন। পাঠকের গুরুবোধকে ছরণ করে নিয়ে রম্যরচনা তাকে দেখে সহ্য হইত। আধুনিক রচনার আর-একটি বৈশিষ্ট্য, প্রবন্ধে অসমাপ্তির একটি। জাগ্রত কোঁড়হল স্বপ্ন করে তোলা; যেন অনেক কথাই বলা হল অথচ কোনো সিদ্ধান্ত বা উপসংহার পাওয়া গেল না। এই অসমাপ্তি-বোধই একে একটা আর্টে পরিণত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্পর্কে সচেতনতা যেন বিশেষ করে বর্তমানেই দেখা বাচ্ছে। অবশ্য বর্তমান সংকলন-গ্রন্থটি থেকে এ রকম একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়ার থেকেই এই প্রবন্ধরীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু এটা ঠিক, বাংলা সাহিত্যের নবময়ের সূচনায় যে বিভিন্ন প্রকাশ-পদ্ধতি দেখা দিল, ব্যক্তিগত প্রবন্ধর পদ্ধতিটি তাতে আলাদা স্বীকৃতি পায় নি। অর্থাৎ অহুত্বের যে বিশিষ্টতার ফলে বিশিষ্ট প্রকাশ-পদ্ধতি অবলম্বন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে, উনবিংশ শতাব্দীতে সেই প্রথম বিশিষ্ট অহুত্বই দেখা দেয় নি। বহুমুখীয় কথলাকাত্তের পথর রচনা করে সাহিত্যে এক নবীন পদ্ধতির সূচনা করলেন, তখন পাঠক এর আপাতকৌতুকর আড়ালে গুরুত্বটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের স্বাভাবিক তথ্যনিষ্ঠ গভীরতার সঙ্গে এর বোগ সহজেই বোঝা গিয়েছিল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধও স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। কারণ এই প্রবন্ধের পূর্ণতা ও গভীরতাও স্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবিসংবাহিত পরিচয়। রম্যরচনা বলতে আজকাল যা বোঝায়, বোধ হয় তার সম্পর্কে সচেতনভাবে সর্বস্বন্যহক প্রবন্ধ প্রথম লিখলেন প্রথম চৌধুরী। ‘বেয়াল বাতা’ নামক প্রবন্ধটিতে তিনি এর যে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করলেন, সেটাই আধুনিক রম্যরচনার ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম চৌধুরীর এই লেখাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ‘বামে কথা’ প্রবন্ধটির তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রাচীনতর রূপ এবং আধুনিক রূপের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। নবোদ্ভূত রম্যরচনা নিয়ে সংশয় যেন সম্পূর্ণ ঘুচতে চায় না। বাঙালী চিন্তার যে-স্বাভাবিকবিধি প্রায় প্রত্যেকের পরিণত হয়েছে, সেই ভূমিকাও রম্যরচনার আবির্ভাব স্বাভাবিক হলেও উৎসাহবাতক কি না সে-বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ নন। বিশেষত, বাঙালী সমাজে বেশ কিছুকাল থেকেই অনিচ্ছয়তার পালা শুরু হয়েছে, বাঙালী লেখকদের চেতনায় তার ডেউ এসে লাগবেই। রম্যরচনা এই সংবাদপ্রদান যুগেরই ফল। এই সংকলনে সাম্প্রতিক লেখকদের একটা গুণ সানন্দে স্বীকার করতে হবে। ভাবার তার। যে ধাবৎ-শক্তি নিয়ে এগেছেন, তাতে ভাবা অনেক সঙ্গতি হইছে। কিন্তু এ-অপেক্ষাও কিছুতেই দূর করতে পারি নে যে, এতে হয়তো গড়ে সংঘম এবং গাঢ়ত্বতার অভাব ঘটেতে পারে।

‘পরমরমণী’তে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন বিভাগাগরকে দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। তখনও এর

প্রস্থপরিচয়

ব্যকীয় রূপটি স্থাপ্ত হয়ে ওঠে নি। বিভাসাগর, সমীকচন্দ্র, বিশেষজ্ঞনাথ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানাথ প্রভৃতির রচনার ব্যক্তিমূলের স্বতন্ত্র উন্মেষ লক্ষ্য করি। কিন্তু বিষয়কে সম্পূর্ণ গোপন করে ব্যক্তিতেভনাকে পাঠকের কাছে অনাবৃত্ত তাঁরা করেন নি। আট হিসাবে এর চর্চা তখনও হয় নি। সাহিত্যে ব্যক্তিতেভনার অস্থপ্রবেশেই আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিতেভনার বৈঠকী রূপ যেখানে বড়টুকু অসতর্কভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়েছে সেখানেই আশ্রয় উন্মেষ শতাধার বিষয়-গাঢ়তার অটলবলতা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশী হই। বিভাসাগরের নামে পাঠকের মনে উন্মেষ প্রাণিক গন্তরীতির লেখকের যে-যুক্তি ভেসে ওঠে স্বভাবত ব্রজবিলাসে তার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রূপটি পাঠককে আনন্দিত করবেই। সাধারণ ভাবে দেখছি, এ যুগের লেখকরা বিষয়নিষ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে রীতিনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নি। এই প্রসঙ্গে মনে হল, রায়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ব্রাহ্মণ্যের রূপ' প্রবন্ধটি (যেট। বন্ধিনচন্দ্র বীকৃতি সহকারে কমলাকান্তের দ্বারা স্থান বিধেছেন) সংকলনে সেও চলে।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারাকে যদি তিনটি পর্দায় ভাগ করে নেওয়া যায়, তবে প্রথম পর্দায় এই লেখকদের রচনার ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টির সূচনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্দায় ব্যক্তিরূপটি সাহিত্যে আপন প্রভাব উজ্জল। বিষয় হয়েছে গোপন, কিন্তু তার পরিবর্তে এসেছে ভাবের অনন্তসাধারণ ঐশ্বর্য। সাধারণকে অবলম্বন করলেও ভাবটি অসামান্য ব্যক্তিমূলের গভীর। প্রবন্ধ-লেখক তখনও ভাবনিষ্ঠ, রসার্তী। প্রবন্ধে ব্যক্তির কল্পনা-ভবিই বড়ো এবং সেই হিসাবে এগুলি যে খাটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তাতে সন্দেহ নেই। সিরিকের ধর্মে এবং এই জাতীয় প্রবন্ধের ধর্মে নিল অমূলক নয়। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় সিরিকের প্রচারের সঙ্গে এর প্রচারও তাই অর্থপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, বলেশ্বরনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ—প্রধানত এই তিনজনকেই এই সময়ের প্রতিনিধি বলে ধরা চলে।

প্রথম চৌধুরী থেকে তৃতীয় পর্দায়ের শুরু। পরবর্তী কালে ঐরা রম্যরচনার প্রাধান্য লেখক বলে গণ্য হয়েছেন, ডাঃ এবং রীতির দিক দিয়ে তাঁদের অনেকেরই প্রথম চৌধুরী রচনাগুলির অস্থবর্তী। আধুনিক অর্থে রম্যরচনার নির্দিষ্ট রূপটি এসে হাতেই গড়ে উঠেছে। সংকলনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে—সংখ্যায় এরাই অধিক। বাচাবিক কারণেই এসে সংখ্যাধিক। প্রবন্ধগুলোর নামের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধিতে পারা যায় লেখকসত্তা কত দিক দিয়ে আলোড়িত হচ্ছে। লেখকমন কত গতিশীল এবং সপ্রতিভ। জীবনের গভীরতর উপলব্ধির ধ্যানমগ্ন শান্তি যদি সে হারিয়ে থাকে, সাধারণের দৃষ্টিতে কোলাহলের মাঝখানে কেগে উঠে সেই কতি সে পূরণ করেছে। রম্যরচনা এখন সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বিপজ্জনক সংকীর্ণ দীঘারোহণ এসে গাড়িয়েছে। সংকলক জুমিকায় বলেছেন, 'অর্নালিসটিক লিটারেচার' ধরনের রচনাকে তিনি সাবধানে পরিহার করেছেন। রম্যরচনা যে কোন্ অংশ বা স্বাভাবিক ভাঙিত হচ্ছে, সংকলকের এই সতর্কতাই তার ইঙ্গিত। সংকলন-কার্যে তার এই সতর্কতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কোনো প্রবন্ধই কৃত্রিম মনে হল না। বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন মেজাজের সাহিত্যে এসে পাঠকও চকিত কৌতূহলী এবং আনন্দিত বোধ করবেন। বুদ্ধদের বহু, অসিত বস্তু, প্রবেশিত বিদ্র, অজ্ঞানবন্ধ রায়, পরিমল রায়, ইন্দ্রজিৎ, বিমলাপ্রদায় মুখোপাধ্যায়, মুক্তবা আলী, হুশীল রায়, রূপনারী এবং অন্তর্গত ঐরা রম্যরচনার আদর্শ লেখক বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রচনারীতির বিভিন্নতা বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তার সৌরভ নিয়ে আসে। কেউ ভাষায় আলাংকারিক রীতির পক্ষপাতী, কেউ নেহাত মজলিশি চালের মাহু,

কেউ বিষয় নিয়ে লোকালুক করতে ভালোবাসেন, কেউ আত্মসমীক্ষণে রত, কেউ নিম্নেতে হারান খুঁটিনাটির মধ্যে, কেউ করনার লঘু হাওয়ায় ঘড়িয়ে সেন নিম্নেতে, কেউ উচ্চকণ্ঠে, কেউ গুরুনরত, কেউ মুগ্ধ, কেউ নিতবাক। প্রবন্ধগুলোর নবীনতা (freshness) পাঠককে স্তম্ভ হতে দেখে না। এরা সকলেই শিল্পী— তুচ্ছকে ব্যক্তিগত ভঙ্গি দিয়ে আলোচনাবোণা এবং রমণীয় করে তুলতে পেরেছেন বলেই শিল্পী। কোনো কোনো প্রবন্ধে যে ঐহিক অতিকথন-সোষ আসে নি কিংবা কোনো রচনা খণ্ডিত ব্যক্তিমানেদের চিত্র বহন করছে না— এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু রচনার সত্তাবনা এত ব্যাপক যে কোনো ক্রটিকে এককথায় ফ্রট বলে অভিহিত করা নিরাপদ নয়। তবে সংকলনে আর-একটি কথা বোঝা হয় বিবেচনাবোণা। সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ ঘাই থাক, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যে একটি সম্পূর্ণ রচনা হওয়াই বাহ্যিক ভাবে স্পষ্ট থাকবার কথা নয়। সেইজন্য কোনো দীর্ঘ রচনার অংশবিশেষকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলে নির্দেশ করা সংগত কি?

শ্রীভবতোষ দত্ত

জনশত্রুর সাহিত্য। শ্রীবিহার বোষ। শতাব্দিত লাইব্রেরী, কলিকাতা ৬। মূল্য পাচ টাকা আট আনা।

মুদ্রণ বিহার। শ্রীঅশোক বোষ। স্বাক্ষর, কলিকাতা ২০। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের অনেক বিশ্বদয়ক আবিষ্কার আখ্যাদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়েছে বাহ্যিকের জীবনের উপরে। রনোবগতে বিগত এনেছে মুদ্রণের উন্নত পদ্ধতির আবিষ্কার। সে বিগত এক স্বপ্নপ্রসারী যে বর্তমান যুগকে মুদ্রাঘরের যুগ বললে অত্যাধিক হয় না। মুদ্রণের ইতিহাস ও আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস প্রায় অভিন্ন। অথচ আকর্ষণের কথা এই যে, শিক্তি লোকদেরও মুদ্রণশিল্প সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানেরও অভাব দেখা যায়। এর কারণ হয়তো এই যে মুদ্রণশিল্পের ক্রমোন্নতির মধ্যে আকর্ষণিক আবিষ্কারের চমক নেই। বহু শতাব্দী ধরে একটু একটু করে এগিয়ে মুদ্রণ পারিপাট্য বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মুদ্রণশিল্পের প্রথম সূত্রপাত হয় চীন দেশে,— যীতর মন্দির কর্তৃক শতাব্দী পূর্বে। সে দেশে মুদ্রণ পদ্ধতি উদ্ভাবকদের প্রচেষ্টা অনেকদূর অগ্রগতি হতে নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রচেষ্টা নতুন করে ঘুরোপে আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সহায়তায় মুদ্রণকলায় আশ্চর্য উৎকর্ষ লাভ করতে পেরেছে।

মুদ্রণের ক্রমোন্নতির প্রায় আড়াই হাজার বছরের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস ইংরেজী ভাষায় অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু এগাব ইতিহাস প্রায়ই অসম্পূর্ণ। কারণ, মানবসভ্যতার উপর মুদ্রাঘরের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা থাকে না। বাস্তবের প্রয়োজনে মুদ্রাঘরের স্বষ্টি; সেই প্রয়োজন কতটা মিটেছে সে বিষয়ে কিছু না বলে শুধু মুদ্রণকৌশলের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করলে কোনো ইতিহাসই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

মুদ্রাঘরের প্রত্যক্ষ দান হল বইয়ের জগৎ। আশ্চর্য জগৎ। মৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যোগ থাক্য সঙ্গেও এ জগৎ পৃথক এবং নতুন। বই ছাড়া আমাদের দিন কি করে কেটেছে, এমন তা কল্পনাও করা যায় না। অবশ্য মুদ্রাঘরের দান অধিমিশ্র দশলের কারণ ছয়নি। অনেক অব্যাহিত বইপত্র বহুল প্রচারের

স্বযোগ পেয়েছে। এই মুক্তিতেই একসা কলকাতার পণ্ডিতসমাজ সভা ক'রে মুন্সায়ের বিরোধিতা করেছিলেন। অগ্নাজ দেশেও অমুদ্রণ বিরোধিতা হয়েছিল।

মুন্সায় সাহিত্যের আরো একটি ক্ষতি করেছে। হাতে-লেখা পুথির আমলে মূল গ্রন্থের পাঠ-পরিবর্তন করার অধিকার সকলেরই ছিল। ডাঃ ও রুচি-বদলের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যই এই পরিবর্তন করা হতো। তার ফলে রামায়ণ-মহাভারতের মনোগ্রন্থতা শত শত বৎসর ধরে অক্ষত ছিল। উত্তরে-পশ্চিমে, পূর্বে-পশ্চিমে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ও শাক্ত সম্প্রদায়ে তাই রামায়ণ মহাভারত ও অগ্নাজ প্রসিদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থের অলংকার পাঠ পাওয়া যায়। পাঠভেদ ও অগ্নাজ কিছু কিছু পরিবর্তন সবও মূল স্বরূপে কোনো ক্ষতি হত না। মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে একটা কঠোর নিষেধাজ্ঞা উদ্ভূত হয়ে আছে; যুগোপযোগী পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সুতরাং একশত বৎসর পূর্বে যে বই হামার হামার কপি বিক্রি হয়েছে, ডাঃ ও রুচি-পরিবর্তনের ক্ষত তার কাটতি বন্ধ হয়ে বাঙালি ভাবাবিক। হয়তো সাহিত্যের ইতিহাসে সে বই ক্লাসিক বলে গণ্য হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভালিকার অন্তর্ভুক্তও হতে পারে; কিন্তু ভ্রমগ্রন্থতা যে বহল পরিমাণে ভ্রাস পাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মুন্সায়ের যুগে কোনো লেখকই শত বৎসর ধাবৎ কনচিত্ত অধিকার করে থাকবার আশা করতে পারেন না। কয়েক বছরের ক্ষত বিপুল প্রচাঃ এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম যুগে বইয়ের মুদ্রক, হরফ-নির্ধাতা, প্রকাশক ও বিক্রেতা একই ব্যক্তি ছিল। কখনো কখনো লেখক নিজেই সবগুলি দায়িত্ব পালন করত। এখন তা আর সম্ভব নয়। বইয়ের মগৎ বিস্তার লাভ করার কাজ ভাগ করে নিতে হয়েছে। লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, গল্পী, অলংকরণশিল্পী, ইত্যাদি অনেকের সহযোগিতার ফলে পাঠক বই হাতে পায়। বই সমাজে কতকগুলি আর্থিক শ্রেণীর স্বত্ব করেছে। এই সব শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকার পাঠকের হাতে পৌছবার পূর্বে বই অনেক ভটিল পরিদ্রুতি পার হয়ে আসে। বই যনের খোরাক বলে ভটিলা আরো গভীর হয়।

বই ছাপা ও প্রকাশের অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞান প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের থাকা উচিত। সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, ফুটবল, ক্রিকেট, প্রভৃতি এখন বইয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে; সুতরাং বই সমাজে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাটা বর্তমান সময়ে বেশি দরকার। আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বইয়ের দান কী তা বিচার করে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার কথা ভাবতে হবে। অবশ্য বইয়ের মগৎ লোপ পাবার কোনো আশঙ্কা নেই। মানুষের হৃদয়ই চিন্তা করার শক্তি থাকবে, হৃদয়ই কোনো বিষয় বুঝে দেখবার আগ্রহ থাকবে, ততদিন বই ছাড়া চলবে না। সিনেমা, রেডিও ইত্যাদি যে জ্ঞান পরিবেশন করে তা ধরে রাখা সম্ভব নয়; সময় ও স্থযোগ-বত তাকে উটে-পাটে দেখবার সুবিধা নেই। তাক থেকে ধবন গুণি বইটি নিয়েই দেখা যায়; রেডিও বা সিনেমার বিশেষ একটি প্রোগ্রামকে অমন সহজে ইচ্ছানুযায়ী আনা যায় না।

বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই আশঙ্কা নতুন নয়। বিদ্যবস্ত্র পরিদ্রুত করার ক্ষমতা বইয়ে ছবি দেবার রীতি আরম্ভ হবার পর কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ হতান হয়ে পড়েছিলেন। বই পড়ে বর্ণিত বিষয়ের ছবি কল্পনা করার ক্ষমতা কি পাঠকরা হারিয়ে ফেলেছে? ছবি সংযোগনার অর্থ হল মানবসভ্যতার শৈশবে প্রত্যাবর্তন। সেই অবস্থায় কিরে যাওয়া, যখন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি ছিল প্রাথমিক স্তরের। তাই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন: "Heaven keep us from a lower stage." একথা ১৮৪৬

সাধের। একশত মশ বংশর পার হয়ে গেল; এখন দেখা দাবে ওয়ার্ডশুওয়ার্থের আশঙ্কা নিখা প্রমাণিত করে বইয়ের মগ্ন কি আশ্চর্য বিস্তার লাভ করেছে! অবশ্য রেডিও, সিনেমা, ইত্যাদির বহুল প্রচারের ফলে আমাদের জীবনে বইয়ের প্রভাব যে কিছুটা হ্রাস হতে পারে,—এমন আশঙ্কা অশূলক নয়।

বাংলায় বই সম্বন্ধে বই নেই। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় দু-একটি প্রবন্ধ দেখেছি। 'প্রিটার্স গাইড' নামে বাংলায় যে বইটি আছে সেটি ছাপাখানার কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের সহায়ক, সাধারণ পাঠকের উপযোগী নয়। সুতরাং বইয়ের মগ্ন সম্বন্ধে ত্রিভিন্নর ঘোষ ও ত্রিংশোক ঘোষের বই দুটি একই সঙ্গে পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব উদার গ্রন্থ সঞ্চয়র চেষ্টা করেছেন। একত্র লেখক ও প্রকাশকদের আদর অভিনন্দন জানাই।

ত্রিভিন্নর ঘোষের 'জনগণের সাহিত্যে' '...সাহিত্যিকের ইতিহাস, তাঁর সমাজের ইতিহাস এবং তাঁর স্টেটস রাষ্ট্র-রাষ্ট্রতা, মুক্ত প্রকাশক ও পাঠকের ইতিহাস' আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তৃত; তাকে এতদূর সম্বন্ধে পাঠকের সম্বন্ধে উপস্থিত করার কৃতিত্ব লেখক দাবি করতে পারেন। এই বই থেকে পাঠক বিশেষী সাহিত্য, বিশেষী লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানতে পারবেন যা পূর্বে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা হয় নি।

"জনগণের সাহিত্য" তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রাজসভার সাহিত্য বা পেট্রনের মূল, দ্বিতীয় ভাগে রাজসভা থেকে জনসভায় হস্তান্তর কাহিনী, তৃতীয় ভাগে জনসভার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। "প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস হল পেট্রন ও লেখকের ইতিহাস" (পৃ ৪৩)। লেখকের নভে এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল এই: "পেট্রন যুগের কবিরে যেন অধি বিভাগসই ছিল অল্প রকম। মেক্স ও গুডের সবসময় বেকেরি থাকত এক ঘাড় থাকত হেট হয়ে। কাব্যচর্চার চেয়ে মোদাহেবি ও গুডমির চর্চাতেই তাঁরা পটু ছিলেন বেশি" (পৃ ৩০)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সম্বন্ধে একত্র একটি সাধারণ মন্তব্য সমীচীন হয়নি। কারণ বেদ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য এই মন্তব্যের আওতায় পড়ে। পেট্রন-যুগের সাহিত্যের প্রতি লেখক কঠোর অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মুক্তি সমর্থিত হতে পারে শুধু এরূপ কবি ও কাব্যের কথা উল্লেখ করার সমগ্র সভ্য আলোচিত হয় নি। স্বাধিদাস ও সভাকবি ছিলেন। রাজার পৃষ্ঠপোষকতার রচিত বলে কি তাঁর রচনাবলী উপেক্ষা করা যায়? পেট্রন থাকটাই যদি সাহিত্যের অপকর্ষের কারণ বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে সংস্কৃত সাহিত্য তে সম্পূর্ণরূপেই বাতিল হবার আশঙ্কা।

মধ্যযুগে রাজসভার বাহিরেও যে সাহিত্য রচিত হত বিনয়বাবু তারও কোনো উল্লেখ করেননি। বৈষ্ণবকবিতা, বাউল-সংগীত ও পূর্ববঙ্গীতিকার মতো পল্লীগীতি রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্য দু রকম: ওষধিজাতীয় এবং বনশ্চিজাতীয়। রাজার গুণগায়ক সভাকবির রচনা ওষধিজাতীয়। অথচ একবার এই-জাতীয় সাহিত্য আলোচনা করে লেখক তাঁর দিম্ব্যত্ব এত প্রকাশ করেছেন। রাজা, সরকার অথবা ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা দল চিরকালই স্তুতি লাভ করে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে তা করা হয়। একালেও তা আছে। সভাকবি নেই বটে, কিন্তু প্রচার-পত্র আছে, সংবাদপত্র আছে। তারা সরকার বা দলবিশেষের গুণকীর্তন করে। মধ্যযুগে গল্পগীতি প্রচলিত ছিল না, তাই প্রচার-পত্রের কাল হত কাব্যে। শুধু এইজন্য একে সাহিত্যের বর্ধাঙ্গ দিয়ে প্রাপ্যত্ব দেবার কারণ নেই।

গ্রন্থপরিচয়

লেখকের আর একটি মন্তব্যের সঙ্গেও আমরা একমত হতে পারি না। তিনি লিখেছেন, মধ্যযুগে "কোন মমতাবোধ ছিল না। মানুষের প্রতি বা জীবনের প্রতি।" যুরোপের সাহিত্যে লুপ্ত এ কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু বাংলা কিংবা ভারতের সাহিত্য সম্পর্কে এই উক্তির বাখ্যার্থী স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের বাঙালী কবি চতুর্দশের মতো এমন দৃষ্ট বোধগা আর কে করেছেন যে, মানুষই পৃথিবীতে সব-কিছুর উপরে একমাত্র সত্য? আমাদের পরীক্ষিত ও মঙ্গলকাব্যে সাধারণ মানুষের স্বপ্নদঃপের কথা বেশপ মর্মস্পর্শী ভাষায় বলা হয়েছে তা থেকে কবির মানবতাবোধ ও সহানুভূতির স্থপতি প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্যের কথা না হয় বাদই দিলাম। ঐতিহাসিক, দাদু, কবীর প্রভৃতি মানবপ্রেমী মহাপুরুষরা মধ্যযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ দেশে মধ্যযুগে মানবপ্রীতির এক স্রোতঃ এসেছিল।

সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা একটি ধাপ বার। সেটা অত্যাবশ্যক ধাপ। যখন বই ছাপিয়ে বিক্রি কববার উপায় ছিল না তখন রাজ-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া লেখকের বাচ্যের পথ কোথায়? এখন কেউ একখানি ভালো বই লিখলে অর্থপ্রাপ্তির আশা করতে পারে। পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব ছিল না বলেই ব্যক্তিবিশেষের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করতে হত।

এখন লেখকের পৃষ্ঠপোষক কে? নিশ্চয়ই পাঠক। একদল লেখক পাঠকদের মনোবৃত্তনের ক্ষমতা সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ বিসর্জন তো এখনো দিয়ে থাকে। স্বতরাং কিছু-সংখ্যক লেখক চিরকালেই পৃষ্ঠপোষকের মুগ্ধাপেক্ষী হয়ে থাকবে। তবে আশায় কথা, এদের রচনা সাহিত্যস্রবিকের নিকট সমাদৃত হয় না।

বিরয়বাবু ৩০ পৃষ্ঠা থেকে ১৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যুরোপের মুদ্রণ ও প্রকাশনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এসেশের পাঠক শিক্ষণীয় অনেক নতুন কথা পাবেন। ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন: "লেখকদের লুণ্ঠন করাই প্রথম যুগের প্রকাশকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য প্রকাশকদের প্রথম যুগটাকে অনেকে literary piracy যুগ বলেছেন। কমার্শিয়াল পাইরেসির মতন পিটারারি পাইরেসি ছিল প্রকাশকদের নীতি। যেকোনো দক্ষিণা দিয়ে প্রকাশকরা লেখকদের পাণ্ডুলিপির সর্বস্বত্ব কিনে নিতেন, লজ্জা বা রহস্যটি দিয়ে নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি সাহিত্যিক এই ভাবে প্রকাশকদের লুণ্ঠন-নীতির সৌভাগ্য সহ্য করেন, তাঁদের মধ্যে লেক্সপীসরও ছিলেন। অনেক নাটক লেক্সপীসর এইভাবে প্রকাশকদের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে বাধা হয়েছিলেন।"

পিটারারি পাইরেসির এই ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থ বলে মনে হয় না। লেখককে পারিভ্রমিক (যত কমই হোক) দিয়ে এবং তাকে জানিয়ে বই প্রকাশ করলে 'পাইরেসি' বলার প্রচলন নেই। কার্টার পিটারারি পাইরেসির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল এই: "A term commonly applied (sometimes with, sometimes without, legal accuracy) to an edition produced and marketed without the authority of, or payment to, the author."

"বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত" অধ্যায়টি আরো বিস্তৃত হলে আমরা আনন্দ লাভ করতাম। এই বিষয় নিয়ে একটি পৃথক বই লিখতে বিনয়বাবুকে অহুরোধ করছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাংলা বইয়ের কাটতি সয্ছে বিনয়বাবু যা বলেছেন সে বিষয়ে আমরা একমত। রূপোপের হুইভেন প্রভৃতি দেশের মোট লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের লোক লোকসংখ্যার প্রায় সমান। পূর্ব-পাকিস্তান ও ভারতের অন্তর্গত রাষ্ট্রের বাঙালীদের বাদ দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে লিখন-পঠনকর্ম লোকের সংখ্যা ৩১ লক্ষেরও বেশি। হুভরাং রূপোপের ছোট ছোট দেশের সাহিত্য যদি আত্মনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি নঃ হবার কারণ নেই। একটি ভালো বই মন-বিশ হাজার কপি বিক্রি হবার আশা করাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নথীভাণ্ডার না করবার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বাহত হয়ে আছে। বাঙালীর শেষ স্বাধীন নৃপতির সভাকবি সংকুতে কাব্য রচনা করেছেন। তারপরে হাজারে মুসলমান আমলে ফারসী এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজী হয়েছে আমাদের সরকারী ভাষা। স্বাধীনতার পরে বাংলা ভাষার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সুযোগ এসেছিল রাষ্ট্রভাষার নথীভাণ্ডার না করবার। কিন্তু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয়নি। বাংলা এখনো প্রধানত চিত্রবিনোদনের ভাষা হয়ে আছে। যেদিন বাংলা বৈদ্যনিন দ্বীবনের প্রয়োজনীয় ভাষা বলে স্বীকৃত হবে সেদিন থেকে আমাদের সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির পথটা মুক্ত হয়ে যাবে।

ত্রিঅশোক ঘোষের 'মূত্রণ বিশারদে' ছাপাখানার কাজ সয্ছে হুম্মর বিবরণ পাওয়া যাবে। লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীল। বইটি কিশোরদের জন্য রচিত হলেও বড়রাও উপকৃত হবেন। টাইপ, কম্পোজিং, ছাপা, কাগজ, রক, রঙিন ছবি ছাপবার কৌশল, প্রক দেখা, বই বাঁধাই, ইত্যাদি বিষয়গুলি সরল করে লেখক বৃত্তিতে বলেছেন। বন্ধনী ব্যবহার করার পদ্ধতি গিয়ে বাধা পেতে হয়। এগুলো না থাকলেই ভালো হত এবং কথাবার্তার আন্বিক ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল না। যে-সব শব্দের বাংলা নেই তাদের ইংরেজী রূপ পাঠে দিয়ে দিলে পাঠকদের সুবিধা হত। 'ক্রমা' শব্দটির আসল রূপ যে 'forme' তা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব না-ও হতে পারে।

বাংলা মূত্রণের ক্ষেত্রে গুরা পবিত্র লেখক তাঁদের প্রথমেই স্মরণ করেছেন। কেরির আগে হবে পকানন কর্কাদের নাম। এবং তারও আগে থাকা উচিত ছিল উইলকিন্সের নাম,— যে নাম অশোক-বাবু উল্লেখ করেন নি।

লেখক এবং প্রকাশক কি সত্যি বিশ্বাস করেন এ বই পড়ে কেউ 'মূত্রণ বিশারদ' হতে পারে? 'বিশারদ' কথাটি গুরুগম্ভীর এবং একটি হুনিদিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। হুভরাং লব্ধ অর্থে এর ব্যবহার না হলেই ভালো হত। সাধারণ পাঠকের জন্য মূত্রণশিল্প সয্ছে কুমিকার কাজ করলেই কি বইটির উদ্দেশ্য সার্থক হল বলা যায় না?

'মূত্রণ বিশারদে' নিবুর্ল ছাপা এবং প্রধান শ্রেণীর মূত্রণপারিপাটা আশা করেছিলাম। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। বিবরণের পরিষ্কৃত করার জন্য কতকগুলি ছবি ব্যবহার করার মূল্য ভালোই হয়েছে। তবে বেশিরদূর ছবিগুলি এত ছোট এবং অস্পষ্ট যে পাঠকদের কোনো উপকার হবে না।

'জনসভার সাহিত্য'ও মূত্রণের ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। মূত্রণ ও প্রকাশন সয্ছে বই বলে প্রকাশকদের নিবুর্ল ও হুম্মর ছাপার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

বাংলা কবিতার বইয়ে প্রথম অলংকৃত প্রচ্ছদের ব্যবহার আরম্ভ হয়। তারপরে গল্প ও উপন্যাসের প্রচ্ছদেও এর প্রচলন আসে। আলোচ্য বই দুটি প্রবন্ধের বই; তবু এদের প্রচ্ছদের অলংকরণও লক্ষ্যীয়।

"জনসভায় সাহিত্যে"র প্রচ্ছদের মত প্রকাশক বেশ অর্থ ব্যয় করেছেন, সেপক্ষেও ভালে হয়েছে। আমাদের প্রকাশকেরা এই ধরনের প্রচ্ছদ ব্যবহারের রীতি ধ্বংস কৃত গ্রন্থ করছেন তার ফল কি হবে তা কেবে দেখবার সময় এসেছে। প্রকাশকেরা প্রচ্ছদের মত যে অতিরিক্ত ব্যয় করেন শেষ পর্যন্ত তা ক্রেতাকেই দিতে হয়। বাংলা বইয়ের ক্রেতা কম; অত্যাধিক ব্যয় বচান্দ মিটিয়ে বই কেনার সামর্থ্য খুব বেশি লোকের থাকে না। প্রচ্ছদের মত বইয়ের দাম যদি বাড়ানো হয় তাহলে ক্রেতার ক্রমশ: বিলুপ্ত হবে। প্রচ্ছদের বাহার না থাকলে বই বিক্রি হয় না, এ যুক্তি অচল।

বেশি দাম দিয়ে বই বাড়ি আনবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রচ্ছদ খুলে যায়। কারণ এ ধরনের বই ধাঁধাই করা হয় না, যা করা হয় তাকে ইংরেজীতে বলে 'কেসিং'। যদি বইটি রাগতে চান তাহলে দপ্তরীর বাড়ি পাঠিয়ে ধাঁধিয়ে আনতে হবে। এই দোকর অতিরিক্ত ব্যয় করতে না হলে পাঠক এই পয়সা দিয়ে আর একটি বই কিনতে পারত। সুতরাং আপাতদৃষ্টির খেলা প্রচ্ছদ পরিণামে বাংলা বইয়ের ক্ষতি করবে।

চিন্তারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা গণেশের আনল । ঐহুখনয় মুখোপাধ্যায় । শৈলশ্রী, কলিকাতা ১২ । মূল্য তিন টাকা ।

বাংলার ইতিহাসে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেবল যে রাজনৈতিক দিক দিখাই এ কথা সত্য, তাহা নহে— এই শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজা গণেশের অধ্যাখান যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেমনই বাংলার সামাজিক ইতিহাসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং সাহিত্যের ইতিহাসে কৃত্তিবাস ও বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব তেমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান শাসনের মধ্য হইতে রাজা গণেশের মাধ্যমে আকস্মিক একটি হিন্দু রাজশক্তির অধ্যানব্ধের প্রভাব খুব হৃদগ্রসারী না হইলেও বাদসাহীর আত্মীয় জীবনে কৃত্তিবাস-চণ্ডীদাস-চৈতন্যের আবির্ভাব হৃদগ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে মধ্যযুগের বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক জীবন ইহাদের দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। অতএব এই এক শতাব্দী কালের উপর ভিত্তি করিয়া যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভব, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাংলার সমগ্র ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব বাহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহারা এই শতাব্দীর গুরুত্বটি উপলব্ধি করা সবেও ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক পরিচয় এ পর্যন্ত কেহই প্রকাশ করেন নাই। অত্যন্ত সূখের বিষয় এই যে, বর্তমান গ্রন্থকার এই শতাব্দীর গুরুত্বটি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া এই বিষয়ে সকল শ্রেণীর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বাহাই থাকুক-না কেন, এই বিষয়ে সর্বদৃষ্টিমান কোনো গ্রন্থ রচনা করা যে সম্ভবসাধ্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিও যে এই বিষয়ে একটি সর্বদৃষ্টিমান রচনা তাহাও বলিতে পারা যায় না, তবে ইহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্যসংগ্রহ করিয়া রাজা গণেশের কাল নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এ সম্পর্কে যে-সকল জনপ্রতি সহজ ইতিহাস-রচনার অবলম্বন হইয়াছে, তাহাদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মূল্য বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিকবিদের মধ্যে প্রচলিত এই

বিষয়ক বিভিন্ন মতগুলিও তিনি পরিবেশন করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থখানি কেবল তাঁহার নিজস্ব মতবাদের বাহন না হয়। এই বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইয়াছে।

গ্রন্থটিক আপাতদৃষ্টিতে লেখকের রচিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি যোগেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বত্ব করা যায়। 'রাজা গণেশ ও তাঁর বংশ' শীর্ষক সর্বপ্রথম প্রবন্ধটির ভিত্তর দ্বিতীয় যোগেশ্বরের সম্পর্কিত বিস্তৃত ঐতিহাসিক পরিচয় দিবার পর তিনি তাঁহার পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে চীন ও বাংলার রাজনৈতিক সংযোগ' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটির ভিত্তর দ্বিতীয় যোগেশ্বরের চৈনিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এ যাবৎ অজ্ঞাত কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রাজা গণেশের সম্পর্কিত কতকগুলি হুপ্রাপ্য তথ্য চৈনিক উপকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার বাংলার ইতিহাসের উপর একটি নূতন আলোক-সম্পাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহার পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধে যথাক্রমে 'রায়মুহুট বৃহস্পতি বিশ্র' 'কবি চণ্ডীদাস' এবং 'চণ্ডীদাস-বিজ্ঞাপতি'র বিষয় অবলম্বন করিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় দিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কবি-কৃতিবাস রাজা গণেশের সাক্ষ্য সম্পর্কে আশিয়াছিলেন বলিয়া লেখক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নান্য বৃত্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতীপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, রাজা গণেশই কবি কৃতিবাসকে রামায়ণ অম্বুবাধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে এখন পর্যন্তও এদেশে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। বর্তমান গ্রন্থকারেরও মতবাদ সকল দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যোগ্য।

রাজা গণেশের রাজত্বের সম্বন্ধে রায়মুহুট বৃহস্পতি মিস্ত্রের সাক্ষ্য সম্পর্ক ছিল বলিয়াই লেখক অম্বুবাধন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'তিনি শুধু বন্যমুগের বাংলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন না, বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কুটিল ঘটনাপ্রবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাই তিনি সুবদিক দিচ্ছেই 'অনন্তশাধারণ' (পৃ ৮৭)। এই সূত্রেই তাঁহার বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার সর্বশেষ প্রবন্ধে চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতির সমসাময়িক কিনা এবং তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষ্য হইয়াছিল বলিয়া যে অনুমান প্রচলিত আছে, তাহা কতদূর সত্য এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বড়ু চণ্ডীদাস প্রাক-চৈতন্য যুগের বাংলার একটি গৌরব-রস। রাজা গণেশের সঙ্গে তাঁহার কোনো সম্পর্ক ছিল এমন দাবি এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই। অতএব তাঁহার বিষয়ক আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে স্থান লাভ করিবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন হইতে পারে। তবে গ্রন্থকার বিভিন্ন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহারে দাবি করিয়াছেন যে, 'কৃতিবাস, বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাস একই সময়ে বর্তমান ছিলেন (পৃ ১০০)।' বিষয়টি বিস্তৃততর তথ্যের উপর আরও নানা দিক হইতে আলোচনার যোগ্য।

গ্রন্থকার বাংলার ইতিহাসের কতকগুলি বিতর্কমূলক বিষয় অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি সকল দৃষ্টান্ত বিষয়ের স্রষ্টা বীমাঙ্গা করিতে পারিয়াছেন, এমন দাবী তিনি নিজেও নিচ্চাই করিবেন না। তবে তাঁহার গ্রন্থখানিতে যে অধ্যবসায় ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রশংসনীয়।

স্বরলিপি

ও জোনাকি, কী স্থখে ওই জানা দুটি মেলেছ ।
 আধার পাঁখে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ।
 তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তোমার তাই ব'লেই কি কম আনন্দ ।
 তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জেলেছ ।
 তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো কণী কারো কাছে,
 তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ ।
 তুমি আধার-বাধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
 অগতে যেথায় বসে আলো দ্বায়ে আপন ক'রে ফেলেছ ।

কথা ও স্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীঅনাদিকুমার দত্তিদার

সা সা সা II	[ধা -ধা গা] সা -ধা কী •	ধা	{ধা	ধা -ধা I	ধা	ধা -ধা	ধা	পা	-১ I
জো না কি	কী •	হ	খে	ও -ই	ভা	না •	হ	টি	
I	রা রা -গা	মা -পা	-১ I	(মা -পা মা	গা	রসা	I		
	যে লে •	ছ •	•	ও জো	না	কি •			
I	সা -ধা ধা))	। সা সা -মা	। মা মা -১ I	-১	-১	-গা	I		
	কী • হ	জা ধা	বু	সা	ঝে				
I	রা রা -পা	পক্ষা	পা	I					
	ব নে বু	মা •	ঝে						
I	ধা -১ না	সাঁ	সঁনা	I	সাঁ	নসাঁ -ধা	পা	-১ I	
	উ লু লা	সে	প্রা •		ডে	লে •	ছ		
I	রা -গা গা	ধা	পা -১ I [] I						
	ও • জো	না	কি						
II	-১	-১	পা	পা I	পা	-১ পা	ধা	-১ না I	
	•	•	তু	নি	ন	ও তো	হু	বু	য
I	সাঁ -১ রী	রঁসাঁ	-রঁ	-সঁনা I	সাঁ -১	সাঁ	না	-সাঁ I	
	ন ও তো	চ •	•	• নু	•	•	তো	মা	বু
I	ধনা -ধা না	সাঁ	-১ রী I	সাঁ -১ সঁনা			-১	-না I	
	ভা • ই ব	লে	ই	কি	ক	মু	আ •	•	নু

I				ধা	পা		I	ধা	না	-	না																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---	--	--	--	----	----	--	---	----	----	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ବିଶ୍ଵଭାରତୀ ପତ୍ରିକା

ଅଯୋଦ୍ୟ ବର୍ଷ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂখ୍ୟା କାର୍ତ୍ତିକ-ପୌଷ ୧୯୬୭

ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀପୁଲିନବିହାରୀ ସେନ

ବିଷୟସୂଚୀ

ଚିତ୍ରିତ୍ର	ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର	୮୨
ବନ୍ଧୁସଂସ୍କୃତିର ଉଦ୍ଭିଦ	ଶ୍ରୀବିନୟଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୨୧
କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଶ୍ରବଣ	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୦୮
ଘୋଷା ସେନ	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୧୧
କ୍ୟାରିବିଗ୍ନେର ଚିତ୍ରି	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୧୮
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବାର୍ନାଡ଼	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୧୯
ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ବିପ୍ଳବ	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୦
'ଗୋଷ୍ଠୀନା'	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୧
ପ୍ରାଚୀନ ଗୋଷ୍ଠୀନା ପଟ	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୨
କାଳୀଘାଟର ପଟ	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୩
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀନା ରାୟ	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୪
ଗୋଷ୍ଠୀନା ରାୟର ଜୀବନକଥା	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୫
ଗୋଷ୍ଠୀନା ରାୟର ଶ୍ରବଣ	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୬
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୭
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ : ଦେ-ଉତ୍ତରୀନା	ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	୧୨୮

ଚିତ୍ରସୂଚୀ

ଗୋଷ୍ଠୀନା	ବାଂଲା ପଟ	
ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	କାଳୀଘାଟ	
ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	କାଳୀଘାଟ	
ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	କାଳୀଘାଟ	
ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	କାଳୀଘାଟ	
ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	କାଳୀଘାଟ	୧୬୦
ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	କାଳୀଘାଟ	୧୬୧
ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	କାଳୀଘାଟ	୧୬୨
ଶ୍ରୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ	କାଳୀଘାଟ	୧୬୩



ଲୋହୀୟା । ବାମନ ଗଣ୍ଡି
 । ଶ୍ରୀରାମ ଲୋକ ଲୋକ



চিঠিপত্র

হরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইবা

নদিয়া

শ্রীতিসম্ভাবনপূর্বক নিবেদন

আমাকে যখন কেহ পথের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন মনে মনে হাসি এবং মনে মনে বলি—হায় রে আমার কপাল ! স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পাইলে নিজে বাঁচিয়া যাই অন্তকে পথ দেখাইব কিসের !

কিন্তু শিশুকাল হইতে সকল রকমে ইহাই দেখিলাম পথটাকে অস্পষ্ট করিয়া নিয়াই তিনি মজা করিতেছেন। জীবনটা শুধু কেবল পথে চলা নহে, খুঁজিয়া রাস্তা বাহির করা।

শতদ্বন্দ্ব পথের মধ্যে কেবল একটা পথ আছে বাহা আমার—নানাপ্রকার পরাধ করিতে করিতে সেইটে বাহির করাই আমার সমস্ত লক্ষ্যের পরিণাম। আজ পর্যন্ত কেবল এই কাজই করিয়া আসিয়াছি—তাহাতে ছাঃও পাইয়াছি আনন্দও পাইয়াছি—এখনও নিঃসংশয় হই নাই। কিন্তু ভয় কাটিয়া গিয়াছে; একথা আর মনে হয় না যে একেবারে পথ হারাইয়া ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া যাবা যাইব। ইহা বেশ বুঝিয়াছি এই পথ বোঝার মধ্যেই জীবনের সকলের চেয়ে বড় শিক্ষাটা আছে—যদি খুঁজিতে না হইত তবে আর বাহা পাই নিকেকে পাইতাম না। গুরুকে পাইয়াই বা লাভ কি, শাস্ত্রকে পাইয়াই বা লাভ কি—নিকেকে না পাইলে নয়—অন্ত নিকেকে এত করিয়া ঘুরাইতে হয়। কর্ণের পথও যেমন লজ্য কর্ণভাগের পথও তেমনি লজ্য—প্রত্যেকের পক্ষে ইহার স্বল্প সামঞ্জস্যটিক কে কোন্‌খানে তাহা বাহির হইতে কোনোমতেই শেখা যায় না—তাহা বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে উৎপন্ন এমন একটি নৈপুণ্য বাহা কাছাকাছি হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না। পোকার যেমন ক্রমাগত টাং। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে স্পর্শমাঝে মেকি টাং অহুভব করিতে পারে কিন্তু সেই অহুভব পেয়াইতে পারে না এও সেইরূপ। না শিখাইতে পারার একটা প্রধান কারণ প্রত্যেকের বোধধর্মের একটি বিশেষত্ব আছে—আমি ঠিক যেখানে পৌঁছিলে তুমি আর একজন ঠিক যেখানটি পৌঁছিলে বোঝে না—যাত্রার ভারতম্য আছে স্বতরাং প্রত্যেকের focus ঠিক একটি বিন্দুতে নয়। এই বিন্দুটিকে ঐক্য করিয়া খরিবার জোঁতা আছে—তাই কখনো কান করিতেছি কখনো কান ছাড়িতেছি কখনো একটুখানি

এগোইতেছি কখনো একটুখানি পিছাইতেছি— এমন করিতে করিতে ঠিক আয়গাটিতে গিয়া পৌছিব। পৌছবার পূর্বে যে একবারে নিছক ছাখ তাও ত আমার মনে হয় না। হঠাৎ এক একবার একটা দিক হইতে দৃষ্টি যে একটু খোলসা হইয়া যায় তাহাতে যেটুকু পাওয়া যায় তাহার চেয়ে আভাস পাওয়া যায় অনেক বেশি— তখন বোঝা যায় এ একটা বেলা হইতেছে, লুকাচুরি বেলা, ইহা ধরা না ধরায় মিশ্রিত বেলা— ইহাতে সত্যন্ত বেশি হতাশ হইবার দরকার নাই— কেননা এটুকু জানা গেছে যে যিনি খেলাইতেছেন তিনি কাছেই আছেন— তাহাকে না ধরিয়া খেলা শেষ হইবে না। তিনি আছেন, তিনি আছেন, বাস্ আর ভয় নাই— তিনি যেমনি জান করুন, তিনি আছেন এইটেই আমার পক্ষে প্রচুর— আমার সমস্ত ভয় ভাবনা ইহার মধ্যে ছায়ায় যত বিলুপ্ত হইতেছে। বাহা হয় তাহাই হউক এইটে খুব জোর করিয়া বলিয়া ভরপুরে কোমর বাঁধিয়া পেলিতে লাগা থাক্। সে খেলার মধ্যে সবই আছে— ভাবও আছে রূপও আছে, আনন্দও আছে তপস্কাও আছে, এড়ানোও আছে, ধরা দেওয়াও আছে।

আমার বোট কুটিয়ায় আসিয়া পৌছিল— এমার কলিকাতার দূখে ছুটিয়াছি। আমার এখানে ফিরিব এমন আশা আছে। ইতি ২৬শে কার্তিক ১৩১৮

ডবলীর
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা

শ্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন

আনি এখন উড়িয়ার দূখে।^১ কিছুদিন হইতে মনটা পালাই পালাই করিতেছিল— কিন্তু বাটার দ্বার খুলিবার কোনো লক্ষণ দেখা বাইতেছিল না। অবশেষে নিজেই কন্ড ধরনা ভাঙিয়াছি। কান্নকণ্ঠ লাড় লোকগান উচ্চিত অহচ্চিত কোন কিছুর মোহাই মানিব না— এবার বাহির হইব এই পণ করিয়াছি। আমার পক্ষে কর্ণের যে প্রয়োজন ছিল সে বোধ করি শেষ হইয়াছে। এখন আর মন পিছনে তাকাইতে বা কোনো কাজের কথাই কান নিতে পারিতেছে না। এখন সময়ে আপনাবা আনাকে আর পিছু ভাকিবেন না। নিবন্ধন যদি করেন তবে পত্র পাঠাইবেন কোন্ ঠিকানা— আমি যে বড় রাগত। নবী যেমন চলিতে চলিতে নিজের বেগে আপনাবা পথ কাটিয়া লয়— কোনো পাল কাটা এজিনিওরকে শিকি পয়সা বেতন দেয় না— আপনাবাও পক্ষি তেমনি নিজের গতিপথ নিজের দ্বারা ইচ্ছা করিয়া লইবে। আপনাবা বলিবার কথাই আপনাবা বাহনকে দ্রুত করিয়া লইবে— শুধু তাই নয়, শোভাকেও কানে ধরিয়া টানিয়া আনিবে।

আমার এখন বিদায়ের সময় আসিয়াছে— আপনাবা প্রত্যক্ষ কামনা করি। “গ তপোংপাত” এই

১ এই সময় রবীন্দ্রনাথের ফিল্ড-মাস্টার আয়োজন চলিতেছে।

চিঠিপত্র

বাক্যকে স্মরণ করিয়া তপস্জ্যকে আশ্রয় করিবেন—রূপ পরিগ্রহের সাধনা ও বেধনার দ্বারা আপনার ভাবের সম্পদকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। ঈশ্বর দ্বারা আপনাকে দিয়াছেন তপস্জ্যের দ্বারা তাহাকে আপনার করিয়া লইতে না পারিলে গান করিবার অধিকার লাভ করিবেন না। নিষেধ ধনই আমার দিতে পারি ঈশ্বরের ধন দিতে গেলে কেহ তাহা লইতে পারে না। ইতি ২২শে আশ্বিন ১৩১৮

আপনার
শ্রীবীজনাথ ঠাকুর

শাখিনিকেতন
বোলপুর

শ্রীতিনবদ্বারপূর্বক নিবেদন

কোনোদিন উপাধির* অপসেবতা আমার স্বপ্নে ভর করিবে এমন আশঙ্কা যন্ত্রেও আমার মনে আসে নাই। অংশেবে বনগমনের বয়সে সেটাও ঘটিল। আমার নামটার সঙ্গে একটা আওরাতের বস্ত্র বাদিয়া দিয়া বিধাতা এ কি কৌতুক করিলেন? ভূমস্থি সাপের পৃষ্ঠদেশে ভর করিয়া তাহার নকীব তাহার আগমন ঘোষণা করিতে থাকে—আমার মত নিরীহ জীবের পক্ষে ত সেরূপ বিধান অন্যতরক। আমার কাব্যলব্ধির মাধ্যম এতদিন যে ঘোমটা ছিল সে ভালই ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়* সেটাকে সভাস্থলে উন্মোচন করিয়া এখন তাহার মাধ্যম পাগড়ি পরাইয়া দিবে তখন সেটা কিছুতেই মানাইবে না।

আপনার দার্শনিক প্রবন্ধটি বহন আমারকে আদরপূর্বক পাঠাইতেছেন তখন সেটা আমি পড়িব কিন্তু এ সকল বিষয়ে আপনি আমাকে অধিকারী ঠিক করিলেন কোন হিসাবে? আমি যে কত আনন্দি তাহার পরীক্ষা কি এনি করিয়াই করিতে হয়? চিরকাল আমি ত সাহিত্যের খেলাঘরেই দিন কাটাইয়াছি পাঠশালা ঘরে ত পদার্পণ করি নাই—অন্তএব শাস্ত্রালোচনার ক্ষেত্রে আমার মত লোকের বান ততদিন বাচিবে দাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাঙতে। বৌদ্ধিজির ঘটানি-শাস্ত্রে ততখানি ব্যুৎপত্তি দর্শনশাস্ত্রেও আমার ততখানি সৌভ। যে সব বিষয়ে আপনাদের কাছে আমি শিক্ষা করিতে পারি সেসব বিষয়ে আপনারা শিল্পের মত আমার কাছে উপস্থিত হইলে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। ইতি ১৬ কাতিক ১৩২০

আপনাদের
শ্রীবীজনাথ ঠাকুর

২ এই পর শিবিবার করেকনিব পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতবাধক Honorary Degree of Doctor of Literature বিদ্যার শিষ্টান্ত স্বরূপ (২৮ অক্টোবর ১৯১০)। বিজ্ঞাপিত বিবরণ দেখ ১৩৩০ সাহিত্য-সংখ্যার মুদ্রিত শ্রীমৎস্বতন্ত্র অষ্টাচার্য শিখিত “স্বীকৃতবাধ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়” এখানে প্রাপ্য।

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

আমার সম্মানসাহিত্যে বাহারা! আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমার অশ্রুয়ের কৃতজ্ঞতা
নিবেদন করিতেছি। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২০

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

শ্রীতিনমস্কার পূর্বক নিবেদন—

আপনাদের আনন্দই আমার পুরস্কার। আমার গৌরবে আপনারা গৌরব অশ্রুতব করিতেছেন ভগবান
আমাকে এই বে অধিকার দিয়াছেন ইহাই আমার শবলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অধিকার। নোবেল প্রাইজের একটা
নির্দিষ্ট মূল্য আছে কিন্তু শ্রীতির ত মূল্য নাই। আপনাদের নিকট হইতে সেই অমূল্য উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞ
হইয়াছি। আজ ইহার বেশি বলিবার আমার সময় নাই। ইতি এই অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা

শ্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন—

মৃত্যুর আঘাত পাইয়াছেন। এই গভীর বেদনা হইতে পবিত্র সাধনাধারা উৎসারিত হইয়া আপনার
জীবনকে অভিব্যক্ত করক এই কামনা করি।

দুর্ভিক্ষকাতর দেশকে কেলিয়া" আপানে বাওয়া আমার ঘটিয়া উঠিল না। দুঃখের ভাগ লইতে হইবে।

আপনি তত্ত্বজ্ঞানের নেশায় ভোর আছেন। এ নেশা ভাঙাইতে চাই না। কারণ নেশা জিনিষটা রক্তের
ভিতরে গিয়া কাঁচ করে—স্বত্বাঃ ইহার কিরাটা কেবলমাত্র বৃদ্ধি হইতে নহে—জীবন হইতে। অন্তঃর
আপনি বতই বাতিবেদন আপনার তত্ত্বজ্ঞান ততই প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠিবে। বোধ করি এই ক্ষণই
তত্ত্বজ্ঞানী শিব নেশায় ভোর হইয়া তবে তত্ত্বজ্ঞানকে হরণ করিতে পারেন—নহিলে তাঁহার কৈলাসপুরীটুকুও

৩. রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-মাণ্ডি সংবাদে বাহারা! আনন্দপ্রকাশ করিয়া পরামি গিথিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট প্রেরিত
কবির বহুশিখিত উক্তরের স্যাইজোপটাইল হয়ে যুক্তিত প্রতিশিপি।

৪. দুর্ভিক্ষবিধাংশকরে এই বঙ্গের মাথ হানে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফাঙ্কনী অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

চিঠিপত্র

চিঠিক্ত না— স্থান হইয়া যাইত। অল্পপূর্ণা বৃত্তিপূৰ্ণক নিজের হাতে তাঁহাকে সিদ্ধি ঘটিয়া দিয়া থাকেন। দিনে দিনে আপনার বেশ্য বাড়িতে থাকুক এবং ক্রমে অচল যোগাসন ছাড়িয়া আপনি নৃত্যে যাত্তিয়া উঠুন— কটোর কটিলতা হইতে রসমন্ডাকিনী উজ্জ্বলিত হইয়া মাটি ভাগাইয়া দিক। ইতি ২০ আশ্বিন ১৩২২

আপনার
ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

ঐজিনবন্ধার সজ্ঞাধামেতং—

আপনি যে আনন্দ এবং তপস্তা এই দুইকে দার ধরিয়াছেন ভালই করিয়াছেন— কারণ এই দুইয়ের যোগেই সৃষ্টি। বস্তুত এই দুইয়ের মধ্যে আগলে বিরোধ নাই। তপস্তায় আনন্দের আয়োজন— এই দুয়ের যোগ ব্যতীত শুধু আনন্দ ঐক্য।

পৃথিবীতে অনেকস্থলে দেখা যায় শক্তির সীমা বসন্ত আনন্দ ও তপস্তার বিচ্ছেদ ঘটে। সেই ক্ষণই একদল লোক সোপান গড়িতেছে গম্যস্থানের কোনো খোঁজে রাখিতেছে না, আর একদল আকাশে পাখা মেলিয়া উড়িতেছে তাহারাই ইটা পথের কোনো দার ধারে না। এই ক্ষণ বিজ্ঞান পদার্থ টা একটা abstraction হইয়া উঠিয়াছে; তাহা প্রমাণ করে, নির্মাণ করে না। তাহা বৃত্তির ক্ষেত্রে খণ্ডিত হইয়া থাকে, প্রাণের ক্ষেত্রে বসের ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইতে পায় না। বিজ্ঞান বা দর্শন বস্তুতঃ technical থাকে ততক্ষণ তাহা রেশমের গুটির ভিতরকার কীটের মত পরিভাষার সূত্রমালাে কারাবদ্ধ, তাহার মধ্যে প্রবেশ কঠিন। এই সূত্রমালা কার্যধারায় কালে কালে লাগিতে পারে কিন্তু ইহা প্রাণের বাহিরে পড়িয়া থাকে। গুটি বসন পরিভাষার জাল কাটিয়া প্রমাণপতি হইয়া বাহিরে আসে তখন দর্শন বিজ্ঞান রসে রঙে বিভিষ্ট হইয়া সচল ও প্রাণবান সাহিত্য হইয়া উঠে। যাহারা এই সূত্রমালাবদ্ধ গুটির অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রমাণপতির অবস্থা পর্যন্ত বরাবর নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া যান তাঁহারা ই সত্যের সমগ্রভালাভ করিয়া ধন্ত হন।

অতএব আজ আপনি যদি দার্শনিক তর্কহস্তব্রজাশ্রমে মধ্যে মনকে মুক্তবদ্ধ করিয়া তপস্তা করেন এবং কাল যদি সূত্রের আনন্দমলোকে বর্ণচ্ছটাভিষ্ট পক্ষবিস্তার করিয়া বিবরণ করেন তবে আপনার তপস্তা দার্বক হইল। স তপোহতপাত— কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়— স তপস্তা সর্বমহত্তম বস্তুতঃ কিন্তু— স্বপ্ননেই শেষ যে আনন্দ তপস্তাকে প্রবর্তিত করে সেই আনন্দই স্বপ্ননের মধ্যে রূপধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। অব্যক্ত আনন্দ তপস্তার কঠোরতার মধ্যে সৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়া ব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়।

অতএব আপনি এমন মনে করিবেন না, সত্যোহনের দ্বারা তপস্বীর তপোভক্ত করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রিয়ের বিশেষ পরোধান। লইয়া আনি মর্ধ্যো আদিগাছি কিন্তু যাহারা তপস্তাকেই লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করে তাহাদের প্রতি আমার দ্ব্যমায় নাই জানিবেন। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩২২

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতিনববার সত্তাবধমেতৎ—

আপনার লেখাটি সম্পাদকের হাতে গিয়েচি। কিন্তু যেহেতু আমাকে এই প্রবন্ধটির বিষয় করেছেন সেই ক্ষেত্রে মৃত্যুপ্রায়ে এই রচনায় ভব্যবস্থা। আমি কামনা করি যে— আমি আশীর্বাদ করি এর কৈবল্য লাভ হোক। যাই হোক সে যখন বিখ্যাতপুরুষের হাতে গেছে তখন তিনি তার লস্যাটলিপি ঠিক করে দেবেন আমি কোনো কথা ক'ব না।

“দিশকার বাহন” লেখাটি পৌষের সন্মুখপায়ে দেখতে পাবেন।

৭ই পৌষের উৎসব আসন্ন— সেই নিয়ে কিছু ব্যস্ত এবং ক্লান্ত হয়ে আছি— সন্ধ্যা হয়ে গেলে একবার নরীতে বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছা আছে।

চাটগাঁ অকলে বেয়েশি শিন্ন ধা-কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপূজা বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে যে সমস্ত আস্পনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোনো শিন্নগট্ট বেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতায় রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাটি সেবেলে জিনিষ হওয়া চাই। শিকে, কাঁধা প্রভৃতি গৃহস্থালির শিন্নদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই— চাটগাঁ অকলে যত বিভিন্ন রীতির ইঁড়ে ঘর আছে তার কোটো বা অত কোনোরকমের প্রতিকৃতি। আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা কুশাধা হবেন। শুধুনে জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিন্নকর্ম কি রকম চলিত আছে ভাল করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলায় প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গৃহশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিকট জেলার প্রতিগু দৃষ্টি রাখবেন।

আপনার স্নাতক আবার যেহাশ্বিক্সাণ জানাবেন— তিনি এই সংগ্রহকার্যে যেন আপনার আহুত্বা করেন।

ইতি ১লা পৌষ ১৩২২

আপনার

ঈরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চাণ্ডিনিকবর হুস্ত্রনাথ দাসগুপ্ত (১৮৭৫-১৯৫২) মহাপুরুষে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাকবিতা চিঠি ১৩৩০ সাহিত্য-সংখ্যা যেন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যখনকাল হইতেই হুস্ত্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অর্ন্তরূপ ছিলেন, রবীন্দ্র-চরিত্র যিসেব আশোচনা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে তিনি হইয়াছেন—‘রবীন্দ্র-পিতা’ ও RADINDRANATH TAGORE: THE POET AND THE PHILOSOPHER। এই সংখ্যার প্রকাশিত প্রথম পত্রখানি পূর্বে অনুবাদে ‘হুস্ত্র’ (১৩২০) পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়খানি রবীন্দ্রনাথের পুনর্মুদ্রিত হইল। চিঠিগুলি ইংলীশে কৈরী বোঝা পৌঁছে আসে।

বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বঙ্গসংস্কৃতির সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। তার কারণ, গত কেউ ৭ বছর ধরে যে পথে যে ভঙ্গীতে এবং যে সামাজিক কাঠামোর চতুর্কোণে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে আসছিল এখন সব দিকেই তার মৌলিক বদল ঘটেছে শুক হয়েছে। হয়তো নতুন রূপের সন্ধান কোথাও কোথাও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাঙনের খারাটাই খুব প্রবল হয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে, সমাজবিজ্ঞান ভেঙে পড়ছে, গ্রামাঞ্চল বিপর্যস্ত। এ পর্যন্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ। সে সমাজ ক্ষুদ্র ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুকালের মধ্যে নধাবিত্ত সমাজ হয়তো বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে—অন্ততঃ বর্তমান চেহারায় থাকবে না—এ কথা অমূলক নয়।

সমাজ কখনও স্থাপু নয়, তার ভিতরের ভাগিয়ে এবং নানা শক্তির মধ্যে সে অবিরত চলছেই। যখন সেই বিবদমান শক্তির ভারসাম্য হয় তখন আপাততঃ মনে হয় সমাজ ঠাড়িয়ে আছে, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। বরং এইরকম ভারসাম্যের সময়ই প্রাধান্য দেখা যায়, সমাজ তার স্থিতির মহোচ্চ শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর যখন সেই বিবদমান শক্তির সংঘাত ভয়ংকর হয়ে ওঠে তখন দেখা যায় সমাজ স্থিতির বা অগ্রগতির ক্ষমতা হারায়ে, অবিধাঙ্গ প্রবল হয়ে ওঠে, মহৎ ও গভীর স্থিতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। সকল মহৎ স্থিতিই গভীর জীবনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন মানুষ জীবনে বিচাঙ্গ হারায় তখন মহৎ স্থিতি বর্জাবতঃই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

কিন্তু ভাঙনেরও দুটি চেহারা আছে। গত শতাব্দীতে যখন পশ্চিমী সভ্যতার প্রবল সংঘাতে এ দেশের প্রাচীন অরাজীর্ণ সমাজ ভেঙে পড়ছিল, নতুন ভাবের উন্নয়ন ইংরেজ বলা টানল করছিলেন, শুড়গড়ে ভট্টাচার্য্যে স্বভাবতঃই আত্মগোপন করতে বাধ্য হছিলেন, দেশের লোকেই সংস্কৃত (বা ফারসী) ভাষায় ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচলন করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তার ক্ষুদ্র গণ্যমান্ন সকলেই নিষেধের চেয়ার ইতুল কলমে প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেছিলেন, সতীদাহ উঠে গেল, দাসব্রথ্যা বন্ধ হল, দিকে দিকে সমাজসংস্কার শুরু হল, ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন চলতে লাগল, এমন-কি শেষকালে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভট্টাচার্য্যদের উদ্বাস্ত করে ছেড়ে মিলেন, আচার্য্যের নামে বেগম অনাচার চলছিল তা ভেঙে ভাগিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন উহার মানবিকতা। হিন্দুসমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে নতুন রূপ নিল। এও তো ভাঙন, কিন্তু এই প্রলয়ংকর বজ্রা শুধু কূলই ভাঙায় নি, নতুন ভূদেহ স্থান গড়তেও সাহায্য করেছে। নতুন আশা, নতুন বিচাঙ্গ, নতুন সমাজীকরণ, নতুন সমাজ গড়বার উদ্যম, নতুন নতুন বীরের আবির্ভাব, নতুন নতুন উচ্ছল চরিত্রের আত্মপ্রকাশ। এই আবহাওয়া ছিল বলেই তো মাইকেলের কম্পোনিত কাব্য সম্ভব হয়েছিল, যার নায়ক হলেন রাবের পরিবর্তে রাবণ, যার ভাষা মিত্রাক্ষরের বন্ধন ছাড়িয়ে ধ্বনিত হতে লাগল গাগংগারূপের রত আভ্যবনা ভেঙে অনিত্যাক্ষরের পংক্তিতে পংক্তিতে, নিতীক স্বাচ্ছন্দ্যে দেখা মিল ব্যাকরণের নিয়মভাঙা গুরুতপালি গুণ। এও তো একরকম ভাঙন, বা অগতের ইতিহাসে বহুবার দেখা

যাহ, থাকে প্রমথ জেঁয়ুড়ী বলেছেন, সামনে লাফ মারবার ক্ষমতা সাময়িক পিছু হটা। আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং বৃহত্তর অর্থে ফরাসী বিশ্বব ও রুশবিশ্ববেরও এই কথা।

এই একরকমের ভাঙন আছে, যা নবজন্মের ব্যাধির কাতর, যা সৃষ্টির অগ্রদূত। কিন্তু এ ছাড়াও একরকম ভাঙন আছে যা সে জিনিষ নয়, যা কেবলই ভাঙে কিন্তু নতুন কিছু গড়ে না। অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে কিছু গড়ে না। সব ভেঙে চূরমার হয়ে যায়, অথচ নতুন কোনো আশা বা নতুন কোনো বিশ্বাস উজ্জীবন-ময়ের মত কাজ করতে থাকে না, ছুঁচায়জন লোকও সর্বথ পণ করে ভবিষ্যৎ নতুন করে গড়বার ক্ষমতা রাখা যায় না, তেজ ত্রিনিত হতে থাকে, শ্রেয় অপেক্ষা প্রের বড় হয়ে ওঠে, দেশের অপেক্ষা বল, মনের অপেক্ষা গোষ্ঠী, গোষ্ঠী অপেক্ষাও স্বকীয় স্বার্থ। এই পরিবেশেই জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায় ভবিষ্যতে চরম অনাস্থা, সকল বিষয়েই চরম অবিশ্বাস; আদর্শের কোনো ভাবই জনচিত্তকে উদ্ভূত করতে পারে না, সকল বিষয়েই মনে হয় ও সব করে কি হবে।

সমাজে এখন শক্তির ভারশাখা হয় তখন হৃদ্য অবস্থার সৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই, তার চেয়ে কাব্য আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু এখন তা থাকে না তখনও শক্তি হবার কারণ ঘটে না যদি গঠনমূলক ভাঙন দেখা যায়। অর্থাৎ যে ভাঙন নতুন করে গড়বার ক্ষমতা ভাঙে। তাতে বহু বেরনা বহু বিপর্যয় আছে সত্য, কিন্তু তা ছাড়া নবজন্মও জো লভ্য হয় না। কিন্তু যদি তার বলের আশ্রয় এমন একটি ভাঙনের আশ্রয়ে পড়ে যায় যা কেবলই ভাঙছে কিন্তু গড়ছে না, অন্ততঃ আপাততঃ গড়বার কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তা হলেই চিন্তার কারণ ঘটে।

ইয়ং বেঙ্গল যুগের বাংলার সঙ্গে তুলনা করলে একালের বাংলার এই পার্থক্যটিই পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। লোকালে ভাঙার অন্তরালে নতুন সৃষ্টির উদ্যোগ আয়োজন চলছিল, অথচ এখন যে ভাঙনের ধারা চলেছে তার মধ্যে সে লক্ষণ নেই। আজকের বৈশ্বাসিকতা ও অবিশ্বাস যে বেড়ে চলেছে, নতুন কোনো হৃদ্য অথচ প্রাণচকল জিনিষ গড়ে উঠছে না, আমরা বহু সময়ই স্বকৃত বর্ণারবর্তেই পাক বেয়ে চলেছি এ কথা আজ অব্যাহার করবার উপায় নেই। সেইজন্যই এখনকার যে সংকট তা আমাদের চিন্তার কারণ হয়েছে, কারণ অগ্রগতির পথ অবিকার না করতে পারলে আমাদের বহুদিন স্বত্বকারে থাকতে হবে, বহু ক্ষয়-ক্ষতিও অনিবার্য।

সেই পথ খুঁজতে গেলে প্রথমেই ভালো করে বুঝতে হবে আমাদের বর্তমান অবস্থাটা কি। আমাদের সংস্কৃতির চেহারা কি, আমাদের সংস্কৃতির ধারক-বাহক কারা।

ইতিহাসের একেবারে একাল হতে শুরু করা যাক। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি হতে জানা যায় পশ্চিমবাংলার সাক্ষর হল মোট জনসংখ্যার ২৪.৪৪%, তার মধ্যে পুরুষেরা ৩৪.৬৮%, মেয়েরা মাত্র ১২.৭৩%। শহর ও গ্রামে সাক্ষরতার তফাত অনেক। কলকাতায় ৪০.১২% সাক্ষর, সমস্ত শহরগুলিতে মোট জনসংখ্যার ৪৫.১৮% সাক্ষর। অথচ গ্রামের মোট জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৭.৭৩% সাক্ষর। যদি সাক্ষরতা সংস্কৃতির অন্ততম প্রধান উপকরণ হয় তা হলে মানতেই হবে গ্রামীণ মন সংস্কৃতির বিকাশের

বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

স্বযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।^১ অথচ এ হতে একটা বস্তু সম্ভার উদ্ভব হয়। আমাদের গ্রামপ্রধান সমাজ, যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রামসমাজকে জড়িয়েই। এমন-কি এমন পর্যন্ত ঝাঁঝালো শহুরে সংস্কৃতির ছাপ আমাদের সাহিত্যে যুব বেশি পড়ে নি। গল্প উপক্ৰান্ত বা কবিতাও গ্রামের ছাপই সব-চেয়ে বেশি মাত্রায় বহন করে আসছে। ইতিহাসের এই ধারাকে অস্বীকার করা যায় না। অথচ যদি সেবা যার লোকসংস্কৃতির ধ্বংসের সঙ্গে সাক্ষরতা তো বটেই, বিভাগধর্মের শিকাই সংস্কৃতির অনিবার্ণ উপকরণ হয়ে পড়ল তা হলে বলতেই হবে সে অবস্থায় আমাদের একটি সাংস্কৃতিক সংকট অবতরণী। আমাদের জীবনের ধারা ও অভিজ্ঞতা চলেছে একদিকে, কিন্তু সেনিকে কোনো সাংস্কৃতিক উপকরণ নেই— অথচ যেখানে তা আছে সেখানকার অভিজ্ঞতা এবং স্পন্দন আমাদের জীবনের সামান্য অংশই ছুঁতে পারে— এ অবস্থায় সংকট অনিবার্ণ, সাহিত্যও জীবনমূল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আকাশহুহুনে হয়ে পড়তে বাধ্য। তাতে চতুর সাহিত্য্য হলেও হতে পারে, মহৎ সাহিত্য্য কখনও নয়। তা ছাড়া এই ছিন্নমূল মানস কখনও নব হতে নবতর মহৎ হতে মহত্তর বিশাল হতে বিশালতর সৃষ্টির পথে বাড়াও করতে পারে না, সে কেবল বর্তমানের পঙ্কিল আবর্তেই ঘুরপাক বেতে থাকে।

বিভাগধর্মের শিকা সংস্কৃতির বিকাশের নূনতম উপকরণ হয়ে পড়ছে এই স্মৃতি যেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও আসে তার ক্ষত্র সাক্ষরতাই ঘুংটে কি না। বেশ-ব গল্প উপক্ৰান্ত রচিত হবে তার উপভোগের ক্ষত্র সাক্ষরতাই ঘুংটে? তাতেই কি লেখক ও পাঠকসমাজের চিত্ত দূরিত হবে, পারস্পরিক অভিভাবে নতুন নতুন মূল্যবোধ সেবে, নতুন দিগন্ত সেবা সেবে চোখের সামনে, নতুন নতুন ধাতাপথ রচিত হতে থাকবে? তা যে হতে পারে না এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার ক্ষত্র বস্তুতঃ সাক্ষরতার চেয়েও আরও একটু বেশি উপকরণ প্রয়োজন। অথচ সংখ্যার হিসেবে বেশি, সাক্ষরতার বেলায় যেন শহরগুলির প্রাধিক্র, বেশি উপকরণের বেলাতে সে প্রাধিক্র আরও অনেক বেশি। ১৯৫১ সালের সেন্সাসের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গালায় ম্যাট্রিক-পাশ লোকের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৫২ হাজার; তার মধ্যে কলকাতাতেই ১ লক্ষ ৩২ হাজারের বাস অর্থাৎ ৩৭.৬%। এম-এ বা এম-এসসি পাসের মোট সংখ্যা ১১,০২৬; তার মধ্যে কলকাতাতেই ৭,৮২৭ অর্থাৎ ৭১.৮%। বেশি হিসেব সেবার প্রয়োজন নেই, এ হতেই অবস্থাটা বোঝা যায়। সত্তরাত্ত্ব একটি জায়গায় জ্ঞানের রীপটি জালিয়ে বাকি পারা সেন্টটাকে স্বত্বকারে রেখে দিলুম, তাতে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে না। তার উপর যদি সেবা যার যেখানে জ্ঞানের রীপটি জাল সেখানে প্রাণের কেন্দ্র নেই তা হলে বিকাশ তো ঘুরের কবা, সংকটভরণের উপায় খুঁজে পাওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। সেখাপড়া না জানা থাকলে তা হলে কি সংস্কৃতি হয় না? বিদ্যান্ন মাত্রই সংস্কৃতিবান্ পুঙ্খ এমনতর অদ্ভুত কথা কখনই বলছি না, কিন্তু সংস্কৃতিবান্ হতে হলে কি সেখাপড়া জানতেই হবে? আমাদের দেশ তো যুগযুগান্তর বিরক্ষরতার অভিশাপ ভোগ করে আসছে। তা হলে আমাদের দেশে কোনো সংস্কৃতিই ছিল না? চীনও বিরক্ষর দেশ, সেখানেও কোনো সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে নি বলতে হবে?

১ এ বিষয়ে অনেক তর্ক আছে, তার কিছু আলোচনা পরে করছি।

এ কথা যে সত্য নহে তা বলবার কোনো দরকার নেই। মুসলমানের হাতে এই-সব নিরক্ষর দেশেই সংস্কৃতির চরম বিকাশ দেখা গিয়েছে, বিশ্বসভাভাষ্য এদের দান মহতম। সাহিত্যে দ্বিগুণে বিবিধ-শিল্পকলায় গানে ভাষণে স্থাপত্যে—কোন দিকে এই-সব দেশের দান এখনও বিশ্ববাসীর চরম বিশ্বয় জাগাচ্ছে না? মুক্তেশ্বরের মন্দির যে স্থপতি গড়েছিলেন তিনি নিশ্চয়ই পাশ-করা ইন্ডিনিয়র ছিলেন না, কোনারকের মূর্তি গড়েছিলেন যে ভাস্কর তাঁর নিশ্চয়ই আউলখানার ডট্টরেট উপাধি ছিল না।

সুতরাং নিরক্ষরতা সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা এ কথা কখনও সত্য নয়। অথচ এক-এক সময়ে এই অসত্য কথাও সত্য হয়ে ওঠে। নিরক্ষরতা তখনই সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা হয় না যখন লোকসংস্কৃতির ধারা খুব সজীব এবং প্রাণবন্ত থাকে। মুখে মুখে, কবিতানে, রামায়ণের পালায়, পুখুয়াছক্ৰমিক চর্চায়, নানা আলাপ-আলোচনার ফলে এই সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিস্তার ঘটতে থাকে, নতুন নতুন রূপের সৃষ্টি হয়।

তা ছাড়া শুধু লোকমুখে চর্চায় কথাই নয়। সে সময়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও মনে রাখা দরকার। সমাজে প্রাণের স্পন্দন চাই। তা না হলে বাহ্যের মন নতুন দিগন্তের অন্বেষণ করে না। প্রাণচকল সমাজ না হলে তার কোনো বিকাশই ঘটা সম্ভব নয়, সাংস্কৃতিক বিকাশও নয়।

যে-সব যুগে নিরক্ষরতার বাধা অতিক্রম করে এই-সবসমুহ সমাজ বিশ্বকর সৃষ্টি করে চলেছিল তখন তার পিছনে এই-সব নানা কারণ ছিল। তার প্রথম কথা হল, লোকসমাজ তখন এগনকার মত প্রাণহীন এবং একমুখী ছিল না। সমাজে বৈচিত্র্য ছিল এবং সেইসঙ্গে প্রাণের সজীবতা ছিল প্রচুর। বস্তুতঃ এখনকার বাংলার সঙ্গে প্রাচীন বাংলার তুলনা করলে এই পার্থক্যটাই সবচেয়ে চোখে পড়ে। এখনকার বাংলার সমাজে বৈচিত্র্য খুব কম। গ্রামাঞ্চলে চাষা, না হয় তো অমিনির্ভর মধ্যবিত্ত। সকলের জীবিকাই জমি, সকলের মনই সেই ছাঁচে গড়া। শহরে শহরে মধ্যবিত্ত, খুব বেশি পরিমাণে চাকরি-নির্ভর। নানা স্বাধিকার, নানা ধরনের স্বাধীনতা, নানা ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, নানা নতুন স্পন্দন—এ-সবের ক্ষেত্র নিভাতাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ পূর্বে তা ছিল না। বাঙালীরা, কাশিধারের কথাতেও, নৌসাপথনোভ্যত ছিল, বেশবিশেষে চলত ভাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। শ্রেণীরা নৌকো সাম্রাজ্যে পাড়ি দিতেন সমুদ্র পেরিয়ে। কিন্তু শুধু নৌকো সাম্রাজ্যেই তো বাণিজ্য হয় না, বাণিজ্যের উপকরণও তৈরি চাই। সে উপকরণের অভাব বাংলায়ই ছিল না। কার্পাসবস্ত্র, রেশম, নানাবিধ শিল্পদ্রব্য এবং অস্ত্রাস্ত্র বাণিজ্যসম্ভার উৎপাদনে দেশের লোক ব্যস্ত থাকত। তা ছাড়া ঘাসের সঙ্গে বাণিজ্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না তারাও যে এখনকার মত অমিনির্ভর ছিল তা নয়। ধারাই বাংলার প্রাচীন সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন তখন বুদ্ধবিগ্রহে কত সৈন্তসামন্ত দরকার হত এবং সে-সব সৈন্তসামন্ত আসত বাংলা হতেই। যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারি পুলিশ সৈন্তদল ও শাসনতন্ত্র দেশের উপর চেপে বসল তখন অমিনিয়ারদের পাইক গোলা সব বরখাস্ত করে দেওয়া হল। সে সময় শুধু বর্ধমানের মহারাজার অনিবার্য হতেই উনিশ হাজার পাইক বরখাস্ত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তা হয় নি ততদিন এই-সব ছুখামীরা কেবল বাঁকনা আদায় করতেন না। বুদ্ধবিগ্রহে আক্রমণ আত্মরক্ষা বড় কম ছিল না। বারো ছুঁইঘাসের আশলের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তার ডের পরেও দেখা যায়—এমন-কি যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে সে সময়ও—এ-সবের জের মেটে নি। লঙ্ সাহেবের Social Condition of Bengal-এ দেখা

বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

যায় বর্মানের রাজা বা বিষ্ণুপুরের রাজা কোম্পানির উপর হুকুম চালাতে বিধাৰোণ করতেন না। বর্মান-মহারাজের সঙ্গে ইংরেজের বাসান বন্ধু নিয়ে রীতিমত যুদ্ধও হয়েছে। ১৭৬০ সালে নবাব কাশিমখানি খাঁ ইংরেজদের জানাজেঁদে বর্মানের রাজা যুদ্ধের ক্ষত তৈরি হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ১৭৬১ সালে ক্যাপ্টেন হোয়াইট বর্মান-রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। ১৭৬১ সালের ২২শে ডিসেম্বর এই যুদ্ধ ঘটে। কোম্পানির রিপোর্টেই দেখা যায়, বর্মানের রাজার পক্ষে অস্ত্রতঃ বশ হাজার সৈন্য ছিল। কিন্তু এ শুধু একা বর্মানের মহারাজার কথা নয়। প্রায়ই এরকম ঘটনা ঘটত। বীরভূমের রাজা, নগরের যুদ্ধ, ইত্যাদি ইতিহাস সন্নিহারে বর্ণনা করবার দরকার নেই। তারও আগে শোভা সিংহের বর্মান-আক্রমণ (১৬৮৮ ?), বর্মানের মহারাজার বিষ্ণুপুর-আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা প্রায়ই ঘটত। আসলে এগুলো ছিল সেকালের সনাতনের সজীব সত্য। এরই প্রভাব সমাজ-জীবনে তরঙ্গিত হতে থাকত। সেইজন্য আশঙ্কের মত সেকালের সমাজ একমুখী ছিল না, তার মধ্যে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা বহু বিচিত্র গংঘাত জীবনে নতুন নতুন আশা নিয়ে আসত। এমন-কি আমাদের জাতিগুলির ইতিহাস আলোচনা করলেও এই সত্যই প্রমাণিত হয়। হিন্দু বংশেছেন, আমাদের অনেক জাতিই বৃত্তিমূলক, অর্থাৎ functional caste। এককালে সব জাতিরই উদ্ভব ছিল হয়তো বৃত্তি থেকে, কিন্তু সেই সত্য বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রায় একাল পর্যন্ত অনেকখানি চলে এসেছে, এইটাই আশ্চর্যের কথা। ঢালীরা ঢাল ধরত, তম্বারা তম্ব ; পাইকেরা করত লাড়াই। এমন-কি প্রবলপ্রভাপ ইংরেজ সাম্রাজ্যের কাছেও বাংলায় এই-সব বীর জাতি সহসা মাথা নত করে নি। এদের নির্যীণ করবার চেষ্টায় ইংরেজ প্রথমে এদের বৃত্তি থেকে চ্যুত করে, তার পর এদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তার ফলে যে পাইক-বিরোধ হয় তা ধলহুম হতে বাকুড়া মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষুব্ধকে প্রকল্পিত করেছিল। তার মেরে সহজে যেটে নি।

বস্তুতঃ বাংলার সমাজজীবনের এই ইতিহাসের গাফা তার সাহিত্যেও বহন করছে। মঙ্গলকাণ্ডগুলির কথাই ধরা যেতে পারে। এই কাব্যগুলি কি ইঙ্গিত বহন করছে? একটি জিনিস তো খুব স্পষ্ট। এই-সব কাব্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছায়ায় রচিত হয় নি, ব্রাহ্মণ্যসমাজের ছবিও এতে প্রতিফলিত হয় নি। বরং উলটো। ব্রাহ্মণ্যসেবতারী জীবের নিঃস্বের গণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন, লোকসেবতা ছিলেন না। জনসাধারণের, অর্থাৎ তথাকথিত নিচু জাতি, ব্যাঘের শবরের, সাধারণ মানুষের সেবতা ছিলেন চণ্ডী মনসা ইত্যাদি দেববাহিত সেবতারী। তার উপর বয়ে গেল বৌদ্ধধর্মের প্রাণ। বৈদিক সেবতারের ভিত্তি তো আলগা হয়ে গেলই, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার মত সমাজগতী পাচটি লোকও মনেতে হল বিদেশ থেকে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও শংকরাচার্যের নেতৃত্বে সারা ভারতে যে নতুন ধর্মের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই বহুজাতিবিশিষ্ট বহুধর্মগুরুক বাংলাদেশে সে রূপ দেখা গেল না। তার বরলে বার বার এখানে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আচারই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে অঙ্গীকৃত হয়েছে, দেববাহিত সেবতারী ক্রমে ক্রমে তেজস্বি কোটির মধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। লৌকিক শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাকে শুধু বীকার করতে বাধ্য হয় নি, তাকে যেমন নিঃস্বর্ণদা দিতেও বাধ্য হয়েছে। বাংলার আলাদা স্বাতি আলাদা সম্প্রতিষ্ঠার নিঃস্বের পিছনে এই স্বাধীন সামাজিক ও কৌম ব্যবস্থার প্রচণ্ড ভাগি ছিল কি না কে জানে? কিন্তু সে যাই হোক, সাহিত্যের গাফা হতে এ কথা খুব স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, লৌকিক সেবতারেরই আসন খুব দৃঢ়, বৈদিক সেবতারের নয়। কাব্যের

বিষয়বস্তু ইন্দ্র অগ্নি বায়ু নদ, বরঃ ধর্ম মনসা চণী। শেষকালে যখন আশ্বমেধের সমাধিবৈচিত্র্য ভেঙে বীর জাতিগুলি ক্রমে কৃষিকারী হয়ে পড়তে লাগল (শিবায়ন কাব্যে শিবের ত্রিণূল ভেঙে লাগল গড়িয়ে চাষ করতে বাওনার ইন্দ্রিত খুব গভীর) তখন প্রথমে এসেন শিব প্রকৃতি বেবতা, ধারা শবরের বেবতা হয়েও বহুপূর্বেই ব্রাহ্মণ্যবেবতাদের তানিকার স্থান পেয়েছেন। আরও শেষের দিকে (যথা ভারতচন্দ্রে) মঙ্গল-কাব্যও দেখা দিলেন দুর্গা প্রকৃতি অনেক ব্রাহ্মণ্যবেবতা। আর্ক্য নয়, কেননা এতদিনে বাংলার লোকশক্তি হ্রিবাণ হয়ে এসেছে, অগ্রদিকে নাটোর ও কৃষ্ণনগরের কৃষামীদের বিস্তৃত ব্রহ্মর দানে ব্রাহ্মণ্যদের পুনঃজীবন ঘটছে। স্বতরাং একদিকে পাইক-বিলোহের অবলান এবং অগ্রদিকে মঙ্গলকাব্য থেকে বাধ চড়িক। মনসা ধর্মের পণায়ন—এ দুটি আকস্মিক এবং অসংযুক্ত ঘটনা নয় বলসেই বিবেচনা করতে হবে। ও হল কাব্যে সমাধেরই প্রতিফলন। কিন্তু শেষ বে ভাবেই হোক, দীর্ঘ দিন ধরে (বলতে গেলে উদ্যোদন শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত) বাংলার এই লোকশক্তি এচও সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, অত্যন্ত সজীবতার সঙ্গে বেঁচেছে। এমন-কি শুধু সাহিত্য নয়, তার ধর্মকেও সে সেইভাবে গড়েছে। এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার তো ছিলই। কিন্তু পরের যুগেও, তানিকতার প্রথম আমলে, সে জাতিভেদ মানে নি, চক্রে কোনো জাতিভেদ ছিল না, শক্তি সংগ্রহ হতে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্যের জাতি হতেই। তার পর ক্রমে ক্রমে এই উত্তরবর্ধিহিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে হতেই এসে পড়ল বৈষ্ণবপ্রাবন। তার ধর্মহত বাই হোক, সে যে আর একবার অনসাধারণের ক্ষমতার উন্মুক্ত করে দিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সারা সনাম সেই প্রাবনে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল বলসেই তো, সাহিত্যের চরম বিকাশ দেখা দিল। সজীব স্পন্দন না থাকলে অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য কখনও গড়ে ওঠা সম্ভব হত না।

তৃতীয়তঃ, এই সজীবতা যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ছুটে উঠেছিল তার অন্ততম প্রধান কারণ তখনকার অর্থনৈতিক বিস্তার। তখনও বাংলার সমাধে এক বিভিন্ন রকমের শ্রেণীসংঘাত গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ শ্রেণী ছিল বিভিন্ন, কিন্তু সংঘাত ছিল কম। সেই কারণে সংহতির অভাব হয় নি। বিশেষতঃ সামাজিক ও নাসিক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন শ্রেণীতে একালের বড় অভাবানি পৃথক হয়ে যায় নি। আদ্যকের শহরে নিরম্যধাতি, ধারা কোনোদিন শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বাস করেন নি, তাঁরা যেমন গ্রামজীবনের আশা-আনন্দ দিয়ে অহুভব না করুন অনেক সময় বুদ্ধিতেও করতে পারেন না, তখন তা ছিল না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই। আদ্য ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হয়েছেন তাঁদের মনের যে উদার দিগন্তে বেশবিশেষের সাহিত্য ও চিন্তাধারা স্পন্দিত হচ্ছে সে দিগন্তের কোনো হুমিই অশিক্ষিত আয়ের চাবী পাথর না। স্বতরাং অহুভুতির স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে—যা পূর্বে ছিল না। স্বতরাং স্বভাবতঃই পূর্বে যে সংহতি ও নিটোল সামাজিক অভিজ্ঞতা হতে সংস্কৃতি ও সাহিত্য রচিত হতে থাকত এখন আর তা একেবারেই নেই।

এই কথা বেকসই আর-একটি কথা উঠে পড়ে। সেটি হল এই যে, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে লোকালে একটা লোকশিকার ধারাও চলে আসছিল, যা ইংরেজ সাম্রাজ্য এবং মধ্যবিত্ত-অধ্যায়ের পর সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেল। পণ্ডিতেরা অবশ্য সংস্কৃত ও শাস্ত্রানি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু তার পাশাপাশিই টোল ও মন্ডবে, পাঠশালায় চণ্ডীমণ্ডপে, বাহারণ-গান ও কথকতার সর্বজনগ্রাহ্য একটি লোকশিকার ধারা প্রবাহমান ছিল। অ্যাজম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়, গত শতাব্দীর প্রথম পাদেও বাংলাদেশে একটা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রচুর। বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ। তার তুলনায় এখন গ্রাম্য গ্রাইয়ারি স্থল কি খুব বেড়েছে?

বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

কাজেই কিছু শাস্ত্রগণবিলাসীদের কথা ছেড়ে দিলে বাকি সকলের পক্ষে মোটামুটি একটি শিক্ষাসাম্রাজ্য ছিল যাতে সংস্কৃতির স্তর অনেক সমর বিভিন্ন শ্রেণীর ভেদে থাকে অভিক্রম করেও পরিব্যাপ্ত হতে পারত। রাজারণ-গান থেকে উপর স্তর এবং নীচের স্তর উভয়ই রস উপভোগ করত। আমাদের দ্যত বিশেষীকরণ হয়েছে ততই অস্বস্তি ও সংস্কৃতির মোটামুটি সার্বজনীনতা কেটে গিয়ে তা খণ্ডিত ও ভগ্নাংশ হয়ে গাড়িয়েছে। পাটালি, তারপর আগড়াই, ক্রমেই বিশেষ বিশেষ সমাজের উপভোগের বস হয়ে উঠছিল, সকলের নয়। কিন্তু যেদিন ইংরেজ সভ্যতা এল, পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের ধরন পুঁশে গেল, সেদিন যারা তার আশ্রয়লাভের দ্বর্ণত সোভাগ্যের অধিকারী হল তাদের সংস্কৃতির বিশ্বকর হল বটে, কিন্তু যারা সে সোভাগ্য হতে বঞ্চিত হল তাদের আর কিছুই রইল না। বস্তত: যখন ইংরেজী হল খুলবার দ্বিড়িক পড়ে গেল তখন তা সকলের জ্ঞত হল না, হল কেবল উরীয়মান মধ্যবিত্তদের জ্ঞতই। বরং জনসাধারণের জ্ঞত নির্দিষ্ট হল 'ফিল্টারিং মেশিন': প্রথমে কেবল উপরন্তরচারীদেরই শিক্ষিত করে তোলা দ্যক, তার পর সেই দ্যারা একটু একটু করে চুইয়ে চুইয়ে নীচের দিকে বা গড়াবে তাই দেখে।

হুতরাং দেখা দ্যাজে, পূর্বে আমাদের যে দ্যারার বিকাশ হুছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভিযাতের পর তার মৌলিক বদল ঘটল। সম্ভবত: এরকম মৌলিক বদল আমাদের ইতিহাসে এর পূর্বে কখনও হয় নি। তার কারণ, পূর্বে পূর্বে যে-সব বদল ঘটেছে তাতে মূল কাঠামোর এতখানি বদল কখনও হয় নি, শ্রেণীর মধ্যে তফাত এত অলক্ষ্য ও এত বিরটিও কখনও হয় নি। যা এখন হল।

এতে অবশ্য বিশ্বাসের কিছু নেই। সমাজ-বিবর্ভনের ইতিহাসে দেখা যায়, এইরকম বদল মোটামুটি সব দেশেই ঘটে থাকে। অনেক পণ্ডিত বলেছেন, মধ্যযুগীয় অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন যুগের অন্ধার স্তর হলেই দেখা যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অভিজাতদের আশ্রয় ত্যাগ করে মানব-অন্ধারদের নীতি গ্রহণ করে। বস্তত: এই মানব-অন্ধারদের সহিযাই তার নবজীবন আনে। আর সমাজতত্ত্বের নিয়মে এই অন্ধারদের সহিযা গান করবার তার প্রথমে পড়ে মধ্যবিত্তদের উপরেই। এই কথাটাই কার্ল ম্যাক্সহাইম বলেছেন—

If one calls to mind the essential methods of selecting élites which up to the present have appeared on the historical scene, three principles can be distinguished: Selection on the basis of blood, property and achievement. Aristocratic society, specially after it had entrenched itself, chose its élite primarily on the blood principle. Bourgeois society gradually introduced, as a supplement, the principle of wealth, a principle which also obtained for the intellectual élite, inasmuch as education was more or less available only to the offspring of the well-to-do. It is, of course, true that the principle of achievement was combined with the two other principles in earlier periods, but it is the important contribution of modern democracy (as long as it is vigorous), that the achievement principle increasingly tends to become the criterion of social success.

তা হলে প্রথম কথা দেখা গেল, এ সময় কবে অভিজাত্যের বদলে দেখা দেয় মানব-অন্ধার, এবং তার প্রয়ো্য হন মধ্যবিত্ত সম্ভাষ। কিন্তু সেই সম্বে তার চেয়েও বড় কথা দেখা গেল, এ সময় হতে সংস্কৃতি ক্রমেই তার সার্বজনীন মূর্তি পরিহার করে গোষ্ঠী-আশ্রয়ী হয়ে ওঠে, élitesের হাতে পড়ে। যত নতুন

নতুন গোষ্ঠী সজীব হয়ে উঠবে ততই এই সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করবে, অগ্রগতির প্রেরণা পাবে। আর যদি একটি কি দুটি গোষ্ঠীমাত্র জীবিত থাকে, বাকি সব গোষ্ঠী মরে যায়, তা হলে সংস্কৃতির বিকাশ এবং অগ্রগতি আর হবে না, ক্রমেই সে নিম্নের ঘূর্ণাবর্তের পক্ষিপতায় তলিয়ে যেতে থাকবে।

বাংলায় ইংরেজী সাম্রাজ্য ও পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাত এসে পড়বার পর এই ধরনের বিকাশ হয় নি তা নয়। কেবল তফাতের মধ্যে অস্তিত্ব বেশে এই নবযুগের গ্রাণস্পন্দন যেমন নানা গোষ্ঠী নানা স্তরকে উদ্ভূত করেছিল এখানে তা কেবল একটিমাত্র গোষ্ঠীকেই উদ্ভূত ও বিকশিত করতে পেরেছিল, অস্তগলিত নয়। অস্তগলিত ঘটেছে ব্রহ্মা। তাদের প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষার ধারা গেল অবলুপ্ত হয়ে, অথচ নতুন যুগের নতুন ধারার বিকাশও তাদের হল না। এইখানেই বঙ্গসংস্কৃতির বৌলিক দুর্বলতা নিহিত।

গত শতকের ইতিহাস আপোচনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজী শাসনের প্রভাবে গ্রামের হল অপভ্রুত, গ্রামীণ সমাজেরও তাই। পূর্বে গ্রামীণবনের যে নানা বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছি সেও অবলুপ্ত হয়ে দেখা দিল কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর সমাজ। অল্প দিকে দেখা দিতে লাগল নতুন শহর, যে শহর পূর্বের মত 'বিবর্ধিত গ্রাম' নয়, বরং চেহারায চালে চলনে খাঁটি শহর। শহরেমানা তার মধ্যে বিকশিত। উদ্ভব হল কলকাতা কাশ্চায়ে—'বাবু'-কাশ্চায়েও। অর্থনৈতিক দিকে এর প্রেরণা জোগাচ্ছিল নবগঠিত শ্রেণীবিভাগ। ধার্য কর্মওমাশিন ব্যবহার নতুন জমিদার-বড়লোক হয়ে উঠেছিলেন, ধারা মুংহুদি বেনিয়ান হৌগ ব্যবসা করে ঘণ্টে লক্ষের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদেরই আশ্রয়ে নব সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিমান আরম্ভ হয়। কিন্তু এ ধারা নিম্নের গতিবেগেই শীঘ্র খাত ছাপিয়ে উণ্টে পড়ল। তখন আর এই ধারা পুষ্টিপোষকদের কৃষ্ণগত রইল না, মজিত হতে লাগল নবোদিত নগণিত চিত্তে। সেই চিত্তে লাগল মানব-অত্যাচারের অকথাভা। পুরোনো সব সংস্কার ভেঙে ফেলল ইং বেকল হল, কেউ কেউ উৎসাহের আভিনবো ধুষ্ঠান হলেন, দুটে চললেন ইউরোপে, ঘুর করে দিলেন সংস্কৃত শিক্ষা, আবাহন করে আনলেন ইংরেজী শিক্ষাকে। প্রথম যুগের আভিনবো কেটে যাবার পরও এই নব মানবতার আত্মনা উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল বিভাগসংহতের মত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও চিত্তে। তিনি ইং বেকল গেলের মত শাস্ত্রকে অস্বীকার করলেন না—কিন্তু তার নব্যব্যাখ্যা করলেন, যাতে শাস্ত্রের মধ্য দিয়েই মানবমহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বহিঃচর্য পর্বত লিখলেন—*

Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new methods of interpretation, and adopt the old eternal and undying truths to the necessities of that new life.

অথচ এক দিকে যেমন এই বিশ্বব্যবস্থার বিকাশ ঘটছে অল্প দিকে তখন সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটছে। এই অপব্যাত ঘটনা যদি আমাদের দেশে একটি যুগের স্বাভাবিক অস্ত হয়ে আর-একটি যুগের স্বাভাবিক উদ্ভব হত। কিন্তু এ দেশে তা ঘটবার সুযোগ ঘটে নি। ইংরেজী সাম্রাজ্যিক অভিযানে আমাদের নবযুগের সনাক্তবিবর্তন গোড়া হতেই বিকৃত ও বিকলাঙ্গ। এই অপস্বাভাবিক বিকাশের কথা বহু সমাজ-তাত্ত্বিকই আলোচনা করেছেন, তা নিয়ে বিতর্ক আলোচনা নিরন্তর। সংক্ষেপে বলা যায়, এর ফলে ঘটল সমাজজীবনে (একটি স্তর ব্যতীত) বৈচিত্র্যের অভাব। মহাবিক্রমশ্রী ছাড়া আর সন্দেশই চায়

বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

ও জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। বাংলার সমাজজীবনে যে বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছি তা অবলুপ্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয়তঃ, সেই গ্রামজীবনেও প্রকার ও বিকাশের পরিবর্তে দেখা দিল নিরাশ্রয় সংকোচন ও ক্ষয়িক্রান্ত। কলম উঠবে প্রচুর, গ্রামে গ্রামে শ্রামশমারোহ, জীবনযাত্রা হুশ্রমল ও হুমহামহ—এই পরিবেশেই তো গ্রামে গ্রামে ক্ষু-উৎসব লেগে থাকতে পারে, দ্রবণের অনাবিল আনন্দ ও সহস্র দাক্ষিণ্য স্বচ্ছন্দ ধারার অনর্গল প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি দেখা যায়, করাল দৃষ্টিকে মনে স্থাপন, (ছিয়াররের মস্তকের চিত্র, আনন্দনঠে, মনে করুন), প্রজারা সকল জমি হতে বিভাড়িত ও তাদের সকল বৃত্তির জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে (Resumption Proceedings-এ তাই করা হয়েছিল), তাদের কোনো স্ববই নেই, উপরন্তু জমিদার ইচ্ছা করলেই তাদের আটক বা কয়েদ করতে পারে (হুকুমত পহম রেগুলেশন), মুখে অন্ন নেই, তার উপর আছে কোম্পানির দান ও কুটুম্বালের অভ্যাচার (নীলের কথা কে না জানে?—তা ছাড়াও আরও দান ছিল)—তা হলে সেই পরিবেশে মন বিকশিত হতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তৃতীয়তঃ এই-সব কারণেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দুর্লভ্য হয়ে গেল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আগে রামায়ণ-গান সকলেই উপভোগ করতেন। কিন্তু এখন নবশিক্ষিতদের মনে শেক্সপীয়ার মিন্টুন বার্ক কলোনিজ হতে লাগল। অথচ সাধারণ লোকের পক্ষে পূর্বকার সাংস্কৃতিক অহুতানগুলিও বজায় রাখা আর সম্ভব হল না, নতুন কোনো সাংস্কৃতি গড়ে তোলাও সম্ভব হল না। তার উপর চতুর্থতঃ, শহর ও গ্রামগুলিতে তফাত হয়ে গেল অনেক। সত্যিকারের শহর, শহরোন্মায় শহর, গড়ে উঠল এই আনন্দে। এই কারণেই নবজাগৃতির কেন্দ্র হল স্বভাবতঃই এই শহরগুলি। সাংস্কৃতির কেন্দ্র নবদ্বীপ ডাটপাড়া হতে সরে এসে স্থাপিত হল শোভাবাজারে। এই কারণেই তুফ হল 'বাবু'-কালচার। বাগানবাড়ি ও হাল্-আপড়াইয়ের পালা, পখীর দলের গান। বা গ্রামে ছিল না, কখনও বরদাস্তও হত না। অল্প দিকে নতুন বা ছিল তা অবলুপ্ত হয়ে গেল। সাংস্কৃতির আধার হল শহর, গ্রাম কুলাঙ্গারের।

গত সেড় শ বছর ধরে এই ধারাই বিকশিত হয়ে আসছে। যতদিন নবজাগৃত বিশ্ব-গোষ্ঠীর প্রসার ছিল ততদিন আমরা এই মৌলিক দুর্বলতার কথাটা ধরতে পারি নি। তখন বসন্ত গ্রাম স্বত্বকারে নিষ্প্রাণিত, একটি গোম্মি ছাড়া অল্প কোথাও স্রষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু সে-সব কিছুই নজরে পড়ে নি, কেননা একটি গোম্মি যে মহা-ঐশ্বর্যের অকৃত স্রষ্ট করে চলেছিলেন তারই বিশ্বাকর উজ্জলতায় আমাদের চোখ ঝলসে ছিল। একালের ভারতবর্ষে মহিমার এমন উজ্জ্বল শিখর আর কোথাও রচিত হয় নি। তারই বিশ্বযে মুগ্ধ হয়ে আমরা ভাবতে পারি নি, যেদিন এই ধারা শেষ হয়ে আলবে সেদিনের অবস্থাটা কি হবে। নাইকেলের পর বিভাগসার বহিন্মচন্দ্র, বহিন্মচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ—এর কোথাও শেষ আছে কি?

আমাদের চোখে আমাদের মৌলিক দুর্বলতা ধরা না পড়লেও তা আমাদের মহত্তম মনোবীসের চোখ এড়ায় নি। বহিন্মচন্দ্র বলেছিলেন—

বিভাগ, জল বা হুত নহে যে, উপরে চলিলে নীচে পৌঁছবে। তবে কোন দাতি? একটা কৃতবিদ্যা হইলে তাহানিধে। সন্দেহঃ

অস্বাভাবিক হ্রাস ঘটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ জো থাকে যে, বিষয়ের ভাষা সুস্থ বৃত্তিতে পারে না, তবে সংস্কার কণ কণিবে কি একাধারে ?

একালে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে সমাজের বহু বিচিত্র স্তরই বিধৃত। বস্তুতঃ এত ব্যাপ্তি আর কোথাও নেই। শুধু মধ্যবিত্ত সমাজই তাঁর রচনার উপলব্ধী নয়। এক দিকে যেমন সর্বাগ্রাধন যুগে তিনি বহুমাত্রের আদর্শে রাজসাম্রাজ্যের কাহিনীকে তাঁর বিষয়বস্তু করেছেন, তেমনি কালে কালে তাঁর রচনায় বিনোদিনী-মহোজ্জ্বল মধ্যবিত্ত জীবন, কেটি-সিসি-র শৌখিন অভিজাতপনা ইত্যাদির সঙ্গে পল্লীজীবনের বিচিত্র আনন্দবেদনাও গল্পগুচ্ছে বিধৃত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এত বহুমুখ বিচরণ এবং তা নিয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি সবেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখে গিয়েছেন—

আমার কবিতা, মানি আছি,
ফেনেও বিচিত্র গুণ, হয় নাই সে সর্বস্বামী

এটি তাঁর বিনয় নয়, বস্তুতঃ এটি আমাদের মৌলিক সংস্কৃতিসংকটের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ, আমাদের সমাজচেতনার একদেশশীলতার উপর তাঁর কথাবাত। সে কথাবাতের যে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তা এখনকার অবস্থা আলোচনা করলেই বোঝা যায়।

বস্তুতঃ আমরা এখন কি অবস্থায় এসে পৌঁছেছি ? এক দিকে দেখি, কীর্তমান মধ্যবিত্ততার যুগে যে বিংশ-গোষ্ঠী এককাল আমাদের সংস্কৃতির একমাত্র বিকাশরিতা ছিল তারা বিপর্যত। অল্প দিকে দেখি, যে-সব শ্রেণী বহুকাল অন্ধকারে ডুবে ছিল সেই-সব শ্রেণী রাজনৈতিক আবেগে উপরে তেলে উঠছে বটে, কিন্তু তাদের নতুন সংস্কৃতি রচনা করার ক্ষমতা হয় নি। তাই ইচ্ছার সত্ত্বেও ছাপ সমাজমনে পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও তার মধ্যে প্রতিবাদের সুরই প্রবল, আনন্দের চেয়ে কোথাই দুর্ভয়। বলা বাহুল্য, সৃষ্টির পরিবেশ এখন।

মধ্যবিত্ততার অবলানকালে এইরকমই ঘটে থাকে। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল ম্যাক্সহাইম এই অবস্থার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। এই সময় যে যে লক্ষণ ঘটে তার আলোচনা করতে গিয়ে কার্ল ম্যাক্সহাইম বলেছেন, পূর্বে যে শক্তি বিকাশের সহায়ক থাকে এই যুগে সেই শক্তিই উল্টো। ফল ফলায়। তার কারণ, অর্থনৈতিক তাগিদে নতুন নতুন শ্রেণী সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে, অথচ তারা সাংস্কৃতিক বিকাশের কোনো দরজাই খোলা পায় না। তার উপর, এই অবস্থায় “বিংশ-গোষ্ঠী” খাড়াই থাকে, বিশেষ কোনো একটি বিংশ-গোষ্ঠীর আর প্রাধান্য থাকে না, পূর্বে যে অর্থ প্রতিপত্তি বা কৃতিত্বের ভিত্তিতে বিংশ-সমাজ গড়ে উঠত এখন তারও লাঘব হতে থাকে, বিংশ-সমাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনও ঘটে বহুদূর। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সচলতার অভাব ঘটতে থাকে, বহির্বিষয়ের সঙ্গে যোগ যায় কেটে, নিজের চার পাশে গুঁজি রচনার চেষ্টা চলতে থাকে। ম্যাক্সহাইমের কয়েকটি কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করি* :

The crisis in culture in liberal-democratic society is due, in the first place, to the fact that the social processes, which previously favoured the development of the creative élites,

- অল্প বোর্গহুসারী হাট সাম্রাজ্যিক কাহিনী হলও, বহুবক্তারী সঙ্গে একেবারে মৌলিক পার্থক্য আছে।
- Mannheim: *Man and Society*, p. 85 et seq.



श्रीमती चरित्र

श्रीमती चरित्र



श्रीमती चरित्र



পক্ষ-পারিক। কালীঘাট
শ্রীঅমিত ঘোষের সৌজন্যে

বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

now have the opposite effect, i.e. have become obstacles to the forming of élites because wider sections of the population still under unfavourable social conditions take an active part in cultural activities. This is called "negative democratization." There

are four processes which are of special significance today. They are (1) The growing number of élite groups, and the consequent diminution in their power. (2) The destruction of the exclusiveness of the élite groups. (3) The change in the principle of selection of these élites. (4) The change in the internal composition of these élites. Today a growing number

of social groups strive for a share in social and political control and demand that their own interests be represented. The fact that these social groups come from intellectually backward masses is a threat to those élites which formerly sought to keep the masses at a low intellectual level. . . This [process of keeping down] may, of course, succeed for a time, but in the long run the industrial system puts new vigour in the masses, and as soon as they enter in one way or other in politics, their intellectual shortcomings and more specially their political shortcomings are of general concern and even threaten the élites themselves.

এই নবজাগৃত চেতনাকে স্বয়ং রূপ দিয়ে নব নব সৃষ্টির পথে পরিচালনা না করতে পারলে তুচ্ছ ফল দেখা যায়। প্রথমতঃ এই চেতনা জোয়ারের মত আসে, কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্থায়ী ফল ফলাতে পারে না।*

~ The new impulses, intuitions and fresh approaches to the world, if they have no time to mature in small groups, will be apprehended by the masses as mere stimuli. As a result they fade away with the many passing sensations which abound in the life of a modern metropolis. Instead of creative ability and achievement we find constantly increasing hunger after every new sensation.

বর্তমান কালে বাংলার সমাজজীবনে কি ঠিক এই লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না?

এর দ্বিতীয় ফল হল, চিত্তের অশান্ততা। স্বয়ং ফলবান্ সৃষ্টির পথে না গেলে সে কেবল সময় সময় অস্থায়ী উত্তেজনায় কেটে পড়ে, নিকটকাল জাগিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চায়, আর কিছুই করে না।

Since democracy has become effective, i.e. since all classes played an active part in it, it has been increasingly transformed into what Max Scheler called a "democracy of emotions". As such, it leads less to the expression of interests of the various social groups and more to sudden emotional eruptions among the masses.

আমরা বাংলায় কি এই অবস্থাও দেখা দেয় নি,?

তা হলে ভবিষ্যতের পথ কি?

পূর্বের আলোচনা হতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই সংস্কৃতিসংকট উত্তীর্ণ হতে গেলে আমাদের সংস্কৃতির জিহ্বে প্রসারিত করতে হবে। বর্তমানকালের সংস্কৃতি গোষ্ঠী-আত্মীয়, তা কখনোই একদিনে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে না। তা ছাড়া যে যুগে সমাজে বিশেষীকরণ অনিবার্য সে যুগে জটিলতাবোধিত

* Mannheim : *Man and Society*, p. 87.

জীবনৈককল্পি রূপিপ্রধান সমাজের মত অশুভা ও সার্বজনীনতা ফিরে আসা বোধ হয় কখনোই সম্ভব নয়। কাজেই এই অবস্থা অনিবার্য এ কথা স্বীকার করে নিলে তখন সমাধানের একমাত্র পথই খোলা থাকে। সে পথ হল, যে-সব বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আবর্তে পড়ে জাগ্রত ও সচেতন হয়ে উঠেছে, তাদের দ্বারা সমাজকে থেকে থেকে নড়িয়ে তুলছে, তাদের আদর্শ আর কোনোক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না, অথচ দ্বারা উপকরণের ও চিন্তামার্গনার অভাবে সংস্কৃতিরচনার অংশীদার হতে পারছে না, ফলে বর্তমান সংস্কৃতিকে ডাঙছে কিন্তু নতুন সংস্কৃতি গড়ছে না, সেই-সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে যুগোপযোগী দিয়ে উপকরণ-সমৃদ্ধ করে সংস্কৃতিরচনার অংশভাক্ত করে তোলা। এর মধ্যে দ্বারা কথিত, তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নেই, তারা স্বতঃই বাদ পড়ে যাবে। আর তারা সমাজ-জীবনে দ্বারাও মারছে না। কিন্তু তাদের শক্তি ও সম্ভাবনা আছে অথচ বর্তমানে ঘটনা সম্মিলে প্রকাশ ও বিকাশের পথ খোলা না পেয়ে নিচ্ছে দ্বারা কুটে মরছে তাদের বেলা এ কথা প্রযোজ্য নয়।

বাংলাদেশ শোকসংস্কৃতিরই বেশ, কাজেই এ কারণ বাংলাদেশে অন্ততঃ কঠিন হওয়া উচিত নয়। পূর্বেই বলেছি, আমাদের সমস্ত ইতিহাসের গতিই সেই দিকে। তাই ভারতবর্ষের চিত্রায়িত আধ্যাত্মিকতার মধ্যেও তাইই আড়ালে আড়ালে বাংলাদেশে যুগে যুগে কালে কালে এই মহৎ মানবস্বীকৃতি ও প্রগতি সাংস্কৃতিক ভিত্তি রচনা ঘটে এসেছে এবং সেই জন্যই বরাবর বাংলা সংস্কৃতির এত বিদ্যবৎ বিকাশ, এত ঐশ্বর্য। "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই উক্তির মধ্যে দ্বারা সমৃদ্ধি সাধনার নিগূঢ় অর্থ বুঝলেও বুঝে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে আধ্যাত্মিক কথা বাদ দিয়ে এর সমস্ত লৌকিক অর্থ এ একটি নবযুগের সম্মুখনি। সেই লোকশক্তিকে অস্বীকার করার ফলেই তো সে যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মহত্ব বিকাশ। তারই স্বর্ণা দিতে গিয়ে বহিন্দ্রস্ত লিখেছেন—

"আমি সোজা, কাল যুগ, আর গেলিও, কাল যেকন; ইউরোপের এইরূপ অকল্প্য সৌভাগ্যোদ্ভূত হইল। আঘাতেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকল্প্য বহিঃশে চৈতন্যপ্রসার; তারপর রূপসম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ব গণিত। একদিকে রূপে রূপে নিরোহিনী, পলায়ন, লক্ষণ; দ্বিতীয়ে রূপসম্পত্তি এবং তৎপরদ্বারা। আবার বাস্তব কালের সৌভাগ্য, বিদ্যাস্ত, চৈতন্য চৈতন্যের পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু তারপর পরে চৈতন্যের পরবর্তী যে বাস্তব কৃষ্ণবর্ণিনী কবিতা, তাহা অপরিমেয় ভেদবিনী, রূপত অতুলনীয়।"

কাজেই আমাদের যখন মানব-স্বীকৃতির কথা ভাবতে হয় তখন ইউরোপ-পরিম্পত্তি গ্রীক মানবিকতা, বা আমাদের দ্বারা আঘাত করেছে, কেবল তার কথা না ভেবে আমাদের ইতিহাসের রূপাটাও ভাবতে হবে, কেননা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সঞ্চারিত হয়েও তারই মধ্যে বার বার প্রবলভাবে মানব-অত্যাচার ঘটেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি আচার ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তাকেই সমর্থন করার ক্ষমতা বুঝে বেড়িয়েছে, বাংলার ইতিহাসের এইটাই স্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তার পরের যুগে আমরা যখন আধ্যাত্মিকতার বেড়াশাল কেটে বার হতে পেরেছিলাম তখন ক্রমে ক্রমে মানব-স্বত্বদায়ের স্রেষ্ঠ মহিমা প্রচারিত হতে দেখছি স্বাভাবিকভাবে। এইখানেই বাংলার অন্তর্নিহিত শক্তি, এইখানেই যুগে যুগে তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের মূল রহস্য, এইখানেই তার সংস্কৃতি-উত্তরণের মূল কোশল। অবশ্য তার বাহ্য রূপ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন হতে বাধ্য। বৈকল্পিক সে যে আকার নিয়েছিল, উনিশ শতকে তার চেহারা অবশ্যই ভিন্ন হয়েছে,

বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

একালে আরও তফাত হবে। তা না হলে নুস্তে হবে আমাদের গতি নেই, দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে নয়; আমরা এগোতে চাই না, বরং পিছোতে চাই, আমরা নব্যযুগ রচনার বদলে obscurantism ও revivalism-এর চেষ্টায় ব্যস্তিযুক্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না যে, মানব-অত্যাচারের মহামন্ত্রই বাংলাকে যুগে যুগে রক্ষা করে এসেছে। এ যুগে যে-সব নতুন সমস্যা উঠেছে তারই উপযোগী করে মহত্তম অর্থে এবং ব্যাপকতম ও গভীরতম ভিত্তিতে যদি এই মহামন্ত্র পুনর্ব্যব প্রযুক্ত না হয় তা হলে এই সংকট কাটবে না। তার ক্ষম প্রাচীন লোকসংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপে পুরোনো পুঁথি, ছেঁড়া ঝাঁপা ও কীটমট পট জোগাড় করলেই চলবে না। এমন-কি তার ক্ষম শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কলমে অশিক্ষিতদের ফোডহতাশার স্বর্ণাও যথেষ্ট নয়। তার ক্ষম চাই, যা যা আর আন্দোলিত হচ্ছে, ক্ষুদ্র হচ্ছে, অশান্ত হচ্ছে, অথচ স্বস্থ পরিবেশ ও উপযুক্ত উপকরণের অভাবে বিকশিত হতে পারছে না, তাদের বিকশিত করে সংস্কৃতিকে মানব-অত্যাচারের ব্যাপক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো, তাতে নতুন বেগসঞ্চার করা। আমাদের ভবিষ্যৎ সেই পথেই।

কীর্তন ও ধ্রুবপদ

ঐরাজ্যেশ্বর মিত্র

নরোত্তম যখন পরাবলী কীর্তনের প্রবোধনা করলেন তখন ধ্রুবপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় ধ্রুবপদ তখন উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সম্ভ্রান্ত সংগীতশিল্পীগণ তাকে বরণ করে নিচ্ছেন। নরোত্তম স্বয়ং বিশিষ্ট সংগীতবিদ ছিলেন এবং উত্তরাকল পরিগ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে তিনি ধ্রুবপদ সম্পূর্ণ আদৃত করে তাঁর প্রবর্তিত পদাবলী কীর্তনে উক্ত বিধির প্রয়োগ করেন। এই অস্থান্যের মূল কারণ এই যে, ধ্রুবপদের স্বগম্যীয় গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রাচীন কীর্তনের একটা মিল আছে। এই সম্ভাবনা খুবই আভাবিক; কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে নরোত্তমপ্রবর্তিত কীর্তনের বর্ণনা থাকলেও তার সঙ্গে ধ্রুবপদের উল্লেখ নেই অথচ অপরাপর সংগীতের উল্লেখ রয়েছে। বস্তুত প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে ধ্রুবপদের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। পদের মাঝে মাঝে যেখানে ‘ধ্রু’ আছে তাকে ধ্রুবপদ আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয় কেননা ধ্রুবপদের রূপবদ্ধের (technique) সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ‘ধ্রু’র অন্ত ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু এটি অপর প্রশ্ন।

প্রাচীন কীর্তন এবং ধ্রুবপদের গায়নরীতির মধ্যে যদি ঐক্য খুঁজে পেতে হয় তাহলে দুইয়েরই মূল উৎসের সম্ভান করতে হয় এবং এই সম্ভান করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে যে, দুটিই প্রাচীন প্রবন্ধ-সংগীতের মূলরূপ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কারণেই দুইয়ের মধ্যেই একটি ঐক্য ধরা পড়ে।

প্রবন্ধসংগীত কি? এর উত্তরে কোনো বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে সোজা কথা বলতে চলে যে, সাধারণ গানের সাংগীতিক নামই হচ্ছে প্রবন্ধ। নানারকমের গান আছে যেমন আছে সেকালেও তেমন ছিল এবং সেগুলির বিভিন্ন প্রবন্ধ হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যুগে গানের চারটি কলি—স্বায়ী, অস্বায়ী, স্ফারী, আভোগ। পূর্বে এই সব কলিকে বলা হত ধাতু এবং প্রচলিত ধাতুগুলির নাম ছিল—উৎগ্রাহ, বেশাপক ধ্রুব এবং আভোগ। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যে আবার একটি কলি ছিল, তার নাম অস্বায়ী। ‘ধ্রুব’—এই অংশটি ছিল গানের নিত্য অংশ অর্থাৎ এই কলিটি থাকতেই হবে। কালক্রমে এই সব কলির অদলবদল ঘটেছে এবং এগুলি বর্তমান চারটি কলিতে রূপান্তরিত হয়েছে।*

মোগল আমলের শেষদিকেও আমরা ধ্রুবপদের যে পরিচয় পাই তাতেও ধ্রুবপদ যে প্রাচীন প্রবন্ধ-সংগীতেরই সংস্কৃতরূপ সে সন্দেহে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পণ্ডিত ভাবভট্ট লিপিবদ্ধ করেছেন—

সুসারসভাবাদ্যঃ রাগানুপানাদৈক্যং
পানাসুখাসহুঃ পানাসুখকঃ চ বা ।
অতিপাকঃ যমুযকন্যঃ পাণচতুষ্টয়ম্
উৎগ্রাহধ্রুবকোপাভোগঃ ধ্রুবপদঃ স্তব্যঃ ।*

* প্রিন্সবিলাস সান্ডাণ, “প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা” (বিষয়ভারতী) পুস্তিকাটি এবিদ্যর আলোচনা করেছে।

২ অমূল্যসংগীত রসাকর, ভাবভট্ট

কীর্তন ও ধ্রুপদ

এ বর্ণনা থেকে ধ্রুপদে যে প্রবন্ধের “ধাতু”গুলি প্রচলিত ছিল এইটি প্রমাণিত হচ্ছে। আর, এটিও বোঝা যাচ্ছে যে, ধাতুনিবন্ধ প্রবন্ধের “ধ্রুপ” অংশটি একদা ধ্রুপদের প্রধান অঙ্গ ছিল যে-কারণে এই সংগীতের নামকরণ হয়েছে “ধ্রুপদ”।

দীর্ঘকালপ্রচলিত প্রবন্ধসংগীতের বিকৃতি ঘট। স্বাভাবিক এবং বহুবিধ প্রবন্ধে নানা মিশ্রণ ঘটতে ঘটতে অবশেষে অবস্থা এমন হয়ে পড়াল যে, প্রবন্ধসংগীতের একটি সংস্কারসাধন না করলে হয়তো ভারতীয় সংগীতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিলুপ্তই হয়ে যেত। ধ্রুপদ হচ্ছে এই সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল। দুঃখের বিষয় এই সংস্কারপ্রচেষ্টার নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না এবং ধ্রুপদের সংগঠন সংক্ষেপে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। আইন-ই-আকবরিতে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় সেটুকু অবলম্বন করে এ বিষয়ে নানারকম অনুমান করা হয়েছে। এই বিষয়টি হচ্ছে—

Songs are of two kinds. The first is called Marga or the lofty-style as chanted by the gods and great Rishis, which is in every country the same, and held in great veneration. The masters of this style are numerous in Dekhan, and the six modes * above mentioned with numerous variations of which the following examples, are held by them to appertain to it.

(1) Surya-prakasa (2) Pancha-talesvara (3) Sarvato-bhadra (4) Chandra Prakasa (5) Raga Kadamba (6) Jhumara (7) Svara-variani.*

The second kind is called Desi or applicable to the special locality, like the singing of Dhruvad in Agra, Gwalior, Bari and adjacent country. When Man Singh (Tonwar) ruled as Raja of Gwalior, with the assistance of Nayak Baksha, Machlu and Dhana, who were the most distinguished musicians of the day, he introduced a popular type of melody which was approved even by the most refined taste. On his death Baksha and Machlu passed into the service of Sultan Mahmud of Gujarat where his new style came into universal favour.*

এ থেকে এইটুকুই মাত্র জানা যায় যে রাজা মানসিং (ভেনোয়ার) তিনজন সংগীতজ্ঞের সহায়তায় একটি জনপ্রিয় সংগীতের প্রবর্তন করলেন এবং এই সংগীত উন্নত কলিঙ্গের ব্যক্তিদেরও অনুমোদিত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরিতে এ বিষয়ে একটি সাধারণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র। গবেষকদের এর উপর বেশি নির্ভর করা চলে না। পরন্তু এই গ্রন্থের বিবৃতি অনেকস্থলে ঘাফা নর। এই গ্রন্থে কীর্তনগানের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকেই বোঝা যাবে এই সব বিবরণ কত অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত। উদাহরণস্বরূপ অংশটি উদ্ধৃত করি—

* ধ্রুপদ—ঐ, বসন্ত, তৈরব, পঞ্চ, মেঘ, নটনারায়ণ।

• এই সব গীতগুলি মার্কসংগীতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আইন-ই-আকবরি সংকলিত হবার দশশতাব্দী এর অনেকগুলি দশকসংখ্যক অতিক্রান্ত হলে সংগীতশাস্ত্র পরিণত হওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে সংগীতরসিকেরও প্রত্যক্ষ অভ্যাস নেই। এই ধরনের বিবরণী থেকে প্রমাণিত হয় যে আইন-ই-আকবরির সংগীত বর্ণনার সংকলন ঘটতে পড়িত ব্যক্তির সহায়তায় প্রস্তুত হয় নি।

* Ain-i-Akbari, translated into English by H. S. Jarret, edited by Jadunath Sarkar. Chapter—Sangit.

The Kirtaniya are Brahmans whose instruments
ancients. They dress up smooth-faced boys as
praises of Krishna and reciting his acts,

যে ধরনের সংগীতাহুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে এই বিবরণী লেখা হয়েছে তা কীর্তনের পর্গায় পড়ে না। ঐচ্ছিকত বে নগরকীর্তনের অহুষ্ঠান করে নিজে গেয়েছিলেন—“তুয়া চরণে মন লাগধ’রে। শারংগধর “তুয়া চরণে মন লাগধ’ রে” বা পুঁহীতে বধবারা উপলক্ষে স্বরূপ ধামোদর গেয়েছিলেন—“দেই তো পরাননাথ পাইহু। বাহা লাগি মনন বহনে স্থরি গেহু”—এইসব অহুষ্ঠান স্বরণ করলে আইন-ই-আকবরির বিবরণীর বিকৃতিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাক, মূল প্রসঙ্গেই ফিরি।

মধ্যভারত থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলে যখন ঐশ্বর্য প্রসারিত হচ্ছে তখন বাঙালার কী ধরনের তুলনীমঙ্গীত প্রচলিত ছিল সেইটি বিচার্য বিষয়। বাঙলাদেশেও ধাতু নিবন্ধ বহু প্রকার প্রবন্ধ সংগীতের অস্তিত্ব ছিল। ভক্তিরসায়ণে এই ধরনের ধাতুনিবন্ধ পদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

রাগ-পঠমচরী

উৎগ্রাহ

উদিত পুরণ

নির্দিশিনাকর

ভিক্রম কলতব দুরি

ভাসুদেবিনী

পুলিন পরিবার

ভক্ত শোভিত দুহি।

কোলাশক

কল নক হৃদয়ভিত্তম চলত মদার দখীর।

ঐশ্বর্য মন ভক্ত কত মুহুর্তে কোকিল কীর।

এন

বিরহ বরমকিণার

যদু কৃষ্ণবিশিষ্ট যাদুটী

পেদি পরম বিজোর।

অম্বর

যেহ দ্রুত মদারমণ্ডলে বিপুল কৌতুক আশ।

বসন্তের গহি স্বর পদত বোধ ভীষণীয়া মাত।

হাবিকাভণ চরিতম বর বিরচিত স্বাবিব দীত।

গানরত হুতিনাথ মদার হর্য নিরশন নীত।

আভোপ

কলসোদন মলিত অভিনয় বরিত যক্ষ্মহ সেহ।

ভবন বিরে বনরায় একটত লক্ষত অতুলিত সেহ।

এইটি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতুনিবন্ধ প্রবন্ধসংগীতের সাধারণ উদাহরণ। কিন্তু, শুধু এইটুকুই নয়, প্রবন্ধসংগীতের অপরাপর অবাধিও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। ঐশ্বর্য এর তুলনা স্বরণতর এবং এই

কীর্তন ও ঋষপদ

সরল পদ্ধতি বাঙালার তখনও ব্যবহৃত হয় নি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানশাসনকালে ভারতের অপর অংশের সঙ্গে বাঙালার সংস্কৃতিগত সংযোগ খুব প্রবল ছিল না। এই কারণে কড়কগুলি প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধার। বহুকাল ধরে বাঙালার অপরিসীমভাবে প্রচলিত ছিল। বাঙালার বাইরে যখন প্রবন্ধ-সংস্কৃতির স্থানান্তরিতের প্রতিষ্ঠা ব্যাপ্ত হয়েছে বাঙালী তখনও স্থিতিস্থাপিত বড়ক প্রবন্ধসংস্কৃতি সগোঁদে প্রতিষ্ঠিত। বহুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ইংরেজ আধিপত্যে বাঙালী যখন গুরুত্ব অর্জন করেছে তখন বাইরে থেকে নানা স্তরীভূত বাঙালার ঘাওয়া আশা আরম্ভ করেন এবং বাঙালী ঋষপদের প্রতিষ্ঠা এই সময়েই স্ফূট হয়েছে। এর পূর্বে বোধকরি ঋষপদের প্রচলন আকালিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র সেই সব স্থানে যেখানে মুসলমান শাসনকর্তাদের বিশেষ ঘাওয়া ছিল। এঁদের কাছে বাইরে থেকে গুস্তারী আশা ঘাওয়া করতেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ঋষপদ সেই সব অকালে কিছু কিছু বিস্তার লাভ করেছিল।

এই বড়ক প্রবন্ধের সঙ্গে পদাবলীকীর্তনের বিশেষ সখ্য হয়েছে। তত্ত্ববিদ্যাকরে এই-স্বাভাবিক সংস্কৃতির চরংকার পরিচয় দেওয়া আছে।

একজ্ঞে বাতুগক পায়ে এ নির্ধার।
 বড়ক। একজ্ঞেইত সর্বত্র প্রচার।
 স্বয়, বিষ্ণু, শিব, তেনক, পাঠ, তাল।
 এই স্বয় অঙ্গে সীত পদম রসাল।
 স্বয় সন্নিক্ষিপদাদিক নিরূপয়।
 ভদ্রনামহৃত কতে বিদ্যে কহয়।
 পদমখবাতক এককর স্বয় ইংখ।
 তেন তেনাদিক পদ মরল নিমিত্তে।
 পাঠ বাস্তবদ্বয়াক্ষর বা বা বিদ্যাদি।
 তাল চক্ৰংপুট বহাদিক বখাবিবি।
 এ বড়ক প্রাচীন আচাং নিরূপয়।
 বাক্য, স্বয়, তাল, তেনা চারি কেং কর।

এই ছটি অক্ষ হল— স্বয়, বিষ্ণু, পদ, তেনক, পাঠ এবং তাল। স্বয় হচ্ছে “শা, রে, গা মা”— এই সব স্বয়। বিষ্ণু হচ্ছে গুণবাতক অংশ। পদ বলতে গানের বাক্যাংশকে বোঝায়। তেনক শব্দ মূলবাতক। আগে গানের প্রারম্ভে “ও তৎসং” এই ধরনের মূলবাতক বাক্য গাওয়া হত। একেই বলা হত “তেন”। “পাঠ” হচ্ছে তালের বোল। গানের সঙ্গে ঝাঝে ঝাঝে লগতে ব্যবহৃত বোলগুলিরও উচ্চারণ করা হত। এই ছটি অক্ষের সন্নিবেশ অতুলারে প্রবন্ধের পাঁচটি আঁতির পরিকল্পনা হয়েছে— যেদিনী, নম্বিনী, দীপনী ভাবনী এবং তারাবনী।

বড়ক যেদিনীর একটি উদাহরণ তত্ত্ববিদ্যাকর থেকে উদ্ধৃত করি—

স্বয় লগত বসিনী বিদিত দুপদবিনী বাবিকচত্বর্থনী চুংবোচনী।
 ত্র্যবদ্যবোচনী বৈদ্যভবতত্ত্বিনী স্বত্বভবতত্ত্বিনী পত্তি ত্র্যবোচনী।
 কাত্তবিত্তবামিনী পরমভবতত্ত্বিনী ভামিনী সিদ্ধ কাত্তবিত্তবামিনী।
 স্বত্বভবতত্ত্বিনী লগিত কাত্তবিত্তবামিনী কাত্তবিত্তবামিনী লগিতবিত্তবামিনী।

হৃদয়পুষ্কাসি নবনববিহারিণী, কুশলিঙ্গিনিন্দাবিনী পল্লবিনী ।

হাসনহাসিনী মৃদুতরদিনী, সন্ধ্যাসন্ধ্যবদন নরহরিহাঙ্গিনী ।

সাত্তা বাঃ সাত্তা সাত্তা বিতকতো বৃহা সুমিতি শ্রিণো জ্য কতা জ্য শ্রো ।

সহি রিষদ নবদলহরি সান্দ্যান্তি অই তেরা তেরাতে নান্দি অই ঐ আ ।

এই উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে প্রাচীন বড়নমুক্ত প্রবন্ধের প্রভাবই পদাবলীকীর্তনের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল এবং এই রীতি ছিল প্রবন্ধের চেয়ে কঠিনতর এবং বিস্তৃততর। আমাদের সাহিত্যে পদাবলীকীর্তনগায়নের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে প্রবন্ধে অনিবদ্ধ শীত আলাপন হবার পর নিবদ্ধ শীত আরম্ভ হয়েছিল। এটি আমাদের সংস্কৃতির চিরচরিত রীতি। প্রবন্ধ সংগঠিত হবার বহু পূর্বে থেকে এটি চলে আসছে। অতএব এনিক দিগে বিচার করলেও এই গায়নপদ্ধতিকে প্রবন্ধের প্রভাব বলা সংগত নয়। কীর্তনগায়ন প্রসঙ্গে “কৃত্তিবীর গ্রাম মুছনামি প্রকাশিশা” বা “তাল পাঠাঙ্কর চাকহাঙ্গে উচ্চারণ” এই ধরনের প্রয়োগের উল্লেখ আছে। এইসব প্রবন্ধের পূর্বে বড়ন প্রবন্ধসংগীতেই অধিক প্রচলিত ছিল।

নরোত্তমের বহু পরে রচিত ভক্তিরসাকর গ্রন্থেও বাঙালার সংস্কৃতির যে বিশদ বিবরণী পাওয়া যায় তাতে প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্বপ্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধ সংস্কৃতির মতো প্রাধান্যযুক্ত নয়। প্রবন্ধের প্রসঙ্গে ভক্তিরসাকর বলেছেন—“প্রবন্ধাদি লক্ষণ সর্বত্র বিসিত”, কিন্তু প্রবন্ধসংগীত সম্পর্কে বলেছেন—“বড়ন প্রবন্ধসংগীত সর্বত্র প্রচার”। এইসব উক্তি থেকে এইটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রবন্ধ বহু পরে বাংলায় ব্যাপকতা লাভ করেছে, এমন কি সপ্তদশ শতকের শেষের দিকেও বোধ হয় প্রবন্ধ বাঙালার ততটা গৌরব অর্জন করে নি। ভক্তিরসাকর পরবর্তীকালের রচনা। হলেও বহুগ্রন্থের সহায়তা এতে গ্রহণ করা হয়েছে যাদের প্রামাণিকতা অবশ্যবীকার্য। উদাহরণস্বরূপ,—“সংস্কৃতপারিজাত”, “সংস্কৃতশার”, “সংস্কৃতমুক্তাবলী”, “সংস্কৃত দামোদর”, “নারদপঞ্চমদার-সংহিতা”, “কোহল”, “সংস্কৃত পিরোমনি” “রত্নমালা” প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থটিতে নিত্যম্ সমসাময়িক সংস্কৃতির আলোচনাই হয় নি, বাঙালার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয়ই উন্মোচিত হয়েছে। অতএব বাঙালার সংস্কৃতি ব্যাপারে এই গ্রন্থের প্রাণত অবশ্যবীকার্য।

ভক্তিরসাকর গ্রন্থে “কৃত্তবীত” প্রসঙ্গে প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এসব গানের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উদ্‌গ্রাহ্যি ধাতুরও উল্লেখ করা হয়েছে।

জাল বাতু হুল নাম কৃত্তবীত ।

বাতু পূর্ব উক্ত উদ্‌গ্রাহ্যি যথোচিত ।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে কৃত্তবীত বলতে কেবলমাত্র তাল আর ধাতুর সমাবেশ বোঝায়। অর্থাৎ, অপর ছটি সনের বিস্তারিত প্রক্রিয়া প্রবন্ধে ছিল না, অথবা থাকলেও কমই ছিল। এই কারণেই এ গান “কৃত্ত” অথবা প্রবন্ধসংস্কৃতির স্বতন্ত্র সংস্করণ। কিন্তু, কীর্তন এই কৃত্ত বা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পদাবলীকীর্তনের আয়োজন সুবিপুল। এক দৌরেন্দ্রিকাই কত বড়ো ব্যাপার প্রবন্ধ সংস্কৃতির সম্পূর্ণ রীতি বজায় রেখেও এতে নুতনম্ সম্পাদিত হয়েছে—এটি বড়ো কন্ঠ কন্ঠিদের কথা নয়। সারা ভারতে যখন প্রবন্ধসংস্কৃতি বিকৃতি স্থল্যই হয়ে উঠেছে তখন বাঙলাদেশে বড়ন মেদিনীভাষীর প্রবন্ধের পূর্ববিকাশ ছিল এটিও বাঙালির পক্ষে কন্ঠ দৌরেন্দ্রের বিষয় নয়। কিন্তু, সহজধারায় সঙ্গে পরিচয়



শিকারী বিড়াল । কলৌষাট-পট
রবীন্দ্রভারতীর দৌলভে

কারণেই ঋণপদের প্রসার এত দ্রুতগতিতে ঘটেছে। নরোত্তম বাল্যকাল থেকে বাংলার প্রচলিত প্রাক-ঋণীয় বড় ঋণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সুতরাং তাঁর কাছে ঋণপর কিছু নতুন বস্তু নয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই তিনি পরাবলীকর্তনের ভিত্তি দিয়ে ঋণপদের প্রচার করেন নি, যা করেছিলেন তা প্রবন্ধসংগীতেরই একটি নবরূপের আরোপ। ঋণপদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংগীত যেখানে প্রচাৰিত ছিল সেখানে ঋণপদের প্রভাবের কথা উঠতেই পারে না।

আসল ব্যাপার এই যে, ঋণপদ প্রবন্ধসংগীতের আত্মা হওয়াতে বাংলায় প্রচলিত প্রবন্ধসংগীতের সঙ্গে তার আত্মত্বগত এবং প্রকৃতিগত একটি মিল থাকবেই। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই এইসব সংগীতের প্রয়োগবিধিতে কতকগুলি ঐক্য আছে; নতুবা নরোত্তম-প্রবর্তিত পরাবলীকর্তনের সঙ্গে ঋণপদের আর কোনো সংযোগ নেই। এই দুটি গীতরূপের বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হয়েছে, এবং কীর্তনকে ঋণপদের উপর নির্ভর করার কোনো কারণ দেখা যায় না, কেননা পরাবলীকর্তন ঋণপদ অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং শ্রেষ্ঠতর বড় ঋণসংগীতের প্রভাবে সংগঠিত হয়েছে।

য়োরুবা দেশে

১ লেখক নগরী

ঐশ্বরীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাইজিরিয়া দেশ, ভারতবর্ষ হাত-ছাড়া হবার পরে ইংরেজদের অধীনে এখন সব-চেয়ে বড় দেশ (কানাডা দক্ষিণ-আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভেদে স্বাধীন রাষ্ট্রেরই বড়)। নাইজিরিয়ায় আয়তন ৩ লাখ ৩৭ হাজার বর্গ-মাইলের অধিক (ভারতবর্ষ ১২২ লাখের উপর, আর গ্রেট-ব্রিটেন আর উত্তর-আয়রুলাও মাত্র ২৪ হাজার বর্গ-মাইলের কিছু উপর), লোকসংখ্যা ৩ কোটি। নাইজিরিয়াকে Niger নাইজার নদী আর তার করম নদী Benue বেহুয়ে, এই দুইয়ে নিলে তিনটি স্বাভাবিক খণ্ডে বেন বিভাগ ক'রে দিয়েছে— উত্তর-নাইজিরিয়া, পশ্চিম-নাইজিরিয়া আর পূর্ব-নাইজিরিয়া। দেশের লোকের প্রায় সকলেই কৃষকায় নিগ্ৰো বা আফ্রিকান জাতির মাহুষ। এদের মধ্যে নানা উপজাতি, নানা ভাষা। কতকগুলি ভাষা একই গোষ্ঠির, আবার অনেকগুলি নিম্ন নিম্ন পৃথক গোষ্ঠির। এখন রাজ্যের জাতি ইংরেজের ভাষাই এদের মধ্যে রাজকাৰ্যের শাসনের আর শিক্ষার ভাষা আর কতকটা আনুষ্ঠানিক ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। উত্তর-নাইজিরিয়ার লোকেরা বেশির ভাগ মুসলমান, এবং বিশেষ ক'রে তারা Hausa হাউসা জাতির অস্তরূপ। দক্ষিণে, নাইজার নদীর দক্ষিণ উপকূল ধ'রে, এই বিরাট নদীর দক্ষিণস্থী থাকের যেদের মধ্যে, আদিকালকার পশ্চিম-নাইজিরিয়া প্রদেশে, Yoruba য়োরুবা জাতি বাস করে। এরা সংখ্যায় প্রায় ৭০ লাখ বা ৫ মিলিয়ন হবে। য়োরুবাদের দেশের পূর্বে, নাইজারের বাম উপকূলে আর বেহুয়ে নদীর দক্ষিণে হ'চ্ছে পূর্ব-নাইজিরিয়া। এখানে পরম্পর-সম্পৃক্ত কতকগুলি আফ্রিকান উপজাতি বাস করে, তাদের মধ্যে Igbo ইঘো বা Ibo ইবোরাই প্রধান—এরা সংখ্যায় য়োরুবাদের সমান হবে, ৫০ লাখের কিছু কম বা কিছু বেশি। এ-ছাড়া ইঘোদের আর য়োরুবাদের উভয়ের সঙ্গে সংযুক্ত Bini বিনি বা Edo এদো জাতির লোক আছে। Ijo ইজো, Ibibio ইবিবিও প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্রতর জাতিও আছে। ইঘো আর য়োরুবা—এই দুই জাতি নিলে সংখ্যায় প্রায় ১ কোটি। আফ্রিকান জাতি—বিশুদ্ধ কৃষকায় আফ্রিকান—একই ভাষা বলে আর একই সংস্কৃতির সম্বর্ভূত, সংখ্যায় ৫ মিলিয়ন ক'রে প্রায় আর কোথাও নেই।

য়োরুবা আর ইঘোরা আফ্রিকার সব-চেয়ে প্রগতিশীল অগ্রগামী কৃষকায় জাতির মাহুষের মধ্যে অন্যতম। এদের মধ্যে সেখা-পড়া শেখা—ইংরেজি-শিক্ষিত আর ইউরোপে গিয়ে প'ড়ে আসা পণ্ডিত লোক প্রচুর। আর তারা এই দেশকে এখন পরিচালিত ক'রছে। ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বাণিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক প্রচুর। এদের সঙ্গে তুলনা করা যায় আফ্রিকার মাত্র আর ৩৪টি জাতির মাহুষকে—Gold Coast গোল্ড-কোস্ট (বা Ghana গানা) রাষ্ট্রের Akan আকান জাতির লোকেরের, আর উগাণ্ডা প্রদেশের Baganda বাগাণ্ডা লোকেরের, আর ভা-ছাড়া আরও সামান্য কয়টি জাতির মাহুষদের। ইঘোদের মধ্যে ঐশ্বরীান ধর্ম অনেকটা প্রসাৰলাভ ক'রেছে—কিন্তু মুসলমান ধর্মের প্রভাব কম, আর প্রাচীন ধর্ম এখনও বেশি লোকের

মধ্যেই বিস্তারিত। যোকবাদের মধ্যে মুসলমান ধর্মের প্রচার একটু বেশি। খ্রীষ্টানও অনেক আছে, আর তা-ছাড়া কিছু লোক প্রাচীন ধর্ম আঁকড়ে রয়েছে— যোকবারা বোধ হয় শতকরা ৪০ মুসলমান, ৪০ খ্রীষ্টান, আর ২০ প্রাচীন ধর্মের। নাইজিরিয়ায় যোকবা আর ইঘো এদের মধ্যে প্রভিধম্বিতা আছে। আর উত্তর-নাইজিরিয়ায় মুসলমান এবং শিক্ষার অনগ্রসর Hausa হাউসা আর Fulani ফুলানি প্রভৃতি জাতির লোকেরা, এই খ্রীষ্টান অথবা প্রাচীন-ধর্মী যোকবা আর ইঘোদের পছন্দ করে না, তাদের আশঙ্কা যে ইংরেজি সেখাপড়ার জ্ঞানের ফলে ধর্মবিশ্বের এই লোকেরা উত্তরে গিয়ে সকলের উপরে আধিপত্য করবে। এইজন্য উত্তরের লোকেরা এখন যোকবা আর ইঘোদের সঙ্গে মিলে বাধীন হ'তেও চায় না। তারা বরং আলাদা রাগা গঠনের পক্ষপাতী। এটিক বেন পাকিস্থানী ব্যাপার। উত্তরের মুসলমান হাউসারা সংখ্যার ১৫ মিলিয়ন বা ১৫ কোটি, দুর্ধর্ষ লড়াইয়া জাতির মানুষ, ব্যবসায়-বুদ্ধিও এদের আছে, চারিদিকে এরা ছড়িয়ে প'ড়েছে, এদের পুরাতন ইতিহাস আছে, এরা স্বতন্ত্র জাতি হ'তে চায়।

আফ্রিকার অন্য নাম। জাতি আর উপজাতির মধ্যে, যোকবাদের মধ্যে একটু জানবার সুযোগ আমরা ঘটেছিল। যোকবাদের সঙ্গে নিকট-সম্পৃক্ত Edo এরা জাতি আছে (যেমন বাঙালী আর উড়িয়া)। এদেরা Bini বিনি বা Beniu বেনিন নগরে নিজেরদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ক'রে আছে। সেখানে আম থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে তারা একটি খুব লক্ষ্যীয় সভ্যতা গ'ড়ে তোলে। এই সভ্যতার এক বাহ্য প্রকাশ ঘটেছিল, শিল্পে। কঠোর ঘোড়াই, হাতীর পাঁতের ঘোড়াই, হাতে বোনা ছাপা কাপড়, আর মাটির আর ত্রৈলোচনা মূর্তি, ত্রৈলোচনা ফলক, এইসব এই শিল্প আফ্রিকার সভ্যতার, এমনকি বিশ্বসভ্যতার এক গৌরবের বস্তু। লগনে ১৯১২ সালে ব্রিটিশ-মিউজিয়মে বেনিনের এই শিল্পসম্ভারের নিদর্শন দেখে, নিগ্রো বা আফ্রিকান জাতির সম্বন্ধে আমরা ধারণা খুব উন্নত হ'য়ে যায়। তখন লগনেই নাইজিরিয়ার কতকগুলি যোকবা ছাত্র আর অন্তর্ভ্রমজ্ঞানের সঙ্গে আলাপ হয়। যোকবাদের সম্বন্ধে, এদেরদের সম্বন্ধে হাতের কাছে বা পাই তা প'ড়ে ফেলি। ওদের ধর্ম সমাজ প্রভৃতির সম্বন্ধে একটু জ্ঞানলাভ করি। এর বহু পরে খবর পাই, খাল যোকবাদের সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র Ife ইফে নগরে স্থানীয় রাজা বার শরীফ হ'চ্ছে Oni 'অনি', তাঁর প্রোগাধ বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিতে অনেকগুলি ত্রৈলোচনা প্রমাণ-আকারের নুহুও পাওয়া যায়— আফ্রিকান যেরে পুরুষের, প্রাচীন দেবদেবী আর রাজাদের মূর্তি— ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলি প্রায় ১০০০ বছর আগে এই যোকবাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা তৈরী হয়েছিল। এগুলির ভাষ্য এত স্থলর যে শ্রেষ্ঠ প্রাচীন গ্রীক অথবা রোমান ইটালির অধর্ম্মতার সঙ্গে টক্কর দেয়। আমি এগুলির ছবি দেখি, আর তনি যে এগুলিকে ইউরোপে প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হ'য়েছিল। পরে অনি নিজের রাজধানী Ife ইফেতে একটি মিউজিয়াম ক'রে এগুলি রক্ষা ক'রছেন। যোকবাদের ধর্ম সম্বন্ধে, আফ্রিকান শিল্প সম্বন্ধে, ইংরেজি আর বাঙালী কতকগুলি প্রবন্ধও লিখি।

বহু দিন ধ'রে পশ্চিম-আফ্রিকা— বিশেষ ক'রে নাইজিরিয়া আর গোল্ড-কোস্ট (বা Ghana গানা)— একবার ঘুরে আসবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। 'রোগাযোগে গত ১৯৫৪ সালে তিন সপ্তাহের জন্য গোল্ড-কোস্ট, নাইজিরিয়া ও স্থানীয় নিগ্রো প্রজাতন্ত্রসমূহ Liberia লাইবিরিয়া দেখে আসবার সুযোগ আমার ঘটে যায়। নাইজিরিয়ার যোকবাদের বাসভূমি পশ্চিম-নাইজিরিয়ার ক্বটা শহর দেখতে পেরেছিলাম— সমগ্র দেশের রাজধানী Lagos লেগস, আর যোকবাদের দুটো শহর Ibadan ইবদান আর Ife ইফে, আর এ-ছাড়া

মোকুবা দেশে

Abekuta আবেকুতা শহরে কতকগুলি কাটাতে পেরেছিলেন। তারপরে, উত্তরে হাউগানের প্রধান কেন্দ্র Kano কানো নগরেও দুদিন কাটিয়েছিলেন।

দিল্লী, বোম্বাই, কাইরো, ত্রিপোলি, কানো— এই পথে আকাশ-বানে পশ্চিম-আফ্রিকা ঘাই। ত্রিপোলি থেকে পূর্ব-দাওয়ার দিক পেরিয়ে ২৮শে জুলাই ১৯৪৪ বৃহস্পতিবার প্রাতে কানো নগরে পৌঁছুই। ঘটাপাতকের সেখানে থেকে, আদম্বা সোম্বা গোল্ড-কোস্টের রাজধানী Accra আক্রায় দিকে পাড়ি দিই— সকাল সাড়ে দশটায় সেখানে পৌঁছুই। প্রথমটা গোল্ড-কোস্টের ভ্রমণ শেষ ক'রে, ৩রা আগস্ট মঙ্গলবার বেলা তিনটের পরে হাওরাই জাহাজে অত্র। ত্যাগ ক'রে, বিকালে ৬টায় লেগুন নগরে ছাড়ির ছই। মোকুবা দেশে ছিলুন মাত্র ছ দিন, পরে ২ই আগস্ট লেগুন ত্যাগ করে উত্তর-নাইজিরিয়া হাউগানের প্রধান নগর কানোতে উপস্থিত ছই। হাউগানেশের অভিজ্ঞতার কথা এখন ব'লবো না। মোকুবাদের কয়টি মূল্য কেন্দ্র বেখে আসতে পেরেছিলেন মাত্র, তারই কথা ব'লবো।

একটু পূর্বকথা ব'লে নিই। আফ্রিকার, বিশেষ ক'রে পশ্চিম-আফ্রিকার শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে ঘরে ব'লে “স্বাধীনতা” নামের একটি ক'রে আসছি। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, বাইরের পাঁচটা জাতির সঙ্গে এখন, ইংরেজের মাধ্যমে আর নয়, গোলাগুলি, সমান-ভাবে বেশবার বেশবার যোগে আমাদের হ'য়েছে। এখন নানা দেশের প্রধান লোক বা প্রতিনিধি আমাদের দেশে আসছেন, আর আমাদেরও বিপষ্ট ব্যক্তি বিশেষে যাজ্জন, যাবার আয়তন পাচ্ছেন। ১৯৪২ সালের শেষ ভাগে আর ১৯৪৩ সালের গোড়ায় নাইজিরিয়া দেশ থেকে দুইজন মহা স্বাধীন ভারতবর্ষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার ক্ষেত্রে, আর নিজের জাতির শুভেচ্ছা জানাবার ক্ষেত্রে, এদেশে এসে বেড়িয়ে যান। এরা দুজনেই পশ্চিম-নাইজিরিয়া দেশের মোকুবা জাতির লোক। একজন হ'চ্ছেন ঐযুক্ত Obafemi Awolowo ওবাকেমি আওয়োলো, ইনি পশ্চিম-নাইজিরিয়া প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী; আর দ্বিতীয় জন হ'চ্ছেন ঐযুক্ত Augustus Akinloye আগুস্টন্ আকিনলোয়ে, ইনি এদেশের কবিদলী। এদের সঙ্গে ছিলেন তিনজন আফ্রিকান আর একজন ইংরেজ সেক্রেটারি। দিল্লী আর অল্প নানা আরণ্য ঘুরে এরা ক'লকাতায় আসেন ১৯৪৩ আষাঢ়মাসে। এদের সম্মানের জন্য আমাদের পশ্চিম-বাংলা বিধান-সভা-গৃহে একটি বৈকালিক চা-যোগের ব্যবস্থা হয়, এবং তাতে এদের স্বাগত ক'রে, শিষ্টাচার সেধিয়ে, বক্তৃতাধিও হয়। তখন অবসর পেয়ে, মোকুবা জাতির সম্বন্ধে, তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে ধারণা-চর্চায় কথা আদি বলি। এদের সম্বন্ধে সম্বন্ধভূক্তির দৃষ্টি দেখে, আর এদের বিষয়ে আমার মনে জিজ্ঞাসার ভাব দেখে, উপস্থিত আফ্রিকান সম্মানগণ খুবই স্থি হন। পরে তাঁরা আমার বাড়িতেও একদিন পদার্পণ করেন, আর তাঁদের দেশে যাবার ক্ষেত্রে অহরোধও করেন। ঐযুক্ত আওয়োলোকে পশ্চিম-আফ্রিকার একজন সর্বজনমাত্র নেতা। নাইজিরিয়ার পক্ষিগোষ্ঠ-কোস্ট বা গানা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী Dr. Kwame Nkrumah ক্বামে ঙ্কুমা, পশ্চিম-নাইজিরিয়ার ঐযুক্ত আওয়োলোকে আর ইবোয়ের দ্বারা অধ্যুষিত পূর্ব-নাইজিরিয়ার Dr. Azikiwe আজিকিবে, এই জম্মী এখন পশ্চিম-আফ্রিকার ইংরেজের অধীনে যে কয়টি দেশ আছে সে কয়টির রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নেতা, এরা সব বিষয়ে দেশের আফ্রিকানদের মধ্যে সবথেকে জ্ঞাতীয় এবং সোশালবোদের প্রতীক; তাঁরা ঙ্কুমাকে “পশ্চিম-আফ্রিকার নেত্রী” আখ্যা দিয়ে স্থানীয় লোকেরা আনন্দ পান। এদের সংস্পর্শে এসে, আর এখন পশ্চিম-আফ্রিকার লোকেরা যে-ভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

স্বাধীনতার দাবি নিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছেন, পত্র-পত্রিকার তার খবর পেয়ে, পশ্চিম-আফ্রিকার অন্ততঃ একবার 'ঋণী'-দর্শন করবার জন্যে আগ্রহে বেড়ে যায়। যোগাযোগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জ্যোতিবাহর নেহরুর অর্থসেচরী ও ভূভেদ্য নিচে, দিল্লীর অধ্যাপকস্বরূপ গংগা Indian Council for Cultural Relations (ICCR) —এর ব্যবস্থায়, তিন সপ্তাহের জন্য পশ্চিম-আফ্রিকা ঘুরে আসবার সুযোগ ১৯৬৪ সালে আমার হ'ল। গোয়ড-কোষ্ট, নাইজিরিয়া, লাইবেরিয়া এই তিনটে দেশের উপর চোখ বুলিয়ে, আর শুধানকার জনকয়েক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা ক'রে, কনাসি-আফ্রিকার Dakar ডাকার আর Casablanca কাসাব্রানকা ছুঁয়ে পারিসে বাই, তার পরে পারিস থেকে কেবুলিয়ে ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ প্রতিনিধি-রূপে ত্রয়োবিংশ আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিজ্ঞানিক মহাগম্বেশন-এ যোগদান ক'রে, সোম্বা দেশে ফিরি। আফ্রিকায় এই অভিজ্ঞতাটুকু এত চমৎকার পেয়েছে যে কথায় তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। তার একমুখ যোক্তাদের হেঁশে খাওয়ার কথা এখন কিছুটা লিখছি।

আমি একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ, আর একটি ভারতীয় রাষ্ট্রের বিধান-পরিষদের সভাপতি ব'লে, আমার ভ্রমণের সুবিধা ক'রে দেবার জন্যে ভারত সরকার থেকে আমার গন্তব্য দেশগুলির কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতের একজন বেশকিছু প্রতিনিধির জন্য বিশেষ সৌজন্মের সঙ্গে এই-সব দেশের সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়। নাইজিরিয়ায় একটা ভ্রমণের প্রোগ্রাম ওঁদের সরকার থেকেই আমার জন্যে তৈরি ক'রে রাখা হয়, কিন্তু সময়ের অভাবে সেইটি আমি অনেকটা কাটছাঁট ক'রে ছোট ক'রে নিতে বাধ্য হই। এঁরা বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্তৃপক্ষের অতিথি হবার ব্যবস্থা ক'রে দেন, কিন্তু ভ্রমণের খরচ এঁদের দায়িত্বেই মধ্যে ছিল না। পশ্চিম-আফ্রিকায়, বিশেষ ক'রে ব্রিটিশ এলাকার দেশগুলিতে, ভারতবর্ষের শিক্ষা বণিকেরা গত কয়েক দশকের মধ্যে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নিজেদের একটা বেশ লক্ষ্যর মধ্যস্থান পূর্ণ স্থান ক'রে নিয়েছেন। এঁরা আগে সনদ পুথিখোঁজে বিভিন্ন বড় বড় শহরে রেশম, কিউরিও বা মনোহারি ত্রব্য, জহরৎ প্রভৃতির বোকান ক'রে চালাতেন—এই কাজ এঁদের একচেটে ছিল। কিন্তু প্রায় সব দেশেই বিশেষ ব্যবসায়ের প্রতি একটা বিরোধ-ভাব এসে পড়ায় এঁদের অস্ত্র নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রতে হ'চ্ছে। গিরিয়া আর লেবানন থেকে আগত আরব-ভাষী জীবন ও মূল্যমান ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে অনেকটা প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু তার স্থানীয় কৃৎকর্ণ আফ্রিকানদের সঙ্গে যেতকাল ইউরোপীয়ানদের নতনই অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার ক'রত, আর নানা ভাবে অস্ত্র আফ্রিকানদের শোষণ ক'রত। সেইজন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণার ভাব বেগে উঠেছিল। ভারতের হিন্দু শিক্ষা বণিকেরা কিন্তু তাঁদের স্বাভাবিক মধুর ও কোমল ব্যবহারের দ্বারা আর ব্যবসায়ের লেন-দেনে সততার দ্বারা, সর্বশেষেই শ্রীতি ও শ্রদ্ধার পাতা হ'য়েছেন। এ ছাড়া এঁরা প্রচুর পরিমাণে নিজদের কারবারে স্থানীয় লোকদের নিযুক্ত ক'রে থাকেন, আর ভারতবর্ষে গিয়ে যাতে উচ্চশিক্ষা পেতে পারে এই জন্য কতকগুলি বৃত্তি দিয়ে আফ্রিকান ছেলেদের ভারতবর্ষে পাঠাচ্ছেন। এঁরা পৃথিবীর সব দেশ থেকেই স্থানীয় লোকদের চাহিয়া অহুসায়ে নানা রকম জিনিসের আমদানি করেন, তার মধ্যে কাপড়চোপড়ই প্রধান। ভারতবর্ষের তৈরি নানা বস্ত্র, যেমন সেলাইয়ের কল, সঠন, খাণ্ডামান, প্রভৃতি এঁরা আমদানি করেন। লেগুন শহরে চেলায়াম Messrs K. Chellaram and Sons (Nigeria) Ltd. সবচেয়ে বড় শিক্ষা ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান। এঁদেরও খবর পাঠানো হয়। শিক্ষা বিশেষভাবে অতিবিশিষ্ট আন্তি, আর দেশের বাইরে প্রত্যেক ভারতবাসীকে এঁরা আপন মন বলে

য়োরুবা দেশে

গ্রহণ করেন। লেগস হাওথাই-মাহাকের আজ্ঞায়, চেলাবামের আপিসের দুজন ডাইরেক্টর খ্রীষ্টকৃষ্ণ নিখামচন্দ্র, নীরপুত্রী আর খ্রীষ্টকৃষ্ণ রূপচন্দ্র, স্যামতানী তাঁদের গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হন। তারা আমাকে সোজা প্রথমে তাঁদের আপিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাকে চিঠি ছিলেন নাইজিরিয়ার বিসেপ-নব্বীর পক্ষ থেকে; Ikoyi Hostel ইকোয়ি হস্টেল ব'লে সরকারি কর্মচারী আর অতিথিদের জন্য যে বাসভবন নির্মিত আছে, সেখানে আমার জন্য থাকবার স্থান ঠিক হ'য়েছে। সিদ্ধা বন্ধুর নিবেদনের গাড়ি করে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিলেন, আর ব'ললেন, ঐ রাত্রে তাঁদেরই বাড়িতে গিয়ে আমাকে তাঁদের সঙ্গে আহার কর'তে হবে।

ইকোয়ি হস্টেল-এর ব্যবস্থা ভাল, বড় উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী রাজধানী লেগস শহরে এসে এখানেই স্থান পান। বড় দরের হোটেলের মত সব ব্যবস্থা। আমি লেগসে দুদিন এখানেই ছিলাম। খ্রীষ্টকৃষ্ণ রূপচন্দ্র, তাঁদের কোম্পানীর গাড়ি ব্যবহার কর'তে সেন, তাঁদের এই আতিথেয়তার জন্য সমস্ত সপ্তাহের সুবিধা হ'য়েছিল। এরা নিবেদনও অনেক সময়ে আমার সঙ্গে ঘুরতেন। রাত্রে ঠাণ্ডের ওপানে আহারকালে আমার রোজবা দেশ ভ্রমণের প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে নিলাম, আর তদনুসারে যে ইংরেজ সহকারি-সেক্রেটারি সরকারের পক্ষ থেকে আমার ভ্রমণের ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁকেও জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর'লুম। পরের দিন সকালে হস্টেলেই প্রাতরাশ সেয়ে সহকারি-অ্যাসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারির সঙ্গে টেলিফোনে কথা ক'রে নিলাম। চেলাবাম কোম্পানির গাড়ি এসে আমাকে ঠাণ্ডের আপিসে নিয়ে গেল। খ্রীষ্টকৃষ্ণ রূপচন্দ্র আমাকে British Council নামে ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক খ্রীষ্টকৃষ্ণ Lowden লাউডেন-এর সঙ্গে দেখা কর'তে নিয়ে গেলেন। ঐর কাছ থেকে নাইজিরিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থার সম্পর্কে কতকগুলি খবর পাওয়া গেল। Ibadan ইবদান শহরে আছেন এঁদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় পরিচালক (Regional Director of the British Council) খ্রীষ্টকৃষ্ণ John Danford জন ডানফোর্ড। ইনি ভাষার ও চিত্রশিল্পী। আর তখনুম যে সত্যটি ইনি বিলেত থেকে বেনিন শহরে প্রাচীন কালের স্থানীয় একজন স্মার্টর একটি প্রমাণ-সাক্ষ্যের ত্রুটি-মুক্তি তৈরি ক'রে ঢালিয়ে এনেছেন, এবং সেটি বেনিনে স্থাপিত হ'য়েছে। তারপরে আদরা Methodist Bookshop-এ গিয়ে কিছু বই, আর রোজবা কারিগরের কাম একটি ছোট কার্টের নারীমূর্তি কিনলাম। পথে লেগস শহরের প্রবহমান জীবনস্রোতের সঙ্গে পরিচয় শুরু হ'ল। দেশের অধিবাসী কৃষ্ণকায় আফ্রিকান (Negro 'নিগ্রো' শব্দটি এখন আর ব্যবহার হ'চ্ছে না, এই শব্দের বিকৃত ইংরেজি Nigger 'নিগার'-এর মত মূল শব্দটিও কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকানদের কাছে অপমানজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সেইজন্য এই শব্দের বদলে 'আফ্রিকান' শব্দই এখন সকলে ব্যবহার কর'ছেন)। রাতার মাহু সবই প্রায় আফ্রিকান—পিলু পিলু ক'রছে। পুরুষেরা বেশির ভাগই হাফপ্যাট আর নানা রকমের রঙিন বা সাদা গেঞ্জি পরা, এবং পালি প্যা—এই হ'চ্ছে সাধারণ স্নানিকের পোশাক। খাটি ইউরোপিয়ান পোশাক ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই প'রে থাকেন, কিন্তু ডিলে আলখাল্লার মত রোজবা পোশাক, হাটুর নীচে পর্যন্ত ঘাস ফুল, এবং নানা রঙিন ছিটের কাপড়ে ঘা তৈরি, আর মাথায় গোল কাপড়ের টুপি (মাটিন অথবা হাতির কাপড়ের), পায়ে চপ্পল, এই বেশের জাতীয়তা-ভাবমূর্ত্তি রোজবা ভদ্রলোকও গ্রহণ করত। সাধারণতঃ সাদা বা নীল রঙের কাপড়ের, গোড়ালি পর্যন্ত আলখাল্লা পরা হাউগা বা অন্ত জাতীয় মাহুও অনেক দেখা যায়। যেহেতু বেশির ভাগই একটা বেশ 'চকাকক' নানা

রঙের নকশাগুলো ছাপা কাপড় মুদ্রিত মত ক'রে কোমরে ঝড়িয়ে পরে। একটু অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা গায়ে একটা রঙিন কাপড়ের জ্যাকেট পরে। কেউ কেউ মুদ্রিত মত কাপড়টা ব্রকের উপরে বেঁধেই আবার রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুই কাঁধ খোলা। অনেকেই আর-একখানা কাপড়ে শিশুসম্মানকে পিঠে বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বেয়েরা পৃথিবীর অন্য নানা দেশের মত এখনও উন্নতি অনাহৃত রাখে। আফ্রিকান মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ লম্বা চুল রাখবার রীতি নেই, চুল ছোট ক'রে কাটে, আর কোথাও কোথাও মাথা একেবারে ব্রাডা ক'রে রাখে। কিন্তু মাথায় কেশের অল্পতা বা সম্পূর্ণ অভাবকে এরা অল্প ভাবে মানিয়ে নেয় — মাথায় একখানা রঙিন কাপড়ের কমালের মতন পাগড়ির আকারে ঝড়িয়ে রাখে। এদের গায়ের কালো রঙের সঙ্গে মাথার কাপড়ের, গায়ের জ্যাকেটের, আর পরিষেয় বসনের বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণদ্যাবেশের ফলে যে একটি রঙের খেলা দেখা যায়, সেটি বিশেষ নয়নাভিরাম। বেয়েরা মাথায় যে কাপড় ঝেঁপে সেই কাপড়টা একটা বীড়ার মত কাজ করে, আর কিছু জিনিস-পত্র কিনলে বা নিয়ে যেতে হ'লে নেয়েরা মাথার উপরেই রাখে। নেয়েরা সাধারণত বালি পায়েই ঘরে আর বাইরে পথে-ঘাটে ঢলা-কেনা ক'রে থাকে।

লেগস শহর একটি বীপের উপরে। এক সময়ে এই জায়গাটা প্রায় সম্পূর্ণ জলাভূমি ছিল। পোতাশ্রয় আর অল্প ইউরোপীয় বণিক জাতি আসার ফলে এখন একটি বেশ বড় বাণিজ্যকেন্দ্র আর পরে বিরাট শহর গড়ে উঠেছে এখানে। লেগস শহরটিকে এখন একটি লম্বা পীকো ঘিরে জলের ওপারের দেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে। লেগস যোকবাদের দেশে হ'লেও, নাইজিরিয়ার রাজধানী ব'লে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আর পশ্চিম-আফ্রিকার নানা স্থানের বহু লোক এখানে এসে বাস ক'রছে।

আমি ওদেশে গিয়েছিলুম ঔষধকার মাছ দেখতে; কিভাবে শিকা ও সন্তুতির প্রসার এসেছে দেখা হ'চ্ছে বা সংরক্ষণ হ'চ্ছে তাই দেখবার ক্ষেত্রে। সমগ্র নাইজিরিয়া দেশের উপরে আছেন একজন ইংরেজ গভর্নর, এবং এই গভর্নরের নীচে আছেন তিনজন প্রাদেশিক গভর্নর। নাইজিরিয়ার গভর্নর Sir John Macpherson স্তর জন ব্যাক্সফার্ডন ছিলেন স্থানীয় লোকেরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল যে দেশের লোকেরা স্বাধীনতা লাভ করে। আমি যখন লেগসে পৌঁছাই তখন তিনি ইংল্যান্ডে ছুটিতে গিয়েছিলেন; কিন্তু আমি থাকতে থাকতেই তিনি ফিরে আসেন, আর সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার লেগস-পরিভ্রমণের পূর্বের দিন, ৮ই আগস্ট, প্রায় আধ ঘণ্টার উপর খ'রে আলাপ-আলোচনা হ'য়েছিল। সে কথা পরে বলবো।

আমার নাইজিরিয়া-ভ্রমণের ব্যবস্থা করবার ক্ষেত্রে সহকারি-সেক্রেটারি Mr. Smith মিষ্টার স্মিথের আপিসে গেলুম। ইনি একজন অল্পবয়সী ইংরেজ, খুব ভদ্র, তবে খুব বেশি দয়ালু বা আগ্রহশীলতার ভাব দেখালেন না। যেখানে যেখানে আমার হাওয়ার কথা ছিল অথচ হাওয়া হ'ল না, সেখানকার সেখানকার কর্তৃপক্ষের চিঠি লিখে সেবার ভার নিলেন। যোকবাদের দেশ দেখা শেষ ক'রে, লেগস থেকে উত্তর-নাইজিরিয়ার কোনো বাবার হাওয়াই-মাছাছের টিকিট ঠিক ক'রে রেখে সেবেন, কথা হইল। অল্পত্র দ্বাভার কথা পাকা ক'রে জানিয়ে গিলেন। শহরে শানিক ঘুরে একটি লোকানো নাইজিরিয়ান বা যোকবা-শিল্পীদের জাঁকা ছবি আর কাঠের মূর্তির দোকান পেলাম। দোকানটির নাম হ'চ্ছে Nigerian Art Centre, আর এর প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী শ্রীকৃষ্ণ A. Orisadikpe ওরিসাদিক্কে, অতি সম্মান ব্যক্তি, আমাকে সমস্ত দেখালেন। এখানে একরকম খুব হালকা কাঠ, তাকে ইংরেজিতে thorn-wood বলে, তা থেকে অতি সুন্দর সুন্দর

যোক্কাবা দেশে

ছোট ছোট মূর্তি এদের নিদ্রার তৈরি করেন— আমাদের কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের মত নানা type অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তির বা বিভিন্ন কার্যে রত নানা বস্তুদের মধ্যে আর পুতুলের মূর্তি। এগুলির গঠনরীতি অতি স্বন্দর, আর নিছক প্রকৃতির অঙ্কারী না হ'লেও জীবন্ত ব'লে লাগে। পরে একদিন এর দোকানে আমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়ে এ'র সঙ্গে ছবি তোলাতে হ'ল, আর ইনি আমাকে নিজের তৈরি একটি ছোট মূর্তি উপহার দিলেন। আমি শানসে এ'র বদনের শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার প্রগতি ক'রে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি পত্র লিখে নিলুম।

আমি দুপুরবেলা, এখানকার গভর্নেন্ট হাউসে, স্তর জন ম্যাক্‌কালুগনের অবর্তমানে যিনি গভর্নরের কাজ ক'রছেন, ডেপুটি গভর্নর Sir Hugo Marshall স্তর হিউগো মার্শাল-এর সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন ক'রতে হ'ল। বেলা একটার সময় গভর্নরের একজন এডিকং হস্টেল থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন। স্তর হিউগো মার্শাল একজন ভারিভি চেহারা'র ইংরেজ, solid qualities ব'লেলে বা বোঝাব যেন সেই গুণের মানুষ, এরাই নানাভাবে ব্রিটেনের প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতা গ'ড়ে তুলতে সাহায্য ক'রেছেন। এ'র সেক্রেটারি একজন খুব চাঙা ইংরেজ, ব্যবহারে বিশেষ ভদ্র। আহা'রের আগে পানীয় এল, আমরা সকলেই লেমনেড-স্নাতীয় জিনিস পান ক'রলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে নানা আলোচনা আরম্ভ হ'ল। ভোজনের সময়েও তাই। মোটের উপর দেখলুম যে, এইসব ইংরেজ কর্মচারী, ধারা এই দেশটিকে গ'ড়ে তুলেছেন, তাঁরা সকলেই একরকম মন স্থির ক'রে ফেলেছেন যে এই কালো মানুষদের দেশে স্থানীয় লোকদের হাতেই তাঁদের স্বাধীন-পরিচালনার ভার তাঁরা তুলে দেবেন। মে'র লোক জ্ঞান-স্বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মনেপ্রাণে শাবলক হ'চ্ছে, ইংরেজ আর মোর ক'রে তাদের উপর প্রভুত্ব ক'রতে পারবে না। যেখানে প্রভু আর শাস সম্পর্ক আর সম্বন্ধ নথ, যেখানে বন্ধুর মত ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত—এই সহজ বৃত্তির কথা ইংরেজ মেনে নিতে পারছে বলেই এখানে ইংরেজের দৌরব। আমাদের দেশের সম্বন্ধে এ'দের কাছ থেকে কোনোবাক্য বিকৃত ভাব প্রকাশ পেল না, মনের কথা বাই হোক না কেন। Factum Valet—বা হ'য়ে গিয়েছে তাকে যেন নেওয়ার স্বত্ত্ব ইংরেজের আছে। একটা জিনিস দেখলুম, এরা কেউ আমেরিকাকে পছন্দ করে না। আমেরিকা চার দিকে টাকা ঢালাচ্ছে বটে, কিন্তু আমেরিকার অঙ্গদৃষ্টি নেই, তাদের হুমকতা নেই, তারা ভাগা-ভাগা অভিন্নভাবেই সার করে। এইসব কারণে তাদের কেউ পছন্দ করে না, এইরকম ধরণের কথা শুনলুম।

তিনটের দিকে হস্টলে ফিরে এলুম। স্টোয়ারার আপিস থেকে গাড়ি এলে, একাই শহরে বেড়াতে বেরোলুম। ইচ্ছে ছিল, একটা সরকারি গ্রন্থাগার-ঘরুরে বাই, নাইজিরিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি বই কেনবার ক্ষেত্রে, কিন্তু আমার গাড়ির চালক সে ঘরের খুঁজে বা'র ক'রতে পারলে না। এই চালকটির নাম William উইলিয়াম—বিশুদ্ধ যোক্কাবা আফ্রিকান, ইংরেজিও বেশ জানে। এ-ই পরে আমাকে এদের আপিসের গাড়ি করে ইবাধান ও ইফে শহর দুটি ঘুরিয়ে আনে। লম্বা চেহারা'র মাছঘটি, অতি যত্নসাহা, বেশ ভদ্র আর কর্তৃশীল। আমরা একটু বিজ্ঞাত হ'য়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ঘুরছি, এমন সময়ে একটি আফ্রিকান যুবক আমাদের সাংঘাত্য করবার ক্ষেত্রে আগ'বাড়া হ'য়ে এল। সে কাছেই Daily Post ব'লে এক ইংরেজি সংবাদপত্রের আপিসে নিয়ে গেল, সেখানে কিছু কেউ কিছু খবর দিতে পারলে না। এই যুবকটির পরিচয় নিলুম, তার নাম J. A. Makoli জে. এ. মাকোলি—তার বাড়ি নাইজিরিয়ার নথ, পশ্চিম-আফ্রিকার হুদু পশ্চিমে Sierra Leone সিয়ারা-লিওনি রাষ্ট্র। এখন লেগেলে বিশ্বস্তির মিশ্রি। একে আমি নাইজিরিয়ার শিল্প-

প্রবাস কথ্য ভিজ্ঞান করলুম। এ আশায় ব'ললে, কাছেই বেনিন শহর থেকে আগত কাঠের খোলাইকারদের একটা আড্ডা আছে, সেখানে আবলুস কাঠের নানা মূর্তি আর হুন্সর হুন্সর মিনিস পাওয়া যাবে। আমি গানেশে তার সঙ্গে সেই আড্ডায় গেলুম। গাড়ি বড় রাস্তায় যাইল, নাকালি আমাকে দুই-একটি ছোট রাস্তা দিয়ে তাদের আড্ডায় নিয়ে গেল (Legos Association of Benin Carvers, 16 Tinubu Street)। এখানে বড় বড় আবলুস কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে, আর একটা কাঠে ঢাক। লম্বা ঘরের মধ্যে গুটি মশপনেয়ে। শিল্পী বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে শক্ত আবলুস কাঠ কেটে কেটে মূর্তি আর নানা আগবাব বানাচ্ছে। এই জায়গাটার পৌছবার পথে কতকগুলি আফ্রিকান শ্রমিকদের বাবার আড্ডার ভিতর দিয়ে যেতে হ'ল— সেখানে নেহেরা একেই প্রধান খাদ্য Fonfou 'ফুফু' অর্থাৎ মানকচু-লিঙ্গ চটকানো আর বাড়ির মতন নলিপাকানো, আর Palm-oil Chop অর্থাৎ একটা হাছের ও মাংসের ও সবজির ঝোলের মতন তৈরি ক'রছে, বিক্রি করছে। এই Palm-oil Chop এসেণের একটি বিশিষ্ট খাদ্য, ভারতের Curry-Rice এর মত ফুফু ও পাম-অয়েল চপ এসেণের প্রধান খাদ্য। 'চপ' মানে 'খাদ্য' বা 'বাহন'।

পশ্চিম-আফ্রিকার একরকম নারকেল-জাতীয় গাছ হয়, সেই গাছ উচ্চতায় নারকেল গাছের মতন, কিন্তু তার পাতা খেজুর-পাতার ধরণের। ফল হয় ঠিক অনেকটা খেজুর বা সুপারির মতন, থোকা থোকা। ফলের উপরটা হলদে' আর এই ফলের ভিতরে কালো রঙের বিচি হয়। এই ফলের শাঁস আগ বিচি পিষে তেল বার করে, শাঁস থেকে যে তেল বেরোয় সেটা এসেণের একটা প্রধান খাদ্য। আমাদের সেণের সরষের তেল, হাফিঙ্গ-সেণের তিলের তেল, কেরলের নারকেল-তেলের মতন এই পাম-অয়েল এসেণের রাসায় ব্যবহৃত হয়। এই পাম আবারের সেনে জন্মায় কি না আর আবারের সেনেও আপন উদ্ভিদ সম্পদ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে কি না তা দেখা উচিত। Oil-Palm অয়েল-পাম-এর বাঙলা কি করা বাব ? 'তৈল-বর্জ্য' বা 'তৈল খেজুর', অথবা 'তৈল-গব্য' ? কিন্তু ফলটা খেজুরের মতন মোটেই নয়, বরং সুপারির মত। নানা রকমের সবজি— আলু, ঢেঁড়স, বেগুন, টমাটো, দিম প্রভৃতি মাছ বা মাংসের টুকরোর সঙ্গে হাড়িতে দিচ্ করে, এখানে একরকম সিমের ডাল হয় সেই ডালবাটা প্রচুর সেহ, আর সেহ লম্বা আর অল্প মসলা-জাতীয় উদ্ভিদ, আর তার উপরে সেহ এই গুহাক-তৈল বা গুহা-তৈল। এই 'পাম-অয়েল চপ' আমি ওসেণে খেয়েছি এবং আমার চমৎকার লেগেছিল। এইসব আফ্রিকান শ্রমিকদের বাবার আড্ডার মধ্যে, লাটবাড়িতে ভরপেট খেয়ে আগবার পরেও পাম-অয়েল চপের সৌরভ মন লাগছিল না।

কাঠের কারিগররা সবাই লেগল থেকে অনেক দূরে বেনিন নগরের লোক, আর এরা হ'চ্ছে ভাবায় আর জাতিতে Edo এদের— হোন্সবাসেরই নিকট-সম্পৃক্ত, কিন্তু ঠিক বোকবা নয়। পশ্চিম-আফ্রিকায় বেনিন একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। এগন থেকে পাচ-শ বছর আগে, যে সময়ে পোর্টুগীজরা এ অঞ্চলে বাবলার উপলক্ষে আগা শুরু করে দিয়েছে, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ পনের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বেনিনের শিল্পীরা কাঠখোলাইয়ে, হাড়ির দাঁতের কামে আর ত্রক বা কাংসের ঢালা মূর্তি আর চিত্রকলাকে অসুত ত্রুতিব বেঁধিয়েছিল, এ কথা আগে বলেছি। এই-সময় কাককাণ্ডা বিদ্যুৎ আফ্রিকান জাতির ক্রুতিবের পরিচায়ক। কোথা থেকে এরা এই ত্রক-ঢালাই কাণ্ড শিখেছিল তা ঠিক-বত জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ হুপ্রাচীন যুগে মিসর আর তার পরে রোদক সাম্রাজ্য থেকে এই শিল্পরীতি পশ্চিম-আফ্রিকার ক্রুতবর্ষ জাতির মধ্যে সংক্রামিত হয়, আর পরে বেনিনের এরা জাতির হাতে, আর ইফে শহরে আর অল্প বোকবা জাতির হাতে এই ত্রক-শিল্প একটা

রোক্তবা দেশে

অতীতপূর্ব উন্নত শিল্পের স্থান গ্রহণ করে। ইংল্যান্ডের রোক্তবা ব্রত-শিল্পের ইতিহাস বেনিনের চেয়ে আরও অল্পতঃ পাঁচ-শ বছরের পুরানো— খ্রীষ্টীয় এক হাজারের দিকের ব্যাপার। ১৮২৭ সালে ইংরেজরা বেনিন নথল ক'রে, সেখানকার শিল্পজগতের লুট ক'রে আনে, আর এই লুটের নাল ব্রিটিশ মিউজিয়মে আর বালিনের নৃত্য-বিবরণ সংগ্রহশালায় জমা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আলোচনা শুরু হয়। বেনিনে মূর্তিশিল্প, বিশেষতঃ কাঠে মাটিতে আর ব্রত, এখনও টিকে আছে। আজকাল ইউরোপীয় কলারগিক-মহলে বেনিনের আর আফ্রিকার অন্ত স্থানের শিল্পের উপযুক্ত বিচার আর সমাদর হওয়ার ফলে, অনেকের দৃষ্টি আফ্রিকার অবজ্ঞাত কালো মানুষের স্বকীয় শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছে, আর অল্পবয়সে চাহিদাও এর বাড়ছে। বেনিনের কতকগুলি কাঠের শিল্পী রাজধানী লেগসে একটা আজ্ঞা ভাঙিয়ে নিজেদের হাতের কাজ বিক্রি করার সুবিধে পেয়েছে। এরা আবলুস কাঠের চমৎকার ছড়ি তৈরি করে, ছড়ির হাতশে হুন্দর ভাবে খোঁদা আফ্রিকান মানুষের মুখ ও তা-ছাড়া এই কালো আবলুস কাঠের আফ্রিকান মেয়ে ও পুরুষের ছোট-বড় আবক্ষ মূর্তি, আর নানা রকমের বস বা দাঁড়ানো মূর্তি। কতকগুলি মূর্তি আবার বিভিন্ন আলো বসাবার জন্যে তৈরি হ'য়েছে। এ-ছাড়া আবলুস কাঠের নানা রকম আসবাব, কটোরা ও অন্ত পাত্র ইত্যাদি এরা তৈরি করে। এদের এই কর্মশালায় সেবলুম, এরা গল্পগল্প ক'রতে ক'রতে হাসিঠাট্টার মধ্যে নিজেদের কাজ ক'রে যাচ্ছে। মাকোলির সঙ্গে আমি হারিয়ে হ'তেই, বিশেষ বহিষ্কার বুঝে এরা আমার ঘিরে দাঁড়াল, আর নিজেদের হাতের কাজ দেখাতে লাগল। আমি ১৫ শিলিং দিয়ে, হাতলে আফ্রিকান মানুষের মুখ এরকম একটা ছড়ি কিনলুম, আর একটি ছোট আফ্রিকান বা ও শিশুর মূর্তির ফরমাশ দিলুম, সেটা ছবিদের মধ্যে তৈরি ক'রে চেলারামের মোকানে পাঠিয়ে দেবে। ৫ শিলিং বায়না নিলে, আর দামের বাকি ১০ শিলিং জিনিস পৌছে দিয়ে নেবে। যে কাহিগর এ মূর্তি তৈরির ভার নিলে তার নাম Immanuel Obayagbome ইম্মানুয়েল ওবায়াগোমে। নামে লোকটি খ্রীষ্টান বটে, কিন্তু এদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম উপর-উপর ভাগা-ভাগা ভাবে প্রচার হ'য়েছে মাত্র। এই দৃশ্য ক'রে আমার বেশ ভালই লাগল।

মাকোলি আমার আগ্রহ বুঝে, কাছেই লেগস শহরের সেন্ট লোকসের এক বড় বাজার ছিল, আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। বাজার আবারের শেষের বড় শহরের বাজারেরই মত, অনেকটা অপরিষ্কার, তবে লগাশস্তব লাক-সুন্দর। গ্রন্থবাহ্য চেষ্টা আছে। বিভিন্ন প্রকারের জিনিসের জন্য বাজারের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট আছে। যেমন কোথাও নানা রকমের ছাপা ছিটের কাপড়, বেশির ভাগ ইংল্যান্ড থেকেই আমদানি, স্থানীয় উত্তে হাতে বোনা লক লক কালি কাপড়, বেশির ভাগ নীল আর কালো রঙের ছক আর ছড়ির নকশা; কিছু ভারত থেকে আমদানি বস্ত্র আছে, যেগুলি এদেশের মেয়েরা আধা-পাগড়ি আধা-কমাল হিসেবে মাথায় বাঁধে। অন্ত নানা জিনিসপত্রের, কাঁচা খাদ্যবোর, তামা ও তুটিকি মাদের, মাংসের পসরা বিভিন্ন আরগায় দেওয়া। বাজারের বাইরে মুসলমান হাউসা-আভীয় ব্যাপারীরা বাস্তার উপরে কাপড়ের খুপ লাগিয়ে বিক্রি ক'রছে, এরা এসেছে উত্তর-নাইজেরিয়া থেকে। দু-একজন ওরই মধ্যে পুখ-মুখে নখাল পড়ছে, পশ্চিম-আফ্রিকা থেকে বস্তার দিকে মুখ ক'রতে গেলে পুখ দিকেই মুখ ক'রতে হয়। মাকোলি একজন আফ্রিকান ভদ্র-বুড়ি জাদু-টোনার নাল-মলার মোকানে নিয়ে গেল। এরকম দু-চারটি মোকান আফ্রিকার বাজারে বা হাটে থাকবেই। এখানে অনেক রকম অপ্রত্যাশিত এবং বীভৎস জিনিসের সমাবেশ দেখলুম— ছোট ছোট বাদ্যের স্তম্ভা মাথা, রক্তাক্ত জানোয়ারের মুণ্ডের পরিষ্কার করা কবাল, নানা পাখির পালক,

গুনানো গো-গাণ ভাতীঃ জানান্যায় ইত্যাদি, আর বিভিন্ন গ্রাছের শিকড় লতা ও গুনানো পাতা, ছোট ছোট চামড়ার চৌকো ব্যাগের মতন তার ভিতরে কোরানের আবেং লেখা কাগজ (মাদুলির মতন এইসমস্ত চামড়ার ভাবিষ্ক অমূল্যমান থোকাবা ও অস্ত্র আফ্রিকানেরাও ব্যবহার করে), যোদ্ধাদের দেবতার কাঠের মূর্তি ও তাদের দেবার্ণার কাঠের পাত্র, আর এ-ছাড়া প্রাচীন প্রস্তরযুগের চু-চাংটে ছোট অস্ত্র, যেমন বর্শার ফলা, তাঁরের মুখ, হুডুল ইত্যাদি— এগুলিকে এরা মনে করে যোদ্ধা দেবলোকের ইশ্র, বস্ত্রের দেবতা, Shaugo শাকো। কতৃক নিষ্কিপ্ত বস্ত্রাশ্র বা বাজের পাথর। যোদ্ধা দেবতারের মূর্তির সম্বন্ধে আমার আগ্রহ দেখে এইরকম একটি সোকানের মালিক তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে, সেখানে নাকি বিক্রির সঙ্গে রাখা অনেকগুলি মূর্তি আছে। আমি হাওয়াই সাহাজেই ঘুরেবা, ভারী বড় কাঠের মূর্তি, তাও আবার বেশি নাম দিয়ে কিনে, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আমি ছিলুম ছোট-খাট কাঠের বা হাড়ির দাঁতের মূর্তির সন্ধানে, যা অন্যায়সে হুটকেসে ক'রে নিয়ে আসা যায়। আর এইরকম দুই-একটি হাড়ির দাঁতের জিনিষ গোষ্ঠ-কোটে সংগ্রহও করেছি। শাকোর বস্ত্রের পাথর একটি ১০ শিলিংে বিক্রি ক'রতে চাইলে। কিন্তু তার প্রতি আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। মাকোলি সঙ্গে থাকায়, লেগসের সৌন্দর্য লোকদের দৃষ্টির মতো একটা চান্দ্র পরিচয়ের এই হুবোপটি বেশ উপভোগ করা গেল। মাকোলির বড় ইচ্ছা যে সে কোনোরকমে ভারতবর্ষে এসে তার নিজের আলোচ্য বিভ্রাৎ-বিভাগ্য প্রয়োগ-শিল্প আশ্রয় ক'রে যায়; আর এদেশে ঘুরে যা বুকলুন, ভারতবর্ষ এসে ক'রে যে একটি কলনার রাজ্য হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই ভারতবর্ষ দেখে যায়। ভারতবর্ষের প্রতি এদেশের লোকের মনে একটি গভীর প্রভা এনে গিয়েছে— ভারতবর্ষ প্রাচীন আর সুবড়া দেশ বলে ততটা নয়, বড়টা এই কারণে যে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাত থেকে সম্প্রতি উদ্ধার পেয়েছে, যে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা এসে মধ্যও দেখা দিয়েছে; আর জবাবদার প্রথম ভারতবর্ষের নেতারা মৃতকণ্ঠে সান্নাধ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত অবস্থে জাতির মূর্তির নাবি প্রকাশ ক'রছেন, এই কারণেও বটে।

মাকোলির কাছে বিদায় নিয়ে আমি চেলারামের সোকানে ফিরে এলাম। চেলারামের বড় সোকান সমুদ্রের ধারে Marina বানিনি নামে বাগ্গার উপরেই। বেশ বিরাট এদের সোকান, গরান বা আড়ত নিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে। সোকানের উপরতলায় এদের ভারতীয় কর্মচারীরা থাকে। অল্প মাইনের কর্মচারীরা কেউ পরি-বায় নিয়ে আসে না। দু বছর আড়াই বছরের মেয়াদে এরা কাজ করে, তার পরে মালিকের খরচায় হাওয়াই সাহাজে দু মাস এক বছরের মধ্যে দেশে ফিরে যায়, আবার ছুটি ফুরোলে ফিরে আসে। এইসব কর্মচারী স্থানীয় ভাষা বেশ চটপট আয়ত্ত ক'রে নেয়। শিকী বানিনি বা বাবগারী জাতির লোকের মধ্যে বোধ হয় পৃথিবীর সব ভাষা বলতে পারে এমন লোক পাওয়া বাবে— অর্থাৎ ফেল দেশে এসে কামকর্ম চলে। চেলারামের এই কারবারে জন পয়তাল্লিশ শিকী কর্মচারী আছে, আর তা ছাড়া শতখানেক আফ্রিকান কর্মচারী; এ ছাড়া আফ্রিকান কুলি মজুর তো আছেই। এদের হেড-কার্ক একজন যোদ্ধা ডব্রলোক, তাঁর নাম Josephus Oluwale Majole যোসেফাস জুম্বোলে নামোলো। লোকটি বেশ বুদ্ধিমান, কিছু পড়াশুনাও আছে, ঈষ্টান ফলেও মনে প্রাণে বাঁটি যোদ্ধা, এবং বাতির ক'রে আমার সঙ্গে যোদ্ধা-ধর্ম-সংক্রান্ত একটি দুস্তাপা বই, খেটে সংগ্রহ করবার আমার ইচ্ছা ছিল, সন্ধান ক'রবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কথা শুনে মনে হ'ল তাঁর ভারতীয় মনিবের কাছে কাজ ক'রে বেশ আনন্দেই আছেন।

যোদ্ধা দেশে

শ্রীলঙ্কা রূপচন্দ্ৰ-এর সিদ্ধি কর্মচারীর আদর্শে নিয়ে এদের কারবারের বিভিন্ন বিভাগ দেখাশোনা। বেশ বড় Departmental Store-এর মতো, ব্যাপার। বহু বহু প্রকারের জিনিস পাওয়া যায়, যদেরও প্রচুর, আফ্রিকান ও ইউরোপীয়। কাপড়চোপড় পোশাক-পরিচ্ছদের দিকটাই বড়, আর ত্য-ছাড়া বহুপ্রকারের ঘরগৃহস্থলি জিনিস আছে, নানা আধুনিক শ্রমসামগ্রী বহুপাতিতরও আমদানি করা করেন, শখের জিনিসও প্রচুর। পশ্চিম-আফ্রিকার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভালো, এরা পান-অয়েল বা জ্বাক-ইতল, কোকো, আর চিনেবাসান প্রচুর রপ্তানি করে। প্রথমোক্ত দুটি জিনিসের উৎপাদন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এই দেশেই হয়। কোকো থেকে চকোলেট হয় এবং এই চকোলেট-নিষ্ঠাই না হলে পাশ্চাত্য জাতির চলে না। এ-ছাড়া কফি আছে, নানা উদ্ভিদ এবং গমের পথারও আছে। এইসব জিনিস বিদেশে চালান করে এদের হাতে নগদ টাকা বেশ ভালোই আসে। খাণ্ডনস্তের দিকে এরা তেমন নজর দেয় না, কারণ খাবার জিনিস আর বিলাসের জিনিস এরা টাকা ফেলে কিনতে পারে।

চেলারামের বহুবিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য পাওয়া গেল। শ্রীলঙ্কা রূপচন্দ্ৰ ও তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে। স্থানীয় আফ্রিকানরা আগে তাঁদের ছোট ছোট লম্বা কালি কাপড় তৈরি করে, এখনও করে। সহজ সহজ কতকগুলো নকশা। মাঝে মাঝে উপর নীল আর কালো রঙের মতোয় এরা তোলে। এই কাপড় সাধারণতঃ আধ হাতের বেশি চওড়া হয় না, তাই এই কালি কাপড় পাশাপাশি অনেকগুলি রেখে সেলাই করে চাদর তৈরি করে। সেই চাদর এবেশের লোকেরা গায়ে জড়াত, বা তা থেকে আলখালায় মত পোশাক তৈরি করে। যেহেতুও সেইরকম চাদর লুটির মত পরত, আর উর্দু সাধারণতঃ অনাবৃতই রাখত। এখন এদের পরবার কাপড় বেশির ভাগ ইউরোপ থেকে আসছে। আগে আফ্রিকানরা কাঠের ব্লকে নকশা খুঁবে নানা রঙ নিয়ে সেই নকশা কাপড়ের উপর ছাপত। আর এইভাবে লাল নীল হলদে' কালো প্রভৃতি গাঢ় রঙের ছাপা অসংকরণে এদের পরনের কাপড় আঁত হুল্লর দেখাত। কিন্তু এই প্রাচীন তাঁতে-বোনা ছাপা কাপড়ের পাট উঠে যাচ্ছে বা গিয়েছে। এখন ইউরোপ থেকে—ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স থেকে—নানা রকমের আর বিভিন্ন রঙের হুল্লর বা সুস্টিত নকশার ছাপা ছিটের কাপড় আমদানি হয়, আর এবেশের পুরুষ ও মেয়েরা এইসব উজ্জল বর্ণসামান্যের অতুতদর্শন কাপড়চোপড় পরে থাকে। এদের ঘনত্বক দেখেছকের সঙ্গে এইসব গাঢ় উজ্জল রঙের কাপড় বেশ খাপ খায় কিন্তু। আগে ইউরোপীয় ও সিরিয়ান বণিকেরা এই আমদানি ব্যবসায় একচেটে করে নিয়েছিল, কিন্তু এখন সিদ্ধীরা এই কাজে নিজেদের একটা স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধীরা ভারতবর্ষকেও ভোলেন নি। এসেছে ভারতবর্ষের কলার কাপড় হুবিধে পেলেই চালিয়ে যেন, কিন্তু বেশির ভাগ এরা মাত্রাজের তৈরি হাতে-বোনা লুঙ্গি-জাতিয় কাপড়ের কারবার করেন, এবং এর একটা বড় বিক্রয়ক্ষেত্রও এসেছে এরা গড়ে তুলেছেন। এখানকার মেয়েরা মাথায় একখানা করে গামছার মতন নকশাদার রঙিন কাপড় জড়িয়ে রাখে। এই মাথার কাপড় এদের মেয়েদের শোণালকের অপরিহার্য অঙ্গ। এই মাথার কাপড় সাধারণতঃ দু' গজ লম্বা আর ছত্রিশ ইঞ্চি বহরের হয়, নকশাগুলি কাপড়ের সম্বন্ধে বোনা হয়ে থাকে। কতকগুলি নয়নাডিরাম সেকেন্দ্রে আফ্রিকান নকশা আছে—ছাল চক, নীল বা কালো ত্রিকোণ, হলদে' চক বা রেখা ইত্যাদি; সহজ নকশা, কিন্তু কতকগুলি মৌলিক বর্ণের সম্বন্ধে নয়নমুদ্রকর। নোতুন নোতুন নকশাও এরা পছন্দ-মত গ্রহণ করে। নীল আর কালো রঙেরই প্রাধান্য বেশি। মাত্রাজি তাঁতিরা সিদ্ধি ব্যাপারীদের নির্দেশমত এই ছত্রিশ ইঞ্চি বহরের কাপড়ের আটগুণি খান বুনেন। চেলারামের কার্য

প্রতি মাসে এক হাজারের উপর এইরকম কাপড়ের গাঁট ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করেন। প্রত্যেক গাঁটে থাকে এইরকমের ১২০টি আটগম্বি ধান। সমগ্র পশ্চিম-আফ্রিকায়, যারী ভাষা ইকোনেসিয়া আর আনাসের মনিপুরের মত, দেহেরাও ছোটখাট ব্যবসা করে, বোকারা চালায়। এই যেহে বোকানিরা পাইকারি দরে ভারতবর্ষের তাঁতে-বোনা এই কাপড় কিনে নেয় আর একবারি আট-গম্বি ধানকে দু-গম্বি চার টুকরো করে কেটে খুঁচরে বিক্রি করে। এতে এসের বেশ লাভ থাকে। জনপ্রিয় নকশা এসে কাজাকাড়ি প'ড়ে ঘর, আমি ইবানান শহরে পরে অনেক এরকম কাজাকাড়ি দেখি, সে এক নোতুন অভিজ্ঞতা। শ্রীকৃষ্ণপলন্স আমাকে ব'ললেন যে, এই ভারতীয় তাঁতে-বোনা কাপড়ের ব্যবসা এখন বেশ বিস্তৃতি লাভ ক'রেছে। কিন্তু এর মধ্যে আবার আপানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসে যাবে। তাপানীয়াও আফ্রিকার বাহ্যারে স্থান ক'রতে চায়; তা'দের ব্যবসায়ের প্রতিনিধি পাঠিয়ে, নিজেদের কাপড়ের প্রচারও তারা করছে। কিন্তু আফ্রিকানদের একটা যান্ত্রিক মন্বিত সৃষ্টি থাকার, ভারতের হাতে-বোনা কাপড়ই তারা পছন্দ করে। ভারতের উত্তির এই কাপড় বোনবার সময় হুতোর পাটের দ্রুত চলু ব্যবহার করে, আর সেই হলুদের গন্ধ অনেক আফ্রিকানের ভালো লাগে। জনসুখ, তাপানীয়াও ব্যাপারটা টের পেয়ে, তাদের নিজের কাপড় এই হলুদের গন্ধ দেবার চেষ্টা ক'রেছে; কিন্তু এখনও ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা আছে। আমার খুব লোভ হ'ল্লিল, কতকগুলি খাটি আফ্রিকান নকশার নমুনা হিসাবে পাচ-বপ টুকরো এই ভারতীয় কাপড় নিয়ে আশি, কিন্তু এরা তো আটগম্বি ধান ছাড়— আর তাও পাইকারি হিসাবে ছাড়— বিক্রি করেন না। আর আমার সময়ও ছিল না যে, এসেদই বরিকার কোনো মেয়ে বোকানির কাছ থেকে খুঁচরো হিসেবে কিনে নিই।

এটম্ব দেখতে দেখতে বেলা প'ড়ে এল। লেগলো ছদ্দিন যাত্রা থাক্বে—এরই মধ্যে আমার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত দুই-একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে নিতে হবে। ১৯১২-১১ সালে যখন লওনে ছাত্র ছিলুম, তখন একটি রোক্ষা ছাত্রের সঙ্গে খুব পরিচয় হয়, তার নাম ছিল Benjamin Akiareuni Fadikpe বোকারি আকিনুয়েমি ফাডিক্কেপ। বড়ই সরল আর মিষ্ট ছিল এই ধীর্ঘবধু আফ্রিকান ছেলেটি— তার সেনের অনেক কথা আমাকে সে ব'লত। ১৯২০-২১-এর পরে, লওনেই আর একবার এর সঙ্গে ১৯০৫ সালে দেখা হয়। বন্ধুর ডাক্তার শপথর সিংহ (এখন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় Ministry of Information & Broadcasting অর্থাৎ বৃহত্তা এবং প্রচারবর্ষীয় দপ্তরের Publications Division অর্থাৎ প্রকাশনবিভাগের অধ্যক্ষ) আর তাঁর স্ত্রী (ইনি ইউরোপীয় মহিলা) লওনে একটি পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রয়ের সোকান ক'রেছিলেন। সেই সোকানকে অবলম্বন করে নানা বিশেষীয় ছাত্র ও দূরকদের একটা নিলনকেন্দ্র ১৯০৫ সালের আগ-পাশে লওনে গ'ড়ে উঠেছিল, ফাডিক্কেপের সঙ্গে আমার সেখানে আবার দেখা হয়। পরে খবর পাই, ফাডিক্কেপের মৃত্যু হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণ Herbert Macaulay হার্বার্ট মেকলে ব'লে একজন রোক্ষা ইমিনিয়ারের সঙ্গেও ইংলান্ডে আমার আলাপ হয়। ইনি নাইজিরিয়ার ফাদিনতা-সংগ্রামের অন্যতম নেতা ছিলেন; আর পূর্ব-নাইজিরিয়ার অধিবাসিক নেতা ইবো-আজীয Dr. Azikiwe আকিকিত্তে, স্ত্রীর কথা আগে ব'লেছি, হার্বার্ট মেকলে ছিলেন তাঁর সহচর। মেকলে বহুদিন হল দেহরক্বা ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর প্রভাব ওমেদে এখনও আছে। ১৯২০ সালে আমি বকর-ইয়ের সময়ে, লওনের কাছে Woking উত্তরকি বলে একটি গ্রামে, ভোপালের বেগমের অর্থাৎহুস্লে ভারতীয় হুসলানরা যে একটি ছোট মসজিদ ক'রেছেন, সেই মসজিদে গিয়েছিলাম। আমার এক পাঠাবী

য়োরুবা দেশে

মুসলমান বন্ধু, যিনি ঐ বদজিলে বাগ ক'রতেন আর সেখান থেকে রোজ লগুনে আসতেন, আমাকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বকর-ইয়ের সম্বন্ধে যেতে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি আমায় বলেন যে, ঐদিন ওখানে নবাব প'ড়তে ইংল্যাণ্ড-প্রযাগী বড় ভারতীয় ও অন্ত্রাত দেশের মুসলমান সম্মান করা হ'য়ে থাকেন, এদের সঙ্গে আমার আলাপ হ'তে পারবে। আর একটা লোড সেখানেন তিনি— ধাতা ঐদিন বদজিলে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসবেন, তাঁদের বকর-ইয়ের চোখ খাওয়ানো হবে— গোলাও, কাবাব, মটন কোর্মা আর কিয়দ। বহুদিন পরে ভারতীয় খাওয়ার কথা শুনে রানার বদগ্রন্থ হল, আগ্রহ ক'রে আমিও ঐদিন আটটার টেনে বন্ধুর নির্দেশমত উগ্রকিং ঘাড়া করি। সেখানু প্ৰায় ৩০৭০ জন ভারতীয় ও বিভিন্ন দেশীয় মুসলমান সম্মান আমার বস্ত উগ্রকিং-এর টেনে ঘাড়া ক'রতেন। খুব লাল উচ্চ ডারবু বা তুর্কি টুপি পরা লম্বা-ডগড়া চেহারা কতকগুলি মিসরীয় ডব্রলোক; তা ছাড়া তুর্কি, ইরানী, মালাই, আর আফ্রিকার নানা দেশের মুসলমান। পতনের টেপনেই সেবলু, একটি গ্রোট আফ্রিকান ডব্রলোক, সাদা রঙের কাপড়ের মালবান। প'রে বাড়িতে উঠলেন; তাঁর মাথায় সাদা কাপড়ের গাফি-টুপি বস্ত একটি গোল টুপি, আর সেই টুপির সামনে কপালের উপর কালো রঙের রেশমের হুতোয় অক্ষরে ইংরাজিতে এই দুটি কথা বড় বড় ক'রে সেলাই ক'রে লেখা— Chief Oluwa সর্দার গুল্লা। এ মিনিসটি অকৃত লাগল— যদি আমাদের দেশের কোনো রাজা বা মিনার নিজের মাথার টুপিতে অতিরিক্তে নিজের নাম ঘোষণা ক'রতেন, সে এই রকম ব্যাপার হ'ত। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন, হাতে একটি লাল রঙের বড় ছাতা নিয়ে একটি খুব আফ্রিকান, এ ডব্রলোক গায়ে একটি লাল নীল মধু হলধে' কালো রঙের ছোপ সেওয়া চাপর গড়িয়েছেন, ডান ঠাণ্ড আর ডান হাতটি খোলা, রোমানদের টোপার মতন, গায়ে একটি সাদা হাত-কাটা জামা আমাদের পাভাবির মতন, মাথায় ঐরকম কাপড়েরই একটি কমালা বাধা। এদের সঙ্গে ইউরোপীয় পোশাক পরা দুটি বৃহৎ আফ্রিকান ডব্রলোকও উঠলেন। একজন বেশ লম্বাওড়া চেহারা, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল এবং মুখে লর্ড কিনেনারের গোটের মত এককোড়া সাদা গৌর, দীর্ঘ ঝুঁকি সেহে সোঁরা গাড়িয়ে; আর অত্র ডব্রলোকটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, গৌরনাড়ি কানানো, পরণে উলটো-কলার সমস্ত ক্রীটান পামরির কোট। এরা কে, আর কোথা থেকে আসছেন, কিছুই বুঝতে পারলুম না, তবে ঐটা বুঝলুম যে, সর্দার গুল্লা নিশ্চয়ই মুসলমান, এবং তিনি মরলে বকর-ইয়ের নবাবের জগে থাকেন। আশরা ঘণাকালে সর্দার ঘটাবানেকের মধ্যে Camberley কান্দাবলু টেপনে নাকলু, সর্দার গুল্লা এবং তাঁর সম্বন্ধে আফ্রিকান পোশাক-পর্য্য বৃহৎও নামলেন। বৃহৎটি সেমেই হাতের ছাটাটি খুলে সর্দারের মাথার উপর ধ'রলেন। এইভাবে ছদ্মগতি সর্দার গুল্লা ধীর-গভীর পদক্ষেপে টেপনের ভিতর দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আমাদের উগ্রকিং পদাঙ্ক হেটে যেতে হবে, সেটি মাইল-খানেকের পথ। ছোট গৈরো স্টেশন, ছুখানি মাত্র ট্যান্ডি ছিল, একটিতে সর্দার ও তাঁর সহধার্মীরা উঠলেন; আর মিসরের Khedive খদীর বা রাজার ভাই ছিলেন, তিনি নিজের লোকজন নিয়ে আর একটি ট্যান্ডি নিলেন। উগ্রকিং বদজিলে পৌঁছে, মুসলমান পুরুষেরা আর সঙ্গে কতকগুলি ভারতীয় আর অত্র প্রাচ্য দেশীয় মহিলা, আর বিবাহের দ্বারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন এরকম কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলা— এরা আলাদা আলাদা আশ্রয় স্থানান্তরিত কাতার দিয়ে নবাবের জগে গাড়লেন। আমরা অ-মুসলমান জনকয়েক আলাদা গাড়িয়ে এই সমবেত প্রার্থনা বেগতে লাগলুম। বদজিলের ইয়ান একজন পাভাবী মুসলমান, তিনি সকলের সামনে নবাব পরিচালনার জগে ইমামের স্থানে গাড়লেন।

তার শিহনের কাভারে পাড়ালেন মিশরের রাষ্ট্রবংশীয়েবা, আর তাঁদের সঙ্গে পাড়ালেন এই আফ্রিকান সর্দার ও তার ঘুবক সখী, আর কতকগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তি, ভারতীয় আর অভ্যন্তরীণ। একটু দূরে অনুমলমান দর্শকদের দলে আমি ছিলুম, আর ছিলেন দুটি হিন্দু ঘুবক, আর তা'ছাড়া ইউরোপীয় পোশাক-পরা আফ্রিকান ডহলোক দুটি, যারা আফ্রিকান সর্দারের সঙ্গে এসেছিলেন; আর পরে কথায় বুকনুম উওকিং গ্রামের গির্জার ইংরেজ পাদরি, তিনিও দর্শকরূপে ছিলেন। নমাজ শেষ হ'ল, ইমাম সাহেব তাঁর পাঠাধী ওড়ে ইংরেজিতে পুণিবীর সব ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠতা সত্বে বক্তৃতা দিলেন। তার পরে মুসলমান সম্মানদের মধ্যে কোলাহুলির পালা। আমাদের ভোজনে আম্রান করা হ'ল, কিন্তু মিসরীয় ও অন্তর কতকগুলি বিদেশী আহায না ক'রেই চ'লে গেলেন, তাঁদের তাক ছিল।

আফ্রিকান ডহলোক দুটির সঙ্গে আমি আলাপ সম্বার চেষ্টা করলুম—“কিবা নাম, কিবা ধাম, কিবা পরিচয়?” দীর্ঘাকার ডহলোকটি নিমেষের পরিত্র ছিলেন। ব'ললেন, তাঁরা নাইজিরিয়ার লেগল থেকে আসছেন। পেশায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার, বিলাতে শিক্ষিত। পরে জ্ঞানলুম, ইনি নাইজিরিয়ার বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হার্বার্ট বেকলে। সর্দারটি লেগল অফিসের White Cap Chiefs অর্থাৎ নান্দা টুপি পরিবার সম্বানের অধিকারী ১২ জন বিশিষ্ট সর্দারের অন্তর্য। তাঁর ছাত্রধারী ঘুবক সখীটি হ'চ্ছেন তাঁর এক ছেলে। অত্র আফ্রিকান ডহলোকটি আসছেন গোল্ড-কোস্ট থেকে, এঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ নেই। ইঞ্জিনিয়ার বেকলে সাহেব ব'ললেন যে, লেগসে এই সর্দারের বিস্তর জমি আছে, স্থানীয় গর্ভগমেট সেইসব জমি এই অধুহাত দেখিয়ে কেড়ে নিতে চাইছে যে, তিনি এখন আর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন রাজ্য নন, ইংরেজের অধীন হয়েছেন, তখন এইসব জমিতে তাঁর আর ব্যক্তিগত বস বা অধিকার নেই—সেইসব জমি গর্ভগমেটকে দেড়ে দিতে হবে, সেখানে লেগল বসবাসের ইমারত ইত্যাদি হবে। জমির দান হ-হ ক'রে বেড়ে যাচ্ছে, সর্দার তাঁর অধিকার সত্বে ছাড়তে চান নি, সেখানে এই নিয়ে বোকাশ্রম্য হয়। লেগসে তিনি হেরে দান, কিন্তু হার্বার্ট বেকলেকে সঙ্গে নিয়ে লওনে প্রিভি-কৌন্সিলে আপীল করে ল'ড়তে এসেছেন। বেকলে ইংল্যাণ্ডেই শিক্ষিত, তিনি ইংল্যাণ্ডের সব ব্যাপার জানেন, সর্দার জুরুর সেক্রেটারি হ'য়ে এসেছেন।

এঁদের সঙ্গে পাদরির পোশাকে অত্র আফ্রিকান ডহলোকটি গোল্ড-কোস্টের একজন রাজনৈতিক নেতা। এঁদের আগসের মধ্যে কথায় বুকনুম যে, এঁরা ইংরেজ-শাসিত তিনটি দেশ, নাইজিরিয়া, গোল্ড-কোস্ট ও সিয়েরা-লিওনি, এই তিন ভাগ্যগাথ পৃথক ও বিক্ষিপ্ত ভাবে স্বরাজ আন্দোলন চালাচ্ছেন। এঁদের ইচ্ছা, সম্মিলিত-ভাবে British West African Congress বা অহরূপ একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন। আমাকে তাঁদের লক্ষ্যে কৌতূহলী ও সহায়কৃতিপূর্ণ দেখে, পাদরি-পোশাক-পরা গোল্ড-কোস্টের ডহলোকটি বেকলেকে ব'ললেন, Brother, we should follow the lead given by our friends in India, in their Indian National Congress, for example। পরে কথায় বুকনুম, এঁরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কিছু কিছু ধরন রাখেন। পরাগ্রস্ত ছত্রিশ বৎসর পূর্বেকার কথা—আমি পরে আমাদের তখনকার দিনের বড় বড় রাজনৈতিক নেতা লালো নাভগত রায়, বিশিনচজ পাল, বালগনাথর তিলক প্রভৃতির কিছু বক্তৃতাশি আর আমাদের কংগ্রেস সত্বে কিছু কাগজপত্র এঁদের দিই—গান্ধিজির অগ্রহণ্য আন্দোলন তখনও শুরু হয় নি। ঐকান্ত বেকলে সর্দার জুরুর সঙ্গে আমার পরিচয়

স্নোক্রুবা দেশে

করিবে দিলেন ভাবভীষ ছাত্র ব'লে, নিজের বেশের জাখাখ—সর্দার ইংরেজি জানতেন না। তাঁর ছেলেকে এইবার ভালো ক'রে দেখানু, চমৎকার athletic বা ব্যায়ামবীরের মত দেখের গড়ন, নুখের ডাব ময়লাতা-মাথানো, আর আফ্রিকান আদলের হ'লেও হৃদয়; মেহের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ, আর তার সঙ্গে সাদা আধা-আস্ত্রিন পাভাবীর মতন জামা আর গায়ে রোমান টোপার মতন জড়ানো অশ্ববস্ত্র; খুব হৃদয় দেখাচ্ছিল। পরে লগনে এসে বারান এই ঘুরকে দেখি, তখন সে খালি গায়ে অশ্ববস্ত্র জড়িয়ে ছিল, পায়ে চপ্পল, ঠিক যেন ব্রহ্ম-চালা একটি গ্রীক বা রোমান নেতার মূর্তি। এঁরা সকলে আমাদের লগনে এসে বারান একদিন বেতে নিমন্ত্রণ করলেন, টিকানা দিলেন; আর দেখানু যে আবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রতে এঁরাও উৎসুক। পরে আদি লগনে ছবার এসে বারান গিয়েছিলুম, আর দেখানে হার্বার্ট বেকলে ও স্কুয়া সর্দার ছাড়া আরও কতকগুলি লগন-প্রবাসী যোকবা ডব্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। একজন ছিলেন ব্যারিস্টার-অধ্যাপক, London School of Oriental Studies-এ যোকবা ভাষা পড়াতেন, পাশা আফ্রিকান, হৃদয়কার ধুবক আর সঙ্গে এর স্ত্রী ছিল, স্ত্রীটী একটী ইংরেজ মেয়ে। এবার পশ্চিম-আফ্রিকায় গিয়ে দেখানু, ইংরেজ আর সন্ন্যাসীদের অধীন দেশে এরকম বিবাহ—ইউরোপিয়নরা অশ্ব একে প্রতিদোষ-বিবাহই ব'লবে—বিরল নয়। নিজের ঘরে সর্দার সাধারণ চেহােরে ব'সতেন না তাঁর সঙ্গে একজন বড় কাঠের গুড়ি থেকে তৈরি, তাতে কোনো জোড় বা পেরেক-ইকুপ নেই—আফ্রিকান ধাঁচের, বাটোলাতে কাটা ছোট কাঠাসন, তিনি সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন—তাইতেই ব'সতেন। অস্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করবার ভ্রতে যখন নীচে নামলেন তখন তিনি সঙ্গে-আনা এই বিশিষ্ট আসনেই ব'সলেন। এইরূপ কাঠাসন পশ্চিম-আফ্রিকার রাজা আর সর্দারদের এক লক্ষণীয় লাক্ষন, এবং এই নিয়ে অনেক জটিল সমস্যা-বাবদা আর ধর্মতত্ত্ব, বিশেষ করে গোল্ড-কোস্টের আশস্তি আতির মধ্যে গুঁড়ে উঠছে।

হার্বার্ট বেকলে নিজের কুলপরিচয় দিলেন—তাঁর মাতাবই ছিলেন পশ্চিম-আফ্রিকার প্রধান কৃষকার বিনপ—এঁরা চার্ল-অব-ইংল্যাণ্ডের অধীন খ্রীষ্টান। তাঁর মাতামহের নাম ছিল Bishop Crowther বিনপ ক্রাউসার। যখন ইনি অল্পবয়সের বালক ছিলেন, ১৮৫০ সালের পূর্বে, তাকে দাসবাবদারী নাহুব-খরাস; নিজের এান থেকে ছুঁরি ক'রে খ'রে নিয়ে যায় আর জাহাজে ক'রে অস্ত্র আফ্রিকান ক্রীতদাসদের সঙ্গে আমেরিকায় চালানোর ব্যবস্থা করে। ইংরেজরা তখন ক্রীতদাস-বাবদার বন্ধ ক'রতে বন্ধপরিবর। ইংরেজ মানওছারি জাহাজ একে দাস-বাবদারীদের আহার থেকে উদ্ধার করে, তার পরে ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। দেখানে ইনি বড় হন, শিক্ষা লাভ করেন এবং চার্ল-অব-ইংল্যাণ্ডের রাজক নিযুক্ত হন। পরে যৌবন অবস্থার দেশে ফিরে আসেন, বহদিন পরে পিতামহাতার সঙ্গে মিলিত হন, আর বহাতির মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের কাজে লেগে যান। এর চরিত্র ধর্মভাব আর কার্যকারিতা দেখে, রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে একে প্রধান আফ্রিকান বিনপ করা হয়। বেকলে এঁর পৌছিত্ব, এবং বেকলের পিছনে তিন পুরুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আছে। সর্দার স্কুয়ায় পিতামহ Docemo বোসেনো ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আত্মগোপন পুরস্কারস্বত্ব রূপে-বাধানো একটি লাঠির আকারের রাজস্ব ও উপহার পান, সেটি বেকলে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, আহার দেখালেন। এসে বারান বিকালে গল্প ক'রতে গিয়েছিলুম, কথায় কথায় মনে উঠতে রাষ্ট্রি হ'য়ে গেল, এসে নির্বন্ধে আবার এসে সঙ্গে সায়মান সেয়ে আসতে হ'ল। এইভাবে সপার্বন এই আফ্রিকান রাজা বা ভূমিদারের সঙ্গে আহার বেশ একটু স্বভাৱ ঘটে। খ্রীষ্ট বেকলে আমার বাসাতেও একদিন এলে আমার সঙ্গে অনেক গল্প

ক'রে যান। এর সঙ্গে এদের সমাজ আর সংস্কৃতি নিয়ে যে অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়, তার একই বিগমর্শন অন্তর ইংরেজি আর বাংলাতে প্রকাশ করেছে। পরে শুনে ঘুশি ঘলুশি যে, প্রিন্টিং-কারখানার বোকম্বাঘ সর্দারের ঘর হয়েছিল, আর তাঁর সমস্ত জমি তিনি ক্ষেত পান। সম্রাট পঞ্চম জর্জ তখন গ্রেট-ব্রিটেনের রাজা ও ভারত-সম্রাট। তাঁর এক Levee বা দরবারে দুই হাজার আড়াই হাজার অভ্যাগতের মধ্যে সর্দার গুল্লার নিমন্ত্রণ হ'য়েছিল, যেখানেও সঙ্গে ছিলেন তাঁর রাজনগোবাহী মোভাবী ও সেক্রেটারি রূপে। যেখানে ঐ দরবারে উপস্থিত কোটোগ্রাফারদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করেন যে, যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ অতিথিদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এসে এই সর্দারের কাছে পৌঁছান, তখন সর্দারের হঠাৎে আলখান্না গায়েই ঘন কৃষ্ণ রঙ, আর আফ্রিকান পদ্ধতিতে দুই হাতের আঙুল জড়িয়ে বন্ধাবলি হ'বে, আর ডান হাতের বুড়ো আঙুল বা হাতে থ'বে, যেক্ষণ প্রণালীর নবজার দেখে আকৃষ্ট হ'বে গাঁড়ান, যেখানে দ্ব্যায়ীতি সর্দারের পরিচয় সেন, সম্রাট দ্বিত্যাহতে কৃশল মিজান্না ক'রে তাঁর সঙ্গে কন্মর্শন করেন— ঠিক সেই অবস্থায় একখানি ছবি তুলে নেওয়া হয়। স্বদেশে সর্দারকে রাজগোবাহী বলে ঘোষণা ক'রে বিদেশে ফেলবার চেষ্টা হ'চ্ছিল; এইভাবে তাঁর জাতীয়তাবোধ-অনিত স্বাধীনতা-কামী মনোভাবকে দমন করার চেষ্টা নাইজিরিয়ার তখনকার দিনের ইংরেজ সরকারের ছিল। এই ছবিখানি নাইজিরিয়ায় সর্বত্র প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁদের সেই অপচেষ্টা অনেকখানি ব্যর্থ হ'য়েছিল। ঐ সময়ে আমার মনে হ'য়েছিল, যদি কখনও পশ্চিম-আফ্রিকায় যাওয়া হয় তা হলে, আমাদেরই মত অবস্থায় প'ড়ে আছে আর সেই অবস্থা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা ক'রছে, এমন আমার আফ্রিকান ভাইবোনদের তাদের নিজেদের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দেখে আস'বে।

আম, ৪ঠা আগস্ট ১৮৮৪, সম্রাটের দিকে, হাতে সমস্ত থাকায়, আর সিঁদ্বী বন্ধুত্ব বিশেষ দৌরত্ব ক'রে তাঁদের গাড়ি আর সঙ্গে একজন গ্যারিক-হাল চালক তাঁদের অতিথির সেবার জন্য দেওয়ায়, আমি বেরোলুম সর্দার গুল্লার সঙ্গে দেখা ক'রতে। ইনি এখানে স্থপরিচিত ব্যক্তি। নারায়ণদাস বলে চেলারাদের ফাংয়ের একটি কর্মচারী, মোটর-চালককে বুঝিয়ে দিলেন কোথায় যেতে হবে। শহরের বাইরে, সমুদ্রের ধারে, যেখানে যেক্ষণ জেলের বসতি, সেই পাড়ার মধ্যে দিয়ে, ঘনঘনান অন্ধকারে আমাদের গাড়ি চ'লল। এই অঞ্চলটি ইংরেজি কথায় যাকে বলে slum সেই রকম গরীব অঞ্চল। মর্চে-ধরা টিনের দেওয়াল আর টিনের ছাদ, বাঁশের দরবার দেওয়াল, এইরকম বিস্তার নোংরা বাড়ি আর সোকান— এর মধ্যে রেতোরাঁ আর বার বা পানশালা অনেক। মাঝে মাঝে ভাল স্ত্রীকেছে— সমুদ্র থেকে মাছ ধরা হয়। আমরা শেষে খুব ঘন-বসতি শহরতলি রুগলে গিয়ে পৌঁছোলুম। গাড়ি একটি গলির মোড়ে গাঁড়ান, আমরা নামলুম। আমার মোভাবী হিসাবে গাড়ির চালক Thomas টমাস আমার সঙ্গে চ'লল। অপরিহার্য সড়কে একপাল উল্লম্ব আফ্রিকান শিশু ধুলোবাটি বেগে খেলা ক'রছে। যেক্ষণ পোশাক পরা আফ্রিকান ঘেয়েরা গৃহকর্মে নিযুক্ত, জলের কল থেকে কেরোসিন তেলের টিনে ক'রে তল রাখায় ক'রে নিয়ে আগছে, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের ভিতরে রাজা চ'ড়েছে। এই গলি দিয়ে যেতে বাঁয়ে বেশ বড় আকারের একটি ইমারত চোখে প'ড়ল, টমাস বললে যে এটি একটি মসজিদ, সর্দার গুল্লার নিজ বায়ে তৈরি ক'রে দিয়েছেন। মসজিদটি ছাড়িয়ে সামনেই সর্দারের প্রাঙ্গণ। মাঝারি আকারের সাধা চুনকান-করা সোঁতলা বাড়ি, ঘেরকম বাড়ি পোস্তীজ প্রভাবে লেগশ শহরে আফ্রিকান বিস্তারালী লোকের। নিজ বাসের জন্য তৈরি করেন। বাড়িতে চুকেই বা

য়োরুবা দেশে

হাতি এক শিঁড়ি, সেখানে খুব লম্বা-চওড়া চেহারায আলখাল্লা আর অসব্বর পরা কতকগুলি আফ্রিকান দরওয়ান বা চাকর ব'সে ছিল। টমাস য়োরুবা ভাষায় তাদের ব'লতে তাঁরা আমাকে শিঁড়ি ব'য়ে উপরে এক লম্বা টানা বারান্দায় নিয়ে গেল; সেখানে অনেকগুলো চেহার পাভা ছিল, তার একটিতে বসলে। ভিতরে খবর দিতেই, খালি গায়ে, কেবল অসব্বর হুজানো একটি প্রোট ব্যক্তি এলেন, আর তাঁর সঙ্গে দু-একটি যুবক ও কিশোর। আমার অস্থান হ'ল, আফ্রিকার এই যুগটিত চেহারায প্রোটটি লওনের সেই যুবক, যাকে আমি সৌত্রিশ বছর আগে সেবেছিলুম। ইনি ভিজয় হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, Yes ? what can I do for you ? আমি ব'ললুম, I am from far-away India, and I have come to pay my respects to the Chief Oluwa whom I met 34 years ago in London. প্রোট ব্যক্তিটি আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে ব'ললেন, The Chief is my father, and I was with him in London. Are you the same Indian student who used to come to see us in our home ? আমি শুনে হাত বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে ক্রমবর্ধন ক'রলুম আর ব'ললুম তিনি আগেরই নতুন এখনও handsome young man ই রয়েছেন। ভহ্লোক শুনে অত্যন্ত খুশি হ'লেন, আর আমার বললেন যে, তাঁর বাবার বয়স এখন ৮৬ বৎসর, তবে এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। তাঁকে এখনই বয়স দিচ্ছেন। আমার পরিচয় দেবার ক্ষেত্রে এই ভহ্লোককে আমার কার্ড দিলুম। আমার কার্ডের বিশেষত্ব— একদিকে আমার পুরা পরিচয় আছে ইংরিতিতে, আর একদিকে নাগরীতে, আমার কার্ডে এই নাগরী অক্ষর সেপে অনেক বিদেশীর মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঐন্দ্রজ্য ও কৌতূহল হয়, তখন অবগদরতন হু-য়ার কথা স্বদেশের লম্বা বলা যায়। ভহ্লোক ভালো করে ইংরিতি দিক্টা প'ড়লেন, নাগরী দেখা প'ড়তে না। পেরে আফ্রিকান-মূলভ সরল হাসি—a broad good-humoured grin—স্বর্গাৎ বাংলা কথায় যাকে বলে দিলগোলা, কান-এটো-করা হাসি—হাসলেন, অকৃতক দাঁতের রশ্মিতে ঘোরকৃষ্ণ বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তিনি গিয়ে তাঁর বাবাকে ডেকে নিয়ে এলেন। ৮৬ বছর বয়স, মাথায ঝাঁচপাফা কৌকড়া চুল, প্রশান্ত সোবা মুখমণ্ডল, খুব ঢিলে আলখাল্লায় মত পোশাক পরা, পায়ে চপ্পল, হাতে তস্কা বা মপমালা, আর মাথায় একটি কালো গোল টুপি, তিনি দীর্ঘে দীর্ঘে এসে আমাকে বাড় নামিয়ে অভিবাসন ক'রে, একটি বড় চেহারা আলাদা করা ছিল তাইতে ব'সলেন— এই চেহারাটি কিন্তু ইউরোপীয় চেহারা। এর পুরা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমি ইংরিতিতে আমাদের লাকাতের পূর্বকথা সব বুটিয়ে ব'লতে লাগলুম, ইনি লানন্দ হাতে মাথা নেড়ে নেড়ে শুনতে লাগলেন— এর ছেলে তর্জমা ক'রে ব'লছিলেন— মন্তব্য ক'রলেন যে, বেকলে সেহরক ক'রেছেন, আমার সব কথা মনে আছে সেখে ভারিক ক'রলেন, এবং ব'ললেন, স্বদেশে বিশেষে স্বর্গাৎ যে পরিবর্তন হ'চ্ছে তাও তিনি লক্ষ্য ক'রছেন, এবং তিনি আশা করেন যে, ভারতবর্ষের মত তাঁর বেশও স্বাধীন হবে, তা হ'লে তিনি স্বখে স্ব'গতে পারবেন। তিনি একজন অতি নিষ্ঠাবান ভক্তপ্রাণ মুসলমান, ছেলেকে ব'ললেন তাঁর বেগম মল্লিহ আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে। আমি লক্ষ্য ক'রেছিলাম, ঐ বায়ান্দার এক কোণে কালো আলখাল্লা পরা ফকির-গোছের এক বৃদ্ধ আফ্রিকান তস্কা নিয়ে মপ ক'রছিলেন, আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ বিত্তশালীর ঘরে যেমন লাধু-সন্ন্যাসীর অবস্থান অনেক সময়ে হ'য়ে থাকে। পিতার কথায় পুত্র আমাকে তাঁদের নান্য আসবাব চেহারা-টেবিল দিয়ে শাঝানো পাশেরই এক বৈঠকখানা-ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে

নানা ছবি, সজ্জার কাবা ও অল্প মসজিদের ছবি ইত্যাদির সঙ্গে ফ্রেস্কে বাধা বেশ বড় একটি ব্রোমাইড কোটোগ্রাফ দেখলুম— সেই বিখ্যাত ছবিটি, কোমর বেঁকিয়ে সর্গার লম্বাইকে অভিযান ক'রছেন, সেই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে শরাই পক্ষম গর্জ কর্তৃক ক'রছেন, আর সামনে মুখ ক'রে দৃষ্টভাবে হার্বট বেকলে রাজার রূপা-বাধানে রাজকীয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিটি আমার পরিচিত, এটি ১৯২০ সালে Illustrated London News-এ প্রকাশিত হয়, আর বেকলে আমাকে ঐ ছবি একখানি ক'লকাতার পাঠিয়ে দেন। এইভাবে কিং শিষ্টাচার করা গেল। কিং লেমনেড পান ক'রতে হল। তার পরে আমি সর্গার ওলুটার কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

তাঁর ছেলে আমার সঙ্গে নীচে নেবে এলেন। দু পা এগিয়েই বাড়ির সামনের মসজিদে আমার নিয়ে গেলেন। সাধারণ মসজিদের ভাব। বেহেদাবের উপরে আরবী অক্ষরে 'বিস্মিল্লাহি-বু-রহমানি-বু-রহীম' ও কলমা লিখিত। তখন মসজিদ একেবারে বালি। এ মসজিদের ভাব অল্প ধরনের, সমতল। ঢাকা গির্জার মত। ওমলু কববার অর্থাৎ হাতমুখ খোবার ব্যবস্থা অবশ্য বাইরে। ছেলেকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, মোজা বা ইমাম-এর বেতন তাঁর পিতাই দেন, এবং এই ইমাম জাতিতে যোকাবা। অনেক সময় উত্তর থেকে হাউসা বা ফুলানি অথবা আরবী-ভাষী হুদানী ইমাম এদেশে এসে মসজিদের ভার নেন।

মসজিদ দেখে সর্গারের ছেলের সঙ্গে কর্তৃক ক'রে বিদায় নিলুম। এইভাবে চৌত্রিশ বৎসর পরে পিতা-পুত্রের সঙ্গে পুনরায় আলাপ করাটা আমার কাছে বেশ হৃদয় লাগল।

ব্রীক্লু ব্রপচম্-এর নির্দেশনত আমাকে হস্টেলে নিয়ে এল। একই বিশ্রাম ক'রে আবার ঠাঁয়ে বাড়িতে সাতা-চোতনের জ্ঞান বেতে হল। পথে লেগসের Broadcast House বা রেডিও-অপিস হ'য়ে গেলুম। নতুন বাড়ি, তাতে একটি বিরাট মেয়াল ছুড়ে নাইজিরিয়ার বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রকর Ben Enwonu বেন্ এন্বোন্স, যার সঙ্গে পরে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল ইব্রাহাম শহরে, তাঁর আঁকা একটি Fresco বা ভিত্তিচিত্র দেখলুম, আর দেখলুম তাঁর তৈরি একটি Bas-relief বা মেয়ালের উপরে গড়া ভাস্কর্য-চিত্র। Frescoটি বর্ণোচ্ছল এবং সেটি Futuristic পদ্ধতিতে আঁকা, নৃত্যরতা অনেকগুলি আফ্রিকান কৃষারীর গারিও ছন্দোবহ গতিভঙ্গি, রঙিন বহু আফ্রিকান মুখ, পাছপালায় বিচিত্র সূত্র, ইত্যাদি নিয়ে বৃহৎ হৃদয় লাগল। ভাস্কর্যচিত্রটি পাথরে খোদাই একটি যোকাবা একটি ইবো আর একটি হাউসা পুরুষের— এই তিনটি জাতির বাহুব বখাফ্রবে পশ্চিম পূর্ব ও উত্তর নাইজিরিয়ার প্রধান জাতি।

ব্রীক্লু ব্রপচম্ ও তাঁর সহকর্মীরা— গার্না চেলায়ানের কাণ্ডের পরিচালক— শহরের ধনী লোকদের পত্রীতে একটি হৃদয় বাড়িতে থাকেন। এই বাড়ি আর এদের আপিস ভবন প্রকৃতি এদের নিম্ন সম্পত্তি। বিশিষ্ট অভিযানের থাকবার ক্ষমতা ব্যবস্থাও আছে। চমৎকার ভাবে হৃদয় হাতার বাগানের মধ্যে সাধানো এই বাড়িখানি। এরা এখানে পরিবার নিয়ে থাকেন, তবে এই সময় বেয়েদের কেউ ছিলেন না। বি চাকর হানীর যোকাবা বা ইবো, বেশির ভাগই ঐটান। পাচকও যোকাবা। সিদ্ধীরা বেশ ভোজন-বিলাসী, এবং তাঁরা প্রচুর মাংস আহার করেন; পাচকদের বেশ ভালো করে শিখিয়ে দেন। তাদের হাতের ভারতীয় রাজা বৃহৎ চমৎকারই লাগল। সিদ্ধী ভোজন মানে, দুই-মাড়াই খটায় ব্যাপার। ব'লে ব'লে গল্প করেন, সঙ্গে পান চ'লতে থাকে, মাংসের শুকনো চপ, শামি কাবা প্রকৃতি নানান দ্রব্যের ভোজ্য মেটে ক'রে দিয়ে যায়, এবং এইতেই অনেকটা সময় চ'লে যায়। সিদ্ধীরা অত্যন্ত মজপান আসক্ত হ'য়ে থাকেন।

অতিথিকে মস খাবার জন্তে খুবই সীড়াগীড়ি করেন, নানা রকমের মদ পরিবেশন করেন। আমি ও পণ্ডের পবিত্র নই, তা সবেও নির্বোধের অস্ত ছিল না। এই জন্তেই আবার অনেক বিদেশী সিদ্ধদের আতিথ্য পছন্দ করেন। এইরকম পানে আর অল্প অল্প ডোমেনে ঘটানো কটাবার পর, তবে আহাদের টেবিলে বসবার আরম্ভ আসে। সেখানে চাপাটি বা পুরি বা পরোঠা, পোলাও, কোর্মা ও রকমারি মাংসের আর মাছের বাতন পরিবেশিত হয়, এবং শেষে অনেক রকমের মিষ্টান্ন। লাড়ু মণ্ডার পরে ছুটি পেটু, আমাকে হস্টেলে পৌছে দিলে। কতকগুলো চিঠিপত্র লিখে মখন শয্যা আশ্রয় ক'রলুম, তখন রাত্রি লাড়ু এগারোটা।

যোদ্ধাবাদের দেশে আমার প্রথম পুরো দিনটি এইভাবে কাটল। লোকমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়া দেশের জনসাধারণের জীবনধারণের একটু অভ্যাস পেলুম। বিশুদ্ধ আফ্রিকান জাতির মধ্যে পুরুষ, এদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা—“বে মহিদি” দেখে মনে বিপুল আনন্দ পেলুম। আগামী কাল, এই আগষ্ট বৃহস্পতিবার, আমার ইবাদান খাবার ব্যবস্থা এখানকার সহকারি পররাষ্ট্র-বিভাগের আর আনার সিদ্ধো স্বদেশবাসীদের মিলিত চেষ্টায় হ'য়েছে। ইবাদান সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে সকলকার চেয়ে বড় খাতি আফ্রিকান শহর—এর পরনে বা স্থাপনায় আর প্রগারে ইউরোপীয়দের হাত ছিল না। ইবাদান নানা বিষয়ে যোদ্ধা জাতির মস্তিষ্ক, কেন্দ্র, পশ্চিম-নাইজিরিয়ার স্বাম্যধানী। এখানেই মন্ত্রী অগ্নোতোলোত্তো থাকেন।

এর পরের বারে ইবাদানের কথা বলবো।

ক্যারিবিয়নের চিঠি

দ্বিপ্রহরার সময় সিয়ংলু

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

এইমাত্র হাভানা শহর থেকে উড়ে এগেছি, জানি না এই চিঠিতে বিখ্যাত চুরটের গল্প পাবেন কি না। যদিও শিপারের রাজ্য আমার সম্পূর্ণ অজানা, তবু কার সাধ্য কিউবা বীপে গিয়ে মহাঘনুয়কে অবস্কার করে? নথো মাথানি শহরে নেমেছিলাম সন্নিভায়, সেখানেও ধনীতের ডলার ডব্ব-খোঁঘায় রাত্রি হয়ে উঠেছে দিন। অথবা দিন হয়েছে যোহের রাত্রি। হোটেল-মটালিকার স্রাবণিক বিলাপপতিরা ক্যারিবিয়ন বীপের সৌন্দর্যকে লক্ষ্যন করেছেন, নির্মল জলের নীলে ডুলেছেন ক্যাসিনোর ঘরর জুয়র্ডি সেহাল, বিজ্ঞ-বিশ্ব আকাশে ছুটেছে তাঁদের বিজ্ঞাপিত রতিন মন্তের চিত্রণ। কিন্তু Rock 'n' Roll -এর চাঁৎকৃত সংগীত-শ্রীত। ভের করেও দেখা যায় দূরের বিবৃত শৈলশান্তি, অসীম সমুদ্রের ধৈর্যবোধ, এমন কি হাভানাতেও। হঠাৎ মনে পড়ে যায় পৃথিবীতে আছে, যার চতুর্দিকে কালের সমুদ্র, তারও পারে সমগ্রহীন আকাশ, বেন সবটাই ক্যারিবিয়ন থেকে-কোনা বীপের মতো আশ্বাসপূর্ণ অগতঃপরিধি। তার মধ্যে বীপবর্তী বাহুরের জীবন ক্রোতা-বাবসারী-রাষ্ট্রসুত্বের সম্পূর্ণ করায়ত্ত নয়; আড়কাটির আক্রমণ সমাজের শেষ ঘরবে দেখানে পৌছয় না; আখের ক্ষেতে কফি-কোকোর সারিষ্মশলে দ্বারা কান্দি দাগ বা indentured labourer-এর ভারতীয় বংশের ভারও কোনোখানে মরতে-মরতে অমরত্বের সন্ধান পেয়েছে। West Indies-এর বীপস্বাস্থ্য সেই সব বিবৃত বন্দী কর্মমুদ্রুসের চক্ষের ভরীতে আকো লমল, তাদের ভরশার দীর্ঘবাস চাবুকের আখাত-বন্ধের রেের দূরে গিয়ে পরমাস্তিত। অবিখ্যাত পৌষর্কের পাশাপাশি অবর্ণনীয় অত্যাচার শান্তির তীর বিসংগতি কত বীপে দেখলাম; দৈবের অগতে এসে বাহুরের তৈরি নারকীয় কীতি। অঞ্চ এই নিরস্ত সংঘাতের কথা হতে উৎসিত হয়ে উঠেছে মানবিক বিজয়ী ইতিহাস, তার ধারায় নারায়ণী মহিমার ধনি বারে বারে শোনা গেল। ভাগ্যক্রমে ষে-গুণে রয়েছে তাতে জনসাধারণের মূর্তি সমধিক আগর।

হেইটি বীপে ট্যুরিস্ট-বাসনের অভাব নেই, কিন্তু সব চেয়ে প্রথম বাধীন বীপরূপে ক্যারিবিয়নে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ লক্ষণীয়। হেইটির পার্বত্য দারিঅ্যপূর্ণ গ্রাম, তার উপরে অজোয়া বেঘের স্বাক্ষ, এবং ত্রিহিতিমি আন্থিকান ড্রাম আনার মনকে নাড়া দিয়েছিল। শুধ্যসকলের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, voodoo নৃত্যে এবং rumba নেশা অতুত কৌশলী ধর্মনেশার কারিগরি অনভিজুত আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, চোখে ঠেকেছে সোনার বায়ুতে কাটা বিচিত্র শৈলাস্তবোধ। কোথাও আয়ত্যাগবর্ত হঠাৎ বাসির জীয়ে মেনে একেবারে অগাধ ডেউয়ে অদৃশ্য। কোথাও করতালি মিছে পাম্ গাছ, স্রামবয়্যট্ (আনাদের কৃষ্ণচূড়া গোছেন) আগাগোড়া কুলে রক্তিম আচ্ছন্ন।

হেইটিতে ভারতীয় প্রায় কেউ নেই, এক বর সদৃশ মোকানী ছাড়া, কিন্তু “মহানানবের সাগরতীরে” এসে ভারতবর্ষীয় পথিককে ঘরে খরেই মেনে ফিরতে হয়। কখনো জানাতে নেমেছিলাম ক্রীতদাসের

কারিবিয়নের চিঠি

মৃত্ত বীপে, আকাশ যেখানে আজো তাদের প্রাচীন বেননায় দ্বার্ড, উগাখা উঠেছে শূন্যস্রবঙ্গের আবাহনে।

একটু ইতিহাস শুন। "The first Africans to set foot in Haiti came in the year 1510. Just precisely when they came from no one knows, but it was somewhere along the stretch from Singal to the Congo. What they went through is an old story: disease, thirst, brutality, sea-sickness. And their trials did not end when they were put ashore in the Indies. The masters who had annihilated the Indian (অর্থাৎ আদিম অধিবাসী "আমেরিগিটান") in less than twenty years were not likely to consider the Africans, darker and stronger, as having any particular human right. One of the first prayers of the slaves in Haiti must have been gratefulness for the oxen, horses, and bourriques; if it were not for them the Negroes would have had to bear even greater burdens.

"In the hard years which followed, more and more slaves were poured into Hispaniola, as Haiti was then called. The West Indies became the most prosperous of slave markets, and Haiti, Martinique and a few of the other island colonies absorbed all the slaves they could get. These men who came in chains were of all classes and types..."

সত্তর মার্কিন ঐতিহাসিকের এই বর্ণনা শুধেই ইতিহাসের যে-কোনো বীপের সংস্কৃতি-রূপে গ্রহণ করা চলে। প্রথম পালায় আমেরিগিটান (ভীম কারিব, শাস্ত আরামোয়াক এবং অত্যাচারিত মাদ্রাগে) ধ্বংস, সত্তর হ'লে নিশ্চিৎ বধ (কোথাও তারা দু-চার পরিবার এখানে ওখানে, যেমন বৈবাহিক উদ্ভিদিক। বীপে বা ল্যাটিন আমেরিকান বৃহৎ কুখ্যের দু-এক কোনা, পালিয়ে বেঁচে বর্তে আসে); দ্বিতীয় পর্যায়ে নিগ্রো আফ্রিকানদের বেঁচে আনা আহাজ-ভর্তি করে; এবং তৃতীয় স্তরকে ক্রীতদাস-বাবদায়ের অবসানে ভারতীয় বা অন্ত কোনো এশিয়ান দেশ থেকে "হুলি" চালনা করা। সব বীপে ভারতীয় "হুলি" পৌঁছয় নি, কিন্তু টিনিডাডে, গ্রেনাডায়, ব্রিটিশ গিয়ানায়ে, ডাচ সুরিনামে, জামাইকা বীপে সেই ভাগ্যহত ভারতীয়দের শত শত বেখলায় দ্বারা এককালে এসেছিল বিকৃত সাম্রাজ্যের "হুলি" নাম নিয়ে। আজ তাদের অনেকের অবস্থান্তর ঘটেছে, কেউ কেউ শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত অথবা কতিং ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু গভীর সমুদ্রের দূর অলংকার বহো অতিক্রম বীপে ঘাবের দু-তিন পুরুষ কাটল তাদের না আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ, না আছে পিতৃপুরুষের ধর্ম বা ভাষা। টিনিডাড বিস্তারী বৃহত্তর বীপ, এবং সেখানে সংখ্যায় গরিব ভারতীয়ের দ্বারা অনেকটা ভালো কিন্তু গ্রেনাডা, পেট লুতা, এমন কি জামাইকা বীপের ভারত-সম্পর্কিত বহু সহস্র শোকজনের দুর্গা অবর্ণনীয়। ক্যাসী মার্টিনিক বীপে আফ্রিকানদের অবস্থা গর্ভবন; আবাবদা এবং যুগ-ধরা সাম্রাজ্যিকতার একান্ত পরিচায়ক দেখতে আসবেন ঐ হস্তী, ঐ দুঃখ-লীর্ণ সহায়তীন বীপবাসীদের ঘরে অবলে। অন্ত বীপের মতো ওখানেও rum-এর হংসহরণ স্রোত বইছে, মাছুষকে সত্তা

পাতালের দিকে ঠেলে ফেলে। সেখানেও অগের ক্ষেতের কালিতে কাঁচা রোদ পড়েছে, বরনা-জল করছে, নিপুণ পাখরের নিকণে। কিন্তু মানবদিগন্ত এখনো আঁধা-লাগা।

অপ্রাণদিকভাবে আবার হেইটিতে ফিরে আসি। এখানে এরা ভীত পরশায় বিশ্ববে ফরাসী ইম্পারী হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। হেইটির কাহিনী আরেকটু বলি। তারপর স্বপ্নকালের মতো, সোনার দেশ হ্রীনাং ছুঁয়ে এই চিঠি শেষ করব।

সেই মার্কিন লেখক Harold Courlander বলেছেন—"In the hills of Haiti everyone sings and dances. Babies of three years dance Vodoun and Pétro with their elders. Boys of seven are already master drummers and under the teaching of their fathers, who learned from their own fathers. And old women weighed down by years and infirmities still dance Ibo with their shoulders.

"In Haiti everyone works. If they do not work they do not live. Most of them work very hard. Whether they work so hard or not, living is unbounteous. Women walk great distances with heavy loads on their heads, some of them walk all day and night to get to market, where they may earn eight cents on their Congo bean and cotton, and they walk all day and night to get home. And the men plant and till their garden with a machette or hoe, hang their maize and Kaffir corn high in the branches to dry.

"Sometimes they sit and wait for their big-bananas and the cocoanuts to ripen, but they are not lazy, they are simply patient. They are patient of a summer sun which bakes their ground hard and unfruitful, of earth which often yields not enough to keep their bodies living.

But when it is time to dance and sing, nature pours forth spiritual riches from the large end of the horn. For the moment, life surges in dulled bodies as well as in the quick. Drummers become one with their drums and the drums come alive. People move and sing and vibrate with nature; they dance with each other; with their ancestors, and with old African gods whom they have not forgotten..." (*Haiti Dances* বইখানি পড়ে দেখবেন)।

হেইটির ক্রিমোন্স পুঙ্খ-মেয়েদের দেখে সাঁওতালি চেছারা এবং প্রকৃতি হয়ে পড়ে যায়। অগের বছরে গোল্ড-কোস্ট-এ টিক ঐরকম "talking drums", "male and female drums" শুনেছিলাম, যুগের জন্ত আনিতক প্রাণের স্পন্দন, রক্তের কনি, সমস্ত অরণ্য অর্থর ক'রে উঠেছিল কীবী টাইবল-নেতার ঘন গাছে ভরা অন্ধনে।

হ্রীনাং। পারানায়িবো শহর থেকে দূরে "ভারতীয়" বসতি দেখতে বেরোলাম। তারা আম

কারিবিয়নের চিঠি

ভাচ্-গিয়ানাবানী গিয়ানিমিঃ ; রাষ্ট্র-অধিকারে তারা ভারতীয় নয়, কিন্তু আংলর্ষের বিষয় তাদের চেহারা, ভাষা, ধর্ম, লোকচার আর পর্যন্ত সম্পূর্ণ হিন্দুস্তানী। শাড়ি দুটি অনেকে পরেন বিশেষ উপলক্ষে, পূজাপার্বণে, বিবাহের উৎসবে ; কিন্তু সদাসর্বদা শাড়ি ব্যবহার করেন এমন গৃহিণীও এখানে চোখে পড়ল। সারামকো নদী পেরিয়ে ফেরি-বাটের অনতিদূরে এত সদয় ভারতীয় জনতা দেখব ভাবি নি। একটি গায়ে দারুণ রোদুয় ঠেলে চাষী শ্রমিক বোন-ভাই এগেছিল “আপন দেশী” লত আগত ভাইকে দেখতে। বৃদ্ধ স্ত্রীকেশ চাষী সভাপতি হাত জোড় ক’রে স্তোত্রপাঠের নির্দেশ জানালেন ; সকলে এককণ্ঠে সেই শক্তির স্তবে যোগ দিলেন যিনি “মুকং করোতি বাচালম্, পশুং লক্ষ্যতে গিহিং”। পরিচিত স্তম্ভ স্লোক ঐ সমাবেশে, ধুলোর পরবাসে হঠাৎ কী মহিমায় আবিষ্কৃত হল তা কী বলব। কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় এই ভাচ্ রাষ্ট্র, এই ল্যাটিন আমেরিকান দেশের আটলান্টিক তীরের ফালি, ব্রেজিল-এর কাছে। আরো ময় যোগ হল, “সহনামবতু, সহবীর্ষঃ করবাবৈঃ”—যোগসেতু স্পষ্ট হয়ে উঠল কালকে অতিক্রম ক’রে, দেশকে। স্বরীনায়ে ভারতীয়েরা আত্মো জাগিয়ে রেখেছেন হিন্দি ভাষার সেউটি, অল বিচ্ছেদ তুলসীতলাহ, আতিথ্যদানের ইচ্ছা এতই বেশি যে সমস্ত পরিব গ্রাম আগে থেকে চাষা তুলে আমাকে স্বরীনায়ে সোনাঘ গড়া একটি সোনার আঙটি উপহার দিলেন। কপালে ঠেকল চন্দন, গলায় পরলাম গাঁথা ফুলের মালা। দেশ আর এই দেশের মধ্যে কত দুর্লভ্য দৃশ্য, পনেরো হাজার মহিলের কত মহাত্মা-সমূহের দ্বন্দ্বের ব্যবধান তা তুলে গেলাম। ভারতবর্ষ থেকে সব চেয়ে দূরে স্বরীনায়ে ভারতী-বসতিতে আত্মো অনেকে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম রক্ষা করেছেন, দুই ধর্মের চেয়ে বৃহত্তর গভীরতর মানবধর্মে ভাসা নিলিত। বিভক্ত ভারত-পাকিস্তানের প্রেমস তাঁদের পক্ষে একান্ত দুঃখকর ; কয়েকজন বললেন, ঐ ভাড়া মাদ্রাসে জিব না, তার চেয়ে এইখানেই থাকি। পরে পানামায় গিয়েছি, সেখানেও একটি বাঙালি মুসলমান ঐ কথাই বললেন।

যে সোনার টুকরো হাতে নিয়ে সেহিন অঙ্ককারে বেরিয়ে এলাম তার দাম কোনদিন শোধ হবে না। অস্ত্রভাবে প্রতিদান দিয়েছি, সেটা কেবলমাত্র বস্ত্রগত, কিন্তু স্বার্থ পানের প্রতিদান কোথায়। নদী পেরোবার সময় কাতো কণ্ঠে কথা ছিল না, দৃষ্টি নামাতে হল।

ঐ স্বরীনায়াড়র কাছেই ওখানকার একটিমাত্র বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে দেখা হল। হুতো এখানে-ওখানে কচিং বাঙালি ঐ হিন্দিভাষীদের মধ্যে আছেন, ঠিক কেউ বলতে পারল না। হিম্মিকেই স্বরীনায়ে ভারতীয়রা হাতুভাষা বলে মনে নিয়েছেন, যদিও অনেকের ভাষা ছিল তামিল, গুজরাটি, মারাঠি, বা অন্ত। ঐ বাঙালি ভ্রমলোক বাংলা প্রায় তুলে গেছেন, নাম বললেন—মন্-মোহন, ত্রিশ বছর কোনো বাংলা কথা বলেন নি। যলিন পাঙ্কুন পরা, দাঁড়া শাট গায়ে—আন্তে গলায় জানালেন, “বহ কঠ পেয়েছি, দাদা।” সুনলাম ভ্রমলোকের কোনো আত্মীয় কোথাও নেই। কোন্‌ এক বাহাজে চলে এগেছিলেন কলকাতা থেকে। কিন্তু স্বরীনায়ে কিংবা ব্রিটিশ গিয়ানায় “কলকাতা” মানে কলকাতার এগে যে-কোনো বাহাজে ওঠা। অস্ত্র অনেকে বিশেষ বাহাজের নামও জানেন, হিন্দু-মুসলমান তাঁরা নিজেই সেই বাহাজের “এক-বাহাজী” ব’লে বর্ণনা করেন, ভারতবর্ষের কোন্‌ অঞ্চলে পিতৃপুরুষের বাসস্থান, তা সকলের স্বরণ নেই।

হঠাৎ দেখি মন-মোহনবাবু গায়ের ভিড়ে কোথায় চলে গেছেন। বাংলা ভাষায় যা মনে আগল সেই অস্বভূতির ভাষা আর তাঁকে জানানো হল না।

ইংরেজ রাজ "indentured labour"-এর ব্যবস্থা বন্ধ করেছে; স্বীকার করতে হবে সমস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোঁপগুলিকে এক ফেডারেশন-এর ব্যবস্থায় বান্ধবার উত্তম তাঁদের প্রাণসন্ধানী। যে-কোনো স্বাভাবিক, প্রান্তিবৈশিক রাষ্ট্রত্বপূর্ণ বোঁপসভ্যতার বিভিন্ন স্ফাট ও সংসারকে অর্থ এবং ব্যবসায় আদান-প্রদানকে একেবারে সহযোগিতা দিতে সক্ষম আমরা তাঁর পক্ষপাতী। কিন্তু এতদিনের হানি-গ্রানি-বিষয়ের অদ্ভুত সঙ্কেত শেষ হবে না। অস্ত্র বিধান আর যদি এগিয়ে এসে থাকে ভারতীয় পৃথক আদি বনব, বাগত। ধারা ভারতীয় সংস্কার ভাষা ধর্ম রেখে ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রসভ্যতার অস্ত্রাত্ত সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাঁদের সমস্ত অধিকার দেন অঙ্গুর থাকে। বেশ তাঁদের ভারত নয়, কিন্তু টিনিভেডিয়ান, জামাইকান, গ্রেনাডিয়ানরাপে তাঁরা আপন ইচ্ছা ও বিবাস সংগত আচার ধর্ম ভাষা রক্ষা করবেন।

অব্যবহার বিপর্যয়ে এবং একান্ত বিরুদ্ধ পরিবেশে ধারা ধর্ম ভাষা সংস্কার হারিয়ে বলেছেন তাঁদের অনেককে দেখলাম। মোহাম্ম-বোকাই নাহব-পণ্য, প্রথমে কাকি "স্নেড", পরে ভারতীয় "হুলি", কোথায় ছিল তাদের আপন রাষ্ট্র, কোথায় তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকার। কোথায় কোন্ মুহুর্তে, ডাচ বা ফরাসী-অধিকৃত ভূখণ্ডে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতীয়কে কোন্ আইনে নামানো হল তা কে জানে। বেথানে পৌঁছল সেখানে তৎক্ষণাত্ তাঁদের জাহাঙ্গা হল মণাঘ-ভরা অশ্বলে। ঢুকল তারা আবেগের অরণ্যে, মরল কেউ শাপের কামড়ে, বারা বাঁচল ধলে ধলে তাত্রা ভতি হল দিনে বারো-চৌদ্দ ঘণ্টার বাটুনিতে। আবেগ রুল ঘণ্টে বেরোলো, চিনির রূপ সাধা উঁচু হয়ে উঠল, কারখানার কল খামল না। মোহাম্ম-বাঁটি ল্যভের বন্দর হল স্তম্ভকায়।

পালাবার পথ বন্ধ হল, কেননা শুধু সন্মুখ লাফিয়ে বাড়ি কেয়ার অসম্ভবতা নয়, শেষ পর্বত ইচ্ছাশক্তির ভ্রাপে বন বন্ধ হয়ে যায়, সম্ভবও হবে ওঠে একান্ত অবিবাক্ত। অনেক বোঁপে, যেমন গ্রেনাডায়, এমন কি জামাইকার অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিপূর্ণ পার্বত্য এনে লোকালয়ে সেখিঁচি বৈশির ভাগ ভারতীয়রা ভাষা, ধর্ম, আপন পিতৃপুরুষের নাম-পরিচয় হস্ত সবই গেছেন ভুলে। সামনে এসেন উইলিয়ম জোনস্—কিন্তু বেশমাত্র বোঝা যায় ভ্রমলোক না উইলিয়ম না জোনস্—অর্থাৎ আসল কোনো ভাবে। ধলে ধলে ঐসের ক্রিস্চান করা হয়েছে; নাম ঐসের বললে দিয়েছেন শাসকপক্ষের ধার্মিকেরা, আছে শুধু পুরোনো এবং অ-বদলানো সাক্ষ্য রং এবং চেহারা, অপরিবর্তনীয় ধরন। ঘরে গিয়ে উইলিয়ম জোনস্ অনাকৃষ্টি বা অভিকৃষ্টির রায়ে ভূতপুত্ৰ করেন, পাখরের টুকরো নেড়েচেড়ে অস্ত্র লোম বা নিং ছুঁয়ে থাকেন তাঁদের ইচ্ছায়, রবিবারে ঘান গির্জায়। নয়তো রবিবার সকালেও পালিয়ে পান করেন rum। সজ্জয় ক্যাস্ট্রি-কর্তৃপক্ষ বোঁপে বোঁপে রান্-এর আড়ত বানিয়েছেন, একই আবেগ গাঁজানো রসে চাবীর এবং মালিকের আনন্দকর্কণ হচ্ছে। মালিকেরা একটু সতর্ক, যেখেনই রান্-পান করেন, কিন্তু সময় বুঝে; তা ছাড়া পাকস্থলীতে খ্যন্তের সঙ্গে মত্ত যোগ হলে অতটো দ্রুত অস্ত্রি বশা হয় না। দাবিপ্রচার অঙ্গপানে মত্তের বোগ হলে ব্যাপারটা দাঁকণ হতে বাধ্য। কোনো কোনো বোঁপে বক্তৃতায় বলতে বাধ্য হয়েছি—rum-এর সামান্য ন্য আছে ধর্ম, না আছে বুদ্ধি। স্বার্থ সামান্য চর্চা করলে এরা বাঁচত। দুচার জন দেখলাম ঠিকই বুঝলেন কী বলছি। এমন কি রান্-এর ব্যবসা চালান যে-সব "পাণ্ডিত" (কেউ কেউ এরা হিন্দুধর্ম রক্ষা করেছেন

কার্যবিয়নের চিঠি

কিন্তু একই সঙ্গে রাম্ এবং রামায়ণের ব্যবসা করেন) টিনিজাডে ওদের কাছে থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছি। সব স্ক্রু কী জটিল ব্যাপার তাই বুঝুন। নে-কোনো ধর্ম বা সভ্যতা এতদূর কল্যাণে কোনোই দোষ নেই বলাই বাহুল্য, কিন্তু বিচুড়ি বানিয়ে ধর্মের বা সভ্যতার উৎকর্ষ হয় না। গিছুড়িতেও বাধা নেই, যদি শক্তি রাগা হয়, তার সঙ্গে প্রাণের অন্তরে যোগ থাকে। যেখানে পাচক বা ভোক্তার দল স্থাপন ইচ্ছায় যুক্ত, সেখানে কেবলমাত্র হিন্দু বা খ্রিস্টান বা মুসলমান কিংবা অন্য কোনো ধর্মকে অসহায় সমবেত জনসংখ্যার সামনে একমাত্র পথ বলে জাহির করা হয় নি, সেখানে ধর্মও সমাধে দেয়-মেয়ার মন্তল পথ উদ্ভূত। কেউ কেউ খর্যন্তরে না গিয়ে, সর্বমানবের আধ্যাতিক ধর্মে উপস্থিত হতে চান। নাহুয়ের দেবা এবং ঐশ আরাধনায় কেউ বা প্রচলিত বিশেষ ধর্মের গভীরে প্রবেশিত হয়ে আসল ধর্মকে উদ্ধার করেন। হিন্দু বৌদ্ধ বৃষ্ট ধর্ম বা ইসলামের বিত্তম্ব রূপ কারো অবিদিত নয়। কিন্তু স্ক্রু খও যোগজিহ্ন বীপে বা দুর্গম গংন সেশের কোনো কেবলমাত্র অন্ধ মিশ্রণের বা জ্বররপ্তির প্রথা শুধু হলে ধর্ম ঠেকে ক্রিয়াকাণ্ডে, তাহা ঠেকে talkie-talkie-তে। সেই টকি-টকি না হিন্দি, না ইংরেজি, তাতে না আছে বর্গালা, না আছে কোনো চিন্তা বা সভ্যতা বা ধর্মের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। মার্টিনিক বীপে কাক্সি এবং ফরাসী ভৃত্য-প্রাক্ত-সংশ্লিষ্ট উদয়বিদ জুদায়র বে-ভায়া এবং তকী তৈরি হয়ে উঠেছে তার মহিমা অবর্ণনীয়। ধর্মের মানবধর্ম প্রকাশ করার পথ অন্য।

ভর্নির আইল্যান্ডগুলি পূর্বে ছিল ডেনিশ; এখন কিছু তার ইংরেজ, নার্কিনেরা কয়েকটি দীপ কিনে নিয়েছে। বিভীষিকার কালে একদা যখন পশ্চিমজাতীয়েরা বিস্তৃত আরব এবং আফ্রিকান বাসবাসদায়ীদের সঙ্গে পুরোপুরি যোগ দিল এবং যন্ত্রভাষার যোগে তাকে ফীত, সন্ত্রাস্ত এবং অত্যন্ত লাভজনক ক'রে তুলল তখন এই দীপগুলিতে জীভনাসদের ঘড়া করে পুনর্বার বেচা-কেনা হত। সাহায্যের কাপ্তেনদের লগ-বুক-এ পড়া যায় আফ্রিকা থেকে এইসব দীপে আসবার পথে প্রত্যাহ অনেক মানুষ "নেই" হয়ে যাওয়ায় তাদের সমুদ্রে কেলে দেওয়া হত। মৃত্যুর কারণ সাহায্যের বায়ুহীন কক্ষে অসহনীয় ভিত্তি, কখনো জলের বা খায়ের অভাব, নানারকম যন্ত্রণা, রোগ। সাহায্যে জন্তর ব্যবস্থাও আশ্রয়ের নিম্নে অন্তরকন। দাসদের মধ্যে ঝগড়া বেঁচে থাকত, তাদের ভাগ্যে খানী-স্ত্রী পিতা-মাতার বিচ্ছেদ এবং পুনর্বার বেশি লাভে অন্তরের কাছে বিক্রীত হওয়া। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আনেন বিশ্ববিখ্যাত, তারই পালা আধুনিক রাজ্যসাম্রাজ্যের তুলন বিপ্লবে আবিস্কৃত, কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেকের। কোনো দেশ বা জাতি এর থেকে পরিজ্ঞান পাবে না, কেননা জাতি বা বর্ণ বা "ধর্ম" নামে পৃথিবী জুড়ে মানুষ অমানবিকতার চর্চা করেছে। St Croix দীপে এদেছিলান স্বরণ করতে, লকপের হয়ে এবং বিশেষভাবে জায়তীয় হয়েও। অস্পৃশ্যতার ধর্ম ঝগড়া আনেন দাস-বন্দ্যার ধর্মও ওদের, যদিও অন্যবিধ। কী শাস্ত্র শ্রুতী ছড়িয়ে আছে St. Croix দীপের Christiansted নামক ছোট্ট নগরে; আশীর্বাদী আলো করে পড়ছে চিরবসন্তের বনানীতে, সমুদ্রের শব্দন কোরাগ-বাশির উচ্ছলতায় মধুর মন্ত্রিত, মিশ্রিত। মনে হল এই দুঃখের তীর্থে ক্ষমার সৌম্য এসে পৌঁছেছে। সেই ক্ষমা যেন প্রত্যেক সভ্যতার আয়ত্তা অর্থন কর্ত্তে পারি। গির্জের চূড়ার, বাড়ির খাপড়ে পুরোনো ডেনিশ ভাষা চিত্রাকর্ষক। ভর্নির দীপ ছেড়ে যেতে হল গোটে। রিকো-তে, দান-জুয়ান সাম্রাজ্যে। ভাষা ইন্দোনী, যদিও শব্দে অল্পবিস্তর অনেকে ইংরেজি (বা "নার্কিনি") আনেন। বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম এই দীপ জুড়ে

আমেরিকানদের চিত্তশক্তি স্বার্থ ই ক্রিস্টিয়ান, তারাই এই বীপের প্রকৃত চালক, কিন্তু এই চালনার আন্তর্জাতিক আছে, স্বার্থ জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাধা, আর্থিক সমৃদ্ধির জন্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা বীপবাসীরা নিজা সহযোগী হয়ে দেখা দিয়েছে। সত্যের অর্থ ক'রে বা সত্যস্বাধা ধরিয়ে ক'রের বিতর্কতা রক্ষা হয় না।

কার্যবিহীন বীপপুত্র ছোটো একটি পৃথিবীর মতো। স্বাস্থ্যজাতির সংঘর্ষ এবং সমন্বিততার ধারাবাহী আবেশিত প্রতিক্রিয়া ক্রম আয়তনের দ্বারা স্পষ্ট চোখে পড়ে। "ইতিহাস কাউন্সিল ফ্রম কান্ট্রারাল রেলেশনশিপ" দ্বারা থেকে আদ্যক থেকে নিষ্কাশন করেন এই বীপবাসীর তীর্থে বেতে। অনেক বীপের নাম করেছে; তা ছাড়া গিয়েছি টোবেগো, বার্বেন্ডোন্স, পেট টমাস, গুয়াডেলুপ, আন্তিগুয়া বীপে। পাত হয়েছি, বা ছুঁয়েছি জমিনিকান্ রিপাব্লিক, ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়া দেশের প্রান্ত। পনোবা ক্যানাল প্রবেশে প্রায় হাজার ভারতীয়ের বসবাস, সেখানে কয়েকদিন সৌহার্যের ব্যতীত, বিশ্ববিজ্ঞানের বক্তৃতার ও অন্যে দ্রুত কাটল। ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যানে অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমান বাবীন ভারতের জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিচয় দেবার ভার ছিল আমার; বিশেষ ক'রে সেই সব বীপবাসীদের কাছে যাঁদের সংস্কারে সমগ্র ভারতীয় সম্পর্ক আছো ঘনিষ্ঠ। কখনো ভাবি নি শুধু ইতিহাস নয়, আমেরিকান ভাই-ভগ্নীর খোঁজে ব্রিটিশ সিগন্যার গহনে প্রবেশ করতে পারব। একই অপরায়ে রেজিলের সীমান্ত পেরিয়ে গুডা-জাহাজ থেকে দেখলাম পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু জলপ্রপাত, কাইটুর Kaitum কন্দু—মানবহীন আদিব যন অরণ্যে প্রকৃতির অপ্রাণ জলধারা তুলে সর্বমানে শাখা হয়ে উঠেছে, কেননা ভলিয়ে যাচ্ছে আর্বাতিত খরখার নদী। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে যখন সলজ বিখ্যাসের নির্মল প্রতীতির আমেরিকান পরী-সংসারে নামলাম, ছোটো শিশু এগিয়ে এল হাসিমুখে, তখন মনে হল আমার ভ্রমভীর্ণ একটি মনে পৌঁছেছে। এরাই কার্যের বীপবাসী, ল্যাটিন আমেরিকা, আমেরিকার মূলভূমি ও ক্যানোভা অঞ্চলের অধিবাসী। এরা না হোক, এসেই বংশগত এবং জাতি ও সংস্কারসভ্যতার সব চেয়ে কাছাকাছি বাস্তবতা ছিল পৃথিবীর এই অঞ্চল ছুড়ে। তাদের আম যন বনে, নকর ক্যানিয়ন্ বা পোরাই রাজ্যে হুঁতে বাস করতে হয়। বীপে বীপে তাদের ইচ্ছা করা হয়েছে। এর পিছনে যে ইতিহাস প্রকল্প বা প্রকট তার বর্ণনা এখানে করব না। কেবল ব'লে রাখি পবিত্র আমি আর্বেরা ভারতবর্ষে তুলে পাল হতে দ্রুত নয়। বার্কিন দেশে কল্যাণের ধারা "আদি-বার্কিন"য়ের দিকে ফিরেছে; তা আমেরিকার নানা অন্যে লক্ষ্য করেছে। কার্যবিহীন দেশে এবং ল্যাটিন আমেরিকার তীর-তীর্থে টেন্ট, ইতিহাস পৃথিবী জ্ঞানের গেলান আমেরিকানকে আবারে প্রভাবেদনার অভিনবন। কলম্বাসের তুলে এই অঞ্চলে ইতিহাস নামের অপপ্রয়োগ ঘটেছে, কিন্তু এর কলে ধ্বনি ভারতীয়ের সঙ্গে দূরে ভাইয়ের নতুন যোগ হয় তাহলে কল্যাণ। কার্যের বীপবাসীর অন্যে এদের সঙ্গে মিলন না ঘটলে তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হত না; ভারতবর্ষ যে সর্বমানবিকতার চূড়ান্ত পরীক্ষার নিষ্ঠুর তার পরিচয় এই হত। কার্যবিহানে পশ্চিমদেশীয় নানা জাতির লোক, আফ্রিকার বিবিধ অঞ্চলের নরনারী, ভারতীয় চীন আর্থিক সীমিত ইহুদি সম্প্রদায় একত্র ভাগ্য-পরীক্ষার মিলেছে। কাউকে বাস দিয়ে মানবকা শান্তিরক্ষা হবে না। হিন্দু মূলধান ভারতের বাহিরে সেখানে সহজাত একের মনোনি, স্বার্থ ক্রিষ্টান শিক্ষক ব্রতচারী সেই সহযোগিতায় সমর্থনী। কার্যবিহানের বীপে নতুন বীপালির মূল্য সেবে এসেছি। সব আসো অলস নি। কিন্তু সেখানে অরণ্য ইতিহাস দীর্ঘ ছায়া

ক্যারিবিয়নের চিঠি

কেলে আঝা আখের ক্ষেতে, মনের কারখানায়, ধানের মাঠে জলাধ বাহুরের উত্তর খুঁজছে সেই পরিবেশে একটি নতুন গ্রামীণ জগলে অনেকখানি আশ্বাস পাওয়া যায়। দুই সেবার উৎসবে ভারতবর্ষ থেকে জানী শিল্পী সাপেক্ষে গিয়ানায় টিনিডাতে দুইদিনে নতুন কালের আত্মনাকে বোঝা দেবেন না কি? অন্তর্দেশীয়, অগ্র বাট্টের অন্তর্ভুক্ত জনস্বাক্ষরের সঙ্গে মঙ্গলকর্মে মিলিত হবার অধিকার সকলের। ভারতবর্ষ অনেক দূরে, কিন্তু কাছে-আশা বাহুরের হৃৎ তায় দায়িত্ব কম নয়। বস্টনে ফিরে এসে এই চিঠি পাঠাই।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

জর্জ বার্নার্ড শ

ক্রীসরোজ আচার্য

Caesar and Cleopatra.

আগের কথা পড়ে। জর্জ বার্নার্ড শ-র অসামান্য প্রতিভা এবং শিল্পশাস্ত্রের কথা পড়ে হবে। যে প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে এদেশে এবং বিদেশে তাঁর জন্মশতাব্দিকী উপলক্ষে, যে হল তাঁর সাহিত্য-কীর্তির স্বাক্ষর নিয়ে। রাষ্ট্রনেতার চেহেৰে সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক গুণীদের পরীক্ষা বড়ো কঠিন—এক হল সমসাময়িক কালের বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা; আর একটি হল চিরকালের অথবা ভাবীকালের দরবারে আসন পাওয়ার। ভাবীকাল অর্থাৎ ‘পস্টারিটি’ কি ভাববে, অহঙ্কর করবে, কি বলবে, তা নিয়ে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যাহুয়োগী মাজেরই কিছু দুর্বলতা আছে। অতীতের বহু বহু শিল্পকীর্তি অনেক শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে চিত্রশলোকে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে; সেইগুণ ভিন্নায়ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার দিকে তাকিয়ে দ্ব্যবতঃই আমাদের মনে হয়, আমরা ঈশ্বরের ভালোবেসেছি, ঈশ্বরের লেখায় বচনে ও কাজে গভীরভাবে উন্মুগ্ন হয়েছি, ভাবীকালে তাঁদের স্থান কোথায় হবে? ‘আমি হতে শতবর্ষ পরে’র প্রশ্ন কেবল দ্রবীক্ষনাধের মনেই জাগে নি; সাহিত্যিক এবং সাহিত্যাহুয়োগী সকলেরই মনে কখনো না কখনো স্পষ্ট অথবা অর্ধস্মৃতাভাবে এই প্রশ্নের গুত্তরন ওঠে। বার্নার্ড শ সম্বন্ধেও এরকম প্রশ্ন উঠেছে; যেমন কবি যেহিসের স্বাক্ষর নিয়ে আলোচনা কিছুকাল পূর্বে প্রথম হয়েছিল।

শ-র শতাব্দিকী উপলক্ষে ‘ভিকি’র কাটুনে শ বলে আছেন উপলোকে; নীচে পৃথিবী বিরোধ হচ্ছে পারমাণবিক বোমার আঘাতে, আর শ তাঁর বিখ্যাত ‘হেক্সিস্টোফিলিস’ খাঁচের হ্যাগি-হ্যাগি মুখে ঘেন বলাছেন, ‘ওগাই আবার জিজ্ঞাসা করছে আমি টিকে থাকব কি না— And they are asking whether I shall survive.’ অবশ্য ওহা অর্থাৎ সাহিত্যাহুয়োগীরা শ-র স্বাধিকের প্রশ্ন আর পৃথিবীর পারমাণবিক বিনুস্তির আশঙ্কাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখছে না। দেখলে হয়ত শ-প্রতিভার উপরে হুচিয়ার করা সম্ভব হত। কারণ গত এক শ বৎসরের মধ্যে তিনপঞ্চকাল খরে যদি কোনো ব্যক্তি প্রাচীনকালের

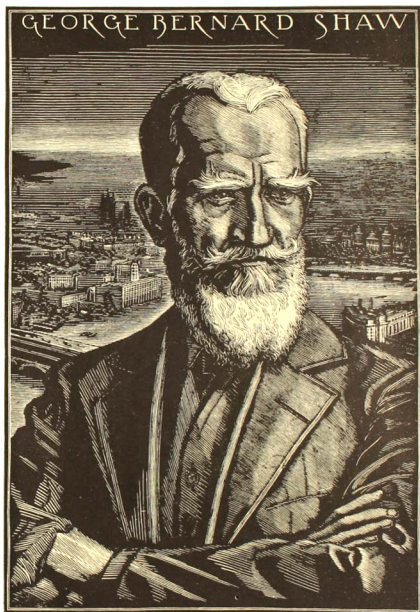
'প্রফেট'দের মতো। মৃত্যুর বিরুদ্ধে, মহতী বিনষ্টির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সাধনাবানী। স্ত্রীকে থাকেন তবে তিনি আর কেউ নয়, একমাত্র জর্জ বার্নার্ড শ। তবু এ ঠিক উত্তর হল না। শ-র স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের প্রশ্ন নিয়ে। এই প্রশ্ন অবশ্য একেবারে নতুন নয়, যদিও শ-র শতবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন করে এ নিয়ে কিছু চিন্তিত্ব প্রকাশ করা হয়েছে।

'দি শেভিয়ান' *The Shavian* পত্রিকা শুরু হয়েছেন বাস ব্রিটেনে শ-র প্রতি উদারীনতা দেখে; সম্ব্যাস করেছেন, 'ঘোরোপের নানা স্থানে, মকো এবং এমনকি স্বপ্ন পিকিংএ পর্যন্ত শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে [ভারতেও কলকাতা এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে]; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমনটি হয়, সেইরকম শেভীয় উৎসাহে ভরপুর। কিন্তু ব্রিটেনে 'ওল্ড ভিক'এর শ-অভিনয়ের পালা এবং আরো দু-চারটি অল্পচলিত ছাড়া যা হচ্ছে সে হল, শ-র উইল নিয়ে মাথলা, তাঁর গ্রন্থাবলীর উপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি, তাঁর সর্বশেষতম নাট্যকাব্যটির প্রকাশ নিষিদ্ধ করা এবং *Pygmalion* ও *Major Barbara* কিম্বা দুপানির প্রদর্শন বন্ধ করা।' বার্নার্ড শ 'স্মারক ডাডার'-এর উদ্ভোক্তারা আবেদন জানিয়েছিলেন আড়াই লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহের ক্ষমতা; পাণ্ডা গেলো মাত্র ৪০৭ পাউণ্ড। দ্বিতীয় হলও, নানা কারণে উদ্ভোগ বাহ্যত্ব হলও, ভারতবর্ষে স্বাধীনতার স্মৃতির ক্ষত এর চেয়ে অনেক বেশি করতে পেরেছে। এগুই হয়তো আহুতবিক ব্যাপার। শ-র প্রথম ব্যক্তিত্ব মৃত্যু, তাঁর অস্থায়ী লেখক চিত্রায়িত্বী শিল্পীর সংখ্যা ব্রিটেনেও এখনও নগণ্য নয়। বি. বি. সি. 'থার্ড প্রোগ্রামে' এবং টেলিভিশনে *Back to Methuselah* ও *The Devil's Disciple* অভিনীত হয়েছে শতবার্ষিকী উপলক্ষে; ডেব সিবিল ধর্মজাইক তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের এক পৌরবসম্বন্ধে ক্রিয়ে এনেছিলেন বার্নার্ড শ-র স্বরণে, বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে গির্জায় *Saint Joan*এর মর্মস্পর্শী বক্তৃতাটি আবৃত্তি করে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রান্সে *St. Malo*তে *Caesar and Cleopatra* অভিনীত হয়; বিরাট ঐতিহাসিক দৃশ্যগটে প্রাচীন চরিত্রের সঙ্গে শেভীয় হান্সরস এবং বাক্যছটার সন্নিবেশ করাও এবং ইংরেজ দর্শকেরা ভালোমতই উপভোগ করেন।

এসব সম্বন্ধে শ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইংরেজ সমালোচকেরা শ-প্রতিভার স্থায়ী আবেদন এবং চিরায়ত গুণ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোনো একজন সমালোচক আশা দিয়েছেন, একপৃষ্ঠার পরে তখন লেখকেরা *Back to Methuselah* থেকে প্রেরণা সংগ্রহে উৎসুক হবেন। হয়তো এই সম্বন্ধে বহু সমালোচক কালের প্রতি কিছু স্রেব আছে। আমাদের এই যুগ আবেগগর্ভক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সমস্ত-পীড়ায় শিশাহীন, প্রায় আশাহীনও। *Back to Methuselah*-র শেভীয় কল্পনাকে সব আশক্তি ও বাসনার সমাপ্তি; সেখানে কেবল বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল স্বর্গীয় জীবন ধরে নিরাশক্তির সাধনা। শ নিজে পৌঁছেছিলেন প্রায় সেই পরম প্রশান্তির বর্ণে; তাঁর আত্মকাল শতাব্দীপূর্তির মাত্র ছ বৎসর পূর্বে হোচট খেয়ে অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেলেও জীবনের প্রান্তিক সময়ে তিনি *Methuselah*র জ্ঞানবুদ্ধির মতোই হয়েছিলেন আবেগহীন বুদ্ধির নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। তাই তাঁর সাক্ষ্যের পরিচয়, পরাজয়েরও। পরাজয় নিশ্চয়ই, নতুন। মৃত্যুর মাত্র ছ বৎসর পরে শ-র স্থায়ীত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে না। পরাজয়, কারণ শ বেঁচেছিলেন স্বর্গীয়কাল, তাঁর ব্যক্তিত্বের অপমান্য দীপ্তিতে, কিপ্রত্যয় মৃত্যু করেছিলেন তিনি পুরুষ ধরে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, চিন্তানায়কদের। তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে। কোনো কোনো সমালোচক হয়তো ঠিকই বলেছেন, এর ক্ষত ক্ষতি শ-র নয়।

প্রথমতঃ তিনি ছিলেন বিরাট প্রতিভাধর; এই বিংশ শতাব্দীর বিতীর্থ অর্থের আর হত শক্তিই থাক্-না কেন, কোনো বিরাট প্রতিভাকে বহন করা তার সাধ্যাতীত। বিরাট আদর্শ সংকল্প ও প্রয়াসের হুগ তরু হয়েছিল গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, আর সে হুগের সমাপ্তি হয় বোধ হয় প্রথম মহাদুর্ভেদ সবে নগে। শ-প্রতিভার বিকাশ ও বিরাট সাফল্য যেটামুটিভাবে এই হুগটির মধ্যে সীমাবদ্ধ—১৮৮০ থেকে ১৮৮৩ হল শ-র সাহিত্যিক শিক্ষানবীশী; ১৮৮৫ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত সমাপ্ততরে প্রথম পাঠ, লওনের বসতিতে পার্কে লড়াশমিতিতে এবং গির্জা ও বিটিস গবেষণা প্রমুখ কেবিরান হুগদের সাহচর্যে; তার পরে ১৮৯৫ *Widowers' Houses* থেকে ১৯২৫ *Saint Joan* পর্যন্ত অন্তত ৩৭খানি নাটকে মি. বি. এল.-এর প্রতিভাশীল ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা। *Saint Joan* এর পরও শ-র অস্রাভ লেখনী ও অপূর্ব উদ্ভাবন-ক্ষমতা কাত হয় নি। *The Apple Cart* (১৯০০)-এ প্রোগ্রাঙ্কল হাস্যরসাস্রিত কর্মেই তাকগোর, তর্ক ও বুদ্ধির স্নিগ্ধ আঘাত-প্রতিঘাতের উকীলপন্থা বিভ্রান্ত্য গতিশীল। *Too True to be Good* (১৯০৪), *On the Rocks* (১৯০৪), *Geneva* (১৯১২)-তেও মি. বি. এল.-এর অবিচল লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। তবে শেষ হুগের এই মি. বি. এল. বড়ো বেশি পরিচিত; তার বক্তব্য, বাচনভঙ্গী, নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানের কৌশল সবই যেন প্রায় জানা হয়ে গেছে। নতুন কেবল সমসাময়িক সমস্রাগুলির নাটকীয় প্রতিফলন—গণতন্ত্রের সমস্রা ও সংকট, রাষ্ট্রপরিচালনায় বলপ্রয়োগের নীতিগত সার্থকতা, যোগ্যতাপী রাজনীতিতে নীতি ও স্বার্থের স্বপ্ন। এর কোনোটিই মি. বি. এল.-এর প্রথম দৃষ্টি এড়ায় নি; মি. বি. এল.-এর মুখের ভাষণ ও ভাষা অল্পতভাবে এগুলির নানা অঙ্গ-গতি ও প্রস্তারণা উদ্ঘাটিত হয়েছে, ভাব-সংঘাত স্রষ্টা করেছে। মি. বি. এল. পেরেছেন নাটকীয় সাফল্য, স্বার্থ হয়েছেন জর্জ বার্নার্ড শ।

শ-শতাব্দিকী উপলক্ষে সমালোচকেরা শেষ পর্যন্ত এই সাধনা যিচ্ছেন যে, অর্থ শতাব্দী পরে যোরোগীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে প্রের লেখক-কতিপয়ের মধ্যে শ নিঃসন্দেহে স্থান পাবেন। সাহিত্যের নামূলি বিচারে কোনো সম্ভেই নেই যে, ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে সেরাণীরের পরেই বার্নার্ড শ-র স্থান। কনগ্রীভ, শেরিডান, অক্সার ওয়াইল্ড প্রত্যেকেই নাট্যকার হিগাবে কিছু-না-কিছু কৃতিত্বের অধিকারী। কেউই কিন্তু বার্নার্ড শ-র সমকক্ষ নন নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রস্রষ্টার বৈচিত্র্যে; সংলাপের তার তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞাতিক সূরণে ও ক্ষিপ্রতায়। ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণ আদ্যরল্যাণ্ডের কাছে নিভান্ত কম নয়। তখনকার কালে রাজনৈতিক বধ্যদায় বাটো হলেও আইরিশবষের কাছ থেকেই ইংল্যাণ্ড পেরেছে এডমণ্ড বার্ক এবং গোল্ডস্মিথকে, হুইফট্র, শেরিডান অক্সার ওয়াইল্ড এবং বার্নার্ড শ-কে। আদ্যরল্যাণ্ডের যে ভাগ্যভাঙিত তরুণটি স্রিমদারী সেরেত্তার লোভনীয় বাজাকিগিরির চাকরি ছেড়ে ডিক্টোরিয়ার ইংলণ্ড এসেছিলেন ১৮৭৬এ, তার অল্প কিছু শয়ল না থাক্, ছিল ছাই-চাপা প্রতিভার ফুল্লিহ আর অমদ্য আয়বিস্যাস। 'লওনকে কিছু শেখাতে হবে' (to educate London) এবং ইংরেজি সাহিত্যের রাজা হতে হবে, এই ছিল ভরুণ বার্নার্ড শ-র সংকল্প। শ-প্রতিভার চিরস্রাঘিষের প্রের বাদ যিষেও তার শতাব্দিকীতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, জর্জ বার্নার্ড শ তার ছুটি সংকল্পেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, অন্যদ্যে অল্পত নয়, দুত্তর সংগ্রাম করে। লওনকে শুধু নয়, সারা পৃথিবীকেই তিনি কিছু শিখিয়েছেন, ইংরেজি সাহিত্যের রাজতিলকও তিনি পেরেছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম অর্ধে হার্ভি, গল্ডস্মিথ, ওয়েল্ড, বেনেট, বোইন, ব্রিজেস প্রভৃতি সাহিত্যিকপ্রেরদের মধ্যমণি ছিলেন বার্নার্ড শ। আর ইংরেজি ভাষার রচনাশৈলীতে শেতীর ক্ষত কখনতকী, রের, বাস, তিরস্রারের সংস্থার দীপ্তি ও স্বচ্ছতা যে



জর্জ বার্নার্ড শ

শিল্পী দিকক

নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে তা অনন্তসাধারণ, তার অস্বাভাবিক প্রাণ সাধাভূত। শ-র নাটকের সালাপ হল কি-প্রতি, মুক্তমন, প্রবর্তী তালের; সাধারণ, অসাধারণ সব চরিত্রই সমান ব্যঙ্গপট, নাটকীয় ভাবে অমিত-ভাবী, প্রগল্ভ; অথচ প্রত্যেকটি কথাই সুমিত, প্রগল্ভ থেকে আলাপ। নয়, কখনো অনর্গল তর্কের ধরপ্রোতে প্রবন্ধ-মান, কখনো বা একটিমাত্র লক্ষিত উক্তিভেদে বুদ্ধির উজ্জলতার ভাবস্বরূপ। তাঁর নাটকের ভূমিকার রচনাশৈলীতে প্রাণাধীন কতকটা অন্তর্যম্য, এখানেও সুরধার বুদ্ধির দীপ্তি, তবে বুদ্ধি আরো দুটো-বন্ধ, নাটকের বিদ্বৎ-ঘটা তাঁর ভূমিকায় দার্শনিক তর্কবোদ্ধা এবং প্রচারক। লওনকে তথা পৃথিবীকে কিছু শেখাবার সংকল্প শ কখনো ভোলেন নি। তবে শ-র নাটকের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বন্ধে তুল ধারণা থেকে তাঁর প্রতি কিছু অবিচারও হয়েছে। অনেকের মতে শ তাঁর তত্ত্ব এবং বক্তব্য ভূমিকায় লিখেছেন প্রথমে এবং পরে তা প্রতিপাদনের জন্য নাটকের আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেজন্য তাঁর সব নাটক ও নাটকীয় চরিত্রই তাঁর নিম্নতর মস্তকের প্রতিফলন মাত্র। প্রকৃত-পক্ষে শ প্রথমে নাটকই লিখেছেন, ভূমিকার কথা চিন্তাই করেন নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই নাটক অভিনীত হওয়ার অনেক পরে তার ভূমিকা সংযোগ করেছেন।

শেভীরা নাটক যে রসোত্তীর্ণ, অভিনয়সাধ্য তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কালোত্তীর্ণ কি না এই প্রশ্ন টিক স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপিত হয় নি। প্রশ্ন যে উঠেছে তার একটুকরা জর্জ বার্নার্ড শ ছিলেন জি. বি. এস.-এর চেয়ে অনেক যৎ ও বৃহৎ। জি. বি. এস. হল জর্জ বার্নার্ড শ-র নাটকীয় পরিচ্ছদ। সেই পরিচ্ছদ অথবা কালক্রমে জর্জ বার্নার্ড শ-র শরীরে এমনই এঁটে বসেছিল যে, অনেক সময়েই শ-র স্বয়ং মানবিক স্বরূপটি হারিয়ে যেত জি. বি. এস.-এর বেপরোয়া ডাঁড়ি, অতিশয়োক্তি এবং নানা বিপরীতকথনের হস্তবুদ্ধির প্রকাশের মধ্যে। জি. বি. এস. এবং বার্নার্ড শ একই ব্যক্তি হলেও একান্ত নন, একার্থক নন। জি. বি. এস.-এর প্রগল্ভতা কখনো কখনো অসহনীয় হয়েছে, কেবলমাত্র আমোদ পাওয়া এবং দেওয়ার উদ্দেশ্যে জি. বি. এস.-কে বুদ্ধির কুলস্কুরি ছড়াবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন বার্নার্ড শ, আর সেজন্য তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মর্যাদা ক্ষুর হয়েছে। সাধারণ লোকে মনে করেছে তাঁকে স্ফুটর আত্মপ্রকাশ নাম-ক-গুণ্ডিতে ফাঁদে। লর্ড রাসেলের মতো ব্যক্তিও তাঁকে বলেছেন, 'অসাধারণ চতুর কিন্তু বিজ্ঞ নহ—Immeasurably clever but not wise'। ডেন্সনও ম্যাকার্থির মতো অস্বাভাবিক সমালোচক বলেছেন, শ-র মনোবগতে অসংখ্য স্বচ্ছ চিন্তার হেতুভেদ, মহা বিশৃঙ্খলা—'chaos of clear ideas'। অন্যদিকে থেকে যে বার্নার্ড শ-কে জানি তিনি হলেন তিন পুরুষের কিম্বদন্তী অথবা পৌরাণিক কাহিনী-চরিত্র—জ্ঞান-তপস্বী, বিদ্বৎ-দার্শনিক এবং সমাজপ্রগতির শিল্পী-বোদ্ধা। আমাদের কল্পিত এই বার্নার্ড শ কিছুটা সত্য, আর কিছু পরিমাণে ব্যাতিমাহাছো অতিরিক্ত। যেটুকু সত্য সে হল শ-র অনাড়ম্বর তপস্বীমূলক জীবন, নির্ভীক ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রিয় সত্য কথনের ক্ষমতা। এই বার্নার্ড শ-র তিরোধানের তাঁর নাটকীয় জি. বি. এস. জীবন পরিচ্ছদের মতো কতকটা অনানুত হবেই তাতে সন্দেহ কি? সেক্ষণীয়রকে মনে করার দরকার হয় না সেক্ষণীয়দের নাটকের রসসাধনে। এরিকে ডল্টোয়ার, ভাস্টার জনসন এবং বার্নার্ড শ-র ব্যক্তিত্বই প্রধান আকর্ষণ, এরা কি লিখেছেন তা না কেনে, না পড়েও এঁদের অতিশয়ের প্রবল পরিচয় এবং ঐতিহাসিক বিভূতি অস্বত্ব কর। গায়। শ-প্রতিভার স্বাধিত্ব সম্বন্ধে কেবলমাত্র এইটুকু সাক্ষ্যের আশ্রয় নিলেও কিন্তু শ-র প্রতি অবিচার করা হবে।

বার্নার্ড শ অথবা জি. বি. এস. কেউই সত্যমাত্র বাস্তবহীন 'ফাঁদে' ছিলেন না। পরিহাস হল শেভীরা

প্রতিভা প্রকাশের আধার, সে আধারও শেভীয় শিল্পকৌশলে অনগ্রসাধারণ গড়ন নিয়েছে। বোধ হয় বার্ক কোনো এক ছায়গায় বলেছেন, 'যে খাবার পাকড়ে এটে যায় সেজন্য খাবারই ইংরেজরা পছন্দ করে— 'The English like the food that sticks to the ribs'। আইরিশ বার্নার্ড শ সেইমতোই ইংরেজের অন্তর তাঁর নাটকীয় ভোম্বাষ্য তৈরি করেছিলেন। আরো একটি কারণ হয়তো আছে। ফেবিয়ান পিতামহ শ-র তত্ত্ব হল, বৃত্তি এবং বৃত্তির নিখুঁত প্রয়োগে রাহবের মনে চিন্তার বিমল ঘটতে হবে এবং সংঘর্ষ ও রক্তপাত বিনা সমাজের আত্মল পরিবর্তন আনতে হবে। শেষ জীবনে শ এই পদ্ধতির উপরে অনেকখানি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের চেয়ে ডিক্টেটরশিপের প্রতি তাঁর বোঁক দেখা দিয়েছিল। অনেক সময়ে তিনি ডিক্টেটরদের প্রশংসায় আতিশয্য দেখিয়েছেন। এর কারণ অবশ্য প্রতিভার খামখেয়ালী বাক্য নয়। অসংখ্য পরম্পরাধারী আইরিশের আকর্ষণে খাবারান হওয়া শেভীয় প্রতিভার স্বভাববর্ণ, তার পরিচয় তাঁর নাটকগুলির আইডিয়া-গত স্বরূপ-ঘাতে হঠাৎ উল্টোপাল্টো পরিণতিতে। অধিকাংশ শেভীয় নাটকে ঘটনার হৃদয়স্থর কোনো ছন্দ পাওয়াই দুষ্কর; শেষভের নাটকে যেমন ঘটনা ও চরিত্র-সমাবেশের অটলতা, শ-র নাটকে তা নেই; সেন্সপীয়ারের যেমন চরিত্রের স্বত্বার্থ ও বিকাশের ধারা, তারও চিত্র সামান্যই শ-র আইডিয়া-মাস্তিত 'হাই কমডি'তে। সোকেটিল নিকমই নাট্যকার ছিলেন না, তবু তাঁর দার্শনিক কথাপকথনে নাটকীয় রসের আশা পাওয়া যায়। সোকেটিলের কথাপকথন বিশ্বাসহিত্যে চিরস্থায়ী আদান পেয়েছে। বার্নার্ড শ-কে বিশেষভাবে সোকেটিল বললে হয়তো অত্যাক্তি করা হবে; তবে শেভীয় নাট্য-প্রতিভা সোকেটিক-গুণসম্পন্ন এবং সেইজন্যই শ-র শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির চিরস্থায়ী আবেদন নষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। *Man and Superman* (1903), *Back to Methuselah* (1921), *Saint Joan*, *Candida* (1898), *Major Barbara* (1907), *You Never Can Tell* (1898), *Pygmalion* (1916) ও *Caesar and Cleopatra* (1901) যেসব আইডিয়া আশ্রয় করে গড়া হয়েছে সেগুলি প্রায় সবই মানব-জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সংযুক্ত। সেন্সপীয়ারের কিং লীয়ার, হ্যামলেট, ব্যাকবেথ, হার্শেট অক্‌ভিনিশ এবং অ্যাঙ্ক ইউ লাইক ইউ-এর ঘটনা এবং চরিত্রাবলী আধুনিক জগতের সঙ্গে আদৌ মেলানো যায় না; তবু এই নাটকগুলির গঠনগৌরব, চরিত্র এবং ঘটনাসংঘাতের মূল মানবিক রূপটির আবেদন এখনো জীবন্ত। শ-র শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। যে আইডিয়া *Man and Superman*-এ আদান এবং ট্যানারকে আশ্রয় করে জীবন-মজল-মস্তির লীলারহস্ত প্রকাশ করছে, *Candida*-র 'চিরন্তন ত্রিভুজ'টির যে পরিহাসোচ্ছল নব আবির্ভাব, মানবসভ্যতার পরিণাম নিয়ে যে সুদূরপ্রসারী কল্পনা *Back to Methuselah*-তে বিদ্যুত, পেগলির মানবিক আবেদনও মূগুপরম্পরায় সজীবতা হারায়ে না আশা করা যায়। শেভীয় নাটক যাত্রাই সাময়িক সমস্তা-মূলক নয়। *Pygmalion*, *You Never Can Tell* অথবা *Arms and the Man* (1898)-এর অনাবিল হাস্যরস, রোমাঞ্চিকতা এবং বাস্তবতার বাস্তবপ্রতিঘাত, এসবই সাহিত্যের চিরন্তন গুণসম্পন্ন। তবু পণ্ডিত বংশের পূর্বে ক্র্যাফ হ্যারিস শেভীয় নাটকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ক্র্যাফ হ্যারিস অবশ্য দৃঢ়ভাবে নিম্নবঙ্গীয়াদিক বত ঘোষণা করায় মি. বি. এল.-এর কাছ থেকেই গুরুমার্য বিভ্রা শিখেছিলেন। চব্বিশবার চাকলাজনক শোনার তাই হ্যারিসের একক ঘোষণা— পকাশ বংশের পরেও সোকে এন্সাইক্লোপিডিয়া পড়বে, শ-র নাটক পড়বে না কেউ, শ-কেজানবে সোকে কেবলমাত্র বোঁদার গড়া

জর্জ বার্নার্ড শ

অপরিস্ফুট কোনো ব্যক্তির আবক্ষমূর্তি রূপে। হ্যারিসাই বলেছিলেন, ‘শ টিকবেন না; তাঁর দু-একখানা নাটক শেরিডান, কন্সট্রীড, অফার ওয়াইল্ডের নাটকের পাশে আত্যাগা পেতে পারে, উপরে নয়। ইংলেন্ডে বেরন আদ্য অচল হয়ে গেছেন, শ-ও তেমনি বার্নার্ড বাওগার পর কুড়ি বৎসরের মধ্যে অচল হয়ে যাবেন।’ ইংলেন্ডের কাছে শ কদী হলেও, শেভীয় নাটক ইংলেন্ডের আদর্শ এবং পদ্ধতি অল্পভাবে অনুকরণ করে নি। ফেক্সবায় শস্যমায়িক সামাজিক সমস্যাতে কেন্দ্র করে নাটকসৃষ্টি করলে সে নাটক কালক্রমে নীরস নিম্নপ্রাণ দলিলের টুকরো হয়ে পড়ায়, সে কথা শ ভালোমতোই জানতেন। *Man and Superman*, *Back to Methuselah*, *Saint Joan*, *Caesar and Cleopatra* সমস্যাময়িক চেতনার ব্যঙ্গের বহন করলেও এই শেভীয় কমেডি লেখকগণের রোমাঞ্চিক কমেডির মতোই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণা এবং এই জগতের শেভীয় চরিত্রগুলি যোহানসিও, অর্গান্ডো, বেনেডিক্ট, বিট্রিস, ম্যান্ডলিসিও, অসিডিয়াসের মতোই অবিবাহিত, তাই চিরকীবীও— চিরকীবী শ্রেষ্ঠ শেভীয় চরিত্রগুলির আইডিয়াগত স্পন্দন ও মূহুরতা। কোন্ নাটক কালের ধারায় তার অস্তিত্ব দ্বারাতে পারে তা শ নিজেই ভালোমতো জানতেন।

আইডিয়ায় প্রতি অল্পরূপ এবং দারিদ্র্যের দুর্গতির প্রতি চরম ঘৃণা ছিল জর্জ বার্নার্ড শ চরিত্রের মৌলিক ও মহৎ মানবিক প্রেরণা। দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণা তাঁকে বই পড়ে আত্মতৃপ্ত করতে হয় নি— বিরোধী বমনৌ পরিবারের ‘downstart’ বার্নার্ড শ নিজের জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই ভেবেছিলেন, দারিদ্র্যই হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। ভল্টেয়ারের যেমন সংকল্প ছিল, ‘দূর করো এই পাপ’, Erase the infamy, শ-ও তেমনি সংকল্প ‘দূর করো দারিদ্র্য’। ধনতন্ত্রের ছলনা ও বিকার, মধ্যবিত্ত মানবের রোমাঞ্চিক ভাবালুতা, জিহ্বারীয যুগের অসংখ্যরাজ্যের স্বকণ্ঠশৈলতা, সমাজের কর্তব্যবোধের নীতিবাহীণ কপটচারণ— এইসব অজাল থেকে মানুষের মনকে মোহমুক্ত করার কাজে প্রথম জীবনের বার্নার্ড শ হলেন রাজনৈতিক প্রচারক কবী ও সংগঠক; মধ্যজীবনে সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে নাটককে তিনি সামাজিক প্রগতির অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। শেভীয় কমেডির একটি অংশ তাই প্রচারবহী, চিন্তার জড়তা ও মানব থেকে মুক্তির মোহমুগুর। *The Widowers' Houses* এবং *Mrs. Warren's Profession* (1898) অবশ্যই উদ্বেগ-মূলক নাটক; বস্তি এবং গণিকালয় চালিয়ে শতকরা ৩৫ পার্সেন্ট মুন্সফা নিয়ে সমাজের উপরতলায় সভ্যতাব্য থাকা যায়, পরিবারের পবিত্রতা, যশসংপ্রদ, মানবধর্ম সবই অহুসীলন করা যায় এবং এইসব ভালো জিনিস চর্চা করা যায় বলেই ধনতন্ত্রের উটো পিঠের বীভৎস রূপটা নব্বয়ে পড়ে না। সেই কথাটি চরমপ্রদ কারবার উটোপাণ্টে নানা ঢঙে ও হুয়ে বলেছেন হেনরি জর্জ, হান্স এবং জেডমন্স-এর মানস শিল্প, কেম্ব্রিজ-গোষ্ঠীর পোব-না-মানা মন্ত্রপ্রচাঞ্চক বার্নার্ড শ। এই কথা বলার প্রয়োজন বহন হুরোবে অথবা যদি কুরিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই *The Widowers' Houses* এবং *Mrs. Warren's Profession*-এর মূল বক্তব্য পাঠক-শ্রমকের দ্বারা স্পর্শ করবে না। বস্তি এবং গণিকালয়, শতকরা ৩৫ পার্সেন্ট মুন্সফা উপরে, সভ্যতার চটক বধন নির্ভর করবে না শুধন শ-র আত্মবিশ্বাস সাধনার অনেকাংশ গার্ভক হবে সম্ভব নেই। শ নিজেই সে কথা বলে গেছেন তাঁর *The Widowers' Houses* নাটকখানির উদ্বেগ-প্রদর্শে : ‘I heartily hope that the time will come when this play will be both utterly impossible, utterly unintelligible.’ বস্তি এবং গণিকালয়ের ৩৫ পার্সেন্ট মুন্সফা ভোগ করার ক্ষমতা বাবৎ। এক সময়ে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে, সমাজের মানুষের কাছে এই বাবৎ। একেবারে

ধারণাজীত দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে। শ-র কাছে এরকম পরিবর্তনের সম্ভাবনা আনন্দেরই। ভিত্তোয়ীয় সমৃদ্ধির স্বর্ণগোধার নবাগত আইরিশ তরুণ বার্নার্ড শ এরকম মহৎ স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিহ্নমাত্র দেখতে পান নি। কেবল তিনি নন, দেখতে পান নি ডিম্বেলি, আর চোখে ধরা পড়েছিল 'মেরি ইংল্যান্ড' ভগ্নাবহভাবে বিগবিত্ত, বিভক্ত দুই আতিতে—এক হল ধনী, আর হল দরিদ্র। কার্লাইল দেখেছিলেন একই বৈষম্য, এবং সকল মানুষের মধ্যে শ্রীতি ও জাতীয়-বোধের অভাব। কার্লাইলের চোখে ধরা পড়েছিল দুই শ্রেণী—এক হল 'ক্লবাবু', আর হল নিয়ামক বিশ্বাস যেহেতুের চাকার বাঁধা জনসাধারণ—'Dandies and Drudges.' শ-র মানসপটে একই চিত্র থরতর হল হেনরি অর্ড এবং হার্ব' অধ্যায়নের ফলে, দেখেও বাবে বিচ্ছুরিত আলোকে উদ্ভাসিত হল তাঁর অনেক নাটকের সমাজধর্ষন, ভাঙ্গ ও ভাষণ। গত পঞ্চাশ বৎসরে সমাজ-প্রগতির ফলে এইসব নাটকের সার্থকতা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে। অন্ততঃ কোনো কোনো সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'ওয়েল্‌কেয়ার স্টেট'-এ বস্ত্র ও গণিকালয়, দারিদ্র্যের চরম দুর্গতির প্রতি শেড়ী আক্রমণের এখন কোনো সার্থকতা নেই। এ যদি সত্যও হয় তবে তাঁর মন্ত অনেকখানি কৃত্রিম শ-র প্রাপ্য। তবে ওয়েল্‌কেয়ার স্টেট শ-র নাট্যসাহিত্য অর্থহীন করে কেলেছে এতবড়ো দাবি করার সময় এখনো আসে নি। অন্ততঃ যোরোপে ওয়েল্‌কেয়ার স্টেট যে বিনিয়াদের উপরে গড়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে তাতে শ-র ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে মনে হয়। *Major Barbara*-র আগু আওরস্তাক্ট সংকল্প করেছিলেন দারিদ্র্যের ঘৃণ্যতম পাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার। কানন বন্স্ক বোনা বাকসের কারবাবী আওরস্তাক্টের স্বেচ্ছাচার *gospel* হল, মানবযুক্তির স্তর চাই 'money and gun-powder ; freedom and power ; command of life and command of death.' আওরস্তাক্টের যোরোপের ওয়েল্‌কেয়ার স্টেটের হর্ডাকর্ড-বিধাতারা আওরস্তাক্টেরই মননিত।

জি. বি. এল. নিজে অল্প কোনো নতুন মন্ত রচনা করেন নি। তিনি বিশেষভাবে কোনো একটি ভব বা দতকে আলস্য করেন নি। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্-এর সঙ্গে শ-র মৌলিক পার্থক্য এই একটি—ওয়েল্‌স্‌ও সামাজিক বৈষম্য এবং অসংগতি সম্বন্ধে সচেতন, তবে তিনি কখনো অজস্র আইডিয়াকে খুঁশবতো প্রমাণ এবং অগ্রমাণ করতে উৎসাহী হন নি। শ-র মধ্যে ছিল একটি অস্থির স্ফুটন তর্কগদ্যনী মন, আর সে মন অর্ধশতাব্দীরও উপরে বহু বিচিত্র আইডিয়ার পিছনে ছুটেছিল শেড়ী 'দুই'বুদ্ধির ভাঙনায়। তরুণ বয়সের শ থেকে পরিণত বয়সের জ্ঞানবৃত্ত বার্নার্ড শ তাঁর বুদ্ধিকে পরিচালনা করেছিলেন একই অপরিবর্তনীয় দারায়। একমাত্র সমাজবাদের মূল আদর্শের উপরে ছাড়া আর কোনো মন্ত-বিষয়ে বোধ হয় শ-র দৃঢ়গত অল্পরায় ছিল না। অল্প সব আইডিয়াই তাঁর কাছে সমান আকর্ষণীয়, সমানভাবে বুদ্ধি ও বাস্তবকৌশল প্রয়োগের স্বত্বমাত্র। *Peter Pan* পিটার প্যান এবং *Puck* পাক্ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শ-চরিত্র প্রতি পরে পরে অপ্রভাশিত বিশ্বয় সৃষ্টি করেছে। মনোবিজ্ঞানী *James* ইংও বোধ হয় বর্ণেছিলেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি এবং সেগুলির অটল বয়স, ব্যাকুলতা, বিকাশ ও বিকার থেকে বার্নার্ড শ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এলেন টেরির সঙ্গে প্রথমদীকার অভিনয় তাই অভিনয়ই, অন্ততঃ শ-র দিকে ; পিটার প্যান ও পাক্ বার বার মরণ করিয়ে দিচ্ছে শ-কে ধরা যাচ্ছে না প্রেমের ছলনায়। এর চেয়েও হারামুক অর্থক অসামান্য বুদ্ধির চপলতা স্টানক্রকের মঠকত্রী সন্ন্যাসিনী-মাতার সঙ্গে শ-র ব্যবহারে। শ-র *Saint Joan* পড়ে সন্ন্যাসিনী-মাতা মুগ্ধ হয়েছিলেন, প্রতিদিন শ-র কল্যাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন।

অন্তঃপর ঈশ্বর এবং ঠানব্রহ্মের সন্ধানিনী-মাতা। দুজনেই জানলেন শ-র চরিত্র স্বর্গীয় প্রার্থনার চেয়েও প্রবল; সেখা হল *Adventures of the Black Girl in Her Search for God* (1932)। শ তাঁর স্বভাবগত ভরীতে দাবি করলেন ঈশ্বরই তাঁকে এই বই লিখবার প্রেরণা দিয়েছেন; বৃত্তির শানিত অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হয়েছে সব অদৌকিক নত-বিবাগ; তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভদ্রও শেভীষ ব্যপ থেকে দফা পায় নি। এ-হেন বুদ্ধিমূর্তী প্রতিভাকে মন্ত-বিদ্যাসের ফ্রেনে বাধিয়ে রাখা যায় না। তবে বুদ্ধিমূর্তী হলেও শ নীরস নির্ভাঙ্ক বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলা যায় না। জীবনস্বরূপকল্প রূপকারের কল্পনায় মরমী অহুজবের স্পর্শ নিশ্চয়ই ছিল—*Man and Superman, Back to Methuselah*-র তার কাব্য-স্বপ্নানুভূতি নিবর্ণন অনেকই পাওঁয়া যায়। শ-র *Saint Joan* টি. এল. এলিট-এর Becket-এর চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশি ভগবদ্বহুত্বভিত্তে ভরপুর।

হুইশ দার্শনিক ফের্নি কলম্বা বলেছেন, গুপ্ত পকাশ বংগের ঘোষোপীয় সাহিত্য হল ‘নাশকতাত্পলক’, subversive; উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন ক্রয়েড, সিব, প্রমুখ প্রকৃতি চিন্তাজীবী সাহিত্যিক-শিল্পীদের নাম। বার্নার্ড শ-ও সাব-ভার্সিড, কিন্তু আরো মহৎ ও বৃহৎ অর্থে। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় তিনি দৌলিক কোনো তত্ত্ব অবতারণা করেন নি; দৌলিক হল তাঁর নিজস্ব বুদ্ধিগত আবেদন এবং নাটকীয়ভাবে সব বিষয়মস্তার স্যোকেটিক আলোচনা। তাঁর তর্ক এবং তাঁর ব্যাপ একাধারে সাব-ভার্সিড এবং ক্রিয়েটিভ, নাশকতাত্পলক ও স্বপ্ননধর্মী। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে দাবিদহীনতার অভিযোগ এনেছে; স্রি. বি. এল-এর অভিরচন, খেদালি-আভিশম্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তবে স্রি. বি. এল. এবং বার্নার্ড শ মূল সংকল্প সাধন সম্পর্কে কখনো দায়িত্বহীন নন; চেম্বারটন শ-র সমাজ-সর্বনের সর্বকর্ষ না হলেও তাই বলতে পেরেছেন, শ-র দায়িত্ববোধে ইম্পাতের মতো টংকাহ—‘his responsibility rings like steel’। শেষ জীবনে ডিক্টেটরশিপের প্রতি তাঁর অস্বরাগ অনেককে ক্রুদ্ধ, ক্রুদ্ধ করেছিল। শ ছিলেন থাকে বলা যায় সমাজবাদের জনসংযোগকারী, ‘Public Relations Officer’; সমাজবাদ বদন সেবর পার্টির হাতে ম্যাকডোনাল্ডী মুক্সি-ভক্তির শরণ নিল তখন ফেবিয়ান পিতামহ শ-র সেখনী স্বভাবতঃই ক্ষুধার হয়ে উঠেছিল। Applecart-এর আনুজ্ঞরী কর্তৃত্বজ্ঞা কপট সমাজবাদী Boanarges হযতো ম্যাকডোনাল্ডের বাস্যাহুত্বিত, হযতো পরবর্তীকালের আর্নস্ট বেজিনেরও। কাজেই ফেবিয়ান তৃতীয় পুরুষের সাবধানী হিসাবী বুদ্ধিবীরা ফেবিয়ান পিতামহের নিক থেকে মুখ ফিড়িয়ে নিয়েছিলেন। এককালে শ-র *The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism* (1928) সমাজবাদকে জনপ্রিয় করেছিল; অথচ বিত্তীয় মহাযুদ্ধের শেষ সময়ে সেখা *Everybody's Political What's What* (1944) উপেক্ষিত হয়েছে, তার একটি কারণ এই গ্রন্থে ফেবিয়ান শ মাস্ত্র এবং মাস্ত্রবাদের প্রবলভাবে সন্ধান করেন তাঁর নিজস্ব ভরীতে। শ তখন অতি মহামাত্র ব্যক্তি, super v. i. p. হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজেই তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয় নি, কিন্তু চিন্তাজীবীরা সে মতামত গ্রহণও করেন নি। বিত্তীয় মহাযুদ্ধের পরে বার্নার্ড শ-র প্রথম উক্তি এবং বুদ্ধি বিশেষ কোনো গাড়া ভাগায় নি, তার কারণ, ঘোষোপীয় বুদ্ধিবীরা সমাজবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, বিপ্লবের বিরুদ্ধ-পরিণাম সম্বন্ধে নানা গভীর গংখরে পড়েছিলেন। ‘ইউটেওপিয়া’ গড়ার বৈপ্লবিক উৎসাহে তাঁটা পড়া যি. বি. এল. তথা বার্নার্ড শ-র সমাজসর্বন অনেকের কাছে অবাত্তব

মনে হয়েছে। শ-র ব্যাভি, প্রভাব ও বুদ্ধিগত আবেদন হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ এই। দ্বিতীয়-মুদ্রান্তর কালের প্রফেট আর বার্নার্ড শ নন; অরুণেয়ল এবং কেন্দ্রীয় হলেন সমসাময়িক কালের অনগ্রসর প্রফেট। শ বিব্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ধনতন্ত্রের অঙ্গগতি মৃত্যু ও কপটগারের বিরুদ্ধে; অরুণেয়ল-কেন্দ্রীয়ের অভিধান হল সনাতনবাদী বিচার ও অপচারের বিরুদ্ধে। মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক সংকটের মোটনোয় ফেবিয়ান পিতামহ শ লক্ষ্যহীন কক্ষচ্যুত হন নি ঝটে, তবে তার বিব্রোহী-ব্যক্তিত্ব অনেকের কাছে নিশ্চয় মনে হয়েছে, মনে হয়েছে যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে শ-র চিন্তাধারার সংযোগ শিথিল হয়েছে। সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকা এবং অনর্গল কথা বলে যাওয়ার জন্য বড়ো প্রতিভাকেও বেশ কিছু জরিমানা দিতে হয়। শ-কেও দিতে হয়েছে। শেষ জীবনে শ তাই প্রায় নিঃশব্দ; তাঁর অনেক কথাই হয় স্বগতোক্তি নয়তো পুনরুক্তি। হয়তো আগামীকালে তাঁর দুঃসাহসিক স্পটডাষণ ও স্ব-বিরোধী প্রতিভা (অগাধ্যা বি. বি. এল.-এর পরিহাসোচ্ছল পরস্পর-সংঘাত) নতুন পরিচয়ে সার্থকতা লাভ করবে। আমাদের কাছেও সেন্ট বার্নার্ড তাঁর ব্যক্তিত্ব, জীবনশিল্পের সমারোহে, প্রাণশক্তির অজস্রতায় কম বিশ্বাস, অর্থপূর্ণ নন। শুক নথ, মল্লভা নথ, সেন্ট বার্নার্ডকে গৃহদেবতা হিসাবে গ্রহণ করাও কারো সাধ্য নয়; শ হলেন মৃত্যুস্থির উষোৎক এ যুগের শেষ সর্বজনীন প্রতিভা। তাঁর জীবনই এক বৃহৎ মহৎ শিল্পকীর্তি, টপ্‌স্টের রহস্যনাথ গাভীকীর মতো। কোনো বীধাধরা বুলি, তত্ত্ববিদ্যাস অথবা সমস্তা-সমাধানের গুপ্ত মন্ত্রের জন্য বার্নার্ড শ-কে আশ্রয় করা কল্পনাভীত, অসম্ভব। প্রিন্টলে থাকে বলেছেন 'great cleansing winds of doctrine', সেই বিরাট প্রতিভাধীশ বুদ্ধি ও মানবিক শুভচেষ্টনার আবহাওয়ায় আমাদের ভাবনা-ধারণাকে নিরন্তর পরিণোদন করার প্রয়োজন এখনো আছে এবং থাকবেই। শ-র স্বচ্ছ বুদ্ধির অহম্মিলন ও নির্ভীক প্রয়োগ সামাজিক এবং সাহিত্যিক ক্ষেত্রে করবার প্রয়োজন ভারতবর্ষে অন্ততঃ ছুরিবে ধায় নি।

প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদ

ঐপরিমল গোস্বামী

স্বীকৃত্য যে সময় 'প্রাচীন সেবতার নূতন বিপদ' লিখেছিলেন, সেবতারের বিপদ তার চেয়ে এখন অনেক গুণ বেশি বেড়ে গেছে। সেবতারের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। পৃথিবী-দাসনে তাঁদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সৈবনীতি এখন ধূলায় মূড়িত।

সেবতারি ছিলেন অজ্ঞ। তাঁদের কমনসেন্সের অভাব ছিল। বিজ্ঞা বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁরা নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনায় সিন্ধুসিদ্ধার ছিলেন। তাঁরা মানুষের বিশেষভাবে অহুগতদের স্তাবারী ছিলেন। কুল তাঁরা অনেক করেছেন, কিন্তু তাতে মানুষের কোনো শুক অহুবিধে হয় নি।

সেব শাসনে মানুষ এক ব্রকম শান্তিতেই ছিল, এবং বহুদিনের অভ্যাগ এক-একটি বিঘরে তারা এক-একটি বিশেষ ধারণা গঠন ক'রে তাকেই ধব মনে ক'রে মহানিদ্ধিত ছিল। কিন্তু আজ সে সব ধারণার মূলে আধুনিক 'সাধারণ জ্ঞান'-এর এমন এক-একটি ধাক্কা এসে লাগছে যে আজ প্রাচীনমানুষ সেদিনকার প্রাচীনসেবতারের অপেক্ষাও অধিকতর বিপদ বোধ করছে।

আধুনিককালে আশাদের গৌরব এই যে, একালে জ্ঞানের পরিধি আমাদের বহুবিস্তৃত হয়েছে।

কথাটা খুবই ঠিক। এমন বিস্তৃত হয়েছে যে স্বয়ং সরস্বতী দেবী এর কুলকিনারা পাচ্ছেন না। জ্ঞানে মূলে অন্তরীক্ষে কোনো এক ইকি জায়গা বাকি নেই যেখানকার কিছু-না-কিছু তথ্য মানুষ সংগ্রহ করে নি। একদিকে ইলেকট্রোনিক মাইক্রোস্কোপ, অত্রদিকে প্যালোমায় মানবমিরের দুই দ ইকি প্রতিফলকবৃত্ত সর্বাধুনিক টেলিস্কোপ। (এর মধ্যে সেবতারের বাসস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা এ বিষ জাগ ক'রে অত্র কোথাও গিয়ে থাকবেন)।

কিন্তু তথ্য-আবিষ্কারের কমতা তো শুধু এইসব বাইরের যন্ত্রে সীমাবদ্ধ নয়, আসল যন্ত্র রয়েছে মানুষের মগজে। সে যন্ত্রে বিশ্বের অনন্ত কোটি বিশ্বয় এসে তাদের লিখন একে বাচ্ছে। জ্ঞান এখন তাই বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত। সাময়িক জীবনে শ্রেণীবিভাগ দত কমানো হচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগের স্তাবানা তত বাড়ছে—স্তাবানার ক্ষেত্র সীমাহীন। আগে যেমন যুগ্তি হিসেবে এক-একটি 'জাতি' তৈরি হয়েছিল, এখন জাতিতের তুলে দিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং কালের ক্ষেত্রে নতুন নতুন জাতি তৈরি হচ্ছে। না হয়ে উপায় নেই। বিশেষজ্ঞ না হলে কাজ চলে না। আর বিশেষজ্ঞ হতে হলে শিক্ষার গোড়া থেকেই শিক্ষার বিষয় জাগ ক'রে দিতে হয়।

শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ধারণার উপর পর পর অনেক ধাক্কা লেগেছে, এখন আর আগের শিক্ষাকে জেনা যায় না। আগে প্রবেশিকা পাস ক'রে কলেজ। কলেজে আটল বা সায়েন্স। ধাপগুলো পর পর নির্দিষ্ট ছিল। সবায় ছিল প্রায় এক ব্যবস্থা। অনেক ক্রটি ছিল তাতে, কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট চেহারা ছিল। বাংলাদেশে ঠারা টাকাকড়ির হিসেব সামলে ধনীরাপে, অথবা শিক্ষা ও চিন্তা ক্ষেত্রে

মনোবীজের খাজ, তাঁরা সবাই ঐ একই শিক্ষা লাভ করে নিম্ন নিম্ন ক্ষেত্রে ব্যাতি অর্জন করে গেছেন।
বিজ্ঞানাগর বা রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন সম্রাট, তাঁদের কথা বড়ই।

কিন্তু এখন গোড়া থেকেই বিশেষজ্ঞ চাই। বেশে কন্ঠ্য চাহিনা। উপায় নেই। বিশেষ শিক্ষার অধিকার
লাভের জন্য প্রবেশিকা পাসই যথেষ্ট। কোনো রকমে একখানা সার্টিফিকেট। ছেলেটা গোড়া থেকেই
জানো তাঁদের বেশি পড়তে হবে না, অতএব পড়ই না। তাই পরীক্ষার আসনে বসে টোকা ভিন্ন উপায়
নেই। টুকে পরীক্ষা দেওয়া এখন সাধারণ রীতি, এতে কেউ অস্বস্তি হয় না। কেউ বা অপরের লেখা
কণ্ঠ্য করে তাই লিখে দিয়ে আসে। প্রশ্নপত্রের বৃত্তির উপর লেশমাত্র দাবি থাকলে ছেলেরা ভোট পাকায়,
পরীক্ষার পর থেকে বেরিয়ে আসে, অনেক সময় মলমুদ্রির জন্য অজ্ঞাত কক্ষে গিয়ে হানা দেয়। এ সবই
শিক্ষা ব্যবস্থার মুক্তিদায়ক পরিণতি। ছেলেদের এতে খুব বেশি দোষ নেই।

তাই পরীক্ষার আদর্শ ক্রমেই নিচুতে নামানো হচ্ছে। পাস মার্কও আগের চেয়ে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
এটিও এ ব্যবস্থার মুক্তিদায়ক পরিণাম। শিক্ষার মান নিচু করা এ যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর শেষ
প্ততে গিয়ে ঠাড়াবে। হয়তো অবশেষে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তির মানই যথেষ্ট মনে করা হবে,
এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন শিক্ষাক্ষেত্রে হবে নিতান্তই সেকেন্ডারি ব্যাপার।

বাংলাদেশে শিক্ষার মান যথাম ছিল বরাবরই। কিন্তু তাতে পূর্বদুগোচিত কিঞ্চিৎ আন্তরিকতা ছিল
ব'লে তখন পাইকেরি হারে পাসের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আম্রকের তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত
বেশি হত। আম্রকের শিক্ষার সাধারণজ্ঞান দারক একটি বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটতে সে শিক্ষাটুকু চাপা
পড়ে গেছে।

এই সাধারণজ্ঞানই হচ্ছে প্রাচীন মানুষের নতুন বিপদ, অর্থাৎ আগের যুগের শিক্ষার শিক্ষিতদের।

একদিকে পরমাণুর গুণ, আর-একদিকে 'কোটি ছাদাপথ মায়াপথ'। সাধারণ শিক্ষিত লোকের এ
জুয়ের মধ্যবর্তী বিষয়ে একটি বোটামুটি ধারণা থাকলেই চলত। এখন চল না। এখন হাজার রকম
মারফেল নলের চাই। এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এ বিষয়ে অপ্রাপ্তবয়সকে রচনা লিখতে হয়, এবং লিখতে
হয় হাইজীন, নইলে 'ব্যালালড' খাওয়া খেতে দেখে না, আলোহাওরামূলক পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে
দেখে না। আললে ভালো বাড়িতে থাকতেও ইচ্ছে হয়, ভালো খাওয়া খেতেও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইচ্ছে
হলেই হাইজীন পড়ে। জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের এই বিচ্ছেদ ছেলেদেরনের এইভাবেই ঘটে। তারপর
আধুনিক বিজ্ঞানের হাওয়া গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণজ্ঞানের চিত্তাকর্ষক গুণ।

এই সাধারণজ্ঞানই এখন লোকের চোখে সম্মানযোগ্য আধুনিক জ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আদর্শ।
তা ভিন্ন এ বিজ্ঞানের কোথায়ও শেষ নেই ব'লে, এবং পথ চলতি হিঁড়ে হিঁড়ে সারি জমা দায় ব'লে, এতে
বেশ একটা বোহা আছে। চাকরি চাইতে গেলেও এমন ডিগ্রীধারীকেও সাধারণজ্ঞানের পরিচয় দিতে হয়।
(জানী ব্যক্তিত্বকেই এই সাধারণজ্ঞানের পরীক্ষার ফেল করবেন)।

পৃথিবীর কোন্ জিনিসটি সর্বোচ্চ; কোন্ জিনিসটি সর্বদীর্ঘ; পৃথিবীর কোন্ দেশের প্রেসিডেন্ট কে;
কে কোন্ আবিষ্কার প্রথম করে; কে'রাতার কাঁটে প্রথম গায়ে চর্বি মাখে; কে প্রথম মলে ভুবে
আম্রহত্যা করে; বা এই রকম সব অসুত অকল্পো এবং স্থলত প্রশ্নোত্তরে সাধারণজ্ঞান গড়া। এই
সাধারণজ্ঞানের সীমা সকল বিভাগে বিস্তৃত। প্রতি বিভাগের একটি বা দুটি কথা শিখলেই সাধারণ

প্রাচীন মাহুঘের নতুন বিপদ

জ্ঞানের দাবি মেটে। এ বিভাগ ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রাচীন মাহুঘ বিখ্যিত হয়ে ভাবে, কে জানিত এমন জাহাজ-বোঝাই বিস্ফা ছেলেরা আঘাত করবে!

আধুনিকতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে অন্তের সংগৃহীত উজ্জ্বল উপকরণ নিয়ে এই জাতীয় বাড়াবাড়ি এ যুগের অপরিহার্য পরিণাম। পৃথিবীতে অজ্ঞাবহি বিজ্ঞানের বৃত্ত আবিষ্কার বা দায়িত্ব উদ্ভাবন, যে কারণেই হোক, তার সবই প্রায় পাকাত্য দেশের। এই রকম মনোভাব এক দেশ থেকে আর-এক দেশের সেকের মধ্যে ছড়ানো যায় কি না জানি না, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য নিয়ে একবার উঠে পড়ে লাগলে হত। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে সারাজীবন অল্পোয় যোজন করে গেলেন। ইত্বলের ছেলেরাও কি ভাবে অন্তের দেখা মুখস্থ না করে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নিরোয়া কিছু দান রেখে যেতে পারে, এ পথেরও নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। ছেলেরা সেই সব নির্দেশের নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয়।

১২২০ সালে সম্ভবত অগষ্ট মাসে, জোড়াপাকার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমায় সাক্ষাতের প্রয়োজন ঘটেছিল। সে সময় কথাপ্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার এম. এ. পড়া এবং পরীক্ষার রীতি সম্পর্কে আমার কাছে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। আমাকে বলতে হয়েছিল, তবু বই পড়ে এবং নোট মুখস্থ করে পাশ করা যায়। তা শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ইত্বলের পড়া আর এম. এ. পড়ার একই রীতি তিনি কল্পনা করতে পারেন না। মনে আছে খুব ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 'চাককে অনেকবার বলেছি এ কথা, কিন্তু তার হয় তো ক্ষমতা নেই।' তাঁর ইচ্ছে ছিল মৌলিক গবেষণাজাত জ্ঞানের পরিচয়ে তবে এম. এ. ডিগ্রী দেওয়া হোক।

সে কতদিনের কথা। আজ এম. এ. তে কি হয়েছে জানি না, তবে নিরপেক্ষা যে ক্রমে নিহত হচ্ছে এ বিষয়ে এখন আর কারো দ্বিধা নেই।

একরা ইংরেজির কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না প্রবেশিকা পরীক্ষায়। পরবর্তী কালে মানকরা সব ইংরেজি বই নির্দিষ্ট পাঠ্যরূপে ছাত্রের খাড়ে চেপেছে। তবু বলব তুলনায় আগের দিনেই ইংরেজি ভালো শিখত ছেলেরা। বহু পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হওয়ার আগেও এখন আর ইংরেজি শিখতে হয় না, কিছু নোট মুখস্থ করলেই পাশ করা যায়, এমন কি সরলতম একটি বাক্য শিখতে না শিখতেও।

প্রাচীন মাহুঘ এদের ইংরেজি বুঝতে পারে না, বিপর্যয় করে। সবই তো 'সাধারণজ্ঞান' থেকে। ভাষা শেখা আর কিছুতেই হয় না। না ইংরেজি, না বাংলা। বাঙালী শিশু বছর পাঁচেক বয়স পর্যন্ত বেশ বাংলা শেখে। তারপর ইত্বলে যায় এবং ক্রমে বাংলা ভুলতে থাকে, এবং বেশি বয়সে একবারেই ভুলে যায়। কৃত্রিম হবার সঙ্গে হাতে ব্যাকরণ দিলে গোড়াতেই সব চুকে যেত।

একটি ইংরেজ শিশু তিন বছর বয়সে ভাষায় যেটুকু নিজে থেকে প্রকাশ করতে পারে, একজন বাঙালী ছাত্র পনেরো বছর ইংরেজি পড়েও সে ভাষায় নিজে থেকে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে না। ইংরেজির কথা ছেড়েই দিলাম। বাংলাভাষায় নিতুল লেখা, কই, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে (ইত্বল বলেছেন) তো আর দেখা যায় না। খারাপ লেখক হতে চান তাঁদের মধ্যেও দুর্ভাগ। সাধারণজ্ঞান সব বিভাগকে গ্রাস করতে চলেছে। শীতার কাটতে কে প্রথম গায়ে চর্বি মেখেছিল, জ্ঞানের রাজ্যে তার স্থান

সর্বোচ্চ।

পত্রগ্রাহিতার দৃশ্য এটি। কথাটি অনেক কালের। শিক্ষার ক্ষেত্রে ওটি নিম্নবীচ। কিন্তু এখন

যে আর ও ছাড়া গতি নেই। অজ্ঞান দেশেও শিক্ষার মান এখন নিঃগামী, কিন্তু এতটা নয়। তবু ওরা যদি ভালো ভালো বেড়াই, এরা বেড়াবে পাতায় পাতায়। গীতারে কে প্রথম গায়ে চবি মেখেছিল জানারকোর শেষ কথা।

জ্ঞান এত সহজ বলেই বাংলাভাষার সাময়িক পত্রের এত বাড়াবাড়ি। সংখ্যা সত্যিই অগুনতি। এটি আর এক বিপদ। অবশ্য প্রাচীন মাহুষের। লেখা চাই, তাদের নতুন কাগজে ছাপবে। এ বিপদ থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। কেন নতুন কাগজ? ভিজ্ঞাসা করলে তার কোনো উত্তর দিতে পারে না। নতুন কাগজের বক্তব্য কি, উদ্দেশ্য কি, উদ্দেশ্য নেই। কোনো ডকুমেন্টারির এমন ঘোর দেখি নি যে দৃষ্টান্তর সঙ্গে বলতে পারে, আমাদের এই উদ্দেশ্য, এবং তার মন্ত্র আখরা নতুন শক্তিময় লেখক ভিন্ন আর কারো লেখা ছাপবে না।

সাধারণজ্ঞান দেশের এই ক্ষতি করেছে। সাহিত্যপ্রীতি ভাষাপ্রীতি ও আত্মরিকতা—এ তিনের অভাব নিয়ে সাহিত্য পত্র প্রকাশ করার মূলে ঐ প্রথম চবি মাথা গীতারের আদর্শ।

সাধারণজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ক্যারিকেচার, মর্কটরুতি।

বিজ্ঞানীরা, দার্শনিকেরা, বিশ্বস্তির রহস্য উন্মোচনের সাধনা করছেন। বিশ্ব প্রথম সৃষ্টি কি ক'রে হল, নক্ষত্র সৃষ্টি প্রথমে কি ক'রে হল, বা পৃথিবী ও পরে প্রাণী ও পরে মানুষ সৃষ্টি কি ক'রে হল এই সব রহস্য আজও উন্মোচিত হয় নি। প্রথম মাহুষের আবির্ভাব নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা খুঁড়ছেন, এই ক্যারিকেচার হচ্ছে, কোন্ গীতার প্রথম গায়ে চবি মেখেছিল তাকে খুঁজে বের করা।

এই-শিক্ষার-শিক্ষিত এক ব্যক্তির লেখা একখানা বই পাঁচ ছ' বছর আগে বেদিয়েছিল। বইখানি বাংলা ছোট গল্পের সমালোচনা বিবহক। অভাব রবীন্দ্রনাথের গল্পের সমালোচনাও তাতে আছে। ২৪০ পৃষ্ঠার বই। কিছু নয়না না দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। জানি না হয় তে। বইখানা কোথাও পাঠানো এখনও চলে কি না। নয়না—

১. “একরাতি। মোট দু-লাইন উদ্ধৃতি ও চার লাইন সমালোচনা। সমালোচনা—“এই পংক্তি কয়টি হইতে মনে হয় যে হিন্দুবিবাহের নীতিতে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।”

২. শুভদৃষ্টি। ৪৭ লাইন সমালোচনা, তন্মধ্যে প্রধান বক্তব্য—“এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ বিবাহের শুভদৃষ্টি প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন...এই স্বানে কবি বোধ হয় হিন্দুবিধান অপেক্ষা কোটশিপ প্রথার অগ্রসূত্রে।”

৩. শান্তি। মোট সাত লাইন সমালোচনা। “কতকগুলি ক্ষেত্রে তাহার (কৃষকের) যে কি রকম মানসিক রকমের অবিরোধ, তাহাও কবি দেখাইয়াছেন।”

৪. দালিয়া। মোট পাঁচ লাইন সমালোচনা। “গল্পটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে লক্ষ্যের অখণ্ড অবকাশ আছে।” সমালোচক এ গল্পের নিম্নেই নাম দিয়েছেন ঐতিহাসিক গল্প, তারপর বলেছেন লক্ষ্যের অবকাশ আছে।

এ বইয়ের শেষে ধানের নাম বসিতে উদ্দেশ্য করা হয় নি তাঁদের একটি নামের তালিকা আছে। তার শিরোনাম “নব অস্থিতি প্রতিভা”। এই নব অস্থিতি প্রতিভার তালিকায় ধানের নাম দেখা হয়ছে তাঁদের মধ্যে ষাট থেকে সত্তর বছরের অনেকে আছেন।

প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদ

বইখানায় লেখকের নামের পূর্ব অধ্যাপক কথাটি ছোড়া আছে, তাতে বোঝা যায় ‘সাধারণজ্ঞান’এর ক্ষেত্র উল্লিখিতও কম বিদ্বত্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথের বাবুকৌতুকের কমলাসনা। সরস্বতীকে আশ্রয় ঘণি প্রেরণ করা যায়, “বিজ্ঞান এই অধোগতির মূলে আপনার দায়িত্ব কতখানি আছে তা প্রকাশ করুন,” তা হলে কি ঘটবে তা অহুমান করা কঠিন নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পার্শ্বস্থ ইঙ্গলটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলবেন, “একে স্নিগ্ধাসা কর”। কিন্তু এ কথা শোনামাত্র বিপন্ন ইঙ্গলটি উড়ে পালিয়ে যাবে এবং দেবীসরস্বতী মাথাটি নিচু করে পল্লের পাণ্ডিত্য ছিঁড়তে থাকবেন।

তার পর প্রহরখানেক গন্ত হলে কল্পিত কণ্ঠে বলবেন, “ ‘সাধারণজ্ঞান’এর ত্রিভা।”

সূত্র-সংগোপন। প্রথম-অধিঃ ১০৬০ সংখ্যা। ‘বহিঃচর ও বাংলায় ইতিহাস’

পত্র	অঙ্ক	বছর
২৪	১১৭৪	১৮৭৪
২৮	১১৭৪	১৮৭৪

‘গোষ্ঠলীলা’

ঐন্দ্রনাথ বসু

চিঠি দেখলাম। আর, ছবিটিও দেখলাম। ই, ইহাকে কালীঘাটের landscape বলতে পারো। তবে একটা তফাত আছে; সে হল কালীঘাটের পটের নিদর্শন বা সচরাচর দেখি তা বানিকটা চীনা এক stroke এর কাছের মতো। একটি মাত্র rhythm এ কর। আর, এই landscape এ কেবল আকাশ ও জুলিচালনার কাদম্ব কালীঘাটের পটের মতো ঠিক হয়েছে। বানিকটা রানপুত ও কাংড়া-ছবির মতো। এইরূপ একটা ছবি ছাড়াই কি কুমারবানীর বইয়ে আছে; প্রায় একই subject, গোষ্ঠের ছবি।

তবে কি এই ছবির পূর্বপুরুষ রানপুত ছবি? অন্তত এ ছবির line ও execution একই ধরনের; কেবল সেই-সব tempera কাজে কালীর line নয় এইমাত্র। সাদা কাগজে এর finish করার ধরণ একই রকম। line এর চীন calligraphic line এর মতন। কিছু পরীক্ষা করাও আছে। shade দিয়ে নিলিয়ে দেওয়া আছে— বানিকটা চীনা ছবিতে যেমন কালী মল-জুলি দিয়ে নিলিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। বা কালীঘাটের পটেও আছে। subject এর দিক দিয়ে কালীঘাটের পটে একটিমাত্র subject, যাকে হাইকাই ছবি আপনাই আর্টিস্টরা বলে। ছবির execution ও লাইনের execution সব বিলে complete whole— artist দুবার ভাবে নি। কিন্তু এই landscape এ বেশ ধরে ধরে composition করা হয়েছে। কেবলমাত্র কালীতে করা নয়, সাদা কাগজে (অনি তৈরি করা হয় নি) টেম্পারা। এইরকম কাজ আনি ঢাকাই আর্টিস্টদের করা oil painting এ দেখেছি— একটি ‘অবিতা’ তব্লা বাজছে— আর, দুর্গার চালচিহ্নে কুমারটুলির পোটোরাও করে। ঘনপটের scroll এ বাজুয়ার আর্টিস্টরা করে। এগরের নমুনা কলাভবনে আছে।

‘কালীঘাটের ছবি’র জাতই আশাস্য। মাত্র একটি ভঙ্গিমা। বড়ো simple। composition এর জটিলতা নাই। ঠিক ব্রহ্মতে পারলাম কি না জানি না।

পাণিনিবেশন

২২. ৮. ১৯১৬

প্রাচীন গোষ্ঠীলার পট

শ্রীযুক্ত বোধ

সম্প্রতি ইংলণ্ডে কালীঘাটের পটুঘাসের আঁকা রঙিন পট ও রেখাচিত্র সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আগ্রহ উদ্দীপিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভিক্টোরিয়া-আলবার্ট, মিউজিয়ামের উত্তেগে একটি পুস্তিকা, প্রকাশিত হতে দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, এরূপ আলোচনামির অল্পক্ষেত্রে বে-সব চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে তা কেবল অক্সফোর্ড, ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউটের নকশা পুঁথি মিউজিয়ামের চিত্রশালা থেকে সংগৃহীত এবং কালীঘাট পটের শ্রেষ্ঠ নিবর্ননও বলা যায় না— অথচ অল্প বে-কোনো চিত্রশিল্পের সম্পর্কেও যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনই বলা যায় যে, কালীঘাট পটকে বুঝতে হলে ও বিচার করতে হলে শ্রেষ্ঠ নিবর্ননগুলির প্রমাণেই তা সম্ভবপর। বিভিন্ন সময়ে রূপস্ ও বিশ্বভারতী পত্রিকায়^১ আমার যে-সব প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে সেই সঙ্গে আমার নিজের চিত্রসংগ্রহ থেকে ঐরূপ পটই প্রকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছিল। বড়োই আনন্দের বিষয় যে বর্তমানেও বিশ্বভারতী পত্রিকা কতকগুলি উৎকৃষ্ট কালীঘাট পট ছাপতে উদ্যোগী হয়েছেন; তদাধো গোষ্ঠীলার রঙিন ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে আঁকা এই ছবিখানি আঁকারে বড়ো, রূপকল্পনার ও বর্ণস্বভাষ চমৎকারজনক। রবিকরোদ্ধল আকাশের তলে নীল ঘন্যার ধারা আর উজ্জ্বল ছত্রাকারে বগরমান পুশিত তিনটি কবচবৃক্ষ— নীল ও সাদার নিপুণ প্রয়োগে বিকশিত পুষ্পস্তবক ও ঘনভ্রাম প্রচুর পল্লব বেড়াতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা বিশেষভাবে মনোহারী— এই পটভূমিতে গোপন ও রাখাল লগাংগে পরিবৃত্ত কক্ষ-বলরামের গোষ্ঠীলার সজীব স্বন্দর একখানি আলোশ। বিলাতী মল্লরঙের ছাপা ছবি বা এনড্রেভিৎ শিল্পী রেখে থাকবেন, তারই স্বত্তি থেকে সন্দেহ নেই, ছায়াস্বন্দরারও প্রয়োগ করেছেন এমন বৃক্ষে-হুকে আর এত নিপুণভাবে যে, এই চিত্র রূপকল্পনার এক উর্ধ্বতরে উন্নীত হয়েছে। চিত্রাগত রেখাঙ্ক আর রূপস্বরূপের দক্ষতা তো আছেই; অধিকন্তু অতি অব্যর্ভাবে আর গড়ন সম্পর্কে কী অপরূপ দরব ও বোধ থেকে প্রতিটি গোত্র-বাছুরের রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভঙ্গিটিও কতদূর যথাযথ, শিল্পীর রূপরসাবিষ্ট মনোযোগ রয়েছে সর্বত্র— অথচ আপন। থেকেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সমস্ত আলোখাটির কেন্দ্রে তার আলস বিষয় কবচবৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গভঙ্গির কক্ষবলরামের বৈত-মুতিতে— এঁদের ঘিরে এঁদের চারি ধারে লক্ষিচ চকল রাখাল বালকগুলি আপন।র আপন।র বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছে সমগ্র চিত্রের স্বন্দর ছন্দ ও গুণন আর স্বতঃস্ফূর্ত একটি আনন্দের রূপ। বিচিত্র বর্ণের সম্বন্ধমাধুর্য্যও চমৎকার। আলো, হৃদ্বি, গেরি ও এলা মাটি, উত্তীক্ষ নীল, সাদা মাটি আর প্রদীপের ডুবো— এ ঘেণেরই সহজলভ্য আর সস্তা রঙের সমবায়ে ও স্থানিপুণ প্রয়োগে এই আশ্চর্য স্বন্দর ছবিখানি আঁকা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চিত্রকর কাগজের রঙটিও কাঁখে লাগাতে ছাড়েন নি, তার আদিত মাটিমেটে ‘দাদা’ শতবর্ষের প্রসঙ্গে এখন চমৎকার একটি কনকাতা বা রৌদ্রভাতিতে পরিণত হয়েছে; সেই হল এই গোষ্ঠীলার প্রসারিত, প্রশান্ত আকান।

^১ Rupam., July-October 1926

বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন-আদিত ১৩৪০

এখন এখন্ডটির বাংলা অনূবাদ প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। ১৩৩৪ সাল সংখ্যা ২৫ই বা।

কালীঘাটের পট

কানাই সামন্ত

‘বিচিত্রা’-ভবনের এই ঘরে পচ্চিমের জানলা খুলে ছুঁতে এক-একদিন মনে হয়, কাংড়া কলনের একথানা ছবি দেখছি, ইতিপূর্বে কোনো চিত্রশালায় তা দেখি নি। সত্যের অহরোধে এ কথাও বলতে পারি, আলো-চোরা কোনো আঘাতের বিকালবেলায় ডাবি, সম্রাট হইংম্বশের ঝাঁক। বাদশ নতাবীর একথানা ছবি, গিরি নিকর পাইন ও অপর নৃত্যতা, সেই কি কোনো দ্বাদশশতাব্দীর একশত প্রাণ পেয়ে উঠল? ক্যানেরার সাক্ষ্য হাজির করলে সেখা থাকে—না, কোলকাতা শহরের জুপারকার বাড়ি একটার পিছনে আর-একটা (ট্রায়ের বটাপ্রতি কানে আসে—রাঙার লোক চলাচল সেখা থাকে না বটে), গলির মোড়ে বুড়োশিবের আঙুর-আঁশিত বুড়ো অশ্বের আকাশ-ছোঁওয়া। ভালপালায় পর্ণপ পল্লব, আর নৃতির শেষ সীমায় হাওড়া-ত্রিদের সৌন্দর্য একটা। স্বল্প মিগন্তে অকিত, রাত্রিকালে অন্ধ জ্ঞানেন হারানো এক চক্ষু রক্ত আভায় জ্বলে ওঠে। নাহয় নৃত্য, পীত, ধূসর, লাল, নীল ও লোহিত রঙের অসম্ভাব নেই; আকাশ-অভিমুখী রেখার বিচিত্র সমাবেশ আছে ইট কাঁচ লোহার আর বিরল বিটপীতে—তা ব’লে কাংড়া কলনের ছবি আর চান। ল্যাওয়েপ? ও শুধু ভাবকের খেয়াল আর নৃতির বিষয়। লালবাচ্চার হাইকোর্ট, আর হাওড়ার হাটে আনাগোনা না ক’রে—সিনেমা-থিয়েটার না বেখে—পুণ্য বা অস্বাভাবিক নানা মুগের, নানা জাতির, গতিয় ইতিহাস খেঁটে আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন পুঁকিত নিমর্শনে নৃষ্টি আবদ্ধ রেখে, হয়তো বা আটকযোগ অভ্যাগ ক’রে—একশ শোচনীয় পরিণামে অবত পৌছতে হবে।

সে কথা মানতে পারি। কিন্তু, কালীঘাটের অজ্ঞাতনামা পোটোর ঝাঁক হরগোরীর এই লামাসিখা ছবিটিতে একটা মুগ, একটা জাতি চক্ষুমান নাহেরই চোখের সামনে জেগে উঠেছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে—এটাকে কখনোই মনের ভুল বলতে পারব না। দু-শো তিন-শো বছর কোথায় গেল কেউ তো জানে না, প্রাণে-ভরা পল্লী, গোলাধ-ভরা ধান, প্রাচীন গিঘির ঘাটে সকাল-সন্ধ্যায় নারীকন্ঠের হাতকাকলি, হুস ক’রে শোনানো ছেলেকুলোনো ছড়া আর অপরূপ রূপকথা সে হরতো চির-পুরানো। আর চির-নুতন চাইই সেপেছে আর শুনেছে—আমাদের কার বা সে সোভাগ্য হয়েছে? রাগ আর ভাল ব্যতীতই মনে মনে গুণ্ডুণ্ড করতে পারি প্রাণগণে বাগ-বও খ’রে জুলতে জুলতে (পারি কি?)—

মি. পি. ও.তে বটী বাজে, সময় নাই রে হায়,

খরিয়ী চলোছি আশ কিসের ব্যর্থতার!

কোলকাতা শহরের এক টেরে ব’লে আদি গঙ্গার ধারে কোনো এক পূর্ণকুটীরে (তখনো খান-পাটের ক্ষেত ছিল আশেপাশে, রাতে শেখাল ডাক্তার প্রহর প্রহরে—এ তো অনাবরণেই অসম্ভব করা যায়) যে শিল্পী যে কারিগর এই পট একেছিলেন, দু-চার পরদার বেশি কী এর মূল্য হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেন নি, অজ্ঞাত পরলোক থেকে তাঁর নৃষ্টি যদি এ লেখা পড়ে আধুনিক শহরবাসী ‘শিক্ষিত’ মনের প্রগল্ভতা তিনি কখন কখন। চিরকালের কানে বাজতে থাকবে এমন কথা তিনি বা তাঁর লজ্জা কেউ কইতে শেখেন নি,

কালীঘাটের পট

আর না-পেশায় কিছু ক্ষতিও হয় নি, চিরকালের চমৎকৃত দৃষ্টিতে বিরাজ করবে এমন অনেক-কিছুকে রূপ দিয়ে গেছেন— যদিও কাগজ অভিশয় সত্তা রক্ষণের, উপকরণ অভিশয় অন্ন, বিষয়ের ঘটা-পটা বিশেষ কিছু নেই— এবং খ'রে খ'রে কাজ করবার, হুঁহু কাজ করবার, প্রাচীন পরম্পরাগত রঙের রুচি প্রকাশ করবার সময় স্বযোগ আর প্রয়োজনও দেখা যায় নি।

প্রশংসক্রেম পুরোনো ছুঁখের কথাটাই বলি। আজও এ দেশের রাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতির ধা-কিছু উল্লেখ যোগ্য আলোচনা, প্রকাশিত হচ্ছে ইংরেজি করানী বা জর্মান ভাষায়। বাংলায় বা হিন্দিতে তেমন নয়, অথবা আসৌ নয়। কালীঘাটের পট সম্পর্কেও বিলাত থেকে একটি বই এই প্রথম বেরিয়েছে কয়েক বৎসর হল। তার দোষ ত্রুটি দেখানো কঠিন কিছু নয়। কিন্তু, এ দেশেই কালীঘাট পটের উদ্ভব, এখানেই নানা কাণ্ডাণ্ড* তার হৃদয় সংগ্রহ আরও আছে, ঐ চিত্ররীতির অক্ষম বা অনাবস্তক অমুকরণেরও বিশেষ অভাব হয় নি— অথচ, এ সম্পর্কে বিগদ আলোচনা অভিশয় অন্ন, আর হৃদয়িত সংকলন কিছু আছে ব'লে জানি নে। কালীঘাট-পট সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত অমিত ঘোষ, বোধহয় ১৯২৬ সালেই প্রথম; নিপুণ ও দরদী সহকর্মীদের চোখ দিয়ে দেখে সংগ্রহও করেছেন অমূল্য সব নিদর্শন— বিস্তারিত বিবরণ বিশ্লেষণ ও আলোচনা এখনো এ দেশ থেকে সর্বদরকে প্রকাশ লাভ করে নি। (সত্য বলতে হলে, 'সর্বদরকে' হল একটা বাধা বুলি, এ ব্যাপারে বেশী 'দর'জনের আনন্দস্বারি না নেওয়াই ভালো।)

কালীঘাটের পট বাংলা হুচিরাগত পট আঁকারই একটি বিশেষ ধরন, বিশেষ পরিণতি। ইংরেজ-রাজত্বের শ্রীমুদ্রির হুচনায়, কালীঘাট-হুতাশটির রূপসন্নিধানালিনী কলিকাতা-নগরীতে পূর্ণ পরিণতির অনেক পূর্বেই, প্রায় শতবর্ষ সময়ের তার উদ্ভব বিকাশ ও বিলয়। দূরকাল থেকে কয়েকটি নাম মাত্র এ কাল অবধি এসে পৌঁছেছে : নীলমণিলাস, বলরামলাস, গোপাললাস। আরবা অজিতবাবু কাছে শুনেছি, দারদাল তুলি দিয়ে টানা কালো রেবার রূপই হল এই পটের আদিম চেহারা। তুলি দিয়ে আঁকার আগে পেনসিল দিয়ে দাঁড়া হাতে একটি আঁরা আঁকা হয়েছিল, এমনও দেখা যায়— এটি কিন্তু উত্তরকালীন রীতি। আর, নিতাস্থই সংকলভা হনু, নীলবড়ি, আলতা ও ভুবার বিশ্র বা অবিমিশ্র প্রয়োগে রূপের রঙন এটি আরও পরবর্তী ব্যাপার। কালো রেবার ভ্রুবিভের উপর রঙ বুলিয়ে তাকে অধিকন্তর জনমনোহারী করা হয়েছে এও যেমন দেখা যায়, পেনসিলে আঁকা রূপের আভাসকে রঙিত করা হয়েছে, কালো রেবার কাজ শুরু হয়েছে বা পরে হবে—এরূপ পটেরও অভাব নেই। / সাবলীল বলিষ্ঠ রেখাতেই কালীঘাটের পটের অতুলনীয় বিশিষ্টতা। অথবা, 'অতুলনীয়' কথাটা একেবারে নিরুত্থল হল না; দেশী ও বিদেশী গুণীগণ, রসিকগণ, বহুপ্রাচীন অস্তিত্ব-বাগের রেবার সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখেছেন। এ রেখাই কথা কয়, কোনো রকমে বস্তকে বের দিয়ে দিয়ে রেখেছে ('আউটলাইন' বললে ঠিক ধা বোঝায়) তা নয়। রূপের গড়ন, গড়নের বিভিন্ন স্থলের কঠিন বা কোমল ভাব, হৃদয়বিহব সচেতন ও সারা পটে একটি নিরন্তর গতির ব্যর্থতা, রেখারই নিম্নর এক শ্রী ও শক্তি বা লেখাকর্মের মতো সচেতন ও সর্বগর্বা না হয়েও কতকটা লেখাকর্মেরও শুণোপেত—এ-সবই এই রেখার নিহিত আছে। কালীঘাট-পটের উৎকর্ষ নিদর্শনগুলি দেখলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। (ছুঁখের বিষয়, মূল চিত্রে রেখার যে অপকৃপ লাগবা ও আর্চ-শক্তি, প্রতিচিত্রে তার অল্পই আভাস আছে।)

১. ফকন শ্রীযুক্ত অমিত ঘোষের সমগ্র, বিদ্যাহারীর কলাকর্মের ও স্বীকৃতিস্বরূপে। বর্তমান সত্যায় মুদ্রিত 'বিকারী হিড়ান' ছবি স্বীকৃতিস্বরূপ-সমগ্র; অন্তর্গত সত্যায় চিত্র শ্রীযুক্ত অমিত ঘোষের সৌন্দর্য প্রাণ।

আমার মনে হয়, এরূপ রেকর্ডকেই আচার্য নন্দলাল তাঁর 'নিরুচ্চা' গ্রন্থে 'গড়নের রেখা' অভিধা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। নানাভাবে এর দুঃশেষকাল-ব্যাপী পরম্পরা চলে আসছে পনোরা-কুড়ি হাজার বৎসরের প্রাগৈতিহাসিক ওছাত্রিত্ব থেকে আর পর্যন্ত। পূর্বেই এক-প্রকার বলেছি, ঐক্যপুঁথি-চিত্রের ঘের-বেওরা রেখা আর পারসিক-চিত্রের লেখাধনের রেখা থেকে এ পৃথক— উভয়ের মধ্যবর্তীও বলা চলে। আকার-সংঘটনের ব্যাপারে অগ্রদূতও নয়, অগ্রদূতও নয়, আকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত, এমন-কি একাত্ম। প্রাণময়, বায়ব। রূপরচনার বটুঘর্ষে মণ্ডিত হয়ে এর পরমোৎকর্ষ দেখা যায় অমৃত্যু-বাণের উৎকৃষ্ট সূত্র-নিচয়ে। শত শত বৎসর ধরে ক্রমবিকশিত ধারার একটি পরম পরিণাম সেখানে আমাদের দৃষ্টিগোচর। কিন্তু, ছাপতা ও ডাকঘের তুলনায় চিত্রের আধার ও উপকরণ প্রায়শই অভিন্নমাত্রী হয়ে থাকে; তাই উক্ত চিত্রশৈলীর পূর্বে কী ছিল আর পরে কী হয়েছে তার নিদর্শন পাওয়া যায় অল্পই, ধারাবিবরণ সেও। কারণ গাথাঘর নয়। তবু সারা ভারতের এখানে সেখানে, প্রাচীরে আর পুঁথিতেও, তথা সিংহলের সিংগিরিয়ার আর অল্পসংখ্যে পাগানের প্রাচীর-চিত্রাবলীতে^২ এই একই রীতির বহুধা বিকাশ দেখা যায়। পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী শতকে রাজা মানসিংহের প্রাণময়ভিত্তিতে যে ছবি রঙে ও রেখার ঝাঁক হয়েছিল, স্থানীয় তাত্ত্বিক দেখেছেন অল্পাচার্যশৈলীর বিশেষ প্রভাব। আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান বাদশার কালে এনে কি সে ধারা লুপ্ত হয়ে গেল? গেল বলেই শোনা ছিল। কিন্তু, সম্প্রতি দু-একখানি গ্রন্থে (অবশ্য, ত্রাঙ্গ বা লওনে প্রকাশিত, ফরাসী বা ইংরেজি ভাষার কৃত্রিম) বোম্বাই-চিত্ররীতির যে বিশ্বকর পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে আমাদের মতো বিজ্ঞানী ব্যক্তির বলতে বাধ্য নেই যে, ভারতের চিত্রাঙ্গত রীতির সঙ্গে তার বর্নিত এমন-কি অঙ্গাঙ্গী সূক্ষ্ম উচ্ছল ভাবে পরিচুট হয়ে উঠেছে। পারস্য থেকে একটা প্রভাব এসেছিল সত্য; আকবরের সময়ে তার প্রতি পক্ষপাত শুনে শুনে যেখানে যায় সেও সত্য; কিন্তু সে প্রভাবকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদ্য করে ভারতের নিজস্ব প্রতিভার পরিচয়পত্র-রচনা ও স্বাক্ষর-লিখন ভারতীয় চিত্রকরণের অঙ্গাঙ্গী হয় নি। ঘর্ষে তাঁরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান; প্রতিভায় তাঁরা ভারতীয় ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক সময় একই চিত্রে বক্ষ্যতা দেখিয়েছেন ফকরু বেগ ও বনন, শংকর ও মুন্সি। অর্থাৎ রূপকল্পের কোথাও কোনো ভেদের রেখা পড়ে নি। পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা যাই বলুন, আকবরের পরে বোম্বাই-চিত্রের ক্রমান্বিত দেখা যায়। সে আলোচনা নিম্নোক্ত। এইটুকু বললেই যথেষ্ট বা যথেষ্টর বেশিই হবে যে, আকবরের আমলের এই-সব শ্রেষ্ঠ

২ এই প্রাচীরচিত্রাবলী সম্পর্কে অল্পাচার্য বা পুরাতন জ্ঞান চিত্রবিদ্য রসিক-মহলেও কল্পন সো বিঘ্নে সন্দেহ আছে। অল্পাচার্য প্রকাশিত *The Art and Architecture of India (The Pelican History of Art Series)* গ্রন্থে একটীব্যক্তি বাক্যে বলা হয়েছে: Such fragments of thirteenth-century wall-paintings as survive in various shrines near Pagan are clearly derived from the style of Tantric painting of Bengal.

অর্থাৎ, পাগানের বিভিন্ন মন্দিরে পুণ্ড্রাবিভি ভিত্তিগ্রন্থ বা আকিত হলেও তাতে বাংলার তান্ত্রিক চিত্ররীতির সঙ্গে কোন স্ট্রভাবে প্রকটিত। (তান্ত্রিকরীতি বলতে, তান্ত্রিক ভাস্কর্য্যের পুঁথি-চিত্রণ যে রীতি দেখা যায়)। অল্পাচার্য উল্লিখিত ভিত্তিচিত্রাবলী নিয়ে কল্পন পুরাতন্যেৎসব মন্দিরে বোঝা দেন না। ফেননা, বাহার ভাবেরে অল্পাচার্য প্রকটিত সেও হয়েছে— অল্পাচার্য অঙ্গাঙ্গী— অঙ্গাঙ্গী ওছাত্র চিত্রও অল্পাচার্য, বোম্বাই ওছাত্রের একটি চিত্র আছে, পাগান-প্রাচীর-চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতীয় চিত্রকলায় পশ্চিমার ও সামগ্রিক বিবরণ এর দ্বারা কোথায় সংক্ষেপে তার আলোচনা করেছেন শ্রীনিহারারঞ্জন রায়, ১৩৬৩ বৈশাখের প্রাচীরে 'পাগানের প্রাচীর-চিত্রাবলী' প্রবন্ধে।



ঈশ্বরদেব দুর্লভ-লিঙ্গ। কালীঘাট
শিখড়িত গোবর্ধন সৌরভে



ধর্মপৌরী । কালীঘাট-পট
শ্রীমন্ত ঘোষের সৌম্যে

কালীঘাটের পট

সৃষ্টিতে সাবলীল রেখার ব্যবহারে, রূপকল্পনার সাহসে ও বাঙ্কমো, পটকুনির সমস্ত ঝাঁক ত'রে সেওয়ার প্রবণতা—অমৃত-বাগ-ওহার ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য এবং সার্থকতা রয়েছে প্রচুর। অমৃত-বাগ-ওহার চিত্রকলা যেমন বৃত্তিকলার সঙ্গে সোহোদর 'ডাই-জগিনী' সম্পর্কে বাধা, এও তাই। অর্থাৎ, এতেও গড়ন আছে, ছায়াতপের বাড়াবাড়ি নেই। বলা যেতে পারে স্বভাব নেই তা নয়, স্বভাবের অহুকরণ নেই। পারস্ব চিত্রকলার জাতই আলাদা। আর, আকবর-পরবর্তী চিত্রকলাও ক্রমে ক্রমে তার স্বপ্ন থেকে চ্যুত হয়েছে। 'সে প্রচণ্ড গতি অবগান'। 'নিরঞ্জন' আকবরের দৈর্ঘ্য বোধ সংগঠনশক্তি ও সমর্থন-ভাবনা পরবর্তীদের ছিল না। তাঁরা পূর্বপুরুষজিত ঐশ্বর্য ভোগবলন করেছেন—অর্থাৎ ঐশ্বর্য—প্রাণপ্রবাহ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বোগল চিত্রকলায় এই সাক্ষ্য। নব্য-অত্যাধিক্ত পাকাত্য প্রভাবে প'ড়ে নিশাণ অহুকরণে তার অকাল দৃষ্টি।

এ কথা মানা আছে, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হতে থাকে বড়ো বড়ো রাষ্ট্রাধীনীতে আর বিভিন্ন রংক্ষেত্রে যে কালে, ঠিক সেই সময়েই পল্লীর লোকেরা চাষ-আবাদ করে, বাউল ভাটিয়ালি গান গায়, শি'ড়ি ঝাঁকে, গট ঝাঁকে, আর চিরকালে হুখে হুখে দিনাতিপাত করে। অস্বস্ত বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই চলেছিল। অর্থাৎ, এক কালে পাটলিপুত্রে উচ্ছিন্ননীতে আর বহু পরবর্তীকালে দিল্লি আদ্রা শাল্ভী শহরে, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, বাহুশাহ ও আমীর-ওব্বাহ—এঁদের প্রসাদপুত্র, এঁদের আনন্দমন্ডল ও আনন্দগীর যে ভাবের কাব্য সংগীত চিত্রকলাই চলুক, সে-সব বৃত্ত উন্নত বা কালক্রমে বৃত্ত অবনতই হোক, সমস্ত বেশ ব্যোপে, সমাজ ব্যোপে, সর্বসাধারণের স্তরে ঐ-সবের আর একটা দান্য হয়তো চলত থাকে পণ্ডিতগণ বলেন লৌকিক, কেউ উপেক্ষা করেন, কেউ বা নাস্তিভিত্তিক বহননও দিয়ে থাকেন—এই লৌকিক সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিরও দারা চলে আগছে দরপাতীত কাল থেকে। বর্তমান ঘরদুগে বর্ধন পৃথিবীর আরতন দেবতে দেবতে 'ছোটো' হয়ে আসছে, সর্বস্তরে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়েছে দ্রুত ও প্রচুর, সমাজ এসে পড়েছে রাষ্ট্রেরই মুঠোর মধ্যে—পূর্বে তো এমন ছিল না। তলে তলে বোগ থাকত সমাজের সর্বস্তরে। প্রত্যেক প্রভাব এসে পড়ত না শহর থেকে পল্লীতে, বিরূপানিত্য বা আকবরের রাজসভা থেকে কৃষিকোষী-শিল্পজীবীর শান্ত জীবনে দিনকার দিন। এতে যে সবটাই ছিল লোকশান এমনও বলতে পারি নে।

কালীঘাটের পটই তার অন্ততম প্রমাণ নয় কি? মোগল-সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের সঙ্গে, মোগল চিত্রকলার বিকাশ ও বিকাসের সঙ্গে পূর্ববাহ্যক্রমে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকলে গোপাল-নীলমণি-বলরানের ঝাঁক এই সহস্র সরল সবল স্বনামস্মৃতির সাক্ষ্য মিলত কি? এ দেশের বা চিরন্তন প্রাণধারা স্রষ্টাধারা তার নিঃশব্দ সফার চলে এসেছে হুগ থেকে হুগে, প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে, তার স্রজে এঁদের প্রতিদিন দিল্লি আদ্রা মুর্শিদাবাদের মূখ চেয়ে থাকতে হয় নি, কোনো আর্ট স্কুলেও ভর্তি হতে হয় নি। বরন্ত, বর্ধনই কোলকাতা শহর স্কুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, অল্প অনেক জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে আর্ট স্কুলেরও উৎপত্তি হল, তব্বনই কালীঘাটের পটের মুমূর্ষু মশা এসে গেল। হুগের প্রভাব এসে পড়ল স্রষ্টাধারিত ধারায়, ধরণে। তার স্রষ্টিই ইতিহাস লেখা কিছু কঠিন নয়। কালীঘাট-পটের বিচিত্র বিবর্তনের প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ এখনও সব নষ্ট হয় নি বা বিশেষে চলে যায় নি।

যেখাই কালীঘাট-পটের প্রায় খোলা আনা। পরবর্তী কালের ছবিতে রঙ সেওবা হয়েছে বটে, রঙের

বিচিত্র ব্যাচনা আর অতুল ঐশ্বর্য তেমন নেই।^১ সর্বস্বাই এটা মনে রাখতে হবে, তার সঙ্গে পট একেছিল পটুয়া, কতটুকু সময়ে, কী সামান্য উপকরণে, কত দর আর কী সমাদর পেয়েছিল। তার কবরদী ছিল না আদৌ-ওমরাহ্, রাজা-মহারাজা।। ম'রে ভুত হয়ে বাগদার আগে নবগজাভিমানী নৃতন-শিকিত জনের নফেও তার জানাশোনা ছিল কি? সব তথা বর্তমান লেখকের জানা নেই। এটা জানি, উঠতি শহরের প্রান্তে গ্রাণ্ড কালোয়ারে রত্নপদতলে রত্নরথ্য ও বিদমল বাসা দিতে আসত, তারাই ছিল এর জেতা কোম্পানির-ছাপ-

০ বর্তমান সমায় ব্রুতিত 'পোটলীয়া' হাবিট 'জাত কালীঘাটের পট' নয়। কালীঘাট অকসেই আঁকা হয়ে থাকতে পারে, কোনো কালীঘাট-পটুয়ারই তুলিতে অর্থ্য তাহের কোনো জাতিকটুহের। পিতাধর বদল যেমন দিত বর বা পিতৃদ্রব্যদী ব্যক্তি না ব্যক্তির কিস্ব করে শ্রিকৃৎকেই বোঝায়, 'কালীঘাট পট' নয়ও তেমনি তার আধিষ পরিভর-নত বা যুগপতি-নত অর্থক অতিক্রম ক'রে বিশেষ একটী রূপ বা বোক্ষরু অর্থের ব্যাচনা দিচ্ছে। পূজনীয় শ্রীমন্তলাল বহুর চিত্রিতে সেটির ব্যাখ্যা রয়েছে। 'পোটলীয়া' হাবিট সিম্পলিসিত আঁকা, বা টোপায়া। অমন শুক কবায় পুংইই সাধা আভরণে 'ধনি' তৈরি করা হয় নি সত্য— তন্ম অনন্য ভারী রঙে, সাধা-বেনাধো রঙে, ফেদে ক'রে ক'রে এক ধ'রে ধ'রে কান করা হয়েছিল। গড়ন ঘোটাবার সঙ্গে ভারতের বিদ্বৎ পদ্ধতিতে (যেমন অমৃত্যু, যেমন উচ্চুই বোঙ্গল চিত্রে) ছাত্রাধবায় হুনিপুণ অঙ্গোপ আদে, পর্দায় আছে। আকাশের নলচাঁও, তা ছাড়া কোণও কোণও হুদিত ও স্ফাতির দেহে, কান্দনের রঙটি বারো লাগানো হয়েছে অতি অপরূপ বক্ষতার। কালীঘাট-চিত্রের সমাজোচনা এর বসিট এক সাংলীল কাসে রেবার ফেদে— রঙে লাখাবার আবেই সেই রেখাপাত একরূপ সারা হয়েছিল মনে হয়। খো ছাড়া, রূপকন্দারও বিশেষ লাখাণ্ড ও কন্দীভার্য বাঙালির জাতিগত প্রতিভার বিশেষ ছাপ রয়েছে। পোত-বাহ্যরুদ্রিত পর্দা একপ্রকার নিহিত মানবচরা কুট উঠেছে, কৃষ্ণ-বলরামে একটা যেন অদ্বুত বাৎসল্য ও ঐতিহ্য; এরা যে খোশো-জানা আ-রাণা ধীর তা হবে হয় না। কলকাতা, রাজধানী-কাজার পটুয়ারের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি লম্ব-দ্রব্যোপ উপাধ-উপকরণ ও ইচ্ছার সন্ধ্যোবে, রাজা-মহারাজা বসিক বনিকের সমাবরণপূর্ণ অকুট পোষকতা পাওয়া দেশ, বাঙালি পটুয়ার হবি যেমন রেবার তেমনি রঙে কী ভক্তি এক কতখানি ঐশ্বর্য একাধ করত এই চিত্র ব্রুতি সেই সমাবরণাই ব্রুত ই-পায়া। হজতো বা টিক বলা হল না। কারণ, এই চিত্রে বাৎসল-সেণের ধারাবাহী পটের সমাবরণ ই-পায়া শুধু ছিল না, অত্যন্ত ইতিবৃত্তও সম্বল। এটানি পুঁথির পাটায় যে রূপ ও রঙের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে তাই শুধু নয়, বিকৃশুর অকসে এমন পট (ব্রাহ্ম-অবতার?) পাওয়া গিয়েছে ও আমরা যেখানি যাতে কাচ-রাঙ্গানোর হবির মতোই ধ'রে ধ'রে কান করা হয়েছিল, অস্বাধ শতাব্দের শেখতামে। পুত্রাপুত্রি টোপায়া হবি; পিঠির কল্লু, কোষচের মতো নীল, লাল, সবুজ, সাধা, বিভিন্ন রঙের সমাবেশ তাকে— যেমন উচ্চল তেমনি দ্রিষ্ট, আর তেমনি সন্নিহিত। বিষভারতী পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সমাখ্যার যে 'মহিষাশুরাধিনী' হবিখানি ছাপা হয়েছে, রূপ রেখা রঙ ও অলংকরণের সন্ধ্যোহা সমাবেশের বিকল হিসাবে, কাজে রাঙপুত হবির সঙ্গে সেটিরও তুলনা হতে পারে। কলকাতা, 'পোটলীয়া'র যে চিত্রশৈলী, বাংলাদেশে তারও খার অনেক দিন থেকে চলে আসছিল লম্বের সেই। হুদেখর বিদ্য নির্যণ তার একই রকম পেয়েছে। প্রথমতঃ, তারস্তর ইচ্ছের সমাখ্য কর্তৃক ব্রুতিত ও একাধিত Art-Manufactures of India (1888) গ্রন্থে, অভিজ লেখক জৈনো-করণ যুগেপগাধ তৎকালীন বাংলা পট সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে তথা দিয়েছেন তাও উচ্ছারযোগ্য—

Until recently, a superior kind of water-colour paintings was executed in Bengal by a class of people called the *Patuas*, whose trade was also to paint idols for worship. These paintings were done with minute care, and considerable taste was evinced in the combination and arrangement of colours. The industry is on the decline, owing to cheaper coloured lithograph representations of Gods and Goddesses turned out by the ex-students of the Calcutta School of Art having appeared in the market. A painting in the old style can still be had, by order, at a price of Rs. 10 and upwards.

['ব্রাহ্ম-অবতার' বা 'পোটলীয়া'র সমাজোচনা চিত্র]

মারা বা মহারাজী-জিষ্ঠারিয়ার-মুখ-খাঁক। দু-চারটে আমার পয়সার। খালা-বাটি, শাড়িশি-খুস্তি, তাঁতের কাপড় আর ছেলে-ঝুলানো। কাঠের বা মাটির পুতুল কিনত— সেই সঙ্গে কিনত দু-একখানা সেবসেবীর পট। পত্ৰপকীর ছবি* আর হাসি-মশকরা ব্যঙ্গবিজ্ঞপের নম্রাও কিনত। কিন্তু কতদিন আর কিনেছিল? বোঝার আর্ট্‌স্ট্রিও'র রত্নিন লিখো-ছবি পাওয়া যেতে লাগল অল্প দামে। কালীঘাট পটের চেয়ে কত যে চমৎকার! বস্ত্রের তার শক্তি ও সখল, রঙ দিয়ে, বিষয়বৈচিত্র্য দিয়ে, ব্যঙ্গ দিয়ে, বিপুল জনমানসকে ধরে রাখতে চেয়েছিল দ্বিধা পটুয়া। শেষ পর্যন্ত পাবে নি। গ্রামে কেগে নি নিষ্ঠুর, এখানেই কোনো রকমে শেষ দিনগুলো কাটিয়েছে প্রায় নিঃসখল, এবং কপা; স্ত্রীর হৃদয়ে চিকিৎসা করতে পাত্রে নি, বয়স্ক মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় নি এবং ছেলেটা বড়ো হলে বড়ো লোকের ঘরে ধরা দিয়ে হয় তাকে পানসামাগিরিতে ভর্তি করেছে, নয়তো কি আর্ট্‌স্ট্রি ?

এদব ইতিহাসই হারিয়ে গেছে। স্বপ্নের বিষয়, বড়ো জ্বিনিল মরে না, হারায় না। বারে বারে চিত্তাভ্রম থেকে ওঠে নবমেহ পেয়ে পুরাণপ্রবৃত্তি বিহঙ্গের মতো। সে আলোচনা আজ নয়।

কালীঘাট-পটের বিস্তারিত ইতিহাস লিখি বা নিখুঁত বিশ্লেষণ করি সে শক্তি আর সময় আমাদের নেই। যোগ্য ব্যক্তি কোনোদিন সে কাজে প্রবৃত্ত হবেন। আমাদের কাজ সাহেবরাই সব করবেন, আমরা করি এ ভাব চিরদিন থাকবে না। এই অসম্পূর্ণ লেখাও ইতি লেখার আগে আর-একবার চেয়ে দেখব হংগেরীয় মূল চিত্রটির দিকে। অমিত্রাব্যব অভিযুক্তে চিত্রটি প্রায় শতবৎসরের পুরোনো। শাবা কাগজ খাদ্যাদী হয়ে এসেছে; ধারে ধারে ছিঁড়েও গেছে; চিত্রের আয়তন চওড়ায় এক ফুটেরও কম, উচ্চতায়

The Patals now paint rude "donbs" which are sold by thousands in stalls shrine of Kalighat . . . at a price ranging from a farthing to a penny.

[হু-পদসা চার-পদসার বেশি দাম নয়]

উনিশের 'বরাহ-মহত্ম্য' চিত্র বা ত্রৈলোক্যনাথ সুখোপাধ্যায়ের প্রচুর-তথ্য-পূর্ণ গ্রন্থানি সম্পর্কে ইহুত্ব অধিত খোদ মহাপ্রভু মাঝে মাঝে আকর্ষণ করেছেন। কালীঘাট পটের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তথ্যের দিক দিয়ে যথেষ্টই পরিষ্কৃত হল, মন্তব্য দিকটা অবশ্য বর্তম— বিশেষ যেন কালের বিশেষ সংযোগ-সুবিধা আখ্যাত-ব্যখ্যাতের সব উদ্দেশ্য।

■ নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় নিম্নলিখিত ভঙ্গীতে খাঁক হ'ত। যেমন সাপে ঘাও করতে, বিড়ালে বাহ বা গাধা শিকার করেছে, অথবা ছুটি টিগা গাধা এক গাধের ডালে উড়ে বলেছে। কালীঘাট-পটুয়াসের রূপ লেখবার বা বিষয়-সাধারণ্যের দ্বিতীয় যে বিশেষ ভাবে আলোকায়িক, সাংলীল রেখার হচ্ছে ঐরা— এ কথা না বললেও চলে। সেই মতনবী রেখার হল টিগাপাখির হৃদিত একান্তভাবে একট, অতঃপরবর্তিত অত্যন্ত ক্ষণের সঙ্গে সবহিত হয়ে কোনো একটী মৌলিক বা অমৌলিক আখ্যান বলবার দায় নিয়েছে এই-দাতা— নষ্ট হয় নি বা চাপা পড়ে নি।

মৌলিক নিয়ে কতকগুলি ঐরা বাহা বিবাহ, রূপ, ভঙ্গী ও বিকাশ থাকে। কতকাল পরে পরে কোনো নির্দিষ্ট যখন নতুন একটী রূপকল্পনা করে এবং সেটি দৃশ্যভিত্তিক ও রসিকতামূলক আবৃত্ত হত, তখন সেই নির্দিষ্ট রূপে পূর্বরূপকল্পনার ভারই অমূলক বা অমূলক হলে ধীরে ধীরে যায়। এতদূর কতকগুলি রূপকল্পনা থাকে এক-এক নির্দিষ্টবিষয়ের পৈতৃক সম্পত্তি। অতঃ, উৎকৃষ্ট কল্পনা রূপ পরিবর্তনের ঘাঁয়েও বহুচিত্র পড়ে। রাজধানী কাংড়া যোগল চিত্রশিল্পিতও অমূলক প্রথা ছিল; এবং সে ক্ষেত্রে তাগো হবির মূল রেখাচিত্র নির্দেশই সফল ক'রে রাখা হত, কোথায় কোন্‌রঙ বেঞ্জা হবে তাও হয় দিগে নয় একটু রঙ ছুঁতে প্রথমে রাখা হত। এই মূল রেখাচিত্রকে বলা হত ঐরা। এই ঐরায়ে পূর্ববিস্তৃপ্ত একই ছবি একাধিক রঙিত হতে পারত। অতঃ, হবির ঐরাই হাতে অবশ্য যে তাগে ওত্রাতো পরে তেমন আর হতে পারত না বলাই বাহুল্য। কালীঘাটের পটুয়া-মহলে চর্চায় চলি ছিল ব'লে জানা যায় না। ওঁদের সরল দাবলীল রূপকল্পনা ওঁদের স্মৃতিতে আর তুলির ভ্রমেই সঞ্চিত থাকত।

সওয়া এক ছুট। তুলি ধরায় আগে পেলিল ধ'রে হাভাহাতে বংশামাত্র আদ্রা একটা আঁকা হয়েছিল তারও চিহ্ন আছে; হয় লাগ-বোহা রবারের চপন ছিল না, নয়তো গুঁহুয়ার তাতে প্রয়োজনই ছিল না। ঠিক এই বিষয় এই রূপ প্রায় এইভাবে গাণানো, আরও বহু দেখেছি। কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট অমন, অপরূপ ছবি, আর তো চোখে পড়ে নি।

সওয়া এক ছুট উকতা বলেছি। আমার মনে হয়, কণাধরবিম্বিত গিরিশের শির হিমালয় ছাড়িয়ে উঠেছে। হিমালয় পর্বতমালায় আকাশচুম্বী শেগর শিখর তারই রেখার সঙ্গে উর্ধ্বমুখী রেখাবল্লীর একটি নিল আছে। গৌরী শুয়ে আছেন শিবের কোলে মাথা রেখে—কী শান্তি! কী তৃপ্তি! কী নির্ভর! কেন হিমালয়ের মাছুতে মাথা রেখে তারতন্মিই শুয়ে আছেন। এসব কল্পনা এই পট-প্রস্তার ছিল না। কিন্তু তখনকার সমাবে, সমষ্টি ও ব্যস্তির জীবনে, যে শান্তি, যে তৃপ্তি, যে অনায়াস ছন্দ ছিল—যে ধর্ম, যে বিশ্বাস, যে গভীর উপলব্ধি ছিল—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বহু বিড়ম্বনার তলে তলে যে অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা বয়ে চলেছিল অল্পবিস্তর ‘অশিক্ষিত’ সাধারণ নরনারীর ও ভিতরে, তারই তো নিখুঁত একটি প্রতিরূপ এই। অ্যাদর্শ গুহী শিব ও পার্বতী—একাধারে ভুবনেশ্বর ও ত্রিধারী, একাধারে পতিগতপ্রাণী অবলা আর সর্বশক্তিময়ী। কেবল কৈলাশে নয়, ঘরে ঘরেও তাঁদের লীলা অগণ্য নরনারীর জীবনে। সেই দ্বর্গে-মর্ত্তে-যেশানো, দেবভাষ-মাহুবে-বেলানো বিশ্বাস ও উপলব্ধি, বাঙালি প্রতিভার বিশেষ লাবণ্য মাথানো, এই একখানি চিত্রে সম্পূর্ণই শরীরী হয়েছে মনে হয়। তাই বলতে হয়েছে, একটি দেশ, কাল, জাতি ও সংস্কৃতি এই চিত্রপটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আশা করি এ কথায় কোনো অত্যাধিক ঘটে নি।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম আনন্দ ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। প্রবাসী, সাহিত্য এবং অন্যান্য পত্রে তাঁহার লেখা বাহির হইত। তাঁহার লেখার ধরন অত্যন্ত সুন্দর হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল, সেই স্বতন্ত্র ভাষা গুণগ্রাহী পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিত। লেখার ভঙ্গী দেখেও চোখে পড়িত তাঁহার বর্ণালিপি, তাঁহার অক্ষর ও বানান, সেজন্য সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হরেশচন্দ্র সমাধিপতি মহাশয় রহত করিয়া তাঁহার বানানের ন্যায়করণ করিয়াছিলেন, 'যোগেশ বানান'। এখন যে নতুন বানান বাংলায় চলিতেছে তাহার মূল যোগেশচন্দ্রের চেষ্টা, অনেকগুলি তিনি তাঁহার রচনায় বহুকাল ধরিয়া চালাইয়াছিলেন; প্রবাসীর সম্পাদক এবং যোগেশচন্দ্রের পুত্রের দুই-একজন প্রকাশক তাঁহার বানান অবিকৃত রাখিবার জন্য নতুন টাইপ করিয়া লইয়াছিলেন। অন্যদের দ্বয়ের সময়েও তিনি লেখক হিসাবে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কটক কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৮৯৬ সালে তিনি প্রকৃতি পরিচয় সম্বন্ধে *A Primer of Physiography* নাম দিয়া একখানা বই লেখেন। বইখানির মধ্যে শিক্ষাদাননীতি বেড়াইতে গৃহীত ও অগ্রহত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য মনেও তাহার মূল্য হ্রাস হইয়াছে কি না সে কথা বিজ্ঞানশিক্ষকেরা বিবেচনা করিয়া বলিতে পারেন। সমস্তবালী বাংলাদেশের ছাত্রদের নিকট আবহৃতক বেশি কালের হইতে পারে ও বেশি ভালো লাগিতে পারে বলিয়া তিনি ইহাতে কৃতিপাভ, অপ্রীতি, তাপ প্রভৃতি দ্বারা নিত্যা বৈদিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অথচ আঠারোটি মাত্র পাঠে এই পুস্তিক সম্পূর্ণ। লেখকের পরিচয় সেওয়া আছে— *Professor of Physical Science, Katak College*.

ইহার কিছুকালের মধ্যেই তাঁহার রচিত তিনখানি বইয়ের নাম করি— শব্দনির্মাণ, রত্নপত্রিকা ও আশ্বাসের স্রোতিবী ও স্রোতিব। লেখকের পাণ্ডিত্য তখনকার লেখককে চমৎকৃত করিয়াছিল। বই তিনখানি পড়িওঁদের মধ্যে কতজন পড়িয়াছেন অবগত নহি; তবে প্রথম দুইটির প্রচার তেমন হয় নাই। আশ্বাসের স্রোতিবী ও স্রোতিব-এর আয়তন কম নহে, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। আমি না, কখনও এ বইখানিও পড়িয়াছেন। কিন্তু বইখানির সম্বন্ধে যোগেশবাবুর দ্বয়ের বিশেষ স্থান ছিল। একবার সংবর্ধনাসভায় তাঁহার চিঠি বইখানিরও নাম হইয়াছিল, কিন্তু এই বইখানির নাম করা হয় নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন — 'একজন আমার রত্নপত্রিকা হ'তে আমাকে F. R. M. S. S. করেছিলেন। কিন্তু আশ্বাসের স্রোতিবী ও স্রোতিব হ'তে কষ্টলব্ধ F. R. A. S. উল্লেখ করেন নাই। বইখানিতে যে তাঁহার পরিচয়সঙ্গততার বিশেষ চিহ্ন রাখিয়াছে, তাঁর মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় আছে। পণ্ডিত বালাদ্রাঘর টিলকের সুবিখ্যাত *The Arctic Home in the Vedas* বইখানি প্রচলিত হইবার পূর্বেই যোগেশচন্দ্রের আশ্বাসের স্রোতিবী ও স্রোতিব-এর ভূমিকা মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তাই যোগেশবাবু অতিরিক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন—

এই গ্রন্থের ভূমিকা মুদ্রিত হইবার পর প্রকৃত বালাদ্রাঘর টিলকের নতুন গ্রন্থ আশ্বাসের হৃদয় হইয়াছে। সেই গ্রন্থে [*Arctic Home in the Vedas*] তিনি প্রথমবার চিহ্ন করিয়াছেন যে, বৈদিক ভবিষ্যের সুবিশুদ্ধতা গ্রীকদের আর ১০০০ বৎসর পূর্বে

মেক্স-পরিহিত গ্রন্থে বাস করিতেন। তৎকালে সে গ্রন্থেপ কর্তব্যের দ্রাঘ ইচ্ছা ছিল না; পরন্তু সে গ্রন্থেপ চিত্রসংগ্রহে বিদ্যমান ছিল। বহির্বিষয় গ্রন্থে দ্রাঘ চিত্রক মহাশয় বীর অমুদান সমর্থন করিতামেন। আত্মা চিত্রক মহাশয়ের অমুদানকে সান্ত্বিত মনে করি। যে যে বিবরণের সহিত আবারের উপস্থিত গ্রন্থের সমস্ত আছে, কেবল সেইজন্য কয়েকটি গ্রন্থে বিবরণ সংক্ষেপে চিত্রক মহাশয়ের ব্যাখ্যা গ্রন্থে হইতেছে।

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ দুই খণ্ডে বিভক্ত— প্রথম খণ্ডে আমাদের জ্যোতিষীদের পরিচয় দেওয়া আছে, দ্বিতীয় খণ্ডে আছে আমাদের জ্যোতিষের পরিচয়। গ্রন্থের পূর্বভাগে জ্যোতিষগ্রন্থাবলীর তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকাটি পড়িলেও যোগেশবাবু যে কি অসাধারণ পরিচয় করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা কিছুটা অসম্ভব বলিতে পারা যায়। শ্রবণশীলতার সঙ্গে দৃষ্টি ও ধর্মশীলতা দেখিলে। লেখকের সময় সময় সাধারণগ্রন্থে অথচ উচ্চতরে লইয়া গিয়াছে। একটামাত্র উচ্চতর এখানে দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না—

কোন কোন উপহাস-রসিক পণ্ডিতের মত পূর্ণাঙ্গ-বর্ণিত জ্যোতিষশাস্ত্রকেই এটান আত্মকণ্ঠের জ্যোতিষিক গ্রন্থের নির্বাক মনে করিয়া থাকেন। অমুদান দ্রাঘপাণি দ্বারা করিলে কোন কথা ছিল না। সমস্ত অনন্তে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে নিম্নোক্ত গ্রন্থে এটান গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ গ্রন্থে করিয়া আনয়ন পায়। তাহার দৃষ্টি দ্বারা যখন যে, যে জাতি বস্তু পূর্ণাঙ্গ, তাহার পূর্ণাঙ্গও তত পূর্ণ। আমাদের ও এটান জাতির বস্তু পূর্ণাঙ্গ আছে, অন্য জাতির বস্তু নাই; পরন্তু কোন আধুনিক জাতির পূর্ণাঙ্গ তত বৃহৎ হইতে পারে না।

অতঃপর, পূর্ণাঙ্গবর্ণিত জ্যোতিষশাস্ত্র একমাত্র সত্য, তাহারই প্রদর্শন করা অভিপ্রেতি নহে। তাহা পূর্ণাঙ্গ, তাহা চিরদিন পূর্ণাঙ্গই থাকিবে। সত্য বাস্তব করিলেও তাহা কখনো সিদ্ধান্তের দ্বারা হইতে পারিবে না। এই কথাটি দৃষ্টি দিয়া কেহ কেহ পূর্ণাঙ্গবর্ণিত কৃত্যেপ ও জ্যোতিষকেই সত্য মনে করেন; এবং কি, আধুনিক শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা বলিতেও পারা হয় না। তাহার দৃষ্টি দ্বারা যখন, পূর্ণাঙ্গ মনেও নুতন হইতে পারে না; দৃষ্টি দ্বারা যখন, নুতন পূর্ণাঙ্গের পর, নুতনের পর পূর্ণাঙ্গ বহে।

মানবজ্ঞান চিরদিনই অসম্পূর্ণ। যে জ্ঞান-পরিচয় আত্মকাল শাস্ত্রের যেন পণ্ডিত, জ্যোতিষের তাহার কতকটুকু হইবে, এবং কতখানি পৌরাণিকী কথা বলিয়া বিশ্বাস-বৃত্তি নিষ্পেষ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আধুনিক আবিষ্কারের সত্য এবং, কত জ্ঞান, কত বোধ জ্যোতিষকালে প্রদর্শিত হইবে, তাহা আবার এক্ষণে কখনও বলিতে পারি না।

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ বইটি লইয়া একটু বিস্তরে আলোচনা করিতেই ইচ্ছা করে। কারণ, মনে হয়, যোগেশবাবুর ভাবভীর সাধারণ প্রতি অস্বাভাবিক এখানে হইতেই আরম্ভ হয়। জ্যোতিষ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাহার পরিচয়ও হয় এই সময়ে। খণ্ডপাড়া নামে উড়িষ্যার এক ক্ষুদ্র কল্যান নামের সন্ন্যাসী চন্দ্রশেখর দিগ্বেশের মন; তিনি সংস্কৃত এবং মাতৃভাষা ওড়িয়া ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানিতেন না, জ্যোতিষের লগ্ন নক্ষত্র ইত্যাদি শিখিয়া বর্ণ-বারো বৎসর বয়সেই আকাশে সেগুনি পরোক্ষ করিয়া দেখিতে চান। জ্যোতিষের গণনা ও গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্যে পার্থক্য দেখিয়া তিনি জ্যোতিষে অস্বাভাবিক হইলেন এবং কাশ্য অস্বাভাবিক করিতে লাগিলেন। নিজেই তিনি সিদ্ধান্তনিয়োগনি ও স্বর্ধসিদ্ধান্ত চীকার সাহায্যে পড়িয়াছিলেন। তথু তাহাই নয়; তিনি নিজেই উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত দুই-একটি দ্রাঘ নির্ণয় করিয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্র বেধ করিতে লাগিলেন এবং তাহার পরিবর্তনকাল অবলম্বনে সিদ্ধান্তবর্ণন নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। চন্দ্রশেখর নামক তাহার গণনা দ্বারা পরিকার যে সংস্কার সাধন করেন তাহাও পূর্ণাঙ্গ দ্রাঘের নিত্যপূর্ণা পরিচালিত হয়। যোগেশচন্দ্রের দ্বারা চন্দ্রশেখর নামক গ্রন্থের কতিপয় ইউরোপে পৌঁছায়; তিনি চন্দ্রশেখরকে Tycho Brahe টাইকো ব্রাহীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন; *Nature* পত্রিকা দ্বারা করেন— Prof. Roy compares the author very properly to 'Tycho. But we should imagine him to be a greater

than Tycho. *Knowledge* পরিকায় যত্ব্য হয—Of all the numerous works on astronomy that have been published within the last few years, this is by far the most extraordinary, and in some respect the most instructive. বনে রাখিতে হইবে, এম্ব ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দেৰ কথা, তখনও বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হয় নাই।

চন্দ্রশেখর সানস্কেয়র লকে বোগেশবাবু'র পত্রিচয় নাটকিত্ত ভাবেই হয়; মহানহোপাধ্যায় মহেন্দ্ৰচন্দ্র চাষদত্ত পত্ৰিকাংশ্বারে উৎসাহী হইয়া কটকে চন্দ্রশেখর সানস্কেয়র সন্ধান করেন, কিন্তু ওড়িয়া পণ্ডিতের বিশেষ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্ত কটক কলেজের দুইজন অধ্যাপককেও নিমন্ত্ৰণ করেন। এই দুই জনের মধ্যে বোগেশবাবু ছিলেন। সরল অনাড়ম্বর ভাবে সানস্কেয়র দেখে দুই তারার মধ্যে দূরত্ব বুঝিয়া গিলেন এবং তারার ও নক্ষত্রের মধ্যে প্রভেদ বোপাইয়া গিলেন তাহাতে অধ্যাপক দুইজন চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ক্রমে পরিচয় বাড়িল; সানস্কেয়র একমাত্র কাগজ সিদ্ধান্তবর্ণন প্রকাশে ও পণ্ডিতসমাজে প্রচারে বোগেশচন্দ্র অগ্রদূত হইলেন। এই পরিচয়ের কথা বোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, এবং মুখেও বলিয়াছেন। তাঁহার তরুণ জীবনে কি এই একমাত্র সাধনার আদর্শ কোনোই দেখাপাত করে নাই? এই দিক দিয়া বেশিভেও আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ স্বপ্নাঙ্গী গ্রহ।

১৯১৩ সালে জুলাই মাসে যোগেশবাবুকে আমি প্রথম দেখি। আমি কটকে পড়িতে গিয়াছি, সেখানে কাহাকেও চিনি না— কটক তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ বিদেশ। দীনেশচন্দ্র সেন অনাবের আত্মীয় হইতেন, তাঁহার নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া যোগেশবাবুর সঙ্গে দেখা করি; পত্রে আমার তথ্যবর্ণনের কথা ছিল। যোগেশবাবুর বদিব্যার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত। আমাকে বসিতে বলিয়া পরিচয় গ্রহণ করিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্রষ্টা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল “বাংলা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সম্বলন”। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করিতেছিলেন; ব্যোমকেশ মুস্তাকী রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত তালিকা ছাপাইয়া সমস্তের বাংলা ভাষার দাবতীয় শব্দ সংগ্রহ করিতে বলেন। পরিষদের সমস্তের মধ্যে কেহ কেহ একদম শব্দ সংগ্রহ করিয়া পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। প্রথমে যোগেশবাবু এ কাৰ্য্য তাঁহার নয় বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু একবার পুরীতে অবকাশ ছিল প্রচুর, হঠাৎ পরিষদের কথা মনে পড়ায় জান। শব্দ লিখিতে লাগিলেন। সংস্কৃত শব্দ বাতীত বাংলা শব্দ বর্ণে বর্ণে ভাগ করিয়া এক-এক বস্তু কয়গরে এক-এক শব্দ লিখিয়া ঘাইতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় আট হাজার শব্দ লিখিয়াছিলেন। শব্দকোষের আরম্ভ এইখানে।

যোগেশবাবু বাংলা ব্যাকরণ শেষ করি। তখন দশকোষ পুনরায় দেখিতেছিলেন। আমাকে এ বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করার অর্থ মাঝে মাঝে আসিতে বলিলেন। এই ভাবে কাজের মধ্য বিয়া আসা-যাওয়ায় তাঁহার সঙ্গে কতকটা ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার দ্বারা যে তাঁহার এমন কিছু সাহায্য বাতবিক হইয়াছিল, তাহা নয়; আমার বিজ্ঞান ও বঙ্গ হিগাষ করিয়াই তিনি আমাকে কাৰ্য্য নিতেন, কিন্তু তাঁহার সম্ভাষ্য করিবার সুযোগ আমার ধুখেই হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তিনি গল্প করিতেন। একবার বলিয়াছিলেন, “আমার কিছু লেখা হইলে আমি তাহা বিভিন্ন ধর্মীয় লোককে দিয়া পড়াইয়া লই।

তাহাদের পড়া হইতে বৃষ্টিতে পানি, নিজের কথা কতখানি শ্রুতি করিয়া বলিতে পারিরাছে। পাঠকের কোথায় ঠেকিতেছে, কেন ঠেকিতেছে তাহা বোঝাও যে লেখকের কাৰ্য।"

১২১০ হইতে ১২১৭— চারি বৎসর আমার কটক কলেজে পড়ার সময়। এই চারি বৎসর কলেজের ছাত্রসমাজের দিক হইতে নানা কর্মে উৎসাহ ও দুর্ভিক্ষাদি বিপদে সাহায্যের জন্য টাকা জুলিতে কয়েকজন অধ্যাপকের নিষেধ হইতাম। যোগেশবাবুর নিষেধও হইতাম। তাঁহার দান পরিমিত ছিল, কিন্তু বল ছিল না। সকল বিষয়েই তিনি কিন্তু খুঁটিনাটি নানারকম প্রশ্ন করিতেন। সামাজিক হিতসাধনের প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব অনেক মত ছিল। আমি বেবার কটক হাই, সেই বৎসরই কলেজের একটি ছেলে কাঠদুড়ি নবীতে গাঁতের দিতে গিয়া বৃক্কের নীচে একটা ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া যায়। তাহার একজন বন্ধুও শীতের মিতেছিল, সে তাহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়া যায়। কিন্তু প্রথম ছাত্রটি বদন দেখিল যে তাহাকে সাহায্য করিতে আসিয়া তাহার বন্ধুটি বৃষ্টি ধম হারাইয়া ফেলে, তখন সে তাহাকে নিজেই ঠেলিয়া দিয়া অস্তির নমস্কার করিয়া ফলে ভুবিয়া গেল। এই শোচনীয় ব্যাপারে শ্রুতিরক্ষার জন্য যোগেশবাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত শ্রুতিরক্ষার জন্য শুধু শীতের-শিক্ষা নয়, মজ্জমান ব্যক্তিকে বাঁচাইবার কৌশল শিখাইবার ব্যবস্থাও করা হউক। পণ্ডিত হইয়াও তিনি বাহিরের লগ্নতের প্রতি কি সমাজের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, ছাত্রদের কল্যাণ কিসে হইবে তাহা চিন্তা করিতেন এবং উপদেশও দিতেন। নিত্যসময়ের সময় দুই-একজন ছাত্রকে সঙ্গে লইতে চাহিতেন। ছেলেরা কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সহজে ভাল ব্যবস্থা চলিতে পারিত না—তিনি ঘোরে ঘোরে পা ফেলিতেন, বেড়ানো যে ব্যাঘ্রদের জন্য, অথপরিচালনার জন্য। অনিচ্ছাছিলান, অত্যধিক পড়াশোনা ও একান্তভাবে ব্যায়াম বর্জননের জন্য তিনি নাকি একবার কঠিন অক্লান্ত-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; তাহার পর নিজের চেষ্টায় ওজন করিয়া থাকতেন হাইতেন এবং নিত্য নিয়মিত দ্রুত ভ্রমণ করিতেন বলিয়া পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করেন। বৃদ্ধবয়সেও ভ্রমণ তিনি ব্যাধ পেন নাই। কিন্তু আহাদের পরিমাণ স্বাভাবিকই ছিল।

১২১৭ হইতে ১২৪০— এই দীর্ঘ ছাত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমিও কতবার কটক গিয়াছি, যোগেশবাবুও কলিকাতার আসিয়াছেন; তাঁহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াই চলিয়াছি। (ইহার কৃত্তি আমার নয়, তাঁহার।) সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা আলোচনার বিষয়ে তাঁহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি হয়তো অহুসমানের জন্য আমাকে লিখিয়া পাঠাইতেন, হয়তো দুই-একখানি এর সংগ্রহ করার কথা বলিতেন, নয়তো কিছু অহুসমান করাইয়া লইতেন। তাঁহার বৈদিক গবেষণা এই সময়ে পুরাতাত্ত্বিক চলিতেছিল। আমার কলিকাতার থাকিয়াও গবেষণায় বিলাতের জ্যোতিষবিদ্যার কথা ডাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি; যোগেশবাবু কলিকাতার থাকিতে পারিতেন না, থাকিতে চাহিতেন না, কিন্তু কটক ও বাবুজায় থাকার ফলে তাঁহার জ্ঞানচর্চা কোনোদিন ব্যাহত হয় নাই।

তাঁহার চণ্ডীদাস-চরিতের সম্বন্ধেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। একবার বাবুজায় গিয়াছিলাম, তিনি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান দেখিয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার নির্দেশে এবং স্বামানন্দবাবুর অহুরোধে মর্ডার রিভিউ পত্রিকায় চণ্ডীদাস-চরিতের মর্দার



મહાત્મા ગાંધી

ইংরাজিতে লিখি। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ পণ্ডিতেরা কিন্তু তাঁহার ছাত্রতা-ব্যাপ গ্রহণ করেন নাই। এবিষয়ে তিনি তাঁহার নিজস্ব মত এবং তাঁহার পক্ষে যাহা কিছু বলিতে পারেন তাহা বলিয়া নিশ্চিত থাকিতেন। বাহ্যদ্বন্দ্বের প্রবৃত্তি হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেন না। প্রতিদ্বন্দ্ব সন্যালোচনাও তাঁহার মতের ভিত্তি নড়িত না। ভবিষ্যৎ পাঠকের হস্তে বিচারের ভার দিয়া তিনি নিবৃত্ত হইতেন।

১৯১৭ হইতে ১৯৪০— রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক দিয়া এই সময়ের গুরুত্ব বুঝি বেশি। বোমেনচন্দ্রকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক দিয়া আমরা পাই নাই। চরকা ও তাঁতের সম্বন্ধে, যখনই প্রচার সম্বন্ধে কিছু তাঁহার চিন্তাও ছিল, তিনি পরীক্ষাও করিতেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প গুনিয়াছি। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—“আপনি তো আমাদের বার্তাপত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, আপনি কি মনে করেন, ইংরেজেরা এসেই থাকিতে আমাদের আদিক উন্নতির কোনো সম্ভাবনা আছে, বাহ্যদ্বন্দ্ব লাভের কোনো উপায় আছে?” ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, “না।” ইহার পর আর কোনোও কথা চলিল না। সরকারী কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, রাধবাংসদেব, নিষ্ঠাবান, বিজ্ঞানসাধকের মূখে এই সর্বাঙ্গীণ অথচ দৃঢ় অভিন্নত পাইয়া সেদিন সন্ধ্যায় ঘুমই ভালো লাগিয়াছিল।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস। আমার আটকবন্দীর মেয়াদ শেষ হইলে আমি গাঁহুড়ায় বাট, কয়েকদিন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে আলোচনা করি। বন্দর ভেঙ্গে পত্র লিখিয়া তিনি আমার শব্দে বাহিরের জগতের বোমেনচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের বাঙালিবিমুখ বঙ্গোপকূলের বেদিনীপুর প্রভৃতি ভেলায় যে ক্ষতি হইয়াছিল তাঁহার প্রতিকার-চিন্তা করিয়া প্রবাসীতে অবিলম্বে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা ভেঙের ভিতরে আমাদের ঘুমই ভালো লাগিয়াছিল। বিজ্ঞানের অহুইলন, অবসরপ্রাপ্ত জীবন, বার্ষিক্য—এসব সম্বন্ধে তিনি বেশের কলাপচিত্রনে ও সেই চিন্তার প্রকাশে স্বল্প তৎপর ছিলেন তাহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। তখন হইতেই মনে হইতেছিল যে বোমেনচন্দ্রের নানাবিধের লেখাগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা পত্র-পত্রিকা পড়িয়া আছে, সেগুলি হইতে বাহিয়া বাহিয়া বিষয়ভেদে প্রকাশ করিলে বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালী পাঠকের সম্পদ বৃদ্ধি করা হইবে। এ কথা তাঁহার নিকটে বলিলাম, তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধের তালিকা দিলেন। তাঁহার পর এই বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার অনেক লেখা তিনি এতদ্বায়ে প্রকাশ করিয়াছেন। কেবলি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত ছিল সেগুলিও নতুন ভাবে সাজানো হইয়াছে। বাঙালী পাঠকেরা তাঁহাদের কথা জানেন। একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরাজিতে লেখাও পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি রচনা একত্র করিয়া পৃথকের আকারে প্রকাশিত করিবার কথা। এই পুস্তক *Ancient Indian Life*— ১৯৪৮ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, এবং তিনি একজন রবীন্দ্রসাহিত্য পুরস্কার পান। ইহাতে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা, পানভোজন, শরৎপ্রভৃতিবিধি, বস্ত্রশিল্প, আয়েবস্ত্র, হিন্দু-পঞ্জিকা, হিন্দু-বিবাহবিধি—এই সকল বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ আছে। অনাথগোপাল সেন শ্রুতি-সমিতির পক্ষ হইতে আমাদের শিক্ষাবিষয়ে তাঁহাকে এক পুস্তিকা লিখিতে বলি; তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার’ নামে ১৯৫০ সালে এক পুস্তিকা রচনা করিয়া পাঠান।

পুস্তিকার প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে, তাঁহার মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পাঠকের চিন্তা করিবার মত অনেক কথাই আছে, তাহা এখনকার প্রচলিত মতের অহঙ্কলই হউক আর প্রতিহিংসাই হউক।

তাঁহার লেখার উপযুক্ত সমালোচনা হয় নাই, তিনি তাহা বুঝিতেন; শুধু প্রশংসায় তাঁহার মন ভরিত না। তাঁহার অনেক মত পাক্যাত্য সমালোচকদের মতের সঙ্গে মিলিত না; এ সেনের বহু বিধান ও পণ্ডিত, বিশেষ করিয়া ঐহারা পাক্যাত্য পণ্ডিতদের নিকটই শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহাদেরও সঙ্গে মিলিত না। অথচ তাঁহার রচনা শিক্ষিত সমাজের সামনে আসে, ইহাও তিনি চাহিতেন।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিশেষ উপাধি দান করিবার ক্ষমতা রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য উপাচার্য ও সংসদের কয়েকজন সমস্ত পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্মান তিনি সমাজের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা কেহ কেহ কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই কথাটা ভুলিয়াছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যে ত্রুটি হইতেছে মনে করিতেছিলাম। কিন্তু যোগেশবাবুর মনে এই কারণে কোনো ভিত্তিকতা ছিল না। ‘আচার্য’ যোগেশচন্দ্র দ্বায় এই কথাতেও তাঁহার একটু আপত্তি ছিল। ‘বিদ্যানিধি’ ও ‘বিজ্ঞানকুণ্ড’ পণ্ডিতসমাজের প্রদত্ত, স্নতরায় গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন, কিন্তু সে সময়ে বাংলা সংবাদপত্রে বিশেষ কোনো উল্লেখ ছিল না বলিয়া তিনি সংকোচ বোধ করিতেন।

এই বাগে বৎসর ধরিয়া সেবিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জ্ঞানর আক্রমণ সবেও জাগ্রত মন লইয়া জানের তপস্বী করিতেছেন। বর্তমান সময়ে এইরূপ জ্ঞানচর্চাই তো অস্বাভাবিক। আহিতাতি যেমন অগ্নি নিরস্তর জ্বালাইয়া রাখেন, তিনিও তেমনিই জ্ঞানাগ্নি নিরস্তর জ্বালাইয়া রাখিতেন— চোখে কম দেখিতেন, কানে কম শুনিতে— নরই বৎসরের কাছাকাছি আসিয়া পড়ে লিখিলেন ‘জ্ঞান আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে’— তথাপি তাঁহার মন ছিল সম্পূর্ণ সমাগ। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বদিনই, রোগের শেষ আক্রমণের দশ ঘণ্টা পূর্বেই হঠাৎ, স্বেচ্ছায় তাঁহার গাফা লাভ করি। গিয়া শুনিলাম কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ হয়, ডাক্তার আসিয়া দুর্বল ঙ্খণিও বলিয়া বেড়ানো পর্যন্ত বহু করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি তখন গাইতে বসিয়াছিলেন, আমরা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খাওয়া হইলে বাহিরে আসিয়া আমাদের বসিতে বলিলেন এবং কেন বাহুড়ায় আসিয়াছি তাহাও জানিতে চাহিলেন। এখন শুনিলাম যে হরিজন-বাগারেই আসিয়াছি, তখন বলিলেন, ‘সমাজে এ ভাব একেবারে instinct-এর মত হয়ে গেছে। সময় লাগবে।’ তাহার পর আমার পিঠে হাত রাখিয়া স্নেহে বলিলেন, ‘পরিশ্রম কম করবে। কার সঙ্গে বাস করছ, জান তো?’ তিনি আমার রক্তচাপের কথা মনে রাখিয়াছিলেন। প্রতি কথাই তাঁহার সমাগ মনের পরিচয়। আমরা এখন চলিয়া আসি, যেখানায় তিনি বাহ্যিক উপর বসিয়া আছেন। তখনও আশা রাখিয়াছিলাম, তাঁহার উপদেশ ও স্নেহ হইতে এত শীঘ্র বঞ্চিত হইব না। কিন্তু বিবাতার বিধান আমাদের অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়।

যোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনকথা

যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিপি বাংলাদেশের একটি শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। তাঁর জীবনের সঙ্গসঙ্গ শতবর্ষের ইতিহাসের দীর্ঘ অধ্যায়টি সমাপ্ত হয়েছে।

সেই প্রায়-শত বর্ষের ইতিহাস তাঁর নিঃস্বের মূখ থেকে শোনার সৌভাগ্যের কথা আর মনে পড়ে। ১৯২২ সালের ৭ অগস্ট তারিখে বাঁকুড়ায় তাঁর মৃত্যু দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রথম কথাই তিনি বলেছিলেন, “আমার বয়স কত জান? বিজ্ঞানকই বংশের নয় মাম।”

তাঁর পর আরো কয়েকটি বছর কেটে গেল। তাঁর শারীরিক বয়স বাড়তে লাগল, কিন্তু সেই মতে তাঁর মানসিক বয়সের কোনো তারতম্য হল ব’লে মনে হল না। কেননা, তাঁর দীপ্তি মননশক্তি ও রচনাশক্তি অব্যাহত যে ছিল, তাঁর প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হতে আদর পেয়েছি। যতই বেখেছি আনন্দে ও বিশ্বের হৃদয়াকর্ষ হতেছি ততই; সেই সঙ্গে সম্ভবত লক্ষিতও হয়েছি। প্রায়-শতাব্দী বৃদ্ধের পক্ষে যা সম্ভব হচ্ছে হয়তো কোনো তরুণ যুবক কিংবা প্রৌঢ়ের পক্ষে ততটা কর্মক্ষমতা সম্ভব নয়।

তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তাঁর পরলোকগমনের কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি মাকে-মাঝে চিঠি লিখতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর হস্তাক্ষর অস্পষ্ট হয়ে আসছে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু চিত্তাশক্তির কোনো দুর্বলতা ধরা যায় নি।

যোগেশচন্দ্র নিজেকে নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, নিজেকে রাষ্ট্র—এবং শেষপর্যন্ত মনীষী—করে পড়ে তুলবার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে অশেষ প্রেরণা পুষ্টিভূত ছিল। সেই প্রেরণা সফল করে তাঁর জীবনের বাত্মা শুক, এবং বাত্মা ধ্বন শেষ হল তখনও তাঁর প্রেরণার সমগ্রটুকু সফল নিঃশেষিত হয় নি। মৃত্যুর পূর্ব বিনয় ও সকালে তিনি লিপিকায়ের সাহায্যে একটি প্রবন্ধ রচনার ও সন্ধ্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব সম্বন্ধে আলোচনার অভিযোজিত করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ধূপের ইতিহাস সম্পর্কে স্মৃতিকথা লেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে— ৩০ জুলাই ১৯৮৬। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ প্রভাত— করোনার প্রদীপে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর জীবনদীপ নিবাপিত হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিকথা লেখার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার স্ববেগ তিনি পেলেন না, সম্ভবত তাঁর স্মৃতিকথা লেখার ভারই অর্পণ করে পেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর।

সময়সীমার কাছ থেকে লক্ষ্য পাওয়া— সে বড় ভাগ্যের কথা। যোগেশচন্দ্র সেই দুর্লভ ভাগ্যে ভাগ্যমস্ত। তাঁর জীবনদীপ-নিবাপের মাত্র কয়েক মাস আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ বাঁকুড়ায় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে অনারারি ডক্টরেট অব লিটারেচার উপাধি দিয়ে এসেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর যোগেশচন্দ্র প্রায়-সময়সীমী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তির মাত্র কয়েক মাস বাকি, যোগেশচন্দ্রের শতবর্ষপূর্তি হতেও বাকি ছিল মাত্র তিন বছর।

১৭৮১ খ্র. ১৮৬৬ বঙ্গাব্দ, ৪ কান্তিক, ইংরেজি ১৮৪২ সালের ২০ অক্টোবর, তারিখে বৃহস্পতিবার হুগলী জেলার আগামবাগের চার মাইল দক্ষিণে দিগুড়া গ্রামে যোগেশচন্দ্রের জন্ম হয়।

নয় বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া করেন। এর পর তাঁর পিতা তাঁকে বাঁকুড়া নিয়ে আসেন, মাস দুই-তিন এখানকার বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়ে এখানকার জেলা ইন্সপেক্টর তাঁর ইংরেজিতে হাতে পড়ি হয়।

এর পর বঙ্গের অক্টোবর মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এই পারিবারিক দুর্গে বাঁকুড়া থেকে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান।

দুর্গে গমনে একা আসেন। বর্ধমান থেকে তাঁদের গ্রামের দিকে ম্যালেরিয়া মহামারী গ্রাম উজাড় করতে করতে এসিয়ে এল। তাঁদের গ্রামও মরণে পরিণত হল। বালক-যোগেশচন্দ্রও এই রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি এই ভয়ংকর রোগের বর্ণনা দিতে দিতে বলেছিলেন, “জীবনের দৃষ্টি বঙ্গবঙ্গের কথা মনে পড়ে না; আমি ঠেঁকে ছিলাম না মরে ছিলাম জানি না। তখন আমার বয়স বারো।”

ক্রমে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া একটু কবল। তিনি বর্ধমান মহারাজার ইন্সপেক্টর জর্জ হলেন, এবং পাঁচ বছর এই বিদ্যালয়ে পড়ে ১৮৭৮ সালে ৭৭ টাকা বৃত্তি পেয়ে এনইন্সপাস করলেন। তার পর হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করে ১৮৭৯ সালে স্নাতক টীকা বৃত্তি পেয়ে এক.এ. পাশ করেন। হুগলী কলেজ থেকেই ১৮৮২ সালে প্রথম বিভাগে বি.এ. এবং ১৮৮৩ সালে বটানিতে দ্বিতীয় বিভাগে এম.এ. পাশ করেন— এই বঙ্গের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই একমাত্র ছাত্র বটানিতে এম.এ. পাশ করেন।

এম.এ. পাশ করার পরই, ১৮৮৩ সালেই, তিনি কটক কলেজে লেকচারার ইন সায়েন্স নিযুক্ত হন। কটক কলেজে তিনি তখন একাই বিভাগের শিক্ষক। কলেজের চারটি শ্রেণী ছাড়াও এম.এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল একজন। একজন ক্লাস নিয়ে এবং এম.এ.-ছাত্রটিকে পড়িয়ে তাঁর বেহ-মন ক্লাস হয়ে পড়ত। যোগেশচন্দ্র এই ছাত্রটি কটক কলেজের প্রথম এম.এ.।

তিন বছর কটক কলেজে কাজ করার পর তিনি কলকাতার মাদ্রাসা কলেজে আসেন। এখানে এসে তিনি সম্ভবত একটু ক্ষতি বোধ করেন। বলেছিলেন, “কটক কলেজে আমি কেবল পড়িয়েছি, নিজে পড়বার-শেখবার সময় পাই নি; মাদ্রাসা কলেজে এসে আমার বোধের অবলম্বন হল। এখানে মাত্র দুটি এক.এ. ক্লাস ছিল, বি.এ. ক্লাস ছিল না। পড়াশুনার আবশ্যক বই ও স্বযোগও এখানে পাওয়া গিয়েছে।”

মাদ্রাসা কলেজে দুই বছর কাটবার পর, মাদ্রাসার কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যোগেশচন্দ্র এই সময় চট্টগ্রাম কলেজে গিয়ে যোগ দেন, কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকতে হয় না, মাস সেকড় পরেই তিনি ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন এবং মাত্র পাঁচ-ছয় মাস এখানে কাজ করেন।

কটক কলেজ থেকে তিন বছর তিনি অহুপস্থিত। তাঁর অহুপস্থিতিকালে সেখানে বিজ্ঞানশিক্ষা অনাস্থত হয়ে পড়ে। এইজন্তে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর তাঁকে পুনরায় কটক কলেজে পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয় বার কটকে গিয়ে তিনি সেখানকার কলেজে একটানা ত্রিশ বঙ্গের কাজ করে ১৯১৩ সালে কাণ্ড থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২০ সালে তিনি ফিরে আসেন বাঁকুড়া। ৭৭ বঙ্গের বয়সে তিনি বাঁকুড়া ভ্রাম্য করেন, অর্ধশতাব্দী

যোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনকথা

বাঘে বাট বংসর বয়সে ঘিরে আসেন সেই বাঁহুড়ায়। সেইদিন থেকে বহুতার দিন পৰ্ব্বত বাঁহুড়াতেই ছিলেন।

ঊর পুত্রো নাম হচ্ছে যোগেশচন্দ্র রায় এম. এ., বিজ্ঞানিধি, বিজ্ঞানভূষণ, এক. আর. এ. এল., এক. আর. এম. এল., রাঘবাঙ্গার। কিন্তু বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য তাঁকে কেবল বিজ্ঞানিধি নামেই চেনে। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিত-সভা তাঁকে 'বিজ্ঞানিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিভীষ বার বার তিনি কটকে ঘান তখন অধ্যাপক জ্যোতির্বিদ চন্দ্রশেখর সিংহ নামেদের সঙ্গে ঊর পরিচয় হয়। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র স্ত্রাবরত্ন পত্রিকা-সংস্কার-বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার টোলের পরিদর্শক ছিলেন তিনি। দেখানেনই তিনি যেতেন সেখানেই পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে পত্রিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। দৈবাৎ তিনি স্তনতে পান যে, উড়িষ্যার এক পার্বত্য ও অঙ্গল রাহো এক ব্যক্তি আছে, তিনি নিজে নাকি গ্রন্থ-লক্ষ্য বেধ করে কী-সব করেন; লোকে বলে তিনি জ্যোতিষী। এই জ্যোতিষী রাজ্যের নাম বগুড়া, কটক থেকে পঞ্চাশ-বাট বাইল দূরে অবস্থিত। এই জ্যোতিষীর নাম চন্দ্রশেখর। তিনি বগুড়ার তৎকালীন রাজার পুত্রতাত ছিলেন, এবং সাধারণ লোকের কাছে পঠানী সান্ত্বনা দিয়ে পরিচিত ছিলেন। রাজার অধমতি ব্যতীত তিনি গড়ের বার হতে পারতেন না। স্ত্রাবরত্ন মহাশয় কমিশনার সাহেবকে দিয়ে রাজার নামে চিঠি দিয়ে পঠানী সান্ত্বকে কটকে আনান।

এই সময় পঠানী সান্ত্বের বিজ্ঞানভার, বিশেষ জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রগাঢ় প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেখে যোগেশচন্দ্র জ্যোতিষের প্রতি আকৃষ্ট হন। পঠানী সান্ত্ব, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর সিংহ, -কৃত সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ সিদ্ধান্ত-স্বর্ণণ: যোগেশচন্দ্রের হাতে আসে। বলেছিলেন, "দৈবক্রমে আমাকে এই বই পড়তে দ্ব্যততে ও সম্পাদন করতে হয়।" সিদ্ধান্তস্বর্ণণ সম্পাদনকালে যোগেশচন্দ্র পঠানী সান্ত্বের জীবনচরিত ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করেন। এর কলে এবেশে ও বিলাতে পঠানী সান্ত্বের অসুত রুতিষের ভূয়সী প্রশংসা হয়। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিতসভা যোগেশচন্দ্রকে বখন 'বিজ্ঞানিধি' উপাধি সেন তখন মানপত্রে তাঁকে চন্দ্রশেখরের আধিকৃত বলে উল্লেখ করেন।

ঊর বালোর জীবন, বিজ্ঞানভের জীবন, বিজ্ঞানানের জীবন শেষ করে ১৯২০ সালে তিনি অবলর বাপনের মত্রে এলেন বাঁহুড়ায়। কিন্তু অবলর নয়, ঊর জীবনের প্রকৃত কাজই অরণ্য হল এই সময় থেকে। প্রকৃতপক্ষে ঊর বিজ্ঞানিধি-জীবনই শুরু হয়ে গেল। দ্ব্যকের উল্লাহ নিয়ে বাট বংসর বয়সের বৃদ্ধ জানায়েষণে বাজা করলেন।

ঊর জ্ঞানচর্চার দীপ্তি বহুপ ১৯২১ সালে তিনি ঊর *Ancient Indian Life* গ্রন্থের মত্রে রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। ঊর পূত্রপার্শ্ব গ্রন্থের মত্রে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে ১৯২২ সালে রাঘপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৪০ সালে সেরোজিনী বহু পদক ও ১৯৪৭ সালে অগস্ত্যগিণী পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৪৫ সালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় অনাবারি ডক্টরেট উপাধি দিয়ে ঊর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

কিন্তু সকল সম্মানের শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি পেয়েছেন ঊর বহুতার মাস কয়েক আগে। যোগেশচন্দ্রের গ্রাঘ-সমবয়সী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঁহুড়ায় গিয়ে ১৯৪৬ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি

দিয়ে এগেছেন। বাকুড়া ক্রিষ্টিয়ান কলেজের অ্যাটেনশন্সি হল বিশেষ সমাবর্তন অঙ্কিত হয়। বাংলায় প্রবীণতম মনোহী ২৭ বৎসর বয়স জ্ঞানভণ্ডারী অ্যাচার্স বোণেশ্বর রাধা বিদ্যানিধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সেলার ডক্টর হরপ্রসূদ্রাধার মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে কলিত হস্তে গ্রহণ করলেন উপাধিপত্র—অনারারি ডক্টরেট অব লিটারেচর।

এই তারিখটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে অস্বীকার্য দিন হয়ে থাকবে; কলকাতা শহরের বাইরে এতদূর সমাবর্তন-অঙ্কন ইতিপূর্বে হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় এই মনোবীকে এইভাবে সম্মানিত করার স্বযোগ পেয়ে নিজেই সম্মানিত হয়েছেন।

বলেছি, তাঁর জীবন ছিল প্রেরণায় পূর্ণ। তিনি ছত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তার মধ্যে যে অল্পকাল সময় পেতেন সেই সময়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন—প্রত্যেক ভাগের ক্ষেত্রে বারোটি বছর। বলেছিলেন, “আমি প্রায় বারো বৎসর বাংলাভাষা চর্চা করেছি, বারো বৎসর স্রোতির্বিদ্যা চর্চা করেছি, আর বারো বছর কেটেছে দেশীয় কলা চর্চায়।”

দ্বীখনকে উদ্বীত করার তাঁর আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই পরিকল্পনার উদ্ভব। বলা যায়, সময়কে হত্যা না করে তিনি সময়কে তাঁর ভূতা করে নিয়েছিলেন। এইক্ষেত্রেই দ্বীখনের প্রতিটি দিন তাঁর কাণ্ডে লেগেছে, এবং এইক্ষেত্রেই তাঁর ভাগ্যে দুর্লভ সম্মান লাভও সম্ভব হয়েছে।

সংকীর্ণ গতির মধ্যে তাঁর মন আবদ্ধ ছিল না। এইক্ষেত্রেই তিনি নানাবিধ বিষয়ে চর্চা করেছেন, এবং প্রথমে বা পুঙ্খকো তাঁর অরিত জ্ঞান বিস্তরণ করে গিয়েছেন।

নব্যভারত পত্রিকায় তাঁর রচনা শুক, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ছিলেন সম্পাদক। দ্বীখন পত্রিকায় ‘নানা কথা’ নাম দিয়ে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে লিখেছেন। প্রবাসী পত্রিকায় স্বল্পকাল থেকে এতে লিখেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়, সাহিত্যে, নবপর্দায় বঙ্গবর্ধনে, ভারতবর্ষে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাসীতেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি।

তাঁর এইসকল রচনার কথা বলতে বলতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “শিখডাম বটে, কিন্তু বাংলাভাষা কখনো শিখি নি, শিখবার অবসর পাই নি। তার পর বাংলাভাষা শিখতে বসি। তারই ফলস্বরূপ ‘বাংলা-ভাষা’ নামে দুই ভাগে বিভক্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলন করি। বাংলাভাষা চর্চা করার সময় দেখি, বাংলা সংস্কৃত ব্যাক্তনাক্ষরের সংস্থার করতে না পারলে এই ভাষা শিক্ষা সম্ভব হবে না। রেখাক্ষর ব্যাক্তনের দ্বিধ বর্জন, সংস্কৃত ব্যাক্তনাক্ষরের আকার-রক্ষণ এখন অনেক প্রেসে চলেছে। আমিই প্রথম ১৯২২ [বঙ্গত, ১৯০৪] সালে এই দ্বন্দ্ব খরিয়ে দিই। আমার শব্দকোষ এইরকম স্বকরে ছাপা হয়েছে।”

বোণেশ্বর রাধের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীমদ্বৈদ্যনাথ বসু মহাশয়ের অভিহিত এই প্রণবে উল্লেখ করা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, তিনি বলেছেন, “এই শব্দকোষ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের এ একটা কীর্তি। এতে কেবল শব্দের অর্থই নেই—এটা আসলে একটা এন্সাইক্লোপিডিয়া।”

যে বিষয়েই বোণেশ্বর চর্চা করেছেন, সেই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি তৃপ্তি পান নি। তাঁর দ্বীখনের এইটাই অঙ্গতম বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষ তাঁর যোগ ছিল অস্বল্প। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ১৩২২ থেকে ১৩৩০, ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২, ১৩৪৫ থেকে ১৩৪৮ ও ১৩৪৯—

যোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনকথা

এই কয় বৎসর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি-পদ এবং ১৩২৭-২৬ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদ অলংকৃত করেন।

এ ছাড়া বিজ্ঞান-পরিষৎ ও উদ্ভিদবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং শেখরীবন পর্বত কটকের উৎকল-সাহিত্যসমাজের বরেন্দ্র সভা ছিলেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বর্ধমান অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখায় সভাপতিত্ব করেন।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সহকারী সভাপতি দাদু ঘননাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাবুড়া শহরে যোগেশচন্দ্রের উন্নয়নভিত্তিক জ্ঞানতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাঁর গুণসুন্দর বংশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সেবাসাগর কাছে তিনি জ্ঞানভাণ্ডার, সভ্যাসুসম্পন্ন শিক্ষাব্রতী, অধ্যায়কর্মী বৈজ্ঞানিক, একমিষ্ট সাহিত্যসেবী-রূপে পরিচিত হয়ে নিজে ধন্ত হয়েছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু বদবেশ এমত্রে নিঃস্বার্থে ধন্ত মনে করে।

শ্রীশীল রায়

যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী

মাল্যঞ্জ

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ। প্রথম ভাগ। সাক্ষাৎ এণ্ড কোম্পানি। শব্দ ১৮২১। ১২০০। পৃ ১১৪।

দ্বিতী। প্রথম খণ্ড। আমাদের জ্যোতিষী : বেদ-মধ্যস্থ জ্যোতিষ; জ্যোতিষ-সংহিতা; জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত; জ্যোতিষ করণ; জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বৈদ্যবৎ; বৈদ্য জ্যোতিষ; ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব; প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল; অপরাপর সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় খণ্ড। আমাদের জ্যোতিষ : পৌরাণিক জ্যোতিষ—ত্রয়োদশ, গ্রহ, নক্ষত্র; প্রাকৃত জ্যোতিষ—পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারাগ্রহ, ধূমকেতু ও উচ্চা, নক্ষত্র, মণ্ডলের উৎপত্তি ও লয়; কলিত জ্যোতিষ—সংহিতা দ্বন্দ্ব, মাতক দ্বন্দ্ব।

১৮১০ খ্রিস্টাব্দে পূর্বে আমার ঘরগা ছিল যে আমাদের সঙ্কট জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্যোতিষ বিধি কিছু নাই। বৈবর্তনে মহামহোপাধ্যায় সানন্দ ঐকান্ত্যের সিংহ বংশধরের সহিত দাখ্যাক্ষর দাঁট। তাঁহার সহিত বহুদিন আমাশেই স্মৃতিতে পারি যে, আমাদের প্রচলিত পত্রিকার মধ্যেই অনেক ত্রুটিসম্পন্ন আছে এবং দুইবৎসর উদ্ভাবনা ও কোম্পানিকের অনুসন্ধানের পূর্ব্বকালের দ্রোণী জ্যোতিষ আপেক্ষা আমাদের জ্যোতিষ কিছুদূর নূন নহে।—আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি ধার্মিক লক্ষণ ইতিহাসে এমন করাই আমার উদ্দেশ্য।—এইকালের কুটিল।

রত্নশরীক্ষা। কেরান্নাথ বহু কর্তৃক প্রকাশিত। শব্দ ১৮২৭। ১২০৪। পৃ ২১৬

দ্বিতী। রত্নশাস্ত্রের ইতিহাস; রত্নগণনা ও রত্নের সান্নাৎ লক্ষণ; মহারত্ন : হীরক, মাণিক্য, সৌগন্ধিক, নীলগন্ধি, নীলমণি, মরকত; স্বল্পরত্ন : বৈদূর্য, পুশ্পরাগ, গোমেধ, বৈক্রান্ত, কর্কটজন, পুশ্ক, ভীষ্মমণি, তুর্গমণি;

উপনয়ন : ক্ষতিকা, রাজাবর্ত, মৃত্যু-জ্যোতীরস, শিবরী, দ্বাদশমণি, ত্রয়মণ, তৈলাখা, শিখফটিক, নীলাক্ষ, স্বর্ণাঙ্গী, স্বর্ধকান্ত, চন্দ্রকান্ত, জলকান্ত, কধিরাখা, নীল, জ্যোতীরস, পিত্ত, গুহব, গুহমন্ত্র, গুহ, পালক, পীলু, অরুণোত্ত, গিরিকান্ত, সত্ত্বক, তুখক, পাবিত্র, কটক ; মৃত্যু : জলি, শম্ব, মৌন, তেজ, সর্প, বরাহ, গজ, বংশ, মেঘ ; প্রবাল ; শম্ব ; ধাতু : স্বর্ণ, রূপা, তাম্র, বহু, ধনন, নীল, শৌহ, শিতল, কাংস্ত, বস্ত্র, বস্ত্রসংঘাত ; রক্তের পরীক্ষা : উপাধান, সংধান, সন্তেজ, বিভব, কঠোরতা, গুহব, স্বাধ গুহ সম্পর্ক, প্রভা, অকৃত্য, বর্ণ, ছায়া। 'স্বরজ্যোতিঃ', তড়িৎ, চূষক, অরিপরীক্ষা, কানপরীক্ষা ; উপসংহার ।

অত্যন্ত বিজ্ঞান যাহাই হউক, রূপকরীক-বিজ্ঞান আবারের শিতাফল কোন আভির্ষ দিকট বন্ধী ছিলেন না। এই গুরুত্ব পুরাতন ও নূতন জ্ঞান গ্রন্থিত করিয়া পুরাতন আখ্যেয় উপর নূতন ধর্মস্থাপন করা গিয়াছে। যখন ইংকে আখ্যেয় পুরাতন রূপান্তর আধুনিক লক্ষণে করাই উদ্দেশ্য...গ্রন্থকারের কৃত্তিকা।

শ"কু নির্মাণ। অর্থাৎ নানাবিধ স্বর্ধবজী-নির্মাণ-বিষয়ক উপদেশ। দাসগুণ কোম্পানি। শক ১৮৩০। পৃ ১২০

হুতীঃ উপক্রম ; পরিভাষা ; স্বর্ধ-বজীর মূলতত্ত্ব ও নাম ; যথারেখা-নির্মাণ : শ"কু ধারা, বিলাতী বজী ধারা, চূষক-শলাকা ধারা, ক্রবভারা ধারা ; স্বর্ধ-বজী-নির্মাণ ও স্থাপন : বিদ্যুৎ-পীঠ, ধরা-পীঠ, সম-পীঠ, বায়োমাত্র-পীঠ, অপগত-পীঠ, উৎ-পীঠ ; কোভূক শ"কু : ধরা-পীঠ ও সম-পীঠ, বিদ্যুৎ-পীঠ ও উৎ-পীঠ, বজ্র-শ"কু, পিঁচ-শ"কু ও সপ্তশ"কু ; পরিশিষ্ট : স্বর্ধনির্মাণ বিষয়ে সংকেত ; সাত্রীণ বিকৃতি : অক্ষাংশ ও দেশান্তর, কাল-সমীকরণ, আদি, ধরাপীঠ যন্ত্রের ঘটারেখান্তরাংশ, ধরাপীঠ যন্ত্রের ঘটারেখান্তরাংশের পূর্ণতা ; সাত্রীণী : অক্ষাংশ ও কলিকাতা হইতে দেশান্তর নির্দিষ্ট, কালসমীকরণ সাত্রীণী, আদি সাত্রীণী, ধরাপীঠ যন্ত্রের ঘটারেখান্তরাংশ সাত্রীণী, ধরাপীঠ যন্ত্রের ঘটারেখান্তরাংশের পূর্ণতা সাত্রীণী ; শব্দার্থ-হুতী।

বিলাতী বজী নির্মাণের পূর্বে বিলাতেও স্বর্ধ-বজী দৈনিক কালবিভাগের একবারে উপায় ছিল। সাধারণে নির্মাণ ও স্থাপন করিতে পারিলে স্বর্ধ-বজী সাহায্যে এক নির্দিষ্ট একটুকু সমস্ত জানিতে পারা যায়। এখানে পূর্বেকারে ভাষ্যটির ব্যবহার অধিক ছিল। যোতিবিরের পূর্বে অত্যন্ত কালসাপেক্ষ হয় থাকিত। তখনো শ"কু-বজ্র স্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত।...শ"কু-বজ্র একমাত্র স্বর্ধ-বজী।...এখানে অন্যান্যসাধ্য এবং শ"কু-বজ্র অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী কতক একরকম স্বর্ধবজীর স্থান তব, নির্মাণ, স্থাপন ব্যবহার বিবৃত হইতেছে।... 'উপক্রম'।

বাংলা ভাষা। প্রথম ভাগ

ইহা তিন অধ্যায়ে স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুই অধ্যায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ধণাক্রমে পঞ্চদশ ও সপ্তদশ ভাগের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় অধ্যায় 'পরিষৎ-গ্রন্থাবলী ৬৮' রূপে প্রকাশিত।

প্রথম অধ্যায়। রাঢ়ের ভাষা। ১৩১৫। পৃ ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়। বাংলা শব্দ-লিপি। ১৩১৭। পৃ ৩৫-১০৬

তৃতীয় অধ্যায়। ব্যাকরণ। ১৩১৯। পৃ ১০৭-২২৬

বাংলা ভাষা। দ্বিতীয় ভাগ, বাংলা শব্দ-কোষ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

চারি খণ্ডে প্রকাশিত। ২-৪ খণ্ডে 'পরিষৎ-গ্রন্থাবলী-সং ৬৮' মুদ্রিত।

প্রথম খণ্ড। ১৩২০। পৃ ২৬৪

যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী

দ্বিতীয় খণ্ড।	পৃ ২৬৪-৪২৮
তৃতীয় খণ্ড।	পৃ ৪২৯-৮০০
চতুর্থ খণ্ড।	পৃ ৮০১-৯৭৯

বাংলা ভাষার বহু বহু সংস্কৃত শব্দ চলিতেছে। বস্তুতঃ বিকল্পিত হীন দাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাংলা সাহিত্যে চলে। যে সকল শব্দ শব্দে সংস্কৃত, উচ্চারণ না হইলেও বাল্যে সংস্কৃত, সে সকল শব্দের নির্দিষ্ট সংস্কৃত শব্দ-কোষ আছে। কিন্তু বাংলা গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থগত বর্চনা, সে সকল শব্দ এই কোষে পাওয়া চাই। তৎকালীন বাংলা ভাষায় এতদধিক যাত্রেয় শব্দের যুগ্মপুঞ্জ-অর্থ-প্রয়োগ-প্রদর্শন এই শব্দকোষের উদ্দেশ্য।—হুলা

সূত্র ও বৃহৎ। [প্রথম খণ্ড] সেন ব্রাদার্স প্রাইণ্ট কোং। বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখ ১০ ডিসেম্বর ১৯১২। পৃ ১১৬

হুটী। সূত্র ও বৃহৎ; কলাগাহ; কবিকল্প চণ্ডী; ডেলেগ দেশ; ফুলের বাগান; কুহাও; ধূলা; খণ্ডগিরি; পথিবীজ; অগ্রিমখন।

সূত্র ও বৃহৎ। দ্বিতীয় খণ্ড। রাণী বিশেষবরী। সান্তাল এণ্ড কোম্পানী। ১৩৩৩। পৃ ৪৬

হুটী। রাণী বিশেষবরী। দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা, বর্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ; ক্ষয় ও মৃত্যু; ইতিহাসের জ্ঞান; স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ; বর পদ; আমাদের দৃষ্টিশক্তি; ১৩০৪ সালের সুমিক্স।

শিক্ষাপ্রকল্প। বিশ্বভারতী। বৈশাখ ১৩২২। পৃ ৭২

হুটী। পাঠশালায় শিক্ষা; শিক্ষার বীজ; মধ্য ও অমধ্য শিক্ষা; দেশে জ্ঞানপ্রচার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার। অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-সমিতি। ১২২০, ভাদ্র ১৩২৭। পৃ ১০০

হুটী। বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা; বিদ্যালয়ের ভাবী মানস-চিত্র; বিশ্ববিদ্যালয়; মহা-বিদ্যালয়, মহা-বিজ্ঞানালয় ও মহা-কলালয়; মহা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিপাটী।

অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ।

পূজাপার্বণ। বিশ্বভারতী। আশ্বিন ১৩২৮। পৃ ১৭৮

হুটী। বোলদাতা; শারদোৎসব; রাগদাতা; সরস্বতীপূজা; বারমাসে তের পার্বণ; জুর্গোৎসব-গ্রন্থ; জুর্জীর্ঘ্য; মহিষমর্দিনী; দুর্গার প্রতিমা; দুর্গাপূজা পরমকালীন রজ; জুর্গোৎসব নববর্ষোৎসব; জুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল; পরিশিষ্ট।

বর্ষীয়-সাহিত্য-পরিষদের রায়প্রাপ্ত গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ।

কোন্ পথে। শুক্লাল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কান্টন ১৩২২। পৃ ১১৬

হুটী। কোন্ পথে; ছোট ও বড়; আমার মালী; কোন্টি চান; অগ্রচিন্তা; আকারের উৎপত্তি ও প্রয়োজন; নবনারীর কর্মভেদ; কল্পদের বিবাহ হবে না?

পৌরাণিক উপাখ্যান। এম্. সি. সরকার আণ্ড সন্স। ভূমিকায় তারিখ মাস ১৩৬১। পৃ ১০২

হুটী। মৃগবহু; পুরাণে সেন; বিষ্ণু বগ্রাহ ও কুর্ষ অবতার; বিষ্ণু বামনাবতার; বিষ্ণু মন্ত্র অবতার; ব্রাহ্মের কৃষ্ণ; পুরাণে চন্দ্র; অগস্ত্যোপাখ্যান; রামোপাখ্যান; ত্রিশঙ্ক উপাখ্যান; ভারতবৃত্তকাল; পরিশিষ্ট; তত্ত্ব।

ধর্মবৈদ। বিশ্বভারতী। ফাল্গুন ১৩৬১

হুটী। প্রভাবনা; অগ্নিপুত্রাণোক্ত ধর্মবৈদ; সময়নীতি; বশিষ্ঠ ধর্মবৈদ; কয়েকটি প্রাচীন অস্ত্র।

বেদের সৈবতা ও কৃত্তিককাল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। চৈত্র ১৩৬১। পৃ ১৪২

হুটী। প্রভাবনা; সরস্বতী; উষা ও উর্ধ্বা; প্রভাতারা; কৃত্তিকাই পূর্বদিকে উদিত হয়; ধর্মবৈদের কাল; ব্রাহ্মণ ও বেদান্ত রচনাকাল; কল্পনী পূর্ণিমা; কল্প; ঋগ্বেদের আদিভা; ইন্দ্র; অশ্বিন; সোম; অগ্নি ও বিশ্বদেব; আর্ষভূমি; পরিশিষ্ট।

"১৯০৬ সালে Astronomical Landmarks in Indian Antiquity এই নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করি। ইহা চারিত্রিক ও বিতর্ক।...এই পুস্তক কোনও কালে প্রকাশিত হইবে কি না, ...সন্দেহ হইতে পারিল। তখন...এখন এখন বিধে লইয়া বাংলায় প্রকাশ করিত ইচ্ছা করিলাম।...এই পুস্তক আমার ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ নহে; ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লিখিত। বৈদিক কৃষ্টির আদিভাগ আমার ইংরেজী পুস্তকের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বেদের সৈবতার পরিচয় এই পুস্তকের মূল্য বিধে;...ইহাতে দেখাইয়াছি, ঋগ্বেদে অস্ত্রতঃ ধন সন্তান বৎসরের পুত্রত্ব বটনার উদ্দেশ্য আছে।"—গ্রন্থকারের ভূমিকা।

কি লিখি। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩। পৃ ২০০

হুটী। কি লিখি; বাংলা ভাষার লিখন ও পঠন; বাংলা শব্দ ও বানান; ইংরেজীর বাংলা; প্রাচীন পুথির সংস্করণ; কবি শব্দক; বাংলা বিরাম্যাদি চিহ্ন; গল্প; পুথানা গল্প; বাংলা ভাষার প্রকার চিন্তা; বাংলা নবলিপি।

ইংরেজি গ্রন্থ

THE FIRST POINT OF ASWINI (The Indian First of Aries). Prabasi Press. 1934. Pp. 16.

Contents. Introduction; The Initial Point; The Vedanga Jyotisha; L of Chitrâ; Conclusion.

ANCIENT INDIAN LIFE. Published by P. R. Sen, Sen Roy & Co. 1948. Pp. 212.

Contents. Life in Ancient India; Food and Drink in Ancient India; Sugar Industry in Ancient India; Textile Industry in Ancient India; Fire-Arms in Ancient India; The Days of the Hindu Calendar; The Eugenics of Hindu Marriage.

বিভাগ-পাঠ্য গ্রন্থ

যোগেশচন্দ্র রায়-লিখিত বিভাগ্যপাঠ্য গ্রন্থগুলি সব সেবিবার স্বযোগ হয় নাই, উহার তালিকা ও প্রকাশ-তারিখ ঐকবীল রায় লিখিত মনীষী-জীবনকথা হইতে গৃহীত। যেগুলি সেবিতে পাওয়া গিয়াছে সেগুলির বিবরণও প্রস্তুত হইল।

যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী

পুস্তকগুলি গতাহুগতিক পাঠ্যগ্রন্থ নহে, তৎকালপ্রচলিত বহু পাঠ্যপুস্তকে তিনি বে-সকল ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার নিরূপনার্থ রচিত; প্রচলিত শিক্ষাবিধির অপূর্ণতা তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করিছেন।

সরল পদার্থ-বিজ্ঞান। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

হুটী। জড়ের বিবরণ; জড়ের সাধারণ গুণ; গতি ও বল; তরঙ্গ পদার্থ; বায়বীয় পদার্থ; বায়ু-ঘটিত যন্ত্রাধি; শব্দ; আলোক; তাপ ও তাপের ক্রিয়া; তাপ-সকালন; চুম্বকত্ব; ঘর্ষণজনিত তাড়িত; রাসায়নিক সংযোগজনিত তাড়িত।

'বালকবিশেষের দ্বারা লিখিত অবিকার্য বিজ্ঞানগ্রন্থে বিজ্ঞান ও ভবতত্ত্বি জ্ঞানিতির প্রতিকার দ্বারা প্রথমতঃ দৃষ্টকরণ লিখিত হয়। পরে এই সকল দৃষ্টকৃত তত্ত্বের প্রমাণকরণ হইবে একটি উদাহরণ কিংবা পরীক্ষা দিয়া তাহা দেখ করা হয়। এই প্রকার প্রমাণী প্রথম দিকানীর শব্দ—অনুপ্রবেশী—একত আনি এই পুস্তকে উক্ত প্রমাণ একেবারে ত্যাগ করিয়াছি। প্রথমতঃ সরল সরল উদাহরণ এবং পরীক্ষা দিয়া অল্পে অল্পে সাধারণ নিয়মে উপনীত হইবারি। এই প্রমাণীতে দিকানীর ভৌতুল ও আত্ম উদীপ্ত হইবার বিশেষ সন্ধাননা।' —ভূমিকা

এই পুস্তকটির অন্তত ছয়টি সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ পুস্তক (দাসগুপ্ত এবং কোং। পৃ ১২৪। ১২৯৬) বকৌ-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে, এই বিবরণ উহা হইতে গৃহীত।

সরল প্রাকৃত ভূগোল। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

সরল রূপায়ন। ১৮৮৮

A PRIMER OF PHYSIOGRAPHY. Indian Depository, 1899. Pp. 118.

Contents: The Air; The Waters of the Ocean; The Land of the Globe; of the Land; The Earth is a Planet.

"My object in writing this little book has been to give our Indian students an elementary knowledge of the general principles of modern Physiography with illustrations drawn from phenomena falling within the scope of their own observation. It is in this last respect that the numerous existing text-books fall short of the requirements."

PRACTICAL CHEMISTRY FOR BEGINNERS. 1910.

সম্পাদিত গ্রন্থ

সিদ্ধান্তবর্ণনা:। মহামহোপাধ্যায়। সামান্য-প্রীমন্ড্রোশ্বর-সিহেন। বিরচিত:।

ঐয়োগেশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত। ইতিহাস ভিগমিটরী। ১৮২১ শক।

যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত ইংরেজি ভূমিকা ('Introduction') পৃ ২-৬৬; সংস্কৃত 'ভূমিকা', পৃ ৬৭-৬৮

পত্রালী। ঐয়োগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। কেমারনাথ বহু কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮২৫ শক। ১২০৩। পৃ ২২৮ হুটী। প্রকৃতি বৈচিত্র্য ১: পান; চন্দ্র; শুকতার; কি খাই, কেন খাই; কাশ; হৃদ; প্রকৃতি বৈচিত্র্য ২: বিজ্ঞতা; অস্বাভাবিক বিজ্ঞানা নহ; ভূগ; কবিতা; অগ্নি কি আধার; কৃষ্ণ ও পর্লত; প্রকৃতি বৈচিত্র্য ৩: ফুল ফুটে কখন; এক দুই তিন; বিজ্ঞানচর্চা বা প্রকৃতি আরাধনা; বিজ্ঞানে মান্তিকতা; শব্দ; চিত্রকলা; স্বপ্ন-ভূগ।

কয়েক কংসর পুর্বে আবার কোন বহুর সহিত এসে সে সাধারণ জ্ঞান বিচার সম্বন্ধে কণাবার্তা হয়। তাহারই কলচ্ছল তিনি পত্রক্ষেপে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া আবার নিকটে প্রেরণ করেন। অবিকাংশ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হিম। তদ মধ্যে ২০ খানি পত্র প্রকাশিত সম্পূর্ণ করিয়া পমালী নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হইল। —বিজ্ঞাপন।

কৃষ্ণপ্রসাদ সেন-বিরচিত চণ্ডীমালা-চরিত। চণ্ডীমালা-চরিত। সংস্কর্তা শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিভাতিমি। প্রবাসী কার্যালয়। ১৩৪৪। পৃ ২৩৬

যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত কৃমিকা ('সংস্করণের বিজ্ঞাপন'), পৃ ১-৪

যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অধুনা-প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত অন্ত্রগুলি সঙ্কলিত নহে। এই ত্রুটিপা গ্রন্থগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রাপনাগ লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি রামমোহন লাইব্রেরি এবং শ্রীপ্রিয়রতন সেন মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে পুই।

সাময়িক পত্র প্রকাশিত রচনা

বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীতে আচার্য যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার সূচী সংকলিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

ব্রহ্মসম্মাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'পরিষৎ-পরিচয়' গ্রন্থে (কালান ১৩৫৬) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১-৫৬ বর্ষ) প্রকাশিত বাবতীয় রচনার একটি বিবৃদ্ধকর্ম তালিকা প্রকাশিত হয়— এই তালিকায় দেবা দায়, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান (সাধারণ), বিজ্ঞান (পরিভাষা) ইত্যাদি প্রায় সকল বিভাগেই আচার্য যোগেশচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবাসী পত্রে পকাশ বঙ্গের ধরিয়া প্রকাশিত তাঁহার বিভিন্নবিষয়ক রচনার তালিকা প্রবাসী ভাস্র ১৩৬০ সংখ্যায় সংকলিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী পত্রিকায় বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০ সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়াছিলেন।

শ্রীজগদীন্দ্র ভৌমিক

গ্রন্থপরিচয়

বাংলা সাহিত্যের নবন্যারী। ঐগ্রন্থনাথ বিষ্ণু। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য আড়াই টাকা।

ছোট ছোট প্রবন্ধের বই। স্তূপীপত্র উপটে দেখলে মনে হয় গ্রন্থবাবু বাংলা সাহিত্যের চম্পিগণি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত চরিত্রের ছবি একেছেন তুলির ছোট ছোট আঁচড়ে। ঐক্লমকর্তাদের রাগা হতে আরম্ভ করে মুকুন্দরামের আঁড়ন ও ফুরা, ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী, টেকচাঁদের ঠকচাচা, মাইকেলের রাবণ, প্রবীলা এবং নবাবাবু, দীনবন্ধু মিত্রের কাঞ্চন, বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী মনোরমা ইত্যাদি, রবীন্দ্রনাথের সেবদানী মালিনী ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতি, মাধ পরভরামের ঐমং শ্রাবানন্দ ব্রহ্মচারী। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করাই চমকে যেতে হয়। ছোট ছোট প্রবন্ধ, কিন্তু যে পরিমাণে ছোট সেই পরিমাণে গভীর এবং অন্তঃসঙ্গারী। সাহিত্যিকের মেজাজ, সমাজস্বাধীন দৃষ্টি এবং অভ্যন্তর শক্তিশালী কলমের সংহত সমন্বয়। এই স্তূপ পরিণয়ে এক-একটি স্বরপ্রগারী ছবির সৃষ্টি। লেখক কল্পিত্রের পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই।

যেমন, ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী। গ্রন্থবাবু লিখেছেন, “ভারতচন্দ্রের মানসিংহ ও ভবানন্দ রচনা বাহ্যিক ভাষায় কাহিনীর বাহন। বিস্তারিত ও হৃদয় বর্ণনা মাত্র। বাক্য-অলংকারে এবং স্বর্ণ-অলংকারে তাৎপার্য্য এমন ভারগ্রস্ত যে নড়িতেও অক্ষম। ভবানন্দ ও মানসিংহ তবু নড়িত চড়িত। কেবল হীরাকে বিশ্বাস করিতে হইলে কাহাণী সাক্ষ্যের আবশ্যক হয় না; সে শুধু স্বতঃনয়, স্বদৃষ্টি। ভারতচন্দ্রের আগে হইতেই সে ছিল, কবি তাহাকে উন্নীলিত করিয়া দিয়াছেন। হীরা মালিনী নিত্যন্তই *tour de force*.” হীরা মালিনীর অত্যন্ত চমৎকার চরিত্রচিত্রণ। অথবা ঠকচাচা সম্বন্ধে লেখকের অস্থূল নির্দেশ—“হুনিয়া লাভ্য নয়, মুই একা লাভ্য। হরে কি করবো? আমাদের অধিকাংশেরই ঐ কথা। ঐ সামান্ত বহুপথে লগ্নার কীর্তিনামার স্রোতে ভাসিয়া ঘাইতেছে।” একটি মন্তব্যেই সমস্ত চিত্রটি, সমাজের নেকিভেদিক-সম্মত, সামগ্রিক গভীরতাও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রাবণ সম্বন্ধে লেখকের আলোচনাটি বড়ই মনোজ্ঞ। প্রথমেই তিনি দেখিয়েছেন, অটল গভীর রাবণ-চরিত্রের উজ্জ্বলশিবিরে মতো মল্লোচ্চতা এবং একাকিত্ব। যাহা আর আঘাত। যেখানেই আর দস্ত।—

“অতলশর্পী শোকেয় গৌরবে ত্রিবিবিজয়ী রাবণ একপ্রকার বাহ্যিক লাভ করিয়াছে—সমুদ্রোপকূলবর্তী তরলভিষাক-অভিষিক্ত বহীধর বেদন স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে উচ্চতর। স্বাভাবিক অটলতার চেয়ে অটলতর মনে হয়, অনেকট। তেমনি। তার উপরে অন্তর্গামী স্বর্ষ বদন আবার বেদনার আঘেয় কীরট পরাইয়া দেয় তখন আর তাহাকে পৌকিক বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় কোন্ স্বাং-কীরটিট অদৌকিক মহিমা মানব-নরনের সার্থকতা সাধনের উদ্দেশ্যে স্বপকালের অস্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেবা দিয়াছে।”

কিন্তু শুধু তাই নয়। লেখক, যিহীতঃ, দেখিয়েছেন, মাইকেলের রাবণ প্রাথমিক শক্তির (elemental force) সৃষ্টি। “প্রাকৃতশক্তি যেমন এখনো বাবে বাবে একটা আঘট। গিরিচূড়া ঠেলিয়া বাড়া করিয়া দেয়, একটা আঘট। উপসাগর অকস্মাৎ খনন করিয়া সেবার, রাবণ-চরিত্র তেমনি প্রাকৃত শক্তির একটা কাণ্ড — লবণাযুজিত দুর্ঘর্ষ গিরিচূড়ার দ্বাৰ সে দগাধমান। বাংলা সাহিত্যে যেমনাধরামের রাবণ ব্যতীত প্রাকৃত চরিত্র তো দেখি না।” তৃতীতঃ লেখক দেখিয়েছেন তৎকালীন সামাজিক উপদ্রব মাইকেলের

যনে যে সংঘাত ঘটবেছিল রাবণ ভারই সৃষ্টি— “ইন্দ্রাজি-শিক্ষিতের প্রতিনিধিরূপে মাইকেল রাবণ চরিত্র ঢালাই করিয়াছিলেন। মাইকেল মুখে অর্ণলম্বা বলিলেও মনে মনে ইংলণ্ডের কথাই ভাবিতেন। বান্দ্রীকির পরে অনেক ভারতীয় কবি রাবায়ণ-কাহিনী লিখিয়াছে— কিন্তু মাইকেলের কাব্যের সঙ্গে তাৎপরের তুলনাত প্রভেদ এই যে, তাহারা কেহই রাবণের অধর্ষন করে নাই। মাইকেল প্রথমে রাবণের অধর্ষন করিয়া উঠিলেন।” কিন্তু এই তৎকালিক ছায়াপাত সবেও রাবণ যে সার্বকালিক হয়ে উঠেছে তার কারণ, “মাইকেল রাবণের মহিমার সহিত অপর একটি উপাদান মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেটি অপরিবেশ বেননা। সেই বেননার আলাতেই রাবণ আজ আমাদের সমবেদনার পাত্র, আমাদের সঙ্গোত্র। আজ ইন্দ্রাজি শিক্ষার মোহ অপরূপ, ইন্দ্রাজি-শাসনের ব্যর্থতাই আজ শুধু বিজ্ঞান। মহিমার অত্যাচ্ছ চূড়ায় আসীন হইয়াও পার্শ্ববর্তী স্বপ্নভীর খাদটাই কেবল রাবণের চোখে পড়িয়াছে। এত ঐশ্বর্য, এত প্রতাপ সবেও সর্বনাশ যে কেন নষ্ট: নষ্ট: নিকটবর্তী হইতেছে সে বুঝিতেই পারে নাই— তাই সে প্রত্যেকটি বিপৎপাতের পরে এই মর্মে খেলোক্তি করিয়াছে— কি পাশে শিখিলা এ পীড়া ধাক্ক বিধি রাবণের ভালো? এইখানেই মাইকেলের স্বার্থ কবি-দৃষ্টি, ইহাতেই তাহার ভবিষ্যৎ-দর্শনের পরিচয়। তিনি সেকালে বসিয়া দুর্কালকে, তাহাদের সময় হটতে আমাদের সময়কে, ইন্দ্রাজি-শাসনের প্রারম্ভ হইতে তাহার উপসংহারকে, বাঙালি-সমাজের উন্নতির স্বপ্ননা হইতে তদীয় অবনতির স্বপ্নপাতকে যেন খেলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর সেইজন্যই রাবণের চরিত্রে ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিদ্যাদকে, প্রতাপের সঙ্গে নৈরাশ্রকে, সমস্তের সঙ্গে সঙ্কল্প খেলোক্তিক মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এ-ধেন বিধন উপাদানে গঠিত বলিয়াই রাবণ দুটি অসমকালের প্রতীক হইতে পারিয়াছে, রাবণ সেকালেরও প্রতিনিধি, একালেরও বটে।” এমনি অল্পম সময় ও গভীর মনব্যো বইখানা উদয়। সাহিত্যসমীক্ষকরা পড়ে আনন্দ পাবেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

ডাকের চিঠি। শ্রীপতপতি ভট্টাচার্য। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা। দ্বা. আড়াই টাকা

ডাকের চিঠিগুলি পড়ে অধি মনটা খুঁতখুঁত করিতে থাকে, কারণ উনত্রিশখানি নাতিস্থত চিঠি মনোযোগ সহকারে আগাগোড়া পাঠ করিলেও, যে প্রিয়জনদের উদ্দেশে সেগুলি লিখিত, সে বাস্তবই হোক অথবা কাল্পনিকই হোক, তার নাগাল পাওয়া যায় না। আর অল্প পড়লেখকের এত উৎকর্ষ। এত আগ্রহ, সে যে কেমনখায়া মানুষ সে কথা যুগাক্ষরেও জানা যায় না। মনে হয় যে কোনো রূপসী নারীই হবে বা, নিশ্চয়ই তার গুণেরও অল্প নেই, খামখেয়ালীও বটে, সেইজন্য চিঠিগুলিতে ব্যাকুলতার সঙ্গে একটা অস্তিত্বের সাবধানী আড়ষ্টভাবও দেখা যায়। যে লিখছে সে নিজের মনকে জানলেও, যাকে লিখছে তার সম্বন্ধেও যেন একটু নিশ্চয়তার অভাব, মনে হয়। তাই স্থানে স্থানে চিঠিগুলিকে মনের কথার আদানপ্রদানের বাহন হিসাবে কিংবা অযোগ্য বলে বোধ হয়। চিঠি হিসাবে অলপ হলোও, কাহিনী হিসাবে বইখানির অনেক গুণ আছে। যে মানুষটি চিঠি লিখছে তার একটা স্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে। একটি জাবুক ছেলেকে চাকরির খাতিরে বাড়ির ছেড়ে কিছুদিন সম্ভবতঃ বীরভূম-বাহাড়া অঞ্চলে বাস করত

গ্রন্থপরিচয়

হয়, তারই একটা নরন হিষ্টি গল্প। কাহিনীর পরিবেশেরও একটা চিত্রাকর্ষক রূপ ফুটে ওঠে। শুকনো কক মাটি কিন্তু ভারী উর্বরা, ভাল খেজুরের গাছের সারি, শীতকালে সেখানে মেলা বসে, বাড়িলা গান গায়, ছেলেরা বসে ভেলে-ভাঝা কিনে খায়।

বর্ষায় অলে পথঘাট পিছল হয়ে যায়, ঘোঁটারগাড়ি বিপদে পড়ে; মেলা ফুল কোটে; দাঁড়তাল মেয়ে কালো চুলে ফুল গুঁজে বেড়াতে যায়।

যে সব মানুষদের বিষয় চিঠিতে লেখা হয়, তারা সবও জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। গরিব মুসলমান বৌ ছেলে হবার সময় অচেনা হাসপাতালে যেতে রাজী হয় না।

ঘাঘার ডিপারি এর বাড়ি ওর বাড়ি গেছে বেড়াবে তবু তার মান-অপমানজ্ঞান হারাবে না। ঘাবলঘী বুড়োর এক শ বছরের বেশি বয়স, তবু ছেলের কাছে হাত পাতবে না; আহত ডাকাত মর্যাদিক বয়সায় হাসপাতালে পড়ে থাকবে, তবু নিজের পরিচয় বেবে না; ছোট ভাই হঠাৎ রেগে বড় ভাইকে প্রাধ খুন করে কেলবে, তবু তার ক্ষমা হবে; ঘর বাড়ি নেই, তবু বাড়ল তার সব কটি পয়সা নিয়ে ফুলের মালা কিনে থাকে-তাকে বিলিয়ে দেবে; সব ছেড়ে দিয়ে যে-ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে মাহুঘটা জীবন কাটাতে, হঠাৎ একদিন বলা নেই কওয়া নেই, তাকেও ফেলে নিকদেপ হয়ে থাকে। সব কিছুই মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠ মনুষ্যব্দের আদর্শ ফুটে উঠেছে যে লেখককে অভিনন্দন না করে পারছি না। তবে চিঠিপত্রগুলির সবস্বয়ী উদ্দেশ্যটিকে একেবারে উচ্চ রাখাটা ভালো হয় নি। মাহুঘটার যেটুকু প্রকাশ পায় তাও আনন্দের পছন্দ হয় না। চিঠির উত্তর প্রায়ই দেয় না, হঠাৎ এসে ছেঁড়া চেহায়ে বসে আবার চলে যায়, কিছু পায় না বশেও মনে হয় না। এবং সব চেয়ে বেশি অ-স্বমনীয় যেটা সে হল যে ঐ মেয়ে কি বলে এই বকন নৈর্যাত্তিক উচ্ছ্বাসে ভরা, থেকে থেকে স্বদীর্ঘ সার্মন-বিশিষ্ট, এবং সম্ভবত: তৃতীয় ব্যক্তি পড়বে আশা ক'রে যতি গড়ক ভাষায় লিখিত চিঠিগুলির অবিরাম প্রোডকে গোড়াতেই নির্দম হাতে রোধ করে বেগ নি।

হালকা মেয়ের মেলা। সম্পাদক শ্রীল্যাংকুমার দাশগুপ্ত। পুস্তক প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

বইখানির মলাটের উপর পালকের মত আঁকিবুঁকি এবং নামকরণের বালহলভ কবির বেখে গোড়াতে মনটা কিংকিৎ বিন্দ্ব হয়ে পড়লেও, প্রবন্ধসংগ্রহখানি এতই প্রশংসনীয় যে শেষ পর্যন্ত খুশি না হয়ে উপায় নেই। বাস্তবিক এত ভালো প্রবন্ধসংকলন সচরাচর চোখে পড়ে না, সম্পাদক মহাশয় যত্ন বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধসংগ্রহের কৃমিকাটি তদন্তরূপ হয় নি। বরং কৃমিকা না থাকলেই ছিল ভালো, রচনাগুলি আপনাবাই আপনাব্যয়ের পরিচয় দিত।

সম্পাদক মহাশয় নিজে বই-এর নাম রেখেছেন "হালকা মেয়ের মেলা," অথচ তিনি যে কেন "রম্যরচনা" শব্দের প্রতি এতই বিমূহ যে লেখক প্রতিপন্ন কয়বার অন্ত গোটা একটা অধ্যায় রচনা করতে হল, এ কথা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় না। ফরাসী Belles Lettres (বেল্ লেত্ৰ্জ্) -এর অম্ববাদ রম্যরচনাই হোক অথবা ললিতলিপিরই হোক, এইটুকু সংজ্ঞাই বোঝা যায় যে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল লেখকগণে মাহুঘকে খুশি করা। ঐ যে চিত্রায়োগের উচ্ছল স্বচরিত্রবোধের কথা সম্পাদক বলেছেন, ওসব নিয়ে হালকা না করে, বাক্যারম্ভের রঙিন কাচগুলি দিয়েও মাহুঘকে খুশি করা যায়। যদি লেখক থাকে

অস্বল্পতা। এবং এই ধরনের প্রবন্ধের মাধুর্য়ই সেইখানে। বুদ্ধদেব বহু "খাজা", কিংবা জ্যোতির্বিদ্য রায়ের "কড়া", কিংবা বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "গীত" নামক প্রবন্ধের এতখানি প্রশংসণ আছে যে তাদের কোনো গভীর চিন্তার প্রয়োজন থাকে না।

কৃত্রিম সৃষ্টির আরেকটি কথাও বলতে হয়। পঞ্চসাহিত্যের মধ্যে প্রবন্ধই যে সর্বাগ্রে রচিত হয়েছিল এ কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। তবে হয়তো সর্বাগ্রে লিখিত হয়ে থাকা অসম্ভব নয়। পদ্ম মনে রাখা সহজ, গল্পও মাহুকের মনে থাকে, কিন্তু ভালো প্রবন্ধকে আশু লিপিবদ্ধ না করলে তার লোপ পাবার আশঙ্কা আছে। রচনার বিধি বিধে সেখতে গেলে এ কথা নিকিস্তে বলা চলে যে প্রবন্ধের পূর্বে গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং টেকসান ঠাকুর অল্পগ্রহণ করবারও অনেক পূর্বে বাংলাদেশের ছেলেবুড়ো বেঘলার দুঃখে কাঁদত।

প্রবন্ধ শেষোক্ত লেখকদের পরিচিতিটুকুর দ্বারা অনেকখানি, যদিও কৃত্রিমাকারে তাঁদের লেখার সনালোচনাটা বার বিলেও চলত।

প্রবন্ধগুলির কোন্টি ছেড়ে কোন্টির প্রশংসা করব ভেবে পাই না। ১৮৮২ সালে লেখা রাজনারায়ণ বহুর "জ্যোতানো"কেই প্রথম পুরস্কার দেয়, না ১৯০০ সালে নন্দগোপাল সেনগুপ্তর "বই-হানানো"কে? অবনীবাবুর 'দুর্ভিক্ষ'ও কম যায় না, তবে ওটি প্রবন্ধ নয়, স্বেচ্ছা গল্প। এবং অতি উদ্বোধনের গল্প।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এ বইখানি পাঠাগারে রাখবার, বন্ধকে উপহার দেবার, সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার এবং বাড়-বাড় পাঠ করে বন ভালো করবার মতো একখানি বই।

এই ধরনের সাহিত্য শুকনো প্রাণে রস জোগায়, ঘরোয়া জিনিসকে অপরূপ করে তোলে। এর সঙ্গে কবোয় সাদৃশ্য আছে, এবং এ জিনিস রচনা করতে হলে কবির দিব্যচকুর দরকার হয়।

শেষ পর্যন্ত এই ভেবে অবাক হতে হয় যে ১৮৮২ সালে রচিত 'জ্যোতানো' নামক প্রবন্ধটিকে তো কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে নি। তবে পূর্বের আলোরও জো প্রগতি হয় না। ভাগ্যিস হয় না।

লীলা মজুমদার

ਸ਼ੁਰੂਆਤ

দে-তক্ষীখানি ভাঙ্গালে দুখনে আঁঠি, হে নবীন সংসারী ।
কাণ্ডারী কোরে ঠাছারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী ॥
কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পায় বিরামনিহীন
জন্মজন্ম আঁঠি তিনি দিন প্রদামপন সকারি ।
নিষ্ঠো নিষ্ঠো চিরজীবনপাথর, তরি নিষ্ঠো ওতী কল্যাণে ।
হুখে হুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, ঘেরো অমৃতের সন্ধান ।
বাঁধা নাহি থেকো আশলে আবেশে, কড়ে কঙ্কর চলে বেয়ে। হেলে,
তোমাদের প্রেম দিয়ে দেশে দেশে, কিষের মাঝে বিস্তারি ।

କଥା ଓ ସୂତ୍ର ଋଷୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

શ્રવણિણિ : શ્રીમતી રેન્નિરામદેવી ડોધુરાની

II সা সা সা গা গা গম্বা পা পা না পা I
 যে ত র কী খা নিঃ ডা লা লে হ

I ମା ମା ମା । ମା ନନ୍ଦା ନା -ଧନମା ମନା । ମା
ଆ ତ୍ରି ହେ ନ ବୌ० ମ ००୬ ମା० ରୌ

I পা - ধা ^১র্দা গা গা বধা পা পধা পা । মা গা -১
কা নু ডা রী কো য়ো• ঠা হা• রে তা হা ব

I १गा गा गा गमा गमपा मा गमा -रा गा १सा
 बि नि ए ड० बे०० र क० न् डा री

II (ग) मा -पा पा । ना ना -धनर्मा र्मा र्मा र्मा र्मा र्मा -। I
का ल पा वा वा ००३ पि मि छि व० मि न

I "সাঁ সাঁ সাঁ -। সঁসঁসাঁ -। ননা -নধা পা । "নধসাঁ না -। I
ক রি ছে ন পা.. বু বিরা .. ঘ বি.. হী ন

I गी गी गी गीर्वा -गी गीर्वा गी गी गीर्वा गी - I
 ७ ७ ७ वा. व. वा. वि वि नि. नि न

I সী সী সী । সী নরী
প্র গা ব প ব০

নরী -ধা না পী
স০ নু চা ত্রি

I গা গা গা গম্মা গম্পা মা
ষি নি এ ড০ বে০০ র

গম্মা -রা গা সী II
কা০ নু ডা রী

II { সী সী সী সপা পা পা
নি হো নি হো০ চি র

পা পা পা পধা পম্মা গম্মা I
জী ব ন পা০ ধো০ ব০

I পা ধা গা ধবর্মা গা গধা
ড ত্রি নি হো০ ড রী০

পধা -ম্পা মা I
ক০ ০০ ল্যা

I সী গা গা গা গা গরা গা
হু খে হু খে শো০ কে

মা সী মা গা গরা গা I
জী ধা রে আ লো০ কে

I সী গা গা গা গম্মা গম্পা মা
খে হো অ ব০ ডে০০ র

গম্মা সী -১ -১ } I
স০ নে ০

I { [পা] ম্পা -১ পা । সী না না নরী
ধাধা ০ না হি বে কো০

সী নরী সী সী সী }
আ স০০ সে আ বে সে

I সী সী সী । -১ সী সী
ক ডে ক নু কা০০

ননা -নধা পা সী সী সী } I
চলে ০০ বে হো০ ০০০ সে

I সী সী সী । -১ সী সী -১
তো মা সে ব প্রে০০ নু

সী সী সী সী সী
দি০ হো বে ০০০ দে শো০

I সী -নরী সী । সী সী সী ।
বি ০০০ বে র মা রে

নরী -ধা না সী
বি০ নু ডা ত্রি

I গা গা গা গম্মা গম্পা মা ।
ষি নি এ ড০ বে০০ র

গম্মা -রা গা । সী -১ -১ II II
কা০ নু ডা রী ০ ০



বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩

সম্পাদক ঐপুলিনবিহারী সেন

বিষয়সূচী

মৃত্যুশোক

রবীন্দ্রস্মৃতি

রোজবা দেশে

সংগীতসারসংগ্রহ ৮.

বুদ্ধিমত্তার দারুণ সংস্কৃতি ✓

দল

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

মিস্ত্রালের কবিতার অলংকার

মুহুম্মদাবের বেশভ্যাগকাল

বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি ✓

এমপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

ঐমুনোভিসুয়ার চট্টোপাধ্যায়

ঐরায়চন্দ্র মিত্র

ঐভবতোষ দত্ত

ঐঅশোকবিহারী রায়

ঐচিত্তবরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐঅমিত দত্ত

ঐমল্লিকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ঐহুমায় সেন

ঐশশিতৃৎন দাশগুপ্ত

ঐঅমিত দত্ত

ঐপ্রবন্ধনাথ বিশ্ব

ঐদগুনাথ গুপ্ত

চিত্রসূচী

বীণা-বাদিনী

সারিন্দা-বাদক

রোজবা দেশের শিল্পকলা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

ঐনন্দলাল বহু

ঐনন্দলাল বহু

হরিশ্চন্দ্র-চিত্রের রক এনাবার সৌন্দর্য

মূল্য এক টাকা



ବୀণା-ବାଦିନୀ
 ଛବିପୁସ୍ତକ ମଡ଼ : ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ୨୫
 ୨୦୦୦



মৃত্যুশোক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনে যে ব্যক্তি কোনো বড় দুঃখ পেয়েছে অথচ সেই দুঃখের দ্বারা যে কোনো সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পায়নি, অগতঃ দ্বার কোনো অধিকার বেড়ে যায়নি, সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য কেননা সে মূল্য দিয়েছে, অথচ সেই মূল্যের পরিবর্তে তার বা প্রাপ্য সেইটি সে গ্রহণ করল না, ফলে রেখে গেল। দুঃখ তার পক্ষে কেবল মাত্র দুঃখই, কেবল মাত্র ক্ষতি।

আমাদের কাছে জীবনের যেমন দাবী আছে, মৃত্যুরও তেমন দাবী আছে। যাদের আমরা ভালবাসি তারা দ্ব্যতন বেঁচে থাকে ততদিন আমরা তাদের সেবা করি, সেই সেবার অর্থই ত্যাগ করা, নিজের দুঃখ নিজের আরাধকে ত্যাগ করে আনন্ডিত হওয়া। এমনি করে জীবিত প্রি়ত্বনের অন্ত আমরা প্রতিদিন নিঃশেষে নিয়ে গর্হ করি; এইরূপে জীবন যেমন আমাদের কাছে প্রতিদিন অন্ন অন্ন করে ত্যাগ গ্রহণ করে, মৃত্যু তেমনই আমাদের কাছ থেকে লক্ষণের চেয়ে বড় ত্যাগ একেবারে গ্রহণ করে—চরম ত্যাগ, প্রেমের সর্ব্ববিধ বিগড়ন। জীবনে আমরা বা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করি, উৎসর্গ করি, তা যদি আমাদের প্রি়ত্বনের মঙ্গলের কারণ হয়, তবে তার মৃত্যু উপলক্ষে আমরা যে এত লাভ একেবারে বিদগ্ধন করি সে কি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে? ব্যর্থ হয় যদি এর সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধ ঘটে।

যদি এমন কথা বলতে পারি যে আমার বা গেল সে আমি তোমার মতই উৎসর্গ করলুম, আমার এই দুঃখে আমার এই মানে তোমার মঙ্গল হোক—আমি কিছুই চানিনি করতে চাইনে, তুমি যে কাহারো মৃত্যুশোক পাব হতে বাজা করচ, সেই কাহারো তোমার মঙ্গলে আমার বা কিছু হুণ বা কিছু ইচ্ছা সমস্ত সাজিয়ে নিলুম, তোমার দ্বারা মঙ্গল হোক, তোমার গতিপথে কোনো বাধা না থাক, তোমার পক্ষে যা পরম প্রতিষ্ঠা, বা চরম শ্রেয়, তাই যেন সম্পূর্ণ হয়, আমার ব্যর্থ মনিকা, আমার বিরোধ, আমার পঙ্গতে আহ্বান যেন তাকে কিছুমাত্র ভাগ্যক্রান্ত না করে—এমন কথা যদি অন্ধুর শুভ কামনা, যদি পরিপূর্ণ প্রেমে বলতে পারি তবে তা আমার পক্ষে এবং তার পক্ষে কখনই বুঝা হতে পারে না।

এমন করে বলতে পারার একটা প্রয়োজন আছে। থাকে ভালবাসি, দ্বার মঙ্গল কামনা করি, তার শেষ মঙ্গল কামনা এমনি করেই করতে হয়—এই হচ্ছে প্রেমের শেষ দান, এই হচ্ছে প্রেমের শেষ পরীক্ষা। যে প্রেম মৃত্যুর কাছে আপনাকে এমনি করে দান করতে পারে, সেই প্রেম মৃত্যুর দ্বারাই অক্ষয় পরিপূর্ণতা লাভ করে। চরম ত্যাগই প্রেমের চরম সার্থকতা। এই ত্যাগের দ্বারা শুধু মঙ্গল হোক, একথা

নব, সমস্ত মধুময় হোক, প্রেম মুক্তি লাভ করে অনন্তের মধ্যে বাগ্প হোক, সিন মধুময় হোক, রাশি মধুময় হোক, পৃথিবীর আলোক মধুময় হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হয়ে উঠুক। বায়ু মধু বহন করচে, সমুদ্র মধু করণ করচে, এই কথা ঘোষণা করে আমাদের আশ্বের ময় উচ্চারিত হয়। মধু বাতা স্বতঃস্বেচ্ছা মধু কর্ত্তি সিদ্ধিঃ।

মৃত্যুকে সত্য বলে মানুষ্যের যে ভয় হয় সেই ভয়ে এই ময় একেবারে দূর করতে চায়। অগন্তের মাধুর্যের কোথাও পেশবাত্রি কথ হুগনি—সমগ্রই মধুময় হয়ে আছে—এ যখন দেখা যাচ্ছে তখন মৃত্যুও এই মাধুর্যের ছন্দ রচনা করচে। ছন্দে মতো যে ভক্তি পড়ে সে ত ছন্দকে বাধা বেধার অগ্ন ময়, ছন্দকে বহন করার প্রকৃতি। মৃত্যুও অগন্তের মাধুর্যকে বাধা নিচ্ছেনা, তাকে বহন করচে। মৃত্যুর পূর্বে যে মধু ছিল, মৃত্যুর পরেও সে মধু অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সেই মধুকেই আমরা সর্বত্র দেখ, সর্বত্র আশ্রয় কর—যাকে এক জায়গায় বিশেষ করে অন্তে তাকেই সব জায়গায় জান—অনন্ত মাধুর্যের মধ্যে তোমার প্রেমের মুক্তি হোক। [১৯১০]

শান্তিনিকেতনের আন্তর হার্ম শ্রীঅরবিন্দবোহন বহর তদ্বিনীতিযোগে

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরে ঘাঘের কাছে অপেক্ষা করলেও তার অস্ত্রে মন প্রস্তুত হয় না। প্রত্যক্ষ হলেও আমাদের গ্রাণ তাকে প্রতিবাদ করে। কিন্তু হার মানতেই হয়। হার মানার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনে আসে, যে মৃত্যু কেবল যে অপহরণ করে তা নয়, মৃত্যু জীবনের স্ফূর্তি। জীবনের অনেক সম্পদ বেগতে পাইনে তার নিজের আলোর মধ্যে মৃত্যুর কাশো পটের উপর তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হার কোনো মূল্য দিই নি তারও মূল্য ধরা পড়ে, যা ছোটো বলে কোণে পড়ে ছিল তাও দেখি ছোটো নয়। তখন প্রাণসেবতাকে এই বলে প্রদান করি তোমার প্রতিমূর্ত্তের দান আমাকে ধন করেছে, তার বিচ্ছেদে যে শোক করি এতেও প্রদান করি সে আমার কৃতগামি। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে কিছুই তার বর্ষ হয় নি, তার মধ্যে সত্য যা তা রয়ে গেছে। হারানোটাতেই বড়ো করে দেন না জানি, পেয়েছিলুম এইটেই বড়ো, সকল হারানোর উপরে সে থাকে। বিচ্ছেদের শোককে কোনো সাধুনাই দূর করতে পারে না, কেন না সেই শোক আমাদের অর্থা, জীবনের মধ্যে ঘাসের পেয়েছিলুম মৃত্যুর মধ্যে তাদের সেই পাণ্ডার স্বীকৃতি। প্রাণের উপহার থেকে মৃত্যু আমাদের দূর এনে থকে করিয়েছে বলেই তাকে আমরা সম্পূর্ণ করে বেগতে পেয়েছি, গভীর করে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি। বিষয়া দশরী বিশুদ্ধনের বেদনাতেই আমরা দেবতাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করি।

জুনি আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৮ আশ্বিন ১৩৬৩

সেহাসক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোনো সাধবান্যর্থী এতি

রবীন্দ্রস্মৃতি

শ্রীইন্দ্রা দেবী চৌধুরানী

পূর্বনয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পূণ্যস্মৃতির প্রতি বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতি কথা রচিত। বিবর্তনাত্মক মানবীয় উপাচাৰ্য শ্রীমুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাপুত্রের সোৎসাহ প্ররোচনায় এর উৎপত্তি ও কলাগীর্ষ শ্রীমান শুভম্বর ঘোষের সখ্য অহুলিখনে এর পরিণমাপ্তি। প্রায় পোনে শতাব্দীর স্মৃতির ষটটি দ্বারকে সংগীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি—

আপাততঃ নাট্যস্মৃতি অংশতঃ বিবর্তনাত্মক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।— লেখিকা

আমার নাট্যস্মৃতি অনেকাংশ সংগীতস্মৃতির সঙ্গে ঘড়িত, কারণ রবিকাক। প্রথমকীবনে গীতিনাটাই রচনা করেছিলেন। আমাদের কালের ব্যক্তিগত স্মৃতি আরম্ভ হয় স্বভাবতই বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর থেকে। যা আত্মীয়স্বজন নিয়ে ঘুরোয়া অভিনয় করতে খুব ভালোবাসতেন। সেজন্য অনেকসময় তাঁর কত নান-অভিমান ভাঙতে হত, সে গল্পও তাঁর কাছে শুনেছি।

মানবী

গুরুই প্ররোচনায় সম্ভবত মানবী নাটক (প্রথম প্রকাশ ১৮৮০) জ্যোতির্নাথের ব্যক্তিগত আপনাপনানির মধ্যে অভিনীত হয়। এটি কার রচনা সেকালে আমাদের অহুলগ্ণান করবার কোনো প্রকৃতি হয়নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাক, জ্যোতিকাক, অর্গপিসিমা অনেকসময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।^১

মানবীর বিষয়বস্তু লম্বাছোট আমার কেবলমাত্র একটা অম্পষ্ট ধারণা আছে। দেবদেবীর মানবত্ব নিয়েই কারবার— তা ন্যানেই প্রকাশ। মানবীর অভিনয়ে দেবতাবের মধ্যে রবিকাক আর জ্যোতিকাক। মশায় ছিলেন মনে আছে।

১ একদিন জ্যোতির্নাথের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ টীমারে চন্দনবদর বাইরেছিলেন। পাঁচ অক্ষরাং বড় জন তুফান আরম্ভ হইয়া লবত টীমারবাণিকে আশোষিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের কিন্তু সেদিকে দ্রুতগণও ছিল না। জ্যোতির্নাথ পুর-রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষরানু (চৌধুরী) তাহার সঙ্গে একটর পর একট পান বাঁধিয়া বাইতেছিলেন।—এই একদিনকার হঠাৎ ঘনোন্নি হইতেই, পরে মানবত (মানবী) নামে একখানি গীতিনাট্য আরম্ভ হইয়াছিল। মানবত্ব গ্রন্থে জ্যোতির্নাথের ব্যক্তিগত অভিনীত হয়।

—শ্রীললিতমুখার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে জীবনস্মৃতি', পৃ ১৫৭

"জ্যোতির্বিজ্ঞানার্থে স্মৃতি কথা—তিনি গুরু অক্ষরভক্তের নাম করিয়াছেন, মানবীরিতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও পান রহিয়াছে; যেমন পেন পান—"আর তবে লম্বাছোট হাতে হাতে থরি থরি ইত্যাদি।"—রবীন্দ্র-রচনাপট্টা, পনিবারের চিঠি, পৃ ১০৯৬

"মানবীর পানগুলি রবীন্দ্রনাথের পড়িয়া শুনাইয়াছিল, তিনি ইহার ক্ষয় মনে আর দুইটি পান নিয়ে বসিয়া লম্বাছোট প্রকাশ করিয়াছেন।—

১। রতির পান। ছিলে কোথা বস...

২। বলন্তের পান। চল চল, চল চল, চল কুলবহু..."

—রবীন্দ্র-রচনাপট্টা, পনিবারের চিঠি, ক্যান্ডন ১০৯৬

স্ব-প্রথমেই ছিল রতি ও বসন্তের গান—

রতি । ছিল কোথা বল, কত কি বে ফল
জান না কি তা ?
হায়, হায়, আঁহা ।
মান ধায় ধায় ধায় বাসনের আশ ।
এখানে কি কর,
তুমি ফুলসর,
তারে স্নিহে কর আশ ।
বসন্ত । চল চল, চল চল, চল চল, ফুলবন,
চল বাই কাঁদ সাধিতে ।...

অত্যন্ত ভাতের গান মানময়ীতে ছিল যা আমাদের ঐ বয়সে পাওয়া অকালপকতা বলে নিশ্চয় সকলে মনে করবেন—

উৎসি । সন্নী লো বল, কেন কেন এ গোড়া আশ বেশ না ?...
এবে যে এনে যে বিব, আর যে লো পারি না ।

কিন্তু আমরা সববয়সীর হল নিঃসংকেতে এ গান বাড়িনয় গেয়ে বেড়াইতুম ।

বসন্ত-উৎসব

স্বর্ণপিসিমার গীতিমালা 'বসন্ত-উৎসবের' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭২) সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি ভড়িত । তার গোড়ার দিকের গান 'ধরু লো ধরু লো ভাল। এই নে কামিনীফুল' এখনও কানে বাজে ।

অল্প গানগুলিও কতক কতক মনে আছে—

শীলা । চন্দ্রহৃত তারাপুত্র বেবাক নিশীথ চেয়ে
দুরন্ত অন্ধকারে হলায় ছরছে মেয়ে ।...

ঢালা বাগেশ্রী গানিগীতে এই শোকসংগীত নতুনকাকিয়া বসে গাইছেন, তাঁর বড় বড় চোপ আর দীর্ঘ ঘন বেশ ছিল বলে তাঁকে বেশ মনিরেছিল । জ্যোতিকাক্ষা আর রবিকাক্ষা দুজনে মিলে টিনের তলোয়ার নিয়ে এই গানটি গেয়ে হুত্ব করেছিলেন—

কিন । লও এই লও, লও প্রতিফল ।
হুমায় । সেখির বীর্য তোর থাকে কি অটল ।
কিন । দুটু হ রে সাবধান !
হুমায় । এ অরোষ সন্ধান ।
কিন । এ আঘাতে অবশ্যই বধি পরাণ ।

এই নাটকটি পরে লখিমবিত্তির পক্ষ থেকে কোনো বাগানবাড়িতে অভিনীত হয় । যদিও সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল কিন্তু বাকার করতে লজ্জা নেই যে, তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে টের বাঁধা সম্ভব ছিল না । এই নাটকে স্বরেন আর জ্যোৎস্নালালা আমাদের প্রধান সহকারী ছিলেন । স্কেনের পঞ্চাশপটকে বনের উপযোগী করে লাম্বাতে গিয়ে তাঁরা দুই ধর্ম্মের মিলে বাঁশের আত্মির

রবীন্দ্রশ্রুতি

উপর শুকনো বসুন্ডা তার মধ্যে আঁধার জায়গায় জিনের গোলাতে সলতে জেলে জোনাকির ভাব আনতে চেয়েছিলেন। আগুন ও ঘালের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের যে অগ্ন্যবস্থা পরিণতি তাঁদের ছেলেবাহরী বুদ্ধিতে ব্রতে পারেননি, তা শীঘ্রই প্রকাশ পেল। পঞ্চাংগটের মাঝে মাঝে আগুন ধরে গেল। চারিদিকে হৈহুয়া পড়ে গেল। আমরা যেহেতু ছুঁটাছুটি করে নাবার ঘরের টব থেকে গুল আনতে লাগলুম আর হুয়ের ও কোয়াংবা অগ্ন্যাতা কামিহুয়র আগুন গুটিয়ে পর্গ। হেড়ে বাইরে আগতে বাধা হলেন। সে এক হাতকর ব্যাপার, ঘনি ও আর একটু বেশিই গড়াতে কারাটি পড়ে বেতে পাতত।

এই সময়কার একটি হাসির গানও মনে পড়ে—

খিলি খেপানে সেখানে যা রে কুস।
চটক-চটক খেপালে কি হবে
আসুকায়া হাসুকায়া পেরে করিমনে কো রক।
করিমনে করিমনে মিহে প্রাকেরা
হাসে পর পর পর পর গর হাসিছে অস।

বিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষ

বানমহীর আগে কি পরে ঠিক মনে নেই, রবিকাকা ও জ্যোতিকাকা দুই ভাইয়ে মিলে অভিজাত বন্ধুবর্গের চিত্রবিনোদনের অত্র বিবাহটিতে একটি কুহ গীতিনাটিকা অভিনয় করেছিলেন। তাতে তাঁরা দুজনে বিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষ অবলম্বন করে গান করেছিলেন। রবিকাকা বিবাহের সপক্ষে গাইতেন—

একা একা এতদিন কেটে গেল এখন দুয়ের নিশা প্রভাত হল।

আর না ভালো সব

দুজনে এক হব

সোহানে লগা রহ সে চল।

ভাওয়াই যুথ চেয়ে

ঘামিবা ঘাবে হয়ে

বিবাহ তারি মেয়ে হবি-অবল।

তার পর বিপক্ষে জ্যোতিকাকা গাইতেন—

ঘানর ঘানর ঘানর ঘানর—সেই সে কীদুনি কি কব সবা।

কথার কথার অভিমানে তারি, লাখ কি যে সে বন যাব।

দুহে থেকে গাধ করে— অজ্ঞাণে যে হবে নাক।

তার পর আবার সপক্ষের গান—

সবা সাক্ষিতে শাখাতে কত হব

তাঁরা দুঁকিলে না তুমি মনে রয়ে সেল যুথ।

অভিমান খাঁখিল মনে হল হল

যুথতে শাসে জামো কত

তাঁরা দুঁকিলে না তুমি মনে রয়ে সেল যুথ।

এই গানটি গীতবিত্তানে স্থান পেয়েছে।

এই অভিনয়ের সঙ্গে সামান্য একটি মজার শ্রুতি জড়িত আছে। পাইকপাড়ার কান্তিচন্দ্র সিংহ হুয়েন জন্মের ছেলে ছিলেন বলে তাঁকে আদর করে কোলে নিয়ে বর্ষকদের মধ্যে বসে ছিলেন। তিনি এই নাটক দেখে এত হাসলেন যে হুয়েন গড়িয়ে তাঁর চোকির নীচে পড়ে গেলেন!

হেয়ালি নাট্য

এর পরে ছেলেবেলার শ্রুতি জড়িত রবিকাকার হেয়ালিনাট্যের সঙ্গে। বাবা তির্যদ্বিনই ব্রীশিক্স এবং ব্রীশাব্দীনার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্মেই বোধহয় বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমাকে বেশি ভালোবাসতেন। আমাদেরও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বর্ণপিসিমার জোড়ারীকো ছেড়ে একসময়ে কাশিচাবাগান অঞ্চলে একটি বাগানবাড়িতে গিয়ে ছিলেন। সেখানে আমাদের সকলের খুব বাগ্‌বা-আসা ছিল; রবিকাকাও মাঝে মাঝে যেতেন এবং আমাদের আনোদপ্রদানে বোগ দিতেন। এই হুয়ে তাঁর "গ্যাতির বিদ্যনা" (সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশ ১৮৮৩) নাটকটি নিম্নেরাই অভিনয় করে আমাদের প্রচুর আনন্দ দেন। আর-একটি কথা মনে পড়ে—অনুয়েই যেমন বৃক্কের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি সরলাদিগি আর হিরবাবিও এইখানেই পাড়ার ঘেরেদের শিথিরে পড়িরে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের স্থান করেছিলেন।

বাস্তবিক প্রতিভা

বাস্তবিক প্রতিভা (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১) ও কাল-সুগমার (প্রথম প্রকাশ ১৮৮২) নাট্যশ্রুতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যে এই দুটি নাটকেই আমরা বোগ নিয়েছিলাম। বাস্তবিক প্রতিভার আমি একবার লক্ষী পেয়েছিলাম, রবিকাকা বাস্তবিক। তবে ১৮৮১ সালে প্রথম বাস্তবিক প্রতিভা অভিনয়ে নয়, সেবারে প্রতিভাদিগি সরস্বতী আর বোধহয় হুশীলাদিগি লক্ষী পেয়েছিলেন। জেঠামশায়ের একটু অভ্যাস ছিল হঠাৎ হঠাৎ 'এই যে অনুক সাহেব' বলে রেহভাঙ্গনদের পিঠ খাবড়ে দেওয়া। প্রথম বাস্তবিক প্রতিভার অভিনয়ের পরে প্রতিভাদিগি সরস্বতী পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁর পিঠ খাবড়ে 'এই যে সরস্বতী সাহেব' বললেন! আমি সেখানে তখন উপস্থিত।

অভিনয়ক্ষমতা যে আমার খুব ছিল না, তার প্রমাণস্বরূপ একটি ঘরোয়া সাক্ষীর কথা উল্লেখ করব। লক্ষীর কুমিকার আমার একবার গান 'কেন গো আপন মনের' 'আমার শুভকণ্ঠে হের গো চোখে' অংশটি গাইবার সময় যখন বৃক্ক হাতে দিয়ে নিরেক্ষে দেখাতুম, তখন অতি হেসে বলত, "বোন দিদি, অবন কোরো না। মনে হয় কেন পেট কানড়াচ্ছে!" এই বোনদিগি সযোখনের ইতিহাসটুকু হচ্ছে, অতি আমার চেয়ে বোটে পনেরো দিনের ছোট ছিল। অতি একাঙ্গনে বসে সমস্ত বাস্তবিক প্রতিভা বা মায়ার খেলার গানগুলি প্রথম থেকে অভিনয় করে গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে পারত।

এই এক বাস্তবিক প্রতিভা যে কত বার কত হুয়ে অভিনীত হয়েছে এবং আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে কত ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অপ্রত্যাশিত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা বলতে গেলে একটা বই হয়ে যায়। বাবা একবার বিলেত থেকে আসবার সময় তাঁর সহবাত্রী তখনকার লার্ট-পতী লেডী ল্যান্ডাউনকে জোড়ারীকোর বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এখানে বলে রাখলে ক্ষতি নেই যে, ইংরেজ আভির গুণ ও তাঁদের সামাজিক প্রথার প্রতি বাবার স্বাভাবিক শ্রীতি ছিল। কলকাতার আসবার

রবীন্দ্রস্মৃতি

পর লাট-পত্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিশ্রম জানালে তাঁর ক্ষত বাস্তবিক প্রতিভার একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। শেঠী ল্যাংডাউনের সঙ্গে তখনকার ছোটলাট-পত্নী লেডী এলিফট প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের যথাযোগ্য সন্মান দেখাবার জন্য কর্তৃপক্ষ যথাযথ্য চেষ্টা করেছিলেন। বিপুলসী তাঁর স্বতঃসিদ্ধ রসিকতা করে বলেছিলেন, 'ভোড়াগাঁকোর উঠানের সাজসজ্জা দেখে লাট-পত্নী বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই লাটলাহেবকে বলবেন— 'Darling ! All velvet and festoons !'

অক্ষয় চৌধুরী যেমন পারিবারিক বন্ধু বলে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তেমনি অক্ষয় মজুমদার বলে আর-একজন ছিলেন, যিনি অভিনয় ও সংগীত দুজোটেই ভোড়াগাঁকোর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দুজনের একই নাম বলে আমরা তাঁদের যথাক্রমে ছোট অক্ষয়বাবু আর বড় অক্ষয়বাবু বলে উল্লেখ করতুম। বড় অক্ষয়বাবুর খুব দরজা গলা ছিল, যেটি নাথোম্‌বের উঠানে ঋপর গাইবার সময় বিশেষ কালে লাগত। তাঁর আর-একটি অভ্যাস ছিল যে, তাঁর যে চড়া হ্রদ গলায় সূতোত না সেটি উর্ধ্বে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিয়ে কাজ সারতেন। তাঁর এক রোগ ছিল লেখকের রচনার উপর নিঃস্বের কথার রত চড়ানো। তাতে আরও রসিকতা বাড়বে বলে মনে করতেন। রাজ্য ও রানীতে হুমিরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার সংবাদে যখন বিক্রম অভ্যন্তর বিচলিত, সেই সময় ত্রিবেদীর (বড় অক্ষয়বাবু) সঙ্গে পথে দেখা হল। রানীকে ত্রিবেদী যেতে দেখেছেন তখন বিক্রম যখন বাহুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চোখে অশ্রু ছিল ?' সেই নাট্যরসের গাভীর নষ্ট করে তিনি নাক ফুলিয়ে বলেন, 'ওজ্জ-ফোজ্জ, দেখি নাই চোখে'— হুল নাটকে শুধু আছে 'অশ্রু দেখি নাই চোখে।' আর-একবার বাবা যখন ভোড়াগাঁকোর বাড়িতে রাজা ও রানীর অভিনয়ের পরিচালনা করছেন, তখন বড় অক্ষয়বাবু কোনো এক ভূমিকার তাঁর বক্তব্যের অন্তরিক্ত, 'লম্বেশ মল্লেশ বঙ্গগোলা ফলগোলা' ছুড়ে বেগমতে বাবা ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। তাতে অক্ষয়বাবুর এমন অভিমান হল যে, তিনি তাঁর পরবর্তী অভিনয়ে কথাস্তম্বি কিছুমাত্র বসকব না দিয়ে একবারে শুকনো ভাবে বলে গেলেন। তখন বাবাকে না বলতে লাগলেন, 'তুমি কেন ঐকে এমন করে বললে, এখন দেখ কি করে অভিনয় চলবে।' তখন মা'র তাঁর মানভঙ্গন করবার জন্য তাঁকে পকানটি টাকা এবং একটি শাল ঘুষ নিয়ে তবে বাগ মনে'নো গেল। বড় অক্ষয়বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্বযোগ পেলে তিনি শুধু কমেতি নয় ট্রায়েডিও ভালো অভিনয় করতে পারেন। বিভিন্ন যাত্রাবের আয়প্রত্যয় !

এহেন অক্ষয়বাবু বাস্তবিক প্রতিভার পূর্বোক্ত বিশেষ অভিনয়ে লাট-পত্নীর সামনে প্রথম দৃষ্ট। সেজে খুব স্মৃতির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তাঁরা ভাবা না বুঝতে পারলেও অন্তর্ভবীর হারা বিষয়টো সহজেই বুঝে নিতে পেরেছিলেন। অক্ষয়বাবু প্রথম বারের পর দ্বিতীয় বার যখন দৃষ্টমুখে প্রবেশ করলেন তখন লেডী এলিফট নাকি বলেছিলেন, 'He is my man'। ছোটলাট-পত্নী তাঁকে my man বলেছেন এটি গৌরবের কথা অক্ষয়বাবু চিরদিন সকলের কাছে গর্ব করে বেড়িয়েছেন। অবনতানার 'বরোয়া'তে আমাদের বাড়ির নাটক অভিনয়ের হুমকি বর্ণনা আছে।

কাল-সুখ

কাল-সুখার অভিনয়ও প্রায় সমসাময়িক এবং এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। আমি একবার

এই নাটকটি করতে গিয়ে একটু বিশেষ পড়ে গিয়েছিলাম। দিচ্ছি দেখেছিলেন অঙ্কন এবং তাঁর ভাষে ও ভাট্টা সত্যের আর হুঁশা সেজেছিল কবিভূমার ও শীলা। দিচ্ছি বললে, 'কবিভূমারবধের পরে যে সত্যকে খাটায় করে নিয়ে আসবে সে আমি দেখতে পাব না।' আবার কবিভূমারের কিরতে যেই দেখে তাঁর বোন হুঁশা "বল বল পিতা কোথা সে গিয়াছে" গাইতে গাইতে চক্ষের জলে বন্ধ ভাগিয়ে দিল। এসব দেখতেই আমি বললাম— 'থাক, কাল-সুগন্ধার আর অভিনয় করে কাজ নেই।'

"এমন কর্ত্ত আর করা না"

কালোহরুকে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় জ্যোতিকা কামনারের 'এমন কর্ত্ত আর করা না' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) এর পরে আসে। নাটকটির নাম পরে বললে হয় 'অলৌকবাবু'। এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু হয়তো স্মৃতির জাহ্নবনত এর যে অভিনয়টি আমাদের সবচেয়ে সেরা মনে হয় তার পাঠপাঠ্যী এরকম ছিল—

সত্যসিদ্ধ	জ্যাঠামশায়, বিজ্ঞানপ্রাধ
অলৌকবাবু	রবিকাকা
গলাধর	সেউপিসেমশায়
জগদীশ	জগদীশ দাস
হেমাদিনী	শরৎকুমারী চৌধুরানী
পিসুনি	বর্ণশিশিমা

কী ব্যতিক্রমিক অভিনয় করতেন বর্ণশিশিমা। এখনও মনে পড়ে প্রথম দৃষ্টে তিনি দালীনের মতো খাটতে বলে হাটু তুলে হাতের উপর মাথা রেখে সকালবেলা বসে আছেন আর বাইরে থেকে গলাধর ঘরজা ঠেলতেই মাথা তুলে বলে উঠলেন, 'ঘরজা ঠেলে কে ও ? ওবা, গলাধর বাবু যে। বড়মানুষের বোলাহেব, ঘণ্টা বাজতে-না-বাজতেই ঘুম ভাঙল ?' তাঁর পরের দৃষ্টে অলৌকবাবু ও সত্যসিদ্ধ ঢেঁকে ঢুকছেন। ঢুকতে ঢুকতে অলৌকবাবু বলছেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, কামাগ্যাদেশের রাত্রকণ্ঠা, আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার অস্ত্রে হুকুমোহুনি।' সেই ভাব ও কথা এখনও বেন কানে বাজছে। তার পর বন্ধু সেরে অকন্যার গান, ভারিই বা কী কাদা! আর জ্যোতিকাকার সেই চোনেদান সেজে চোনেভাষার কিচিরমিচির কথা— কাকে ছেড়ে কার কথা বলব! হেমাদিনী যে হাতে বঁটি ধরে 'এই বর্নাই আমার প্রাণেশ্বর' এইরকম কী একটা খুব নাটকীয় ভাবে বলতেন, সেও একটা মনে রাখবার মতো। মিনিস।

বিবাহ-উৎসব

বিবাহ-উৎসব নামে আরেকটি ধরোয়া স্মৃতি-নাটক আমাদের শব্দ চলিত ছিল। নামেই তাঁর বিষয়বস্তু প্রকাশ। আমার পিসুতুতো বোন সুপ্রভাতিদির বিবাহের সময় মনে পড়ে পূজার দালান থেকে বরকনে সোতলায় বাদরে পৌছবার আগেই কনের হল ফিট। তখন বাড়িতে কি আমি কেন হিষ্টিরিয়া রোগটির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। আমি আর উষাদিদি কোনোরকম করে সেই মুহূর্ত্ত কনেকে দুর্দিক থেকে ধরে অতিকষ্টে দি'ড়ি ভেঙে সোতলায় বাদরঘরে এনে ফেললাম। সেখানে তিনি মহলমহে অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে

রবীন্দ্র-স্মৃতি

হইলেন, পাশে বর হুম্মার হালদার হতভব হয়ে বসে কি মনে করছিলেন তা তিনিই জানেন। এই অবস্থায় আমাদের সেই “বিবাহ উৎসব” অভিনীত হয়। দিহুর যা হুশীলারোঠান নাথক সেজেছিলেন। তিনি গান এবং অভিনয় দুইই স্বকর করতেন। তাঁর একটি গান ‘ও কেন চুরি করে ঘাঘ’ তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নায়িকাকে বেধে মোহিত হয়ে তিনি গাইতেন, ‘ওই জানালায় পাশে বসে আছে করতলে রাখি মাথা’। সে গানটির একাল পৰ্ব্বত পৌছবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার উত্তরে সরলামিদি লখা সেজে তাঁর মোহভঙ্গের উদ্দেশ্যে যে গান করতেন ‘ভূমি আছ কোন্ পাড়া’ সেটিও প্রাথমিক হাসির গানের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য—

ভূমি আছ কোন্ পাড়া

তোমার পাইনে যে নাড়া

শংখের অঘো হী করে যে রৈলে যে খাড়া।

রাজা অধর নদন ভালো

ভরা পেটেই লাগে ভালো

এখন পেটের মধ্যে নাড়িতলো নিচ্ছে তড়া।

এই স্তরেই আবার পরে ‘আঃ বেঁচেছি এখন’ গানটি রচিত হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিভা ও কাল-দুগ্ধতা : পুনর্জন্ম

গগননাগা খুব ভালো অভিনয় করতেন বলে বহু। রত্নাকর ধ্বন বাস্তবিকিতে পরিণত হলেন তাঁর তখনকার ননোভাবের উপযুক্ত এক মনু সন্নয় প্রবর্তন করে বিবিকাকা গগননাগাকে সেই ভূমিকা নিলেন। এখন ‘এ কেমন হল মন আমার’ কল্পণ গানটি গাইতে গাইতে নিম্ন গগননাগার কাঁধে হাত দিয়ে নিঃস্বস্তি জাবে এমন অভিব্যক্তি হয়ে পড়ল যে, সেও যেমন কাঁধে গগননাগাও তেমনি কাঁধে। অভিনয় করতে করতে ভূমিকার সঙ্গে অভিনেতা যদি একেবারে অভিন্ন হয়ে পড়েন তবে তো অভিনয় করা মুশকিল হয়।

আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা হিসাবে বলি, আমি ও উবারিদি কালদুগ্ধায় বনবেরী গেছে ‘গন্ধেতে বহিছে তটিনী’ গানটিতে এক আত্মগাথ বসে ডানহাতের ডব্বীতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু আঙুল উপরে তুলে ‘দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া’ দেখাতাম, সে গল্প করে দেখিন পৰ্ব্বত কত মেয়েদের হাসিয়েছি। আগে কোনো ইংরিজী লেখায় বলেছি ‘Either on or off the stage’ আমি কখনোই ভালো অভিনয় করতে পারি নে।

রাজা ও রানী

রাজা ও রানী (প্রথম প্রকাশ ১৮৮২) নাটক বহুবায় অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম অভিনয়ের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। কলকাতার সেট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রালের লাগাও ভবিত্তে তখন একটি বিরাট পুঁহর ছিল। তাকে লোকে বলত বিজিতলাও। তারই মাঝে বর্তমান প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের ভবিত্তে বিজিতলাগার একটি পুনো বাড়ি আত্মতা ভাড়া নিয়ে বহুদিন ছিলুম। বাড়িটি ঊর্ধ্ব হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের অনেক স্মৃতি জড়িত। তারই একতলায় চওড়া বাগানবাগ টেম বেঁধে প্রথম রাজা ও রানীর অভিনয় হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এই রকম :

বিব্রন রবিকাক।

হুমিত্রা মা

সেবসত বাবা

মায়াদেবী হুশালিনী দেবী, রবিকাকার স্ত্রী। ইত্যাদি।

মা খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন ভ্রমতে পাই। পরদিন বঙ্গবাসী কাগজে 'ঊনুহবাড়ির নতুন ঠাট' বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে উক্ত পাত্রপাত্রের তালিকা এবং পরম্পরের সম্পর্ক পরিষ্কার করে লিখে দেখা ছিল। বলা বাহুল্য বাবা এবং সমালোচনার ভ্রমশ্রমও করেন না। মনে হয় এই অভিনয়েই "উনি" হুমার, এবং প্রতিভাদিগি ইলা সেজেছিলেন।

মায়া দেবী

মায়া দেবীর একটি অভিনয় এই বিজিতলার বাড়ির বায়ান্মাতেই হয়েছিল, তার বিশেষ এই ছিল যে, মায়াহুমারীদের অভাবে রবিকাক। সৌভাগ্যবশত বঙ্গ ও মন সেজে তাদের গান গেয়েছিলেন। আমি এইবার শান্তা সেজেছিলাম।

মায়া দেবীর নাম করতে গেলে অনেক কথা মনে আসে। অনেকই জানেন যে রবিকাক। (ব্রজ) সরলা রাঘবের অল্পপ্রাণে পবিত্রমিত্তির সাহায্যার্থে এই পীড়িতনাটিকা রচনা করেন। যেখান কলেজের প্রথম আটমাসের এর প্রথম অভিনয় হয়, আমাদের বাড়ির মেয়েরাই অভিনয় করেন। লক্ষ্যের বেশ ছিল খুব টকটকে রঙের লাটিনের প্যাটার্ন ও মুক্তি, তার সঙ্গে ইংলিশ গায়ের রেখা। আর মায়াহুমারীদের হাতের নগের মুখে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল আর নিবছিল, বোধ হয় বিশিষ্ট পরায় অঙ্কুরণে। তখন সব বিষয়ে বিশিষ্ট অঙ্কুরণটাই প্রথম ছিল। তার পরে মায়া দেবী। কত উপলক্ষে কত ভিন্ন বল দ্বারা অভিনীত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তবু সে প্রথমের মোহ কাটে না। এখন মনে পড়ে আমাদের মন-পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির ভেতলার ঘরে রবিকাক। একটা একহারা খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বসে বালিশ দিয়ে মেটের উপর মায়া দেবীর গান লিখছেন এবং গুনগুন করে স্বপ্ন দিচ্ছেন। সে সময় কিছু দিনের জন্য তিনি কাকীমা ও বেলাকে নিয়ে আমাদের গুহানে এসে ছিলেন। তখন ঊরু মারিফিড থেকে ক্রিয়ে এসেছেন এবং আমাকে আনতে লেবটে। তুলে যে গাড়ি যেত তাতে বেলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— আমি কখনও ভুলব না যে গাড়িতে উঠতে গিয়ে, সেই আগেল কলের মতো রাঙা টুকটুক গাল ও কোঁকড়া চুল ও-হালা পুতুলটিকে হঠাৎ দেখে মায়া কি অপ্রত্যাশিত আনন্দই না হয়েছিল। পরবর্তী কালে সরলাদি-লক্ষ্যাদিত ভ্রমতীর সাহায্যার্থে রবিকাকার নির্দেশে প্রোডাক্টোর বাড়ির লোকেরা অভিনয় করে টাক। তুলে সেন। তার মধ্যে অমিমা বৌমা প্রথম সেজে খুব মনোর অভিনয় ও গান করেন। এই প্রদর্শনে আমার মনে হয় যে, মায়া দেবীর বিষয়বস্তুটি,— অর্থাৎ মায়ক যে শান্ত ভালবাসা প্রথম-জীবন থেকে তাঁর বালাগদিনীর কাছ থেকে পেয়ে এসেছেন তার মর্থা বৃত্ততে না পেয়ে তাঁর মানসীর লক্ষ্যনে যেসিবে প'ড়ে এক হাতোজল লীলামবী মারিকার ভ্রমে ঘোহিত হয়ে এবং সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবার সেই বালাগদিনীর আশ্রয়ে শান্তি লাভ করেন— রবিকাক। তাঁর নাম। কাবানাটকে ব্যবহার করেছেন। রবিকাক।, ভ্রমতীর, মলিনী, মায়া দেবী প্রভৃতিতে এই ঘটনাই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রস্মৃতি

আমাদের বাড়িতে এত নাটক অভিনয় হত যে বাইরে নাটক দেখতে যাবার যেওয়ার ছিল না; কেবল একবার স্টার থিয়েটারে 'বসন্ত রায়' নামে "বৌঠাকুরানীর হাটে"র রূপান্তর দেখতে গিয়ে বুড়ে। বসন্তরায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কেঁদেছিলাম মনে পড়ে।

রূপসজ্জা ও নকশা

আগেই বলেছি আমাদের রূপসজ্জা। নকশা অনেকটা বিলিতি অঙ্করূপে হত। হ. চ. হ.— হরিশচন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্যপটগুলি অতি নিকটে বিলিতি অঙ্করূপে আঁকতেন। বাস্তবের ঘণাঘাণ অঙ্করূপ করাই ছিল তখনকার আদর্শ। বাস্তবিক প্রতিভার অভিনয়ে দিহুয় বোড়া নিবে ঠেঁকে ঢোকা, আর 'রিমসিম' গানের সঙ্গে অন্নদাদার টিনের নল ছুটে করে বৃষ্টি নামানোর কথা অবনয়না তো বলেইছেন। বাইরের থিয়েটারে আরবা কম গেলেও স্টার থিয়েটারে "নল নমস্কর্তা"র অভিনয়ে এক-একটা 'উইং'-এর গায়ে এক-একজন পরী গোলাপী মোছা পরে কাগজের পদ্মাসনে দ্রিড মৃতি হয়ে থাকিয়ে আছে মনে পড়ে।

পরবর্তীকালে আমাদের সোখের সামনেই অবশ্য শিশিরকুমার ডাহুড়ী প্রবৃথ বিখ্যাত নটপ্রদানগকেও বিলিতি নকল ছেড়ে রূপসজ্জার ভারতশিল্পের প্রবর্তন করতে দেখেছি। রবীন্দ্রালেরও শুনেছি লখীনের নাচের পোশাকে নতুন ঢং প্রবর্তনে অনেকটা চাত ছিল।

পূর্বেই বলেছি ঠাকুরবাড়িতেও রূপসজ্জার প্রথম দিকে বিলিতি অঙ্করূপই চলত। রবিকাকার বাস্তবিক সাজে পিঠের দিকে যে লম্বা প্লোকা মডো স্থলিযে বেগুয়া হয়েছিল, তাতে বিলিতি রাজ্যরাজড়ানের mantle-এর আভাস পাওয়া যায়। তার সঙ্গে রূপসজ্জার মালা। অবশ্য রবিকাকার বাই পরতেন তাই মানাত, সে আলাদা কথা। তিনি যখন ঐ সাজে বাস্তবিক রূপে তাঁর সেই হুকঠে ভারতপুত্রক অভিনয় পূর্বক রামপ্রসাদী হয়ে গাইতেন 'জামা, এবার ছেড়ে চলছি না' তখন যে দেখানে কি অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হত তা বার্য না দেখেছে না শুনেছে তাদের বোঝানো শক্ত।

তখনকার ভাড়াভদের কাবুলিওয়ালা সাজে কেন সাঝানো হত বলতে পারি নে। সম্ভবত: তাদের ইয়া গৌক এবং ইয়া পাগড়ির লম্বাবেণে ভাড়াভের ভীতিজনক রূপ লহুহেই ছুটে উঠত। তার পরে যাবার যথ্যরূপে তাদের মৃতি, কলুয়া, হুহুতো মাথার একটা ছোট বাণা, এই সাধারণ বৈশ পরানো হত। অবশ্য রূপসজ্জার উপরূক একটু রং চড়িয়ে। লক্ষী-পরবর্তীকে তো মামুলী পৌরাণিক রীতি অহুসারে লাল ও সাদা অরির বেশে সাঝানো হত। বনদেবীদের বাড়ির মেয়েরাই সেলাইকরা মায়া পরিযে একটি নানা রঙের শাড়ি ইচ্ছামত অড়িয়ে মিতেন। আর লতাপাতা এবং এলোচুলে তুল ইত্যাদি দিয়ে বনদেবীদের উপযোগী সাজ করে মিতেন।

আমার ইচ্ছে করে রবিকাকার সংগীতের পারাবাহিক বিকাশের বিবরণ বেরকম একপ্রকার বাধ্যবাধ্য হয়ে গেছে এবং অনেক জায়গায় উল্লেখ্য দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে তেমনি তার নাট্যসজ্জার বিবরণও কালাহুসারে উল্লেখ্য দিয়ে দেখানো হয়। একই নাটক কথা বাস্তবিক প্রতিভার আদ্য, মধ্য ও অন্ত ভূপের সজ্জা দেখাতে পারলে আমার এই ইচ্ছাটি লহুহেই পূরণ হয়।

শাট

তখনকার কালে আমাদের অভিনয়ে এত নাচের চল ছিল না। নৃত্যনাট্যী হয়ে থাকুক অতি সামান্য

ভাবেও কোনো বিশেষ প্রচলিত নৃত্যধারাও শিক্ষা দেবার কোনোরকম কল্পনাই কারো মাথায় আসে নি। বনদেবীদের "রিমঝিম" প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যে অতি প্রাথমিক ড্রিপ-এর মতো একপ্রকার নাচ শেখানো হত, যা দেখে এখনকার নৃত্যপটীয়াগীরা বোধ হয় ভাঙ্কিপোর হাসি হাসবেন। ডাকাতদের 'কালী কালী বলো যে আজ'-এর সঙ্গে মাথার উপর উঁচু করে ধরে টিনের তলোয়ার দিয়ে তালে তালে ঝুঁকে পা ফেলে যে নাচের অঙ্করণ করা হত, তাকে কোনোমতেই বলা যায় ঠিক আমি নে। আমার কেন আমি নে, বিলেতে কোনো পটনের সাহেব-মেম্বরের বিয়ের সময় দু পাশ থেকে তুলে ধরা যে তলোয়ারের খিলেনের তলা দিয়ে আসতে হয়, সে দৃশ্যের কথা মনে আসে। কিন্তু সত্ত্বন্ত আমানের বেপের লাঠিখেলার সঙ্গে কিছু যোগ আছে। 'এত রক শিখেছ' গানের সঙ্গে ঢোলক বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে হঠাৎকৈ লাফানোকে কতকটা স্বাভাবিক আনন্দবিকাশের একটা ভঙ্গি মাত্র বলা যেতে পারে। তবে এইসব নাচের মধ্যেই বোধ হয় রবিকাকার পরবর্তী নৃত্যকলা-বিকাশের অঙ্কুর নিহিত। হয়তো পূর্বপ্রকারবশতই আমি অনেক সময় বলে থাকি যে, এই নৃত্যকলা অভিনয়কলার গলা টিপে মারছে। অভিনয়কলা যুগের ভাব ও কণ্ঠস্বরের উপর বেশি নির্ভর করে, আর নৃত্যকলা হয়ত স্বচ্ছ নৃত্যভঙ্গির উপর বেশি নির্ভর করে। সকলেই জানেন রবিকাকার গগনবাণী আর মিহু ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। অবনবাগারও হাস্যরসের অভিনয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পেরুর আমার ভাব হয়, পাছে বর্তমানে নৃত্যকলা সেই অভিনয়ের দ্বারা ব্যাহত করে। অবশ্য ভাবপ্রকাশ নিয়েই কথা, এবং নৃত্যও যে কলার একটি বাহন সে কথা স্বীকার না করে আমি নিঃশঙ্ক নিভাঙ্ক সেকেন্দ্রে প্রতিপন্ন করতে চাই নে।

কাকুনী

নাচের কথা যখন উঠলই তখন কাকুনী (প্রথম প্রকাশ ১৯১৬) লুইজি স্মৃতি আছে বলি। তার প্রথম অভিনয় মোড়ারগোকোর বাড়িতে হয়। নবী, চাঁপাবন, বেণু প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রভীতের যে মানবীয় রূপ দেখা হয়েছিল, তার মধ্যে আমার ভাইকি যুগু প্রভৃতি ছোট মেয়েদের তবাবধান করবার কিছুটা তার আমার উপর পড়েছিল। আগেই বলেছি, নৃত্যকলার যুগু পদ্ধতি তখনও গড়ে উঠে নি। তার উপর আমি তো এমনি বিবয়ে নিভাঙ্কই অঙ্ক ছিলুম। তবু রবিকাকার অঙ্কুরোধে বেটুকু পারি ছোটদের পরিচালনা ও পথচালনা করবার চেষ্টা করেছিলুম। এ কথা উল্লেখ করছি শুণু জানাবার ক্ষেত্রে যে, পরে রবিকাকার এই নাচকে, 'তোদের ডায়োসিননের নাচ' বলে একটু খোঁটা দিয়েছিলেন। তাতে আমার গায়ে কিছু লাগে নি, কারণ আমি কোনোদিন ডায়োসিননের ছাত্রী ছিলুম না। এখনও মনে আছে মেয়েদের মাথার মাঝখানে উঁচু হুঁটি করে দিয়েছিলুম, যেমন আমরও করে থাকে দেখতে পাই। 'নবী আপন বেগের' সময় বকের এক দিকে সজীব আরেক দিকে নিবিদ পাড়িয়ে একটা নীল কাপড়কে ডেউ খেলিয়ে নদীর বেগ প্রকাশ করছিল, তাতে সেই পুরনো বাস্তবের নকলের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর লেগেছিল, দশ বছরের ছেলে সন্দেশ সিংহের ফুলের বোলনার তুলতে তুলতে 'গুণগা দখিন হাওয়া' গানটি গাওয়া; এ দৃশ্য বরাবর স্মরণে আছে কখনও তুলতে পারবে না।

অবনবাগার মকলঙ্কার কথাও উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালের সেই বিশদূশ বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার কারপায় পিছনে একটি নীল পটভূমি দিয়েছিলেন, সেটি এখনও দেখা হয়। তার উপর

রবীন্দ্রশ্রুতি

কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটি মাত্র লাল ফুল এবং তার উপরে একটি কৌণ চন্দ্ররেখা। রবী, নিছু ওরা নিজে টিকিট বিক্রি করে বোধ হয় মশ-বারো হাজার টাকা হুলেছিলেন, টিকি কত আমার মনে সেই, কিন্তু তখনকার পক্ষে বেশ ভারি অঙ্ক। অভিনয়ান্তে বসন আমরা উঠোন ছেড়ে সোতলার উঠানুম এবং দুই বাড়ির মাঝখানে নাম-সার্বক-করা নীকোম গাড়িতে আছি তখন রবিকাকাকে লক্ষ্য করে বললুম যে তোলা টাকটা ঘেন টিকি হাতে গিয়ে পৌঁছয়। তার উত্তরে তিনি কান্টনীর মাটির একটি কথা উদ্ধৃত করে বললেন, 'আমার দোড় ঘটি পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।' আমাদের অভিনেতা প্রভৃতি সকলকে সোতলার বাইরের ঘরে ডোম খাওয়ানো হল।

ডাকঘর

ডাকঘরটিও (প্রথম প্রকাশ ১৯১২) রথ্যাপর্বের অন্তর্গত বলে মনে করি। এমন হৃন্দর মরুপক্ষা অন্তত আমাদের চোখে তার আগে কখনও পড়ে নি। তখনকার বিচিত্রাঘরের শেষে মকটি বাধা হয়, টিকি একটি পল্লীগ্রামের রথ্যাবিস্ত গৃহস্থের ঘর অহুকরণ করে। সেই চালের বড় পদন্ত স্টেজের সামনে থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ঘরেই ডির ডির উপলক্ষ্যে বাছাকাছি ছয়বার এই নাটকটি অভিনীত হয়। আমার চোখে ঘরটি এত হৃন্দর লেগেছিল যে মনে হয়েছিল কখনও ঘরটি না ডাঙলেই ভালো হয়। তার অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন রবিকাকা, গগনদাস, সমরদাস, অবনদাস এবং অবনদাসের ছোট মেয়ে স্ত্রীপা। আর অবল সেজেছিলেন আশামুহুর নামে একটি শান্তিনিকেতনের ছেলে। বহুদিন পরে বিশ্বভারতী পত্রিকায সে একটি লম্বা কবিতা লিখে অভিনেতাদের প্রত্যেকের বংঘ নিয়েছিল। ডাকঘরের অভিনয়ের হৃন্দর ছবি তোলা আছে। অবনদাসের অপূর্ব লেখনীতে ছবির চেয়েও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিবিধ

বনীকরণ, লম্বার পরীক্ষা, গাছারীর আবেদনও আমাদের কালে অভিনীত হয়েছিল মনে আছে, এবং তাদের সহজে ছোটখাট স্মৃতিও যে ভেঙ্গে না আসে তা নয়, তবে রবিকাকার সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই। হয় রবিকাকা কিংবা নিছু পরিচালনা না করলে কোনো নাটক করাই আমাদের সার্বক হত না। একবার আমার বড় ভাইয়ের প্রয়োজনায প্রথম মহামুন্দের সাহায্যার্থে আমরা নিমেষের বাস্তবিক প্রতিক্রিয়া করবার চেষ্টা করি। তবু রবিকাকাকে অন্ততঃ একবার দেখিয়ে আমাদের ভ্রম সংশোধন করবার সুযোগ লাভ করেছিলুম। সেবার বনদেবীরের সব নবু রঙের পোশাক ও লতাপাতা দিয়ে সারিয়ে সেই পুরনো বাস্তব নকলের পরিচয়ই দিয়েছিলুম। 'সংহে না সংহে না' গানটিতে আমরা বেরকম ভাবে বনদেবীরের মলবন্ত করে মক্কর উপর ইতস্তত বসিয়েছিলুম, তিনি সে পরিকল্পনা বলে বলে দিলেন, গানটি তাদের মনের আবেগ প্রকাশের উপযোগী করে চড়া করে গাইলে ভালো হয়।

এর পরে, আমি থাকে শান্তিপূর্ব বনেছি, অর্থাৎ রবিকাকার শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাসকালে তাঁর বেশব নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে তার সঙ্গে আমার ভেদন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তবে ১৯৪১ সালের

একবারে শেষে এখন শাস্ত্রনিকেতনের ডাঙা হাটে স্থায়ীভাবে বাস করতে আসি তখন ছুটি পুত্রনো গীতি-নাট্যকাকে উদ্ধার করায় আমার কিছু হাত ছিল—‘কাল-সুগন্ধা’ আর ‘ভাঙ্গুনিঃস্বের পদাবলী’। ভাঙ্গুনিঃস্বের পদাবলীর যে অল্পসংখ্যক গান জানতুম, সেগুলিকে স্যামিয়ে নাট্যরূপ দিয়েছিলুম। এখন এই আকারেই নাটিকাটি অভিনীত হয়। ‘কাল-সুগন্ধা’র গানও পুত্রনো ‘ভারতী’ থেকে আমার বৈধব্যী ছাত্রী সূচিক্রমে দিয়ে লিপ্যন্তরিত করেছিলেন। দুঃখের বিষয় অনেক সাধ্যসাধনা করেও ময়চৈত্র থেকে সব গানগুলির স্বর উদ্ধার করতে পারি নি, তবে অধিকাংশই করেছি।

নবর ‘রবীন্দ্রকৃতি’ শ্রীমই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের সন্নিহিত পরিচয়

হরেন। প্রবন্ধনাথ ঠাকুর

ভোগ্যপ্রদ। জানকীনাথ বোমাল ও বর্ধমানীর দেবীর পুত্র

নতুন কাকিত। জ্যোতির্মিত্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

হিংগদিহি। জানকীনাথ ও বর্ধমানীর স্ত্রীকণ্ঠ কন্ঠা

সরলাদি। সরলা দেবী

দুন্দীয়াদি। মহদির সৌমিনী ; শরৎকুমারীর কন্ঠা

প্রতিভাদি। মেঘেন্দ্রনাথের কন্ঠা, পরে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের পত্নী

অভি। মেঘেন্দ্রনাথের কন্ঠা অভিজ্ঞা দেবী

বর্ণিন্দিনা। মহদির কন্ঠা বর্ধমানী

প্রদীপ দাস। সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের বাহুদ

উদ্যাদিহি। দ্বিমেজনাথ ঠাকুরের কন্ঠা

অরুণা। দ্বিমেজনাথের পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১ই আগস্ট ১৯১৪, বৃহস্পতিবার। Ikoyi ইকোয়ি হস্টেলে আটটার নবোই প্রান্তরাণ চুকিরে নেওয়া গেল, দুদিনের হস্টেলের প্রাণ্য বিয়ে দিলুম, ঘরের বয়সকে দু শিলিং বণশিল নিতে সে মহাপুণি হ'য়ে নিলে। ইতিমধ্যে ডেলায়ামের ফার্নের গাড়ি এগে হাজির। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্রের সৌজন্তে ব্যবস্থা হ'য়েছে যে, এই গাড়ি আমাকে লেগন্ থেকে ইবানান নিয়ে যাবে, সেখান থেকে তার পরের দিন 16 ইকে নগরে যাবে, তার পরের দিন আবার ইফে থেকে ইবানানে আমাকে নিয়ে ফিরে আসবে, আর ইবানান থেকে পরে Abeokuta যাবেওকুতা হ'য়ে লেগন্-এ আমাকে আবার পৌছে দেবে। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, আর রবি, এই চার দিনের ভ্রম্ভে এরা গাড়ি আমাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলেন। এদের এই সৌজন্যপূর্ণ আতিথা না হ'লে যোক্তা বেপের ভিত্তিটা ঘুরে আসা আবার পক্ষে একরকম অসম্ভব হ'ত। পূর্ণপ্রতিভিত জাইজার উইলিয়াম গাড়ি নিয়ে হাজির—গাড়ির নম্বরটা মনে রাখবার, ১৯১। উইলিয়াম লোকটি আমার পথপ্রদর্শক আর মোডারীর কাজও ক'রেছিল। বেশি বকে না, আর গিজালা ক'রলে দখাজান উত্তর সেবার চেষ্টা করে, এর এই একটি ভগ ছিল। হস্টেল থেকে ব্রিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে প্রথমভঃ C. M. S.-এর বইয়ের লোকানে গিয়ে আরও কতকগুলি বই কিনলুম। তার পরে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্র আর নারাধনবাল, এদের বাগান গেলুম। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্র কিছু ইংরেজি টাকার বদলে ওয়েস্ট, আফ্রিকান টাকা আমাকে দিলেন, আর নাইগ্রিয়ার সরকারের External Affairs বিভাগের সহকারী সচিব শ্রীযুক্ত Smith দ্বিধ-এর সঙ্গে ফোনে কথা ক'রে যেনে নিলেন যে, আমার Kano কানো যাবার ছাওয়াই আশ্রয়ের টিকিট তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন, যথাকালে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্র-এর কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি ফিরে এগে টিকিট নিয়ে নেবো। শাড়ে ন-টার দিকে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্র আর অর বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলুম। কিছু ব্রিনিস-পত্র এদের হেফাজতে রেখে গেলুম। গাড়িতে বাত্রী শুখু আমি একা—রাবার হালে বাত্রা শুক হ'ল।

লেগন্ থেকে ইবানান ১১০ মাইল দূরে। এই পথে রেল-লাইনও আছে, ইবানান হ'য়ে আরও উত্তরে Ilorin ইলোরিন, তার পরে Jebba জেব্বা, Kaduna কাদুনা, Zaira জাইরা হ'য়ে, উত্তর-নাইগ্রিয়ার প্রগান নগর কানোতে এই লাইনে দাওয়া দায়—কানোর আরও উত্তরে Nguru নুগুরু আর Gashua গাশুয়া নগর পর্যন্ত এই লাইন গিয়েছে। রোববার পরে বড় নদী নাইগার, নাইগারের উপর রেলের পুল আছে। এই অঞ্চলে এটি প্রধান রেল-লাইন। পূর্ব-নাইগ্রিয়ার আর একটি লাইন আছে। আশ্রয়ের মিটার-গজ যাপের লাইন, টেন দীর-ময়র গতিতেই চল—ট্রেন ইবানানে যেতে গেলে অনেক সময় লাগে। এবেণে মোটর চলবার সড়ক চারদিকে ক'য়েছে—রেলের তেমন প্রসার নেই, শরি বান্ আর ঘরোয়া গাড়ি, এই-ই বেশি চলে। লেগন্ থেকে ইবানানের পথটি বেশ প্রশস্ত,

আর মোটর চলার পক্ষে চমৎকার ভাবে তৈরি। এ অঞ্চলটা বেশ জনবহুল, তবে আনানোর দেশের মতন এত ঘিণি নয়। এখানকার জমি লাল; আর ছুই-একখানা খড়্গে-ঢাকা বা মারিকেল পাতার ঢাকা বাড়ি ছাড়া, ঘর-বাড়ি বড় রাস্তার ধারে বিশেষ নেই। মাইলের পর মাইল কোনো বাড়ি গোবেই পড়ে না—অবশ্য শহর ছেড়ে একটু দেশের ভিতরে ঘাষার পরে। পথে এ গাড়ির একটু খোলমাল হ'ল—উইলিয়াম হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ব'ললে যে, গাড়ির বাঁ দিককার পিছনের চাকার অক্ষদণ্ডের ঢাকন গোল চাকতি (axle disk অক্ষ-চাকতি বা 'মাই-চাকতি') প'ড়ে গিয়েছে। আমি কিছুই টের পাই নি, কিন্তু ড্রাইভারের কানে তার আওয়াজ পৌঁছেছে। রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে' খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি ক'রলে, কিন্তু পাওয়া গেল না। পথ-চলতি অস্ত্র গাড়ি বা বাস বা লরি সংখ্যা বেশ নয়। বাসগুলি যাত্রীতে ঠাসা, আর ছাত্তের উপর দুপাকার মালপত্র। অনেকগুলি বাসের গায়ে ইংরেজিতে ডগবানের প্রতি প্রার্থনা বা অস্ত্র কিছু ঐষ্টান-ধর্ম-গম্ভীর উক্তি লেখা আছে—যেমন The Lord be with us, Thy will be done, I take refuge in the Lord, ইত্যাদি। এইসব বাসের মালিক ঐষ্টান যোকবা। আর যোকবাদের মধ্যে ধর্মভাবও যথেষ্ট—কি ঐষ্টান, কি মুসলমান, কি প্রোটান ধর্মের মাহুব। পথে এক জারিগার লরির আর বাসের বিশ্রামস্থান। সেখানে বোতলে করে palm wine—'ভেল-হুপারি' গাছের ফল, বা এখানে লোকে তড়ি বা খেজুর-বসের মতন পান করে, তাই বিক্রি হ'চ্ছে। উইলিয়ামের স্বপ্ন দেখে মনে হ'ল, সে একটু গলা ভিঁিয়ে নিতে চায়—ছয় পেনির মতন খরচ ক'রে তাকে এক বোতল খাইয়ে মিলুন, মহা খুঁশ হ'বে সে ব'ললে, it is very refreshing—সেই-মনকে তত্ব ক'রে দেখ। পথ-চলতি লোকেরের মধ্যে এই ভাড়ি-মাতীর পানীয় সেবার সীতি খুবই আছে দেখলুম। সেবে পসারীরা বাটার উপর চাটাই পেতে বোতলে ক'রে বিক্রি ক'রছে।মোটর-ড্রাইভার আর যাত্রী মেয়ে-পুরুষ ভিড় ক'রে তাদের কাছ থেকে কিনছে। অনেকে ভাল-পাতার মতন পাতার পোনা থেকে এই তড়ি বাচ্ছে।

একটি নদীর উপরে লোহার সীকো পেরিয়ে, আমরা আবেগুতা শহর ছুঁয়ে চ'ললুম, আর শেষে বেশা পোনে একটার ইবাদান নহরে পৌঁছলুম।

পথে যাবার সময়ে নাকে নাকে গির্জাও দেখি, আর মসজিদও দেখি। কিন্তু নানা স্থানে রাস্তার ধারে প্রোটান ধর্মের মন্দিরও দু-চারটে নরয়ে প'ড়ল। এই-সব মন্দির অত্যন্ত অরকিত অবস্থায়, প্রায় ভগ্ন দশায় র'য়েছে। মন্দির মানে, একটা ক'রে ঢালা ঘর—খড়ে বা পাতায় ছাওয়া। কোনো কোনো জারিগার এই মন্দিরের ভিতরে এদের সব দেবতার কাঠের মূর্তি আছে। একটু বড় নরয়ের মন্দিরে খোলাই করা কাঠের খাম—খোলাই কোনো। ফুল-পাতা বা অস্ত্র গোল-চৌকা-ডেকোনা-পান প্রভৃতি নকশার নম, নানা রকমের মূর্তি। এই কাঠের খাম আর অস্ত্র কাঠের মূর্তি হ'চ্ছে যোকবাদের আধুনিক কালের শিল্পের একটি লক্ষণীয় জিনিস।

ইবাদান শহরের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই শহরটি আফ্রিকা মহাদেশের, বিশেষ করে পশ্চিম-আফ্রিকার খাঁটি নিগ্রো শহর। যোকবারা সংখ্যার পূর্ণাঙ্গ লক্ষ—আর আবেগুতা, ইবাদান, Ogbomoshoho গুণাবোনোশো, ইলোরিন প্রভৃতি বড় বড় শহর এদের মতোই গ'ড়ে উঠেছে—'কোনো বিদেশী এসে এই-সব শহরের পত্তন করে নি। যোকবা দেশের জনসংখ্যার বেশ একটা বড় অংশ এই-সব শহরেই বাস



১২০ যৌকথা মুখশিল্প

১২১ যৌকথা জাতির কাঠের কণ্ঠ

১২২ জন ড্যানকোর্ড কৃত যৌকথা-কণ্ঠের আঠায়ে কণ্ঠের রানী ইয়োডান-এর অমণ আঠারের প্রত্নত্ব



ঐশ্বর্য ওমলেন্সি আবেগোবোর গৃহে



ইবদান । পশ্চিম-নাইজিরিয়ার রাজাশাল ও প্রবাসনয়্যো এবং অল্প অত্যাগত লোকদের সহিত

যোকবা দেশে

করে। ইবদান শহরের লোক-সংখ্যা সাড়ে চার লাখের উপর হবে; তেমনি ইলোয়িন, আবেওহুতা প্রভৃতির লোকসংখ্যা তিন লাখের কাছাকাছি হবে। এই-সব শহর যেন কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি। প্রাচীন কালে নিহমিত রাস্তাঘাট ছিল না, আধাকাশ অবশ্য তা হ'য়েছে। এত লোকের বাস, শহরের মহল। আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা পূর্বকালে তেমন ছিল না; তবে চার দিকে গোলা ভাঙ্গা ছিল প্রচুর। এখন অবশ্য রাস্তা-ঘাট ক'রে, হাট-বাজারের স্তম্ভ নির্মিত স্থান রেখে, বায়বায়নিক আধুনিক রীতি অবলম্বন ক'রে, পুথোনো গ্রামখরী শহরকে একেবারে বদলে' ফেলা হ'চ্ছে।

আমাদের গাড়ি এগে দাঁড়া'ল, ইবদান শহরে চেলোয়ানের আগ্নেয় আর মোকানের সাননে, শহরের মধ্যভাগে প্রধান বড় রাস্তার ধারে। আগে থাকতেই লেগন্ থেকে শ্রীকৃষ্ণ রূপচন্দ্র শবর পারিয়েছেন, ঠেগের ওখানেই আমার থাকবার ব্যবস্থা ছিল। লেগন্ থেকে এঁদের গাড়ি আর লরি ইবদানে প্রায়ই বাঁধা-মোসা করে। এঁদের এখানকার যাদুদার ঐক্য কমইমল দয়ারাম আসোআনী (Jhamatmal Dayaram Aswani) আমাকে সানরে খাগত ক'রলেন, আর ঠেগের আগ্নেয় উপরে যে থাকবার ঘর আছে সেখানে আমার স্তম্ভ নির্মিত কামরা দেগিয়ে' নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কমইমল ইবদানে প্রায় ষাঠ্যেগে বছর দ'রে আছে, ১৮৩৬ সাল থেকে। এঁর অধীনে ষাট বৎসর জন এঁদেরই সমাজের সিদ্ধি মুক আর প্রগতি ব্যক্তি করে। শ্রীকৃষ্ণ কমইমল থেকে আরম্ভ ক'রে আর প্রায় সকলেই যোকবা ভাষা শুনবার ব'লেতে পারেন। দেবলুম যে এঁদের গ্রাহকদের সঙ্গে আর শহরের অন্ত লোকদের সঙ্গে খুবই একটা দ্বন্দ্বতা আর মিত্রতাব আছে—এটা দেখে বড় আনন্দ হ'ল।

ইবদান শহরটা মনে হ'ল এখন মূলদান-প্রধান শহর হ'য়ে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ কমইমলের অস্থান, শতকরা চল্লিশ মূলদান চল্লিশ ঐক্য, বড়ি Pagau অর্থাৎ প্রাচীনতর্যাবলী। আর কারও-কারও মতে কিন্তু প্রাচীনতর্যাবলী লোক, যারা এখনও প্রাচীন ধর্মের রীতি-নীতি ঠাঁকচে দ'রে আছে, তাদের সংখ্যা শতকরা মনের বেশি হবে না, আর মূলদান সংখ্যা ঐক্যদের চেয়ে কিছু বেশি হবে। কিছু লকপেই বিবাদ যে, ঐক্য আর মূলদান কেউই এখনও প্রাচীন ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারে নি, আর মুক্ত হবার চেষ্টাও তেমন নেই। উপর-উপর নিরেণের গোমান কাথলিক বা প্রোটেষ্টান্ট—আর্থলিকান বা মেথডিস্ট বা প্রেসবিটেরিয়ান, অথবা মূলদান ব'লে পরিচয় দেয়, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তারা প্রাচীন ধর্মের নানা অহুতান পালন করে, তার পূজা-পার্বণে যোগ দেয়, তার পুণ্যস্থিতদের কাছে গিয়ে ভাগ্যপূজা করায়, ভবিষ্যতের খবর নেয়, আর তাদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রাচীন ধর্মের হুত-প্রোত ডাইন-ডাইনি আর পিতৃপুরুষের শক্তি সঙ্ঘে অবিচ্ছিন্ন বিশ্বাস বিস্তারন আছে। বাই ছোক, ইংল-কলেজের শিক্ষা আর ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতা বেশি দিন এই সাবক ধরণের বিশ্বাসকে টিকতে দেবে না,—যদিও আজিকারনের মধ্যে ইংরিজি-শিক্ষিত অনেকেরই এখন আবিষ্কার ক'রছে যে, তাদের প্রাচীন ধর্ম আর চিন্তাপ্রাণীতে, তাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনের পক্ষে অনেক মূল্যবান ব্রিনিশ আছে। এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিৎদের গবেষণাই একটা বথার্থ ঐতিহাসিক আর কাণ্ডকরণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি মুকলের মধ্যে এনে নিচ্ছে।

ইবদান শহর যোকবা আতির সাম্প্রতিক আর নাগরিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, আর আমার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বরী শ্রীকৃষ্ণ Obafemi Awolowo ওয়াফেমি আতোলোয়ো মহাপ্রবীর নিবাসস্থান। আমি যে তার সঙ্গে আপুছি, এ খবর আগেই উকে জানানো হ'য়েছিল। একটু বিশ্রামের পর, শ্রীকৃষ্ণ কমইমল আমাকে নিয়ে

রৌকবা দেশে

গেলেন শ্রীকৃষ্ণ আরোলোহোর বাড়িতে। কতকটা আশ্বাসের ভারতীয় বাড়িরই অল্পরূপ। যুরোপীয় মতে সাজানো, তবে পর্দার কাপড় প্রভৃতি স্থানীয়। আরোলোহোর আনাকে তাঁর দোতলার বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেলেন। খুব আত্মীয়তার সঙ্গে স্বাগত ক'রলেন। আরোলোহোর-গৃহিণী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এদের পাঁচটি সন্তান, দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। আরোলোহোরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হল— তবে আমার পক্ষে অল্পবিধে হ'ল এই যে আমি এঁদের দেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত নই, রাজনীতিক আবহাওয়া কেনন, কতগুলি বিভিন্ন বল আছে, এদের মধ্যে দত্ত বা কার্যক্রমের বিরোধ-ই বা কি কি, এদর জানা না থাকায়, নাইজিরিয়ার আধুনিক রাজনীতিক অবস্থা লম্বা হ'লে ঠিক দিকে আলোচনা ক'রতে পারবু না। তবে বেশির ভাগ কথা হ'ল, ঐ দেশের সংস্কৃতি আর শিকার বিষয়ে। কথা ছিল, ঠিকের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন ক'রতে হবে, তার পরে আরোলোহোরো তাঁর নিজের বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন, পশ্চিম-নাইজিরিয়ার প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে তাঁর ক্ষত্র যে নতুন বাসভবন নির্মাণিত হ'য়েছে সেখানে। এই নোভুন বাড়ি শহরের বাইরে একটু পল্লী-অঞ্চলে তৈরি হ'য়েছে, আর এর আশপাশে ক্ষত্র মন্ত্রী আর বড়-বড় সরকারি কর্মচারীদের সরকারি বাসভবন। শ্রীকৃষ্ণ আরোলোহোরো এর আগে কখনও এই নোভুন বাড়িতে রাত্রি-যাপন করেন নি— আমার ক্ষত্র তাঁর এই নোভুন সরকারি বাসভবনে রাতিবাসের ব্যবস্থা হ'য়েছে, এবং তিনিও আমার সঙ্গে এসে প্রথম ওখানে রাত কাটাবেন। বিকালে তিনি তাঁর নোভুন বাড়িতে একটি চা পান সভার আয়োজন ক'রেছেন, আমার সঙ্গে স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেবার ক্ষত্র। সন্ধ্যার পরে, আমি গিয়ে আমার শিষ্ঠী বন্ধুদের বাড়িতে গায়মাশ সেবে আসবো, আর তার পরে বাড়ি ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে ক্ষত্র নানা বিষয়ে একটু অল্পরূপ আলোচনা হবে। শ্রীকৃষ্ণ আরোলোহোরের স্ত্রী সেইদিনই বিকালে নক্সুই মাইল দূরে আর একটি শহরে যাবেন, সেখানে তাঁর এক আত্মীয় বৃদ্ধা রয়েছেন, সন্ধ্যার দিকে তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে, এই অস্বাভাবিকতার পরে তিনি আবার নক্সুই মাইল গাড়ি ক'রে ফিরে আসবেন, বেশ রাত্রি হ'য়ে যাবে তাঁর ফিরে আসতে, পরের দিন সকালে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হবে।

ছুপুরে আরোলোহোরের গৃহে মধ্যাহ্নভোজন চুকোতে প্রায় পৌনে তিনটে বাজল। তিনি ইংরেজি কায়দার খাওয়ালেন—ঘন দুগ, বনেন হল তাতে প্রচুর মাখন দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু পরে তখনই মাখন নয়, পান-অয়েল বা জেল-সুপারি গাছের তেল; fish cakes বা মাছের বড়া, শালগম ও কড়াইখুটি নির্ভর সঙ্গে chicken-pie, অর্থাৎ ডিমের ময়ুরির মাংস ও বাইরে বহুদার আবরণ, বড় গোল বাড়ির আকারে, সমস্তা স্নেহপদার্থ নিয়ে আব-ভাজা; তাত, চিনির রসে ভোবাবো পেয়ার-ফল, আর ক্রোম বা ননী। এরা বেশ যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। আহায়ে পর ক্রিমজী আরোলোহোরো, গাড়ি তৈরি ছিল, চ'লে গেলেন, আর আমাকে শ্রীকৃষ্ণ আরোলোহোরো তাঁর নিজের বাড়িতে ক'রে তাঁর নোভুন বাড়িতে নিয়ে এলেন।

আরোলোহোরো বাড়ির বাইরে এক পুখু অংশের দুটো ঘর নিয়ে একটা কাপড়ের-সোকান রেখেছেন। এই সোকান তাঁর স্ত্রীর নিদ্রাঘ, একরকম স্ত্রীঘন। বর্মার মত রৌকবা দেশে (আর আফ্রিকার ক্ষত্র বহু দেশে) মেয়েরা খুবই স্বাধীন, তাদের নিদ্রাঘের পুখু সম্প্রতি রাখবার অধিকার আছে, এবং বাপের, স্বামীর বা ভাইয়ের তাঁবে না থেকে, স্বতন্ত্র ভাবে সোকান-পাট, বিকিকিনি চালাতে পারে, তাদের লাভ-লোকসানের

স্বকৃতি নিজেদের নিতে হয়। এই প্রথা থাকায় যেকোনো মেয়েরা আবলম্বী, আর কারও তোচ্চাকা সাধে না, আর তাদের এই অধিকার মেয়েরা ছাড়বে-ও না। এইজন্য মূলধান ধর্ম এ দেশে নোহুদন রূপ গ্রহণ ক'রছে, এটা মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতার বেশ। মেয়েদের মধ্যে পর্না এখানে কখনও প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে হয় না। প্রগতি-মন্ত্রীও শ্রী হ'য়েও সোফান চালাতে আরোলোলো-পন্ডার লক্ষ্য নেই, বরং গর্বের বিষয়। এ বেশ ছোট-খাট সোফান-পাট সবই মেয়েদের হাতে। একখানা কাপড়ে ক'রে পিঠের সঙ্গে কটি ছেসে-ক বেঁধে, মাথায় খিকির ঝিনিদের পসরা নিয়ে' মেয়েরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, অথবা ছোট বা বড় সোফানে পসরা লাগিয়ে ব'সেছে, পিঠে কিন্তু ছেলে বা মেয়ে কাপড়ে ঢড়িয়ে বাধা (এ বেশে শিশুদের কোলে-পাখে নিয়ে বেড়ায় না) —এই পন্থা যেকোনো দেশে এবং পশ্চিম-আফ্রিকার সর্বত্র খুবই সাধারণ।

ইংরেজরা এখন মেনে নিয়েছে যে নাইজিরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হবে, আর নাইজিরিয়ার জনসাধারণ নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক'রবে, নিজেদের রাজ্য নিজেরাই চালাবে। খালি ইংরেজরা ব্যবস্থা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখতে চায়, আর তারা আশা করে যে কিছুকাল পর্যন্ত অস্ত্র, পিছন থেকে রাষ্ট্রপরিচালনার কলকাটি তামাই নাড়বে। এখন থেকে ইংরেজ ন্যাশিওনালিস্ট বা কনিশনার আর অস্ত্র কখনোই নাইজিরিয়ার মন্ত্রীদের লগুন সেবিয়' চ'লতে আরম্ভ ক'রছে, তাঁদের Sir বলে সম্বোধন করে। এটা এখন অভাবনীয় ব্যাপার, আর দক্ষিণ-আফ্রিকার যেতকার ব্যক্তির, বাহা Apartheid অর্থাৎ সাধা আর কালোয় পৃথক-করণ নীতি কয়েকি ক'রে রাখার পক্ষে, তারা ভো এই অবস্থা বেসলে ক্রোধে ক্ষোভে ঘূর্ণি বাবে। ডক্টর আরোলোলো তাঁর গাড়ি ক'রে আমাকে তাঁর নোহুদন বাড়িতে নিয়ে চ'ললেন। পথে রাস্তাটা একটু সরু ছিল, সাহনে আর একখানা মোটরগাড়ি এসে প'ড়ল। তার চালক ছিল একজন ইংরেজ, গাড়ির চালক-ই নিজে গাড়ী চালাচ্ছিল। ইংরেজের গাড়িখানা ধীরে ধীরে জায়গা থাকা লেবেও ভান দিক ঘেঁষে রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিল, ডাক্তার আরোলোলোর গাড়ির আফ্রিকান চালক আইন-নোভাবক ঠিক-মতোই গাড়ি। দুখানা গাড়ি সাধনাসামনি হ'য়ে গেল। ইংরেজ আমাদের গাড়ির আফ্রিকান চালককে বহুদের হুরে ব'ললে, গাড়ি পিছু হটিয়ে' নাও। নিজে চালক ইংরেজিতেই ব'ললে, তোমারই মোব, জুনি বা মিক ঘেঁষে যাচ্ছ না কেন? ইংরেজ নিজের কেটি ছাড়বে না, সে আমাদের চালককে দিয়ে আমাদের গাড়িকে পিছু হটিয়ে' নিয়ে যাওয়াই। ডাক্তার আরোলোলো তাঁর চালককে বোঝা ভাষায় বা ব'ললেন, অহুমনে বৃত্তনু তার মনে হ'চ্ছে, জুনি ন'চো না। তার পর তিনি গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বা'র ক'রে ইংরেজের দিকে তাকিয়ে' দেখলেন। তাইতেই ইংরেজ ঠেকে পশ্চিম-নাইজিরিয়ার প্রধান-মন্ত্রী বলে চিনে কেলে, আর Oh, I am very sorry, Sir বলে নিজের গাড়ি হটিয়ে' বখান্য়ানে রাখলে, আমাদের গাড়ি ঠিক পথ দিয়ে চ'লে গেল। ঘটনাটি ছোট, কিন্তু এই থেকে ইংরেজদের স্বত্ত্বির পরিচয় পাওয়া যায়—শেষ বধন ছাড়তেই হবে, তখন থানক। মান বাড়াবার চেষ্টায় মান খোদাবার কোনো অর্থ হয় না।

ডক্টর আরোলোলোর নোহুদন বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠলুম। বাড়িটি মাঝারি আকারের, নীচে দু-তিনটি বড়-বড় ঘর আছে, উপরের একটি ঘর আমার জন্য নির্মিত হ'য়েছে। আধুনিক সমস্ত ব্যবস্থা, জলের কল, বিদ্যুতি-বাতি, সানঘর ইত্যাদি। অহুরোধ হ'ল, বানিকশন বিশ্রাম ক'রবে, তারপরে লাড়-

চাংটেই ঐ বাড়ির নীচের তলায় শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব আগবেন, আমার সঙ্গে চাং বাবেন, স্থানীয় সেন্ট্রাল গভর্নর বা ছোটলটি আর তাঁর স্ত্রীও আগবেন। সকালবেলা বেরিয়েছি অটোর পরে, এমন প্রায় বেল: তিনটে—ভালো ক'রে স্থান ক'রে নেওয়া গেল। গৃহকর্তা থাকাশে আমাকে নীচে নিয়ে গেলেন, অভিনন্দন একে একে আসতে লাগলেন। পশ্চিম-নাইজিরিয়ার অধ্যায়ী সেন্ট্রাল গভর্নর শ্রীযুক্ত C. M. Shankland স্নাকলাও আর তাঁর স্ত্রীও এলেন, আর দুজন ইউরোপিয়ান ডব্রলোকও এলেন। আফ্রিকান লোকসের মধ্যে জন-তিনেক অস্ত্র মস্ত্রী, আর একজন বড় মদিনার বা সর্দার—এ সেরে এঁদের Chief বলে—তিনিও এলেন। শ্রীযুক্ত Ado Thani আমো থানি বলে একজন ইংরেজি-পোশাক-পর্য ডব্রলোক এলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তিনি হ'লেন এখানকার Information Officer অর্থাৎ সূচনা-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী। স্থানীয় ইবাদান ইউনিভার্সিটি কলেজের একজন অধ্যাপক এসেছিলেন, লোকটিকে বড় ভালো লাগল, অর্থনীতির অধ্যাপক, বিশিতি ছাপ আছে, অন্ন বংশ, অতি বুদ্ধিমান আর সদালাপী ব্যক্তি, শ্রীযুক্ত Ayo Ogunsheye আমো ওগুনশেয়ে, ইনি হচ্ছেন এখানকার Extra-mural Studies, অর্থাৎ কলেজের শিক্ষার বাইরে পেশমস্ত অধ্যাপনা করা হয় সে বিভাগের ডেপুটি-ডাইরেক্টর। ইবাদান শহরের ডারভীয় বণিকদের মধ্যে জন চার-পাঁচ এই সভায় নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঝমটমলও ছিলেন।

ধানির ফটোগ্রাফ-বল কটামট আমাদের বিস্তর ছবি তুললে। শ্রীযুক্ত Shankland একটু ভালোমাহুয় গোছের লোক, আমার সঙ্গে বেশ সহজভাবে দ্বন্দ্বভার সঙ্গে কথা ব'লতে লাগলেন। আফ্রিকার সংস্কৃতি শিল্প খর্বস্বীভবন প্রভৃতি বিষয়ে সূদূর ভারতের একজন অধ্যাপকের আগ্রহ সেরে একটু বিশদিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রস্তাব ভাবও বেন দেখলুম। বারান্দায় একটি ঔপ-কোটে জোলবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। পাঁচখানা চেয়ার লাগানো হ'য়েছে। আমাদের বাইরে জেক নিয়ে গেল। শ্রীযুক্ত Shankland মাঝের চেয়ারটাতে ব'সতে ঘাবেন, কিন্তু ডক্টর আরোলোস্তো তাঁকে ব'ললেন যে, তাঁদের সম্মানিত ভারতীয় অতিথি মাঝে ব'সবেন। শ্রীযুক্ত আরোলোস্তোর নির্দেশ অহুগাবে আমাদের এইভাবে কসানো হ'ল—ডক্টর আরোলোস্তো আমাদের জানদিকে, তাঁর পরে Mrs. Shankland, মাঝখানে আমি, অন্যের ঠা দিকে একজন আফ্রিকান মহিলা, ইনি পশ্চিম-নাইজিরিয়ার একজন মস্ত্রী, এবং শেষে শ্রীযুক্ত Shankland। আমাদের পিছনে পাড়িয়ে ভারতীয় বণিকগণ ও কতকগুলি আফ্রিকান অতিথি। আফ্রিকান ডব্রলোকেরা কেউ-কেউ পুরো ইউরোপিয়ান পোশাকে এসেছিলেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেক যোদ্ধা পোশাকে ছিলেন—সেই পোশাক টিলে আলখাল্লার মতন, আর পায়ে সাধারণত: চমল জুতো। মোকবারা নীল রঙটা পছন্দ করে। এঁদের ঘেরেঘের কাপড়ও নীল রঙের আধিক্য। শ্রীযুক্ত আরোলোস্তো পয়েছিলেন ঘন নীল আর কিকে নীল আর সাধারণ বড় বড় চৌকো কাটা, কাপাসের কাপড়ের আলখাল্লা। আমি অধ্যাপক ওগুনশেয়ের এবং আরও কতকগুলি অস্ত্র আফ্রিকান ডব্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হলুম।

ছটার দিকে, তখনও কিছু আলো আছে, শ্রীযুক্ত থানি আমাকে নিয়ে গেলেন ইবাদানের পুরাতন কলেজ আর নোভুন বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে। নোভুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ইয়ারত তখনও তৈরি হ'চ্ছে। ছাত্র আর ছাত্রীদের অস্ত্র অতি চমৎকার প্রশস্ত বারান্দা-যুক্ত বাসগৃহ তৈরি হ'য়েছে।

এখন ছুটির সময়, নিয়মিত ছাত্রেরা কেউ নেই ; তবে সময় বেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দেবার ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর অনেক ছাত্র এসে আছে। এদিক একটি extra-mural ক্লাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বাইরে যেখানে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, সে রকম একটি ক্লাস চলছিল। সন্ধ্যা, উত্তর, পশ্চিম আর পূর্ব এই তিন অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্রেরা এসে জমা হ'য়েছে। যে ক্লাসে শ্রীকৃত থানি আমাকে নিয়ে গেলেন, সেখানে একজন আফ্রিকান প্রোকেসর Conciliation (and not Arbitration) in Labour Disputes অর্থাৎ প্রমিকে-খনিকে মত-বিরোধ হলে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য-মূলক মিলন—তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে—এই বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, অবশ্য ইংরেজিতে। আমি ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের মধ্যে ব'লেই শুনেতে লাগলুম, এতে ক্লাসে একটু সাড়া প'ড়ে গেলেও কারো কোনো বাধা হ'ল না। যে অধ্যাপকটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, বেশ স্বক্টিপূর্ণ কথা ব'লছিলেন, বিশেষ শুভ ইংরেজিতে। অধ্যাপক ওজনপেয়ে আমাদের চারের পার্টি থেকে ফিরে এসে এই আলোচনা-সভায় সভাপতির ক'রছেন। অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ হ'য়ে গেলে, আমাকে এঁরা অহরোধ ক'রলেন ছাত্রদের দু'কথা ব'লতে। আমি ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের অধ্যাপক আর ছাত্রদের পক্ষ থেকে, আফ্রিকান লোকেরের সঙ্গে আমাদের লম্বাহুত্ব আর তাদের বাদীনতা-লাভের সাফল্যের ক্ষেত্রে শুভ কামনা জানালুম, আর আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতার, আফ্রিকার জাতীয় আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের জানবার ইচ্ছা প্রকট ক'রলুম, ভবিষ্যতে নিজেদের সম্বন্ধে পূর্ণভাবে গণ্যতন হ'য়ে আফ্রিকার সাহস ও জগতে নোহুন জিনিস যে বিতে পারবে, সে আশাও প্রকাশ ক'রলুম। শ্রীকৃত ওজনপেয়ে বেশ খুশি হ'য়ে ভারতবর্ষের প্রশংসা ক'রে আমাকে ধন্যবার দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিদর্শনের সময়ে শ্রীকৃত থানির কোটোগ্রাফেরা অনেক ছবি নিলে।

তখন সন্ধ্যা বেয়েছে, আমি শ্রীকৃত থানিকে ব'ললুম যে আমাকে শ্রীকৃত John Danford জন ড্যানফোর্ড-এর বাড়িতে নিয়ে চলুন। সেগদ্-এ এর কথা শুনেছিলুম, ইনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্মচারী, ইবাদানে বাস ক'রছেন, যেমন শিল্পরসিক তেমনই উন্নয়নের শিল্পীও বটে। ইবাদান শহরটি সড়কার দিকে অতি স্বন্দর লাগল, এখানকার ছবি ডেউ-পেলানো, চারিদিকে সবুজে ভরা, সন্মানাভিহীন। পথে হটাৎ ক'লকাতায় যিনি এসেছিলেন আর অম্বার বাড়িতেও গিয়েছিলেন, পশ্চিম-নাইজিরিয়ার কুয়িম্বী শ্রীকৃত Akinloye আকিনলোয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি ইবাদানে ছিলেন না, সেইদিনই ফিরেছেন, আবার তার পরের দিন চল'লে যাবেন। পথে গাড়ি থানিরে' আমাদের শিষ্টাচার হ'ল।

শ্রীকৃত ড্যানফোর্ডের বাড়িতে রাজি সাড়ে-আটটা পর্যন্ত থাকা-দেড়েক ঘ'রে নানা বিষয়ে আলোচনা হ'ল। শ্রীকৃত ড্যানফোর্ড একটি বেশ লক্ষণীয় আফ্রিকান শিল্পের সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছেন। আফ্রিকান জীবনকে অবলম্বন ক'রে তাঁর নিজে খাঁকা অনেক ছবিও আছে, তার কিছু-কিছু আমার সানন্দ-আগ্রহে দেখালেন। Cameroon কামেরুন দেশের পিতলের ঢালাই করা মূর্তি আর অস্ত শিল্পবস্ত্র দেখালেন। মোক্কা দেশের Oyo ওয়া শহর ইবাদান থেকে তিরিশ মাইল দূরে, সেখানে calabash অর্থাৎ লাউয়ের তুধির উপরে অনেক রকম নকশা কাটা হয় ; আর পাত্র-রূপে ব্যবহৃত এই-সব তুধির গায়ে কখনও-কখনও রোমান অক্ষরে রোকেবা ভাষার প্রবাদবাক্য লেখা থাকে। দু-তিনটি প্রবাদ লিখে নিলুম ; যেমন, Omo Lere : Ami Ape (ওয়া লেরে : আমি আপে)—অর্থাৎ "শিশু লাভ : তথ্যই হে" ; অর্থাৎ

য়োরুবা দেশে

কিনা, হাথের জীবনে সন্তানই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ভগবান তাই করুন ; Ori Elegam Po : Ami (ওরি এলেগাম কো : আমি)—“নিম্নকের মাথা ডাঙ্ক : তথ্য।” যোরুবা দেশে মধ্যে এরকম বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে, অতি সংক্ষেপে তারের ভাষার মতন এই-সব প্রবাদের অনেকখানি মানে করা যায়। ইবানান থেকে অনেক দূরে বিখ্যাত Benin বেনিন শহরে, যেখানে Bini বিনি বা Edo এদো জাতির বাস, আর বেথানকার প্রাচীন অস্তে ঢালা মূর্তি আর ফলক আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন ব'লে গণ্য, সেই বেনিন শহরে এদের এক প্রাচীন কালের বিখ্যাত রাণী Imotan ইমোতান্-এর মানবাত্মনের স্মৃতি-ঢালা মূর্তি ভূ-ড্যানফোর্ডকে দিয়ে করিয়ে নগরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। “এই মূর্তির ছবি আমাকে দেখাশেন—ড্যানফোর্ডের কাছ থেকে তাঁর কোটোগ্রাফের ঠিকানা নিয়ে পরে লওনে গিয়ে এই মূর্তির কথননা কোটো আমি সংগ্রহ করি। ড্যানফোর্ড আশায় ব'ললেন যে, ঐ রাণী, ঐরূপ মূর্তি লতকে যিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর বংশের একজন রাজকুমারীকে আশ্রয় ক'রে, তাঁকে পুরাতন অঙ্গাভাষি পরিচয়' এই মূর্তি তিনি তাঁকে দেখে তৈরি করেন। এটি খুবই শোচনীয় হয়েছে। ড্যানফোর্ড আরও কতকগুলি যোরুবা শিল্পীর কার কাঠের মূর্তি দেখালেন, এগুলি অতি সুন্দর, যদিও সমস্ত মূর্তির উদ্দেশ্য বা অর্থ বুঝতে পারলাম না। কতকগুলি এদের প্রাচীন দেবতার, কতকগুলি রাজা-রাজড়ার, আর কতকগুলি জনসাধারণের।

ড্যানফোর্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিদ্ধী বন্ধুদের বাসায় গেলুম। এখানে আরও দু-তিনটি সেকান থেকে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আরও কতকগুলি সিদ্ধী ভ্রমলোক এগেছিলেন। সিদ্ধীদের ডেকে এঁরা আমির নিগ্রামির অনেক পদ করেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মস্ত-পান চ'লতে থাকে, আর আড়াই-তিন ঘণ্টার মধ্যে নিম্নমুখিত পাওয়া যায় না। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ক'রতে ক'রতে আর একে-একে নান। শুপ'নো হাচ্চ ও নাংলের পর খেতে খেতে, অনেক সময় কাটিয়ে' পরে মধ্য ভোজনে বসে গেল। এরপর এই ঘেহ আর পৌষন্তের অভ্যাচার থেকে সাড়ে-এগারোটায় পর মুক্তি পেলাম, তখন হাফিহাপনের জগৎ শ্রীকৃষ্ণ আন্তোলোত্তোর গৃহে আমার প্রত্যাবর্তন হ'ল। তাঁর সঙ্গে যে দুই ব'সে কথাবার্তা কইবো দ্বির ছিল, এটি এত রাত্রে তা আর হ'য়ে উঠল না। তিনিও ক্লান্ত ছিলেন, আর আমারও ক্লান্তিতে আর ঘুম জোপ জড়িয়ে' আসছিল। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল। ইবানান শহরের মিউনিসিপ্যাল ইন্সপেকশনে শ্রীকৃষ্ণ আন্তোলোত্তোর রাজনীতিক দল Action Group-এর পরামর্শ ঘটেছিল, বিয়েদী দল, N. C. N. C. অর্থাৎ National Convention of Nigeria and the Comeroons -এর কাছে—তাঁর সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা Dr Nuamadi Azikiwe নামিদি আজিকিরের মতামতের কথাবার্তা। জানবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে শোনা আর হ'য়ে উঠল না। আগামী কাল সকালেই তিনি কার্যাবসরে অত্র এক শহরে যাবেন ; আর আমাকেও ইবানান থেকে একদিন আর এক রাতের ভ্রমে যোরুবা জাতির ধর্মবিষয়ক কেন্দ্র ইফে শহরে যেতে হবে।

৬ই আগস্ট ১৯৬৪, শুক্রবার। ভোরের বেলাতেই মৃচনা-বিভাগের শ্রীকৃষ্ণ বানি এসে উপস্থিত হ'লেন, আর চেম্বারমেনের গাড়ি নিয়ে ঢালক উইলিয়াম্-ও এসে প'ড়ল। শ্রীকৃষ্ণ আন্তোলোত্তোর সঙ্গে প্রাতঃরাশ সেয়ে নেওয়া গেল। যোরুবা দেশে আর পশ্চিম-আফ্রিকার অন্তর একটা নতুন দৃশ্য দেখা দিচ্ছে—স্থানীয় মূলধানদের মধ্যে ধীরে-ধীরে ক্রমবর্ধমান পাকিস্থানী মনোভাব। সাধারণ যোরুবা আর অন্ত আফ্রিকান মূলধান এখনও ধর্ম-বিষয়ে অনেকটা উদার আছে, খুব গোঁড়া মনোভাব হু-চার ঘন নোন্টা-শ্রেণীর

লোকের মধ্যে দেখা গেলেন, এরা দেশের মধ্যে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে মুসলমান রাজ্য বা মুসলমান প্রতিষ্ঠা বাড়ি করবার জন্য এখনও তীব্র চেষ্টা করছে। কিন্তু এদের কেউ-কেউ বাইরের থেকে প্ররোচনা পেয়ে, আর আশঙ্ক ভাবে, জাতীয়তা-বিরোধী বংশে ইংরাজ শাসকসম্প্রদায়ের কিছুটা সমর্থন পেয়ে, এখন নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে, একই বেশি রকম মুসলমান সমাজকে মুসলমান-হিলাবে, ঘোষণা বা আক্রমণ হিসেবে নয়, সচেতন করে তোলবার চেষ্টা আছে। শ্রীকৃষ্ণ আরোলোরো আমার বংশলেন যে নাইজিরিয়া, বিশেষত পশ্চিম-নাইজিরিয়ার সরকার এ বিষয়ে কোনো ধর্ম বা শ্রেণীর প্রতি কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব করেন না। উত্তর-নাইজিরিয়া আর অন্ত-অন্ত আয়গার মুসলমানদের সরকারি শিক্ষায়তনে ভরতির অন্ত বিশেষ সংযোগ-সুবিধা দেখা হয়। উত্তর-নাইজিরিয়া মুসলমান-প্রধান অঞ্চল, আর সেখানে শিক্ষা, অর্থায় আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার উন্নতিও হয় নি—সেইজন্য সেখানকার লোকের মনে একটা আপত্তা দেখা দিচ্ছে যে, পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত অগ্রগত ঘোষণা আর ইতো জাতির লোকেরই স্বাধীন নাইজিরিয়াতে প্রতিপত্তি আরও বাড়বে। (আমি অল্পম শুনেছিলুম যে নাইজিরিয়াতে স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন চলছে, আর তাইয়ের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতি হিসাবে ইংরেজরা যে আন্দোলনকে মেনে নিয়েছে, উত্তর-নাইজিরিয়ার Hausa হাউস; আর অন্ত মুসলমানেরা সাধারণতঃ সেই আন্দোলনে আগ্রহ দেখাচ্ছে না; আর তারা চায় যে উত্তর-নাইজিরিয়া পৃথক একটি মুসলমান রাষ্ট্র হয়ে স্বাধীনতা লাভ করুক,—অন্তাধার তারা ইংরেজের অবদানেই থাকবে। তবে সম্প্রতি শুনেছি যে উত্তরের জন কয়েক দূরদর্শী শিক্ষিত নেতা এখন পশ্চিম-পশ্চিম আর পূর্ব-নাইজিরিয়ার নেতাদের সঙ্গে মিলে, সমগ্র সম্মিলিত নাইজিরিয়ার জন্যই স্বাধীনতা চাচ্ছেন।) শ্রীকৃষ্ণ আরোলোরোর মতে, উপস্থিত এ সমস্যা তেমন জটিল বা প্রবল হয়ে ওঠেনি, তবে ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনা আছে। এখন তারা নিজেদের মধ্যে স্বাধীন চেতনা আর একতা সৃষ্টি করার জন্যই ব্যস্ত। দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকে চায়, উঁচু পথে বা চাকরিতে ইংরেজের বদলে যোগ্য সেনা লোকেরই নিয়োগ যাতে বেশি করে হয়। আরোলোরো নিজে ধর্ম খ্রীষ্টান, এবং পরে দেখলুম যে, তিনি নিঃস্বাভাব খ্রীষ্টান—নিজের সম্প্রদায়ের গির্জায় প্রতি রবিবার নিয়মিত-ভাবে সপরিবারে যান। “অস্বাভাব মজতে জগৎ”—তিনি উপার-দ্রব্য ব্যক্তি, সেইজন্যে ধর্মমতের গোঁড়ামি তিনি বোঝেন না আর তার বিপদের কথা নিয়ে মাথা ঘামান না। আমি তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত স্বাধীনতার সেবার সংগ্রহ, পরমহংসদেবের উপদেশ, Aldous Huxley-র কৃষিক-সম্মত স্বাধীন প্রভাবান্বিত আর Christopher Isherwood ক্রিস্টোফার আইশারউড-এর অনূদিত গীতা, আর আমার কতকগুলি প্রবন্ধ তাঁকে দিলাম—তিনি আগ্রহের সঙ্গে মিলেন—Universal Prayers বলে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত সংকৃত কতকগুলি প্রার্থনার সংগ্রহ, ইংরেজি অনুবাদ সমেত, আগ্রহের সঙ্গে পাতা উলটে দেখতে লাগলেন। শ্রীমতী আরোলোরো গত রাত্রে তার স্বামীকে অস্ত্রাঘাত থেকে ফিরে এগেছিলেন, প্রাতরাশের পর তাঁর সঙ্গে দেখা হ’ল। এঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে এঁদের স্বামী-স্ত্রী আর তিনটি সন্তান, যারা বাড়িতে ছিল, তাঁদের সঙ্গে আমার ছবি তোলা হ’ল। এঁদের ছেলেমেয়েদের যে ভাবে ঘোষণা ভাষায় নামকরণ হ’য়েছে, তা থেকে এঁদের সামাজিক স্বাধীনতা আর ধর্ম-স্বাধীন চেতনা কতকটা বুঝতে পারা যাবে। আরোলোরো মঙ্গলবার ছেলেমেয়েদের নাম—

১। প্রথম সন্তান, পুত্র, তখন বয়স ১৫, নাম Olushegun (ওলুশেগুন), অর্থ, the Lord conquers, অর্থ “প্রভুরই আর”;

য়োরুবা দেশে

২। কস্তা, বয়স ১০, Omotola (অমোতলা), অর্থ, C Whild (omo) as good as (to) wealth (ola), অর্থাৎ “সম্মান-ই সম্পদ”;

৩। পুত্র, বয়স ১১, Oluwale (ওলুৱালে), অর্থ, the Lord enters our home, “প্রহু আমাদের গৃহে এসেছেন”

৪। কস্তা, বয়স ২, Aiyodele (আইয়োদেলে), = Joy comes into the home “খুশি আনন্দ এসেছে”

৫। কস্তা, Olatokumbo (ওলাতোকুম্বো), = “সাগর-পার থেকে শ্রী এসেছে”— এই কস্তাটির জন্মকালে ডব্লিউ আত্রোলোরো ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন, সেইজন্মে এই নাম।

আত্রোলোরো সম্পত্তীর কাছ থেকে বিশেষ জয়তার সঙ্গে সেই শব্দের মতন বিদায় নিলুম। শ্রীকৃত্ত পানি আমাকে নিয়ে গেলেন শ্রীকৃত্ত আত্রোলোরোর প্রতিবেশী Minister without Portfolio, অর্থাৎ বিশেষ কার্যভার-বিহীন মহা Chief the Honourable Ola Alaiyeluwa Olagbegi II, Olowo of Owo, অর্থাৎ ওরো-প্রদেশের ওলোরো-উপাধিকৃত্ত জমিদার বা রাজা দ্বিতীয় ওলা আলাইয়েলুৱা ওলাগবেগি। যখন বেওয়ার ইনি নীচে নেমে এসে আমার সঙ্গে লাক্ষ্য করলেন—হুতহু দীর্ঘবসু বৃক, চিলে নীল রঙের যোক্তা আলখালা প'রে, বাধার রঙিন হুতোর হুতোর কাজ করা একটি টুপি, তার উপরে একটি পালাখ, আর হাতে তাঁর রাজ্য-ও-রূপে একটি সাফা চামর, সম্ভবত সিংহের কেন্দ্রে তৈরী। শুনলুম, ইনি একজন বিশেষ শিক্ষিত ও শংকুতি-পূত চিত্তের মানুষ। আমার সঙ্গে ব'লে অনেককণ ধ'রে কথাবার্তা করার ঐর আশ্রয় লেবলুম, কিন্তু দশ মিনিটের বেশি ঐর কাছে থাকা হ'ল না।

এর পরে, শ্রীকৃত্ত পানি আমার সঙ্গে কাছ থেকে বিদায় নিলেন— ইনি ঐর সূচনা বিভাগের দুজন কর্মচারীকে আমার সঙ্গে নিলেন। এরা দুজনে আমার সঙ্গে ইকে বাবে, আর অবশ্যক-মতন ছবি তুলবে; আর আমার ইকে-ভ্রমণের একটা রিপোর্ট সরকারকে দেবে, সূচনা-বিভাগ থেকে প্রকাশের ক্ষমতা। এরা দুজনই বৃক আর বেশ বুদ্ধিমান আর কৃতকর্মী। একজনের নাম Bernard Akenabor বার্ণার্ড অকেনাভর, এ জাতিতে এগো, অর্থাৎ বেনিন-নগরের অধিবাসী; এ কোটোগ্রাফর। দ্বিতীয় বৃকটির নাম Mac Pepple মাক পেপল্, এ জাতিতে ইবো, আর এ হ'চ্ছে রিপোর্টার। এদের ভাষা যোক্তা ভাষা থেকে আলাদা, তবে ইংরেজি এদের মধ্যে সাধারণ ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম— এতে কোনো অসুবিধে নেই, বরং এই ইংরেজি ভাষাই এতগুলো বিভিন্ন ভাষার মানুষকে এক ক'রে ধরেছে। আমরা ইবাডান শহর থেকে বেরোবার পূর্বে স্থানীয় সব-চেয়ে বড় বইয়ের দোকান Oxford Book Stall-এ গেলুম— এই বইয়ের দোকান, অত্র পশ্চিম-আফ্রিকার তাবৎ শহরে যেন, একটি মিশনারি সম্ভারের দ্বারা পরিচালিত— Church Missionary Society দ্বারা। তবে Gold Coast পোস্টকোষ্ট (বা অধুনা Ghana পান্না নামে পরিচিত) রাষ্ট্রে Achimota আচিমোতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বড় বইয়ের দোকান আছে, সেটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারাই পরিচালিত। এখানে আমি নাইজেরিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি লিখিত সাময়িক পত্র ও অত্র বই কিনলুম। শ্রীকৃত্ত পানির সঙ্গে এই শেষ দেখা। ভুলোকোটি* অতি সঙ্গর, আর যাতে আমি সব কিছু দেখতে পাই আর আমার কোনো অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে খুবই আমাকে সাহায্য করেন। ইনি বরাদ্দর কালো কাপড়ের স্ট প'য়েই ছিলেন— যেমন ও দেশের লোকের কর্মচারীরা (মহা বা জমিদার

বা বিধান সভার সভ্য ছাড়া) প'রে থাকেন। ইনি নিজেই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ধর্ম ইনি মুসলমান, কিন্তু তিনি সব ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা করেন। আর তিনি চান যে আফ্রিকার সমস্ত ধর্মের লোকই মিলিত-ভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্যে কার্য করে আর নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতিকে বজায় রাখে। নিজের থেকেই শেষের দিকে ইনি নিজের পারিবারিক ধর্মের কথা আঁতরণে, আমি তো কথ্যব্যর্থ্য বুঝতেই পারি নি যে ইনি খ্রীষ্টান, মুসলমান, কি পুরাতন যোদ্ধা ধর্মের মাহুষ।

এই-সব কাজে বেলা লাড়ে দশটা বেয়ে গেল। আশরা ওখন ইব্রাহান ছেড়ে ইফের রাস্তা ধ'রলুখ। ইক্সেতে এই দিনটা ও এই রাত্রি কাটিয়ে তার পরের দিন আশরা দুপুরবেলা আর-এক রাত্রির জন্য ইব্রাহানে ফিরে আসি। ইব্রাহান থেকে লেগন্ ফেরবার পথে আর একবার শ্রীযুক্ত আন্তোলোত্তো আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অসংলগ্ন-ভাবে দেখা হ'য়ে যায়। ইব্রাহান শহরে এঁদের আতিথা ও সহনশীলতা কখনও ভোলবার নয়। আন্তোলোত্তোর বয়স মাত্র ৪৫, এই বয়সেই ইনি নিজের জাতির উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক কিছু ক'রেছেন। ভবিষ্যতে সমগ্র আফ্রিকার কৃষক জাতি তাঁর কাছে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। খ্রীষতী স্বাধীর উপযুক্ত সহধর্মিণী। ইনি ইংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা কইলেন। নানা বিষয়ে এঁর সৌভক্তের পরিচয় পাই। আফ্রিকার বেয়েদের পুরাতন রীতিনীতির মধ্যে বা-কিছু ভালো তার সংস্পর্শে ইনি খুবই ব্রতীল। নিজে সর্বদা অভিশোভন যোদ্ধা বেয়েদের পোশাক প'রে থাকেন— পশ্চিম-আফ্রিকার পুরানো নকশায় ছাপা কাপড় একখানা লুইর মতো ক'রে পরা, গায়ে একটা ব্রাউজ—পোশাকের এইটুকুই বিশেষ থেকে আমদানি— আর মাথায় একটা মাত্রাজী হাতে-বোনা কাপড়ের কবল পাগড়ির মতো ক'রে ঝড়ানো, পায়ে পান-স্তর মতন জুতো। পোশাকের রঙের মধ্যে নীলের প্রাধান্য, মাঝে মাঝে লাল, কালো ও হলধে' রঙও দেখা যায়। এবেদের বেয়েদের বহন স্বাঘোষ্য যো'র কৃষক বৈষ্যকের সঙ্গে এই-সমস্ত গাঢ় রঙের কাপড়ের যে একটা স্নন্দর সামঞ্জস্য হয়, তা দেখে শিল্প-বিশ্বের চোখ জুড়িয়ে যায়। গোল্ড-কোস্ট বা গানাতো বেয়ে-পুরুষের কাপড়ে রঙের বেলা আরও বেশি, আর সেইজন্যেই সেপারকার পরিষ্কার আরও মনোহর লাগে। ইব্রাহানে আমার দুদিনের অবস্থানের মধ্যে এক দিকে আন্তোলোত্তো পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘেদন একটি আনন্দবয় স্মৃতি হ'য়ে চিরকাল মনে থাকবে, তেমনি অন্য দিকে চেনারামবের ইব্রাহানের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কনটেল আগোয়ানী আর তাঁর অল্প সিদ্ধী বন্ধুদেরও সাহায্য আর সৌভক্তের কথা কখনও ভোলবার নয়। ইকে থেকে ফিরে এসে এঁদের সঙ্গে আর এক রাত্রি কাটাতে হ'য়েছিল, তখনকার কথা লেখবার সময়ে বারাস্তরে এঁদের সম্বন্ধে কিছু ব'লবে।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী -বর্ণিত গীতি

শ্রীরাধোদর মিত্র

বাঙালীর লেখা পুরোনো সংগীতের বই দুর্লভ। দু-চারটে যা আছে তা এখনো পুঁথির আকারেই আছে এবং অপটু নকশনবিশেষ বোঝে ভ্রম প্রমাণও তাতে আর নেই। উড়িয়াতেও দু-একখানা পুঁথি আছে, সংগীতের দিক থেকে যার মূল্য যথেষ্ট। এখানি একখানা বইয়ের নাম গীতপ্রকাশ। এতে লেখকের পানের রকম-সকম, অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিধবস্ত আছে বলে শুনেছি, কিন্তু কবে সেসব উদ্ধার হবে বলা শক্ত।

সম্প্রতি নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যামদাস রচিত সংগীতসারসংগ্রহ^১ নামক গ্রন্থটি বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছেন। এইরকম বই আর একখানি আছে সংগীতনামোদর, কিন্তু সেটি এখনো মুদ্রিত হয় নি। নরহরি চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বইটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। বইটিতে আগলে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই, নানা গ্রন্থ থেকে অংশগুলি তিনি সংকলন করে বিস্তৃত করেছেন, কিন্তু তথ্যপি দু-একটি বিষয়ে তৎকালীন সংগীতের উপর কথকিত আলোকপাত করা হয়েছে, সেটি অধীকার করবার উপায় নেই। বিশেষ করে “সুত্রগীত” প্রসঙ্গটি আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এবপর সঘর্ষে যে রহস্য আচ্ছন্ন করা সম্ভব হয় নি, নরহরি-বর্ণিত সুত্রগীত এবং শালগ-হুড় প্রবন্ধার থেকে সে সঘর্ষে অনেকটা অহংস্বাদন চালানো যেতে পারে এবং একটা সংগত অহুমান করাও সম্ভব হতে পারে।

নরহরির সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থটি তাঁর আর-একটি রচনা “ভক্তিরত্নাকর”এর পরিপূরক। একটিতে বা নেই অপরটিতে তা আছে। ভক্তিরত্নাকরে ঐশ্বর্যের উদাহরণ নেই, সংগীতসারসংগ্রহে তা আছে। আবার সংগীতসারসংগ্রহে বড়ন প্রবন্ধের উদাহরণ নেই, ভক্তিরত্নাকরে সেগুলি আছে। অতএব এই দুটি বই এক-সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করা কর্তব্য।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে রাগ সঘর্ষে আলোচনার পর গ্রন্থকার সে যুগের গীতরূপ সঘর্ষে উল্লেখ করেছেন। তিনি তিন রকমের গীতরূপের কথা বলেছেন—

বহু: গাঢ়ভিন্নমৈত্ৰ নিন্দনভিন্নভিত্তে।

ভক্ত: হ্যাসঙ্গ: কুত্ৰমিতি ভক্ত মিত্রা দত্তঃ।

নিবন্ধ সংগীত তিন রকম—ভক্ত, ছায়ালাগ এবং কুত্ৰ; সেব্যোক্ত কুত্ৰগীত আবার সংকীর্ণ নামেও পরিচিত ছিল।

মূলমহান-যুগের প্রাচ্যেতে যেসব গান প্রচলিত ছিল তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—হুড়, আলি এবং প্রকীর্ণক। এর মধ্যে হুড়গীতি ছিল আট রকমের—এলা করণ ঢেংকী বর্তনী ঝোঝড়া লগ্ন রাগ এবং একতালী। এই হুড় প্রবন্ধের লক্ষ্য কি? গ্রন্থকার নরহরির ঐশ্বর্য ভক্তিরত্নাকরে বলেছেন—‘বহুতালে শুদ্ধন এ হুড় মনোহর’। এই বহুতালের মধ্যে সাধারণত ন’টি তালের প্রাধান্য ছিল—আদি, বতি, নি:শাক্ক, অড্ড, ফিণ্ট, রূপক, কাম্পক, মঠ এবং একতালী। এখানে একটি বিবরণ লক্ষ্য করবার আছে; সেটি হচ্ছে

এই যে, অনেক ক্ষেত্রে গীতরূপ এবং তালের নাম এক, যেমন, নিঃসঙ্গক মঠ একতালী প্রভৃতি। সম্ভবত এক-একটি গীতের প্রকৃতি থেকে এক-একটি তালের নাম প্রকৃতিগত হয়ে গেছে। এই যে বিবিধ তালে বৈচিত্র্যপূর্ণ হৃদ প্রবন্ধ এইটিই ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ গীতরূপ। তখনকার দিনে এটিকেই শুদ্ধগীতরূপ বলে ধরা হত। তথাপি এই গীতরূপকেই সম্পূর্ণ শুদ্ধ বলে স্বীকার করা হয় নি, কেননা তার আগে আরও বহুপ্রকার গান ছিল যাকে সত্যিকারের শুদ্ধগীতের মর্যাদা দেওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ এইসব গীতগুলির নাম উল্লেখ করা যায়, যথা— জাতি কণাল কয়ল গ্রামরাগগীতি উপরাগগীতি ভাবাগীতি বিভাবাগীতি অঙ্করভাবাগীতি। এইগুলিরও বিস্তারিত পরিচয় সংগীতশাস্ত্রে বেলে।

উপরোক্ত আটটি হৃদগীতি হচ্ছে শুদ্ধহৃদ। এ ছাড়া আরও কয়েকটি হৃদ ছিল যাকে বলা হত ছায়াগণ বা সাগণ-হৃদ। বর্তমান সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাগণ হৃদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কেননা এই গীতরূপটিই বর্তমান ক্রমবদ্যের ঐতিহ্য বহন করছে। এই দুটি প্রকারভেদে সবচেয়ে দৃষ্টাকর্ষ্য বলছেন—

শুদ্ধস্বাভাবিকতাই চিহ্নিত হৃদ উচ্যতে।

এলাদি শুদ্ধ ইচ্ছাক্তে প্রবাদি সাগণো নত।

ছায়াগণস্বভাবোৎপত্ত্যচাঞ্চল্যমতম্।

টীকাকার কলিনাথ ছায়াগণ শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন—‘ছায়াগণশ্রাব্যঃ শুদ্ধ সাধুঃ লগতি গজতীতি তথোক্তঃ। সাগণ ইতি জ্ঞানালগনশ্রাব্যপদ্মশোভনং শোকপ্রসিদ্ধা প্রযুক্ত ইতি বেদিতব্যঃ।’ আরও একটু যুক্তি দিয়ে কলিনাথ বলেছেন যে, পূর্বে যেসব শুদ্ধগীতি ছিল তাদের সঙ্গে নিয়মের অভিলক্ষ্যন না হওয়ায় আটটি হৃদকে শুদ্ধ বলা যায় কিন্তু ছায়াগণের বেলায় নিয়মের অভিলক্ষ্যন হয়েছে, অতএব শুদ্ধগীতির ছায়াটুকুই এলব গানে আছে। এই হিসাবে এলব গানকে ছায়াগণ বা সাগণ বলাই যুক্তিযুক্ত। সাগণ হচ্ছে ছায়াগণ শব্দের অপভ্রংশ।

সংগীতশাস্ত্রঃগ্রহে গ্রহে নরহরি বলেছেন—‘বহনং তালানামেকত্রগুণেন হৃদং, ছায়াঃ লগতীতানেন শুদ্ধত্বং সংকীর্ণরূপেনৈব ভবতীত্যুক্তম্।’

সাগণ-হৃদ হচ্ছে সাত প্রকার—এর মঠ প্রতিমঠ নিঃসঙ্গক অঙ্ক রাগ এবং একতালী। এইটি দৃষ্টাকর্ষ্যের মত। নরহরি দাবোদর এবং পঞ্চসারসংহিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

এককো মঠকৈক্যে প্রতিমঠা নিঃসঙ্গকঃ।

গানকঃ প্রতিমঠান্ত তথাত্তা চৈকতালিকাঃ।

যতিলত্বং হৃদ্যি চেতি সাগণ হৃদ ইরিতঃ।

এখানে অঙ্কতালের পরিবর্তে এসেছে প্রতিমঠাল এবং নতুন দুটি বোগ হয়েছে বাতি এবং জুমারি। কেউ কেউ আবার চর্চরী প্রবন্ধকেও এর মধ্যে গ্রহণ দশ স্বরক সাগণ হৃদের উল্লেখ করেছেন। এই জুমারি খুব সম্ভবতঃ শুদ্ধসাগণ “কোষাচ”র পরিবর্তিত রূপ এবং পরবর্তীকালে এইটিই বোথ হয় জুমার নামে পরিচিত হয়েছে। চর্চরী ছিল প্রকৌর্গক প্রবন্ধের স্মরণ্যতম। পরে এটি সাগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ থেকে এইটি বোঝা যাক যে কবেই নানারকম মিশ্রণের ফলে পূর্বের প্রকারভেদে শেষ পর্যন্ত আর কিছুই বরাহ্য থাকে নি।



ମାରିଆ-ସାମକ
 ହରିମୁଖା ମଠି : ଶିଳ୍ପକଳା ସଂସ୍ଥା
 ୨୦୦୭

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী-বর্ণিত গীতি

সালগজেরীর প্রথম এবং প্রধান প্রকার হচ্ছে 'ধ্রুব'। এই সংগীতের লক্ষণ পর্যালোচনা করে এ কথা বিবাহ করাবার বিশেষ কারণ আছে যে, এই ধ্রুব বা 'ধ্রুবক'ই হচ্ছে আমাদের বর্তমান ধ্রুবপদের আদিরূপ এবং সূত্রগীতের ধ্রুবপদও এই সালগ-ধ্রুব থেকেই এসেছে। কেন, সেটি প্রমাণ-সহযোগে বিবৃত করি। রত্নাকর থেকেই অমূল্যমূল্য আরম্ভ করা যাক। রত্নাকর ধ্রুবগীতির বর্ণনা দিয়েছেন—

একবারতু দ্বিগুণঃ ত্র্যম্বকরাধ্ব্যসাহ স্বতঃ পরম্ ।

কিঞ্চিদ্ধ্রুতঃ ত্র্যম্বকঃ ত্রিভাষ্যতঃকিঃ অম্ ।

ততো দ্বিগুণঃ আভোগতঃ ত্র্যম্বকরাধ্ব্যম্ ।

এক বাতু দ্বিগুণঃ চ বগমুক্ততঃ পরম্ ।

ততান্যাদ্যকিতকাসৌ চাতিহৃতককতকঃ ।

উগ্রাহতাতকতকঃ চ ত্র্যম্বক স এককো ত্র্যম্বকঃ ।

চীকাকার সিংহতুপাল এই অংশের প্রাচল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর চীকাকারই সারমর্ম বিবৃত করি তা হলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। তার আগে বলা উচিত যে, এলব গানে তিনটি কলি— উদ্‌গ্রাহ ধ্রুব এবং আভোগই প্রধান; তাও আবার সব ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ, এই সময় থেকেই পূর্বপ্রচলিত কলিগুলির রূপান্তর ঘটতে আরম্ভ হয়েছে।

সিংহতুপালের বর্ণনা অমূল্যের বোকা বার যে, প্রথমে অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহ অংশের দুটি বগ ছিল এবং এই বগ-দুটির মধ্যে ততকাত বেগি ছিল না। এর পরে একটি বগের পরিকল্পনা করা হয়েছে যেটি প্রথম অংশের চেয়ে উচ্চ স্বরে গাইতে হবে। এই অংশই হচ্ছে আমাদের বর্তমান "অম্বরা", সিংহতুপাল বলেছেন 'ততোহনন্তরঃ কিঞ্চিদ্ধ্রুতঃ বগমুক্তরাধ্ব্যঃ কর্তব্যম্'। অম্বরাধ্ব্যঃ শব্দে তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, এই বগের আধ্ব্য ছিল অম্বরা, এই তিনটি বগই দুই বার গাওয়া হত। তার পরেই আভোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আভোগও উদ্‌গ্রাহের মত দুইটি বগে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম বগটি উদ্‌গ্রাহ অংশের মত গাইতে হবে, অর্থাৎ উচ্চ স্বরে নয়। এই অংশটিই হচ্ছে বর্তমান সকারী। আভোগের পরবর্তী বগটি আবার উচ্চ স্বরে গাইতে হবে, যেমন বর্তমানে হবে থাকে। তার পর উদ্‌গ্রাহ অংশ আর একবার গেয়ে তবে গীতের সমাপ্তি হবে।

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, এই "ধ্রুব"ই বর্তমান ধ্রুবপদের আদিরূপ। পরবর্তী শাস্ত্রকারদের অনেকরকম বাহ্যভূমি দেখা যায়, রাজা মানের সময়ও বাণ-বিভাগ্য কথ হয় নি, কিন্তু রত্নাকর এবং তদীয় চীকা ভাষা ভাবে বিচার করে দেখলে শিখাবন্ধনী যে কোথায় সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি ধ্রুবলক্ষণ বর্ণনা করছেন—'খিখাতু খিাবদবম্, প্রথমখগোপেক্ষা দ্বিতীয় বগ উচ্চৈর্গেগঃ।' এতে পূর্ববর্তী বর্ণনা অপেক্ষা নতুন কিছু নেই তবে রত্নাকর যেখানে আভোগ পরিকল্পনা করেছেন সংগীতসারসংগ্রহে সেখানে ধ্রুব এই কলিটি আরোপ করেছেন। নরহরি ধ্রুবগীতির এই উদাহরণটি উদ্ধৃত করেছেন—

মদারি রাগ আদিতাল

জয় জয় হৃদয় নন্দনন্দন দলিতারনন্দিত জননয়ন আ ।

কল্যানলক্ষণ গোমূলময়ঃ গোমূলতঃ-ভূতকল্পন আয়ে । প্রথম বগ

ବୟାସୁଲିନ-ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ସେବାୟତଙ୍କର ନୂଆ ଗବେଷଣା ।

ସୁଦୂର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଅମୟୁଗତି-ସମୟ ନି ତି ଆଇ ଆଇ କାରେ ।

(এইটি উল্লখও। ছুটি বগই দুবার গাইতে হবে। প্রথম বগ অপেক্ষা দ্বিতীয়টি উল্লবধে গেষ।—
নয়হরি)

बभ्रुवर्धन नामक-युवकस्य बभ्रुवर्धन नामक विद्या ।

महर्षिगुरु-वन्दनं कव्यकल्याणम् । महर्षिः इति शारदाति आचारः ।

५५

(এই তিনটি অংশে ‘আই আই আরে আরে’ এইগুলির কোনো অর্থ নেই, ‘সত্যল গীতলালিতা’ সম্পাদকের অন্তর্ভুক্ত গায়কগণ এইসব শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন—নরহরি)

হয়াকৰ-নিৰ্দিষ্ট অক্ষৰ-সংখ্যা অহুণাৰে বোড়শ প্ৰকাৰ ঐক্যীভূতৰ উল্লেখ কৰেহেঁ। চমৎকাৰ সব নাম অহেঁ এমের, কিন্তু বৰকাল পূৰ্বেই এলব গান মিলে-মিলে একাকার হয়ে গেছে। কৰিনাথ তাঁর টাকার স্পষ্টই বলেছেন যে, তাঁর সময়ের দেসব অক্ষৰ-সংখ্যা অহুণাৰে নিৰ্দিষ্ট ঐক্য প্ৰচলিত ছিল না। তাৰ পৰিবৰ্তে বিভিন্ন পদৰ পৰিকল্পনা হয়েছিল সেই সময়ে।

সংসীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে এর পরে মঠগীতির লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নবাবের "সংসীতসার" নামক গ্রন্থ থেকে মঠগীতির লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন যে, এতে উল্লেখ্য এবং আভোগের ব্যক্তাসংখ্যার চেয়ে প্রবের ব্যক্তাসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তিনি এই উদাহরণটি দিয়েছেন—

समाचार आदिताम

কৃষ্ণ কুণ্ঠাময়ঃ মঙ্গলবিগ্রহঃ বিশ্বজ্ঞানশেখঃ স্যেব হত্রে ।

ସୋନାକୁଜୋଂସବବର୍ଷ ସାବର ଶୋଭା ନିଧାନ୍ତି ଆସି ଆସି ଆସେ ।

उत्तर ।

वैकुण्ठाक्षर कृणोति वा मा ।

ସାଧାରଣ-ଜାଗୃତ-ହୃଦୟର ସମ୍ବଳକୁ କେବଳ ତି ଆପେ ।

इति नाट्यकथनमाळा अन्त ।

শীতাবের প্রথমকথা পদাংক দুইটির মটবর শোরে ।

কংসদ্বিশোঃ শূরধৰ্মন মাধব ঘনভ্রাম ইতি পায়তি আত্ম রে ।

ଆହୁତି ।

বাহুল্যের জন্য অপর্যাপ্ত সাধারণ-বৃদ্ধের পরিচয় নরহরি প্রদান করেন নি। তিনি অহংকৃত্ত্ব-স্বপ্নকে গ্রাহ্যের দেখবার উপদেশ প্রদান করেছেন। এইখানে আর-একটি কথা তিনি বলেছেন যে, রহস্যতা বুদ্ধির জন্য প্রসারিত বৃত্তি করা যেতে পারে, তবে উদ্‌গ্রাহ্য অংশ সেগুলি নিবেশ করলেই ভালো হয়। উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হয় নি, সেটি হচ্ছে “ক্রব” নামক কলিটি বর্তমান কোনো কলির সঙ্গে তুলনীয়। অনেক ক্ষেত্রে কেবা যাচ্ছে যে উদ্‌গ্রাহ্যের অংশবিশেষ বর্তমান অস্ত্রায় কার্য সম্পাদন করছে। অতএব এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অস্ত্রায় বিবিধ শব্দের সত্তা এই “ক্রব” শব্দটিও কোথাও এমন ভাবে বৃত্তিরে বলা হয় নি যাতে পরবর্তীযুগের পাঠকগণ এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন।

সংগীতসারসংগ্রহে নরহরি চক্রবর্তী-বর্ণিত গীতি

অতঃপর নরহরি “কুহুগীত” গ্রন্থে এসেছেন। এই কুহুগীত সংকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য এই জ্যেষ্ঠ গীত আসলে শালগ-স্থ; তবে বহুতর মিশ্রণের ফলে এর আকৃতি কিছুটা বিচিত্র হয়ে গেছে। ভাল এবং খারাপ^৩ বাক্যই হল কুহুগীত। নরহরি বলছেন যে, ব্যতীল্যের জন্য তিনি আর এক্ষেত্রে ঐক্য, মঠ প্রভৃতির লক্ষণ বিবৃত করলেন না। এই উপলক্ষ্যে ভক্তিরসাকরে তিনি বলছেন— ‘ভক্ত্যঙ্গাগের প্রায় কুহুগীত হয়। অত্যাশ্রয় প্রাপ্ত শাস্ত্রে কথ্য’। কুহুগীত চার প্রকার—চিহ্নপদ্য, চিত্রকলা, ধ্রুপদ এবং পালালী।

চিত্রপদ্যের বৈশিষ্ট্য হল পদবৈচিত্র্য এবং প্রসাধন^৪। নরহরি শ্রীমদাখবল্লভ নাটক থেকে এর উদাহরণ দিয়েছেন—

রাগ ভটবরী

কলরতি নয়নঃ বিপী বিপী বলিতম্
পল্লবির বৃহৎ-মালত-চলিতম্ ।
কেলিবিপিনঃ অধিনতি রাগে ।
প্রতিপদ-নয়নিত-মনসি রাগে ।
বিনিময়তী বৃহৎ-মল্লক-পায়ম্ ।
রচতি হৃদঃ-বলতবুবাযম্ ।
জনকু গুণবদ্যবিশ-মুদিতম্ ।
রাগানন্দ্যাক-কবি-পদিতম্ ।

আতোপ ।

এর পর নরহরি “চিত্রকলা” নামক গানের উল্লেখ করেছেন। এই পর্যায়ের গীতে উদ্ভাষ এবং আভোগের মাজাশাখ্যা সমান এবং প্রবের মাজা নূন হবে। তিনি এই গীতের উদাহরণ স্বতন্ত্র মতবের গীতগোবিন্দ থেকে একটি গীত উদ্ধৃত করেছেন—

রাগ ভটবরী*

হরিরতিমতি বহতি বৃহৎপদনে ।
কিমপারমিকন্দাঃ সখি ভবনে ।
বাগে বা বুক বাবিনি বানসরঃ ।
ইত্যাদ্যনন্দঃ—শ্রীমদাখবল্লভ-মুদিতম্ ।
প্রবক্তৃ হরনন্দনঃ হরিতম্ ।

আতোপ ।

৩. খারাপ অর্থে এখানে উদ্ভাষ, এবং আভোগ এই তিনটি কবি।

৪. গীতগোবিন্দ নবম সর্গ (বৃহৎ-মল্লক)। শ্রীমদেবকী মূখ্যোপাখ্যায় কল্ক-সম্পাদিত গ্রন্থে এই গানটির রাগ ভটবরী এবং তাল মতি, এইরূপ উল্লিখিত আছে। পুণ্ডরীকোৎসবীর সীমাক্রান্তে তাই দেখা যায়। এই গ্রন্থ এক তালই পূর্বে নির্দিষ্ট ছিল। ক্রমে গায়কজনে রাসের পরিবর্তন ঘটেছে।

৫. “কিমপারমিকন্দাঃ”—শ্রীমদেবকী মূখ্যোপাখ্যায় সম্পাদিত গীতগোবিন্দ

৬. “শ্রীমদেবকী মূখ্যোপাখ্যায়”—উক্ত গ্রন্থ

৭. “রসিকনন্দনঃ”—উক্ত গ্রন্থ

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জয়দেবের গীত পরবর্তীকালে ক্ষুদ্রগীতের অন্তর্গত হয়েছিল। জয়দেবের গীত আজ আমরা যে ভাবে দেখতে পাই তা থেকে মনে হয় এগুলি ছিল হৃদ-প্রবন্ধের অন্তর্গত এবং খুব সম্ভবত সালগ-হৃদ শ্রেণীর। সালগ-হৃদের গীতখণ্ড যেভাবে নির্ণয় করা হয়েছে গীতগোবিন্দের গানও সেইভাবেই সামান্যে হয়েছে। সালগ-হৃদ পরবর্তীকালে যখন ক্ষুদ্রগীতে রূপান্তরিত হয় গীতগোবিন্দের গীতগুলিও তখন ধীরে ধীরে উক্ত পন্থারই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জয়দেবের গীতে কয়েকস্থানে “ঋব” আছে যেগুলি “ধূম”র কাম করে বললে অত্যাক্তি হয় না। কিন্তু “ঋব” নামে যে ধাতু (অর্থাৎ গানের কলি) নির্দিষ্ট আছে সেই ঋব আর এই ধূম এক মিনিগ নয়। এই বিবর্তিত পরিভাষাভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। “প্রলম্বপয়োদ্বিধুলে” এই বিখ্যাত গানটির টীকায পুথারী গোখারী বলছেন—জয় জগদীশ হয়ে ইত্যোব্ধপদং প্রতিপদমহবর্তমানস্থং। যথোক্তঃ—ঋবান্ন ঋবাঃ প্রোক্তঃ অভ্যোগ্যভাষ্মৈ বত ইতি।’ গোখারী মহাশয় প্রতিপদের শেষে যে ধূম ঘূমে আগে তাঁর সঙ্গে সংগীতসাহচর্যগত ঋব এবং অভ্যোগের কী সম্বন্ধ তা বুঝিয়ে বলেন নি। তিনি refrain বলতে বা বোঝায় ঋব নামক প্রবন্ধাবয়বের সঙ্গে তাকে একাত্মবোধক করেছেন। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, দ্রুতি বিভিন্ন মিনিগ। প্রবন্ধগীতের যে অবয়ব—পরিকল্পনা করা হয়েছিল “ঋব” হচ্ছে তার তৃতীয় কলি এবং সে ঘূমের সংগীত-শাস্ত্রে কোথাও বলা নেই যে উক্ত “ঋব” কলির ব্যবহার বর্তমান “ধূমার” বত হবে। এমনকি টীকাকারগণও এমন কথা বলেন নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ঋবকে ধূমার বত ব্যবহার করবার কলে সংগীত অনিশ্চিত হয় এবং তখন ঋবা বা ধূমার প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু টেকনিকের দিক থেকে এটি তখন অন্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আবার “ঋবা” এই শব্দটি “ঋব” নামক গীতকেও নির্দেশ করে। একালে সালগ-হৃদ পন্থার “ঋব” গীতির অপর নাম ছিল “ঋবক” বা “ঋবা”। এই প্রসঙ্গে লোচন-বিরচিত “রাগতরঙ্গিনী”তে বিভাগতির “ঋবা” গীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানগুলিও “ঋব” জাতীয়। লোচন শর্মা জয়দেব এবং বিভাগতি উভয়ের গানই উদ্ধৃত করেছেন। পূর্বকালের ঋবগীতির আর-একটি লক্ষণ লোচন-বনিত গীতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে এই যে, মাত্রাগংখ্যা নির্দেশ করে গীতখণ্ড পরিচয়িত হয়েছে। পূর্বেই বণেছি, রত্নাকর-বনিত ঋবগীতের যে বোড়ন প্রকার ভেদ ছিল তা অক্ষর-সংখ্যা অল্পাধারে এবং তালভেদে নির্দিষ্ট হত। সালগ-হৃদের অপরাপর গানও এইরকম ছন্দ-ভেদে বিভক্ত হয়েছে। লোচনও অল্পাধারে বিভাগতি জয়দেব প্রকৃতির গানে ছন্দনির্ণয় করেছেন। সম্ভবত এ সকলে পূর্বযুগ থেকে ঋবগীতির উক্ত ইয়াদিনটি চলে এসেছিল। পণ্ডিত লোচন বলেছেন যে, এইসব নিবন্ধ-প্রবন্ধাদির আলোচনা তিনি “রাগতরঙ্গিনী” গ্রন্থে লোচন নামক গ্রন্থে করেছেন। এই গ্রন্থটি কোথাও ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি না—এই পুঁথি দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় এবিষয়ে আলোকপাত করবার সুযোগও হয়ে উঠল না। “রাগতরঙ্গিনী” গ্রন্থে লোচন রাগতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন, সংগীতের সংগঠন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। তবে, বিভাগতি যে ঋব-জাতীয় গীত রচনা করেছিলেন সেটি বোঝবার জন্য লোচন তথ্য এইটুকুই বলেছেন—“তদ্ব্যাপার্যন্ত

৮ একেবারে অবশ্য মাণসুত চারটি—উদাহার, বোধগম্য, ঋব, আভাস। সংগীতরত্নাকর বিশেষ ভাবে বলেছেন যে, সালগ-হৃদ একেবারে ঋব এবং অভ্যোগের দ্বারা—“অভ্যাস” নামক আর একটি কলির অতিরিক্ত ছিল। সিন্ধুখণ্ড টীকায লিখেছেন—“অভ্যাসো-ব্যাপ্ত্যুর্নর্থকং অসৎকৃত্যু। কিন্তু সালগ-হৃদ একেবারে ঋব।” সালগ একেবারে বোধগম্যের অতিরিক্ত ছিল না।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চরুবর্তী -বর্ণিত স্মৃতি

বিভাগ্যপতি কবিকল্পিতনা করিতান্ত্র ধ্বাঃ ১০ এই উক্তিৰ পূৰ্বে তিনি সংক্ষেপে নিবন্ধ শ্রবণশীতিৰ লক্ষণ বৰ্ণনা কৰেছেন। এক্ষেত্রে এটিও লক্ষণীয় যে তিনি এইসব গানকে শ্রবণম আখ্যা দেন নি, কেবল ধ্বা বলেই নিৰ্দেশ কৰেছেন।

চিত্রকলা নামক স্থগীতের পর নরহরি শ্রবণম শ্লোকে এসেছেন। শ্রবণমের সংজ্ঞা-নিৰ্দেশ উপলক্ষে তিনি এই উক্তি কৰেছেন—

এক গীতা ত্রিগাভূতপ্রাচ্যোত্তর গীতত

উত্তরোত্তরগীতানুসারে গীত। শ্রবণম বলা।

ত্রিগাভূতপ্রাচ্যোত্তরগীতানুসারে গীত।

এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রবণম দুই জাতীয় ছিল। একটি অপেক্ষাকৃত সূত্র অর্থাৎ শ্রব এবং আভোগ এই দুই কলিতে সীমাবদ্ধ, অপরটি উদ্‌গ্রাহ, শ্রব এবং আভোগ এই তিনটি কলিতে সম্পূর্ণ। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি উদ্ধৃত করি—

"শ্রবণম বিধতি সমস্ত, উত্তরোত্তরগীতানুসারে: ত্রিগাভূতপ্রাচ্যোত্তরগীতানুসারে: শ্রবণমের সমস্তোপলব্ধিভিঃ তাৎপৰ্য্য, ত্রিগাভূতপ্রাচ্যোত্তরগীতানুসারে ইতি স্মৃতিপ্রকাশে। একস্মিৎ তাৎপৰ্য্যে অস্তথা গানবিত্তি তেতিঃ।"

এখানে একটা সমস্তার উদ্ভব হচ্ছে যেটি সমাধান করা শক্ত। গ্রন্থে বলা হল যে, একপ্রকার শ্রবণম "শ্রব" এবং "আভোগ" এই দুই কলিতেই সম্পূর্ণ; এক্ষেত্রে অস্ত্র কলির অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহের অহুমান করা যায় না, কেননা "শ্রবণোত্তরগীতানুসারে পদসংবর্তী" কথাটিতে অস্ত্র কলি সমস্তযোগের অবকাশ নেই। কিন্তু, উদ্‌গ্রাহ না গেলে একেবারে "শ্রব" কলি থেকে গীতের আরম্ভ কিভাবে সম্ভব? শ্রব হচ্ছে গানের ভূতীয় অবস্থাব অর্থাৎ স্বাক্ষরগণিত পদ—এখানে থেকে তো আর গান আরম্ভ করা যায় না, যেমন একেবারে "অস্থগা" থেকে বর্তমানে কোনো গান ধরার পদ্ধতি হলো কেউই করতে পারেন না। অতএব ব্যাপারটি কেনন করে সম্ভব হচ্ছে সেটি গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, নরহরি এখানে নীরব থেকে গেছেন।

ত্রিগাভূত এই শব্দটি সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা শক্ত। গীতপ্রকাশ-এর মতে ত্রিগাভূত বলতে তালবিশেষ বোঝাচ্ছে। সম্ভবত তালবৈচিত্র্যে ঘারা এই ত্রিগাভূতটি প্রকট হত। সংগীতশাস্ত্রে একধাতু এবং ত্রিগাভূত এই দুটি শব্দের ব্যবহার আছে। সিংহকৃপাল একধাতু অর্থে বলেছেন সমানঃ গেষম্ এবং ত্রিগাভূত অর্থে বলেছেন বিগদম্ গেষম্। কারো কারো মতে তাল ছাড়া তালি ঘারাও এই সংগীতের একটি অংশ সম্পাদিত হত।

নরহরি প্রথমেই শ্রবণমের উদ্‌গ্রাহণ দিয়েছেন—

স্বাস-স্বাসী ১১ তাল লক্ষণ

দ্বয়ম ১১ মধুরিনা

দ্বয়তমস্বাঃ যদি দ্বয়ত হরিণমঃ ১২

পূত্রমিহ-বাহুবলমিহ-ন কলম সত্যম্

পূত্রমোক্তমিহ-পদিতমমৃত্যবঃ নিত্যম্।

আবোধ।

এই উদাহরণটি উদ্ধৃত করে নরহরি বলছেন—‘ইহমেব পাণ্ডাত্যভাষায়াঃ ছটিকিলেতি বদান্তি।’ অর্থাৎ এইটিই হচ্ছে সেই গান যার থেকে ‘চুটিকি’ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। আমাদের কিছ্র ধারণা ছিল যে, ‘চিহ্নকলা’ পর্বাণের গানই ‘চুটিকল’ বলে পরিচিত ছিল; কেননা এই দুটি পদে উচ্চারণগত একটা একা আছে, কিন্তু ক্রবণে কি করে ‘ছটিকিল’ হবে সেটা বোঝা গেল না।

অতঃপর নরহরি অপরপ্রকার ত্রিধাতুক ক্রবণের উদাহরণ নিয়েছেন—

কেশব কলমলেশব কানব কান্ত দুহাতুক কণিত গ্রহণ।

নম তদুহ কনয়তন তরততন কণচরণ কলেশব।

ইতি উগ্রাহ।

ভর জর যোম্ভু-বনাবুতমতনবুণ নকলকলুণ।

পিতাম্বর বরনামর রশম্ব নহুদ তুর ধনিতারন জপ।

এব।

পরমানব কন মধুমানব-সুরলীলাভূতোর ধর।

নরহরিনিব নহুদেব বাধব যোবনবর গোহলবীর।

আভোগ।

সীতাবলী থেকে একটি উদ্ধৃতি গ্রহণ করে নরহরি আনিয়েছেন যে, এই ধরনের আরও বহু গান আছে; অগ্রহরণের ব্যক্তিগণ ‘সীতগোবিন্দ’ গ্রন্থে এর বহু উদাহরণ পেতে পারেন।

সর্বশেষে পাকালীর উল্লেখ করা হয়েছে। অভিবিগ্রহী পদযুক্ত গান হচ্ছে পাকালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি দুই প্রকার—লম্বা এবং অক্ষর। এ ক্ষেত্রে ক্রব অর্থে দুই অক্ষরানই বোঝা হয় সংগত। নরহরি কোনো উদাহরণ সেন নি, কেননা ‘উদাহরণঃ স্থলভূ’। আর গোড়ে ‘পাকালীতি গ্রন্থিচ্ছিত’। কিন্তু এত স্থলভ উদাহরণ নরহরির অল্পকাল পরেই লোপ পেয়েছিল। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের মৃত্যুর বলেছেন অগ্রপূর্ণা ভগবতী যন্ত্রে ব্রাহ্মাকে ‘কয়ে দিল। পঙ্কতি গীতের ইতিহাস’। এতে এই বোঝা যাচ্ছে যে, অগেকার দিনে মঙ্গলকাব্য পাঁচালী প্রভৃতি যেভাবে গাওয়া হত সেটা আর বায়ত্তব্যাকরণে সুপে প্রচলিত ছিল না; তাঁদের আবার নতুন করে একটি পঙ্কতি গঠন করতে হল। এই পঙ্কতি কিছুকাল চলছিল, তার পর আবার নবায়ীতির আয়মানি করলেন দ্বাপরবিগ্রহ।

সংস্কৃতদ্বারসংগ্রহ গ্রন্থটিতে আশোড়িত গীতপ্রসঙ্গে একটি মত অভাবের কথা উল্লেখ করতে হয়। সেটি হচ্ছে এই যে, অগ্রপাকালীকাব্যী নরহরি চক্রবর্তী গোখাও কর্তৃকনের উল্লেখ করেন নি। যে কর্তৃকনের চমৎকার বর্ণনা তিনি তাঁর ভক্তিরসায়াকর গ্রন্থে নিয়েছেন সেই গ্রন্থের সংস্কৃত-অধ্যায়েও কর্তৃকনের স্থান হয় নি, এই এটিতেও নয়। অথচ নরহরির মূগে কর্তৃক বাংলায় একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি পরিণত হয়েছে। বেশিদিনের কথা তো নয়, নরহরি এ গ্রন্থ অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় সংকলন করেন। তখন কর্তৃকনের নানা ঘরোয়ানা থেকে কর্তৃকনের সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করবার সুযোগ নরহরির ছিল, কিন্তু কেন যে তিনি নিজে পরম বৈকল্য হয়ে বিবরণটি এড়িয়ে গেলেন সেটি বোঝা দুঃসাধ্য। এইলব কারণেই কর্তৃকনের সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক ব্যাপারে আলোচ্যপাত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।

নরহরির সংকলিত গ্রন্থে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালন-মুড়ের প্রাধান্য দেখবার সুযোগ

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী-বর্ণিত গীতি

পেয়েছি। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত “ঋব” গীতি পরবর্তী “ঋবপদ”-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটাও জানা গেল যে, ঋগ্বেদের পদাবলী প্রথমে সাধারণ-সুড় এবং পরে সংকীর্ণ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রেক্ষে নরহরি বচবার “গীতপ্রকাশ” নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। আশা করা যায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে বহু সন্দেহের নিরসন হবে।

বস্তুত পূর্বপ্রচলিত গীতগুলি সম্বন্ধে আমরা তেমন অহুগত্বান করি নি; রাগের লক্ষণ ও গঠন-তাৎপর্যই আমাদের সংগীতালোচনার প্রধান অংশ ছুড়ে আছে। গীত সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন এই কারণে যে, নানা সম্প্রদায় থেকে বিভিন্ন ভাবধারা অথবা সামাজিক প্রথা থেকে এইসব গীতের সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হলে বহু বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব হবে। এই উপলক্ষ্যে এ কথাও স্মরণীয় যে, রাগের উৎপত্তিও গীত থেকে, রাগ থেকে গীতের উৎপত্তি হয় নি। স্বতন্ত্রাঃ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের প্রচলিত গীত সম্বন্ধে অনেক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শ্রীভবতোষ দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীতে পাক্ষাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে একটি গুহমুখ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা তাদের অন্ততম। আমাদের জীবন এবং কর্মসূচি সমাজের সমুদ্রে বহন করেপার জীবনের প্রাণবন্ত আদর্শ এসে পড়ল, সভ্যতাই তখন চোঁটা হয়েছিল আমাদের জীবনের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার। এই উদ্দেশ্যেই ইতিহাসচর্চা দেখা দিল এবং সেই উদ্দেশ্যেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং ধর্মশাস্ত্রের পুনর্বিচার এবং পুনরুৎসাহ চলেছিল। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে ইংরেজি বিজ্ঞান বুদ্ধিবাদিতা এবং তার বৈচিত্র্য আমাদের মনকেও মাগিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে আমরা যে সর্বদা বন্ধনশীলতাকে প্রত্যাখ্যান দিই নি, এ কথা সত্য নয়— সে কথা আর আর কারণে অবদিত নেই।

নবজাগ্রত মনের ইতিহাসচর্চার ক্ষুধাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইতিহাস-এর রচনার প্রাচুর্যই চোখে পড়ে এবং সে-ইতিহাস পুণ্ডরীকই ইতিহাস। বহির্বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অবশ্যই কল্যাণকর; কিন্তু বিশ্বের বিষয় এই যে, আমাদের মনের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও অধ্যয়ন তখনও সর্বজনীন হয়ে ওঠে নি। সেই যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে ছিল অবজ্ঞাপাঠ্য ছিল না। এ বিষয়ে শ্রীমানপুর মিশনের পাত্রীকা ছিলেন অগ্রণী।^১ তাদের ফলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য ছিল। জন রায় বার্ষিক্য ইংরেজিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮০১) রচনা করেছিলেন। কেলিঙ্গ কেরী নিম্নের ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই। শ্রীমানপুর ছাড়া অ্যাডামের রিপোর্টে কলকাতার স্কুলগুলির মধ্যে Parental Academic Institution-এ ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য ছিল বলে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।^২ আচার্যের বিষয়, শ্রীমানপুর মিশনের পাত্রীকা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা এবং অধ্যাপনার বৃত্ত উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তেমন আর কেউ নয়। শ্রীমানপুরের প্রকাশিত নিগূর্ণন পত্রিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল। এই ইতিহাসটির ক্ষুধাই কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি পত্রিকাটি কিনে নেয়।^৩ কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে একাধিক ইতিহাস-এর প্রকাশিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই ছিল পুণ্ডরীক ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য সেখানে নীতি হিসাবে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাক্ষাত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে সংস্কৃত এবং চাক্ষুর্যই যুগ বলা যায়। এই যুগে কেউই সম্ভবতঃ সচেতন ভাবে ক্রম আদর্শের সাধনা করেন নি। বিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে আলোচনা ও সম্মান চলেছিল বটে, কিন্তু সবগ্রন্থে কোনো একটি অভিজ্ঞতার

১. যোগেন্দ্র বাসু, বাসুর জনপদ। বিবিসিআইএ, পৃ ১০

২. Adam's Report of Education, 1835-38, Calcutta University, p. 39.

৩. ভবতোষ দত্ত, 'নিগূর্ণন পত্রিকা', ইতিহাস, ভাষা-কৃতিক, ১৯৫১

বন্ধিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি

দিকে দেখালের চিন্তা লক্ষ্যবস্তৃ হয় নি। এক দিকে রামমোহন রায়ে উনার মানবতাবোধ উপনিষদে জার-ভাষা খুঁজে পেয়েছিল, আর-এক দিকে রাধাকান্ত দেব প্রাচীন আচার-অহুগানের মধ্যে সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিকাশ দেখলেন; আবার সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির নিম্নস্থ নির্বোধ আশোচনা দেখা গেল। জ্ঞানোপার্জিকা সভার আলোচনা-পদ্ধতিতে প্রভাব পড়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রবর্তিত গবেষণাশক্তির। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৪ সালে। স্যার উইলিয়ম জোনস, স্যার চার্লস উইলকিন্স, এইচ. টি. কোলব্রুক প্রভৃতির চেষ্টায় এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। এদের উত্তমই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মনোনিবেশ সাধনের বিস্তারিত প্রমাণ দেখা দিল। বৈদেশিকদের দ্বারা প্রবর্তিত আলোচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং দৃষ্টিবাদী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যে তাঁদের বিশেষ অগ্রহণ ছিল এ কথা বলা চলে না। বন্ধিমচন্দ্র পরে এদের কাছে অনেক গুণ স্বীকার করেও এঁদের যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভাপতি যে মৌল্য বৈদেশিক সংস্কৃতির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত ছিলেন, এ কথা লক্ষ্যেই আনেন। এঁদের আদর্শ ছিল দৃষ্টিবাদের আদর্শ। হিন্দু কলেজের ছাত্র রাধাকান্ত মল্লিক সমাচারদর্পণে লিখেছিলেন, "If there be anything under heaven that either I or my friends look upon with the most abhorrence it is Hindooism. And if there be anything that we regard as the best instrument of evil it is Hindooism." * হিন্দু কলেজের এই ছাত্রদের দ্বারা ই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা গঠিত হয়। হিন্দুধর্মের প্রতি এঁদের বিরাগ থাকলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি এঁরা বিমূষ ছিলেন না। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন এঁদের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডিরোজিও তাঁদের দ্বাধীন চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু যত্নেব কল্যাণসাধনে মনোহীন হতে শিক্ষা সেন নি। ডিরোজিও নিজে যত্নশ্রুতি এই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবে গবিত ছিলেন। মরহুমিকে উদ্দেশ করে তিনি একটি হুম্বর লনেট রচনা করেছিলেন। যত্নেব সংস্কারচিন্তাতেও তিনি ছিলেন উৎসাহী। সত্যনাথ নিবারণে উন্নয়ন প্রকাশ করেও তাঁর লবটে আছে। বিজ্ঞানাগর বিধবা-বিবাহ আন্দোলন করার আগে জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটরে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয়েছিল।^১ নব্য বঙ্গের মনবা মুবকদের দ্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যদি বঙ্গের কল্যাণ-সাধনের চিন্তা দৃষ্ট হয়ে থাকে, তবে তার অগ্রতম কারণ ছিলেন রামমোহন-মহতর ভার্যাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব। ভার্যাচাঁদ মহৎ-হিতার অগ্রদূত আরম্ভ করেছিলেন বলে প্যারীচাঁদ মিত্র উল্লেখ করেছেন।^২ ভার্যাচাঁদ এই নব্যবঙ্গের নেতৃত্বপে দেখা দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ভার্যাচাঁদ এবং চন্দ্রশেখরের দ্বাধ্যবে জ্ঞানোপার্জিকা সভার সঙ্গে বেবেঙ্গলনাথ ঠাকুরের তবাবোধিনী সভার

১ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৩১-এ লেখা চিঠি সমাচারদর্পণে প্রকাশিত হয় ৯ই অক্টোবর, ১৮৩১

২ The Bengal Spectator, July 1842, p. 51 এবং 15th January 1843, p. 21

৩ A Biographical Sketch of David Hare, 1877, p. 32.

একটা সৌহার্দুপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকার তত্ত্বাবধিনী সভার সম্বন্ধ উল্লেখ এবং বিবরণও লক্ষ্য করা যায়।*

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শের বাণী দিয়েছিলেন প্রথমতঃ রামমোহন, দ্বিতীয়তঃ সেবেশ্বনাথ।† রামমোহন যদিও হুক্তিবিচারের পথেই চলেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন একটি মহৎ আদর্শকে জাগিয়ে তুলতে। বেঙ্গলের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বমানবতাবোধ। তিনি সকল ধর্মবিশ্বাসকে একটি প্রার্থনাসভায় মিলিত করতে চেয়েছিলেন— সেই সাহস এবং উদ্যোগ তিনি লাভ করেছিলেন বেঙ্গল ধর্মে। উপনিষদের ধর্ম একটি উদার সার্বভৌম উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে পারে, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মানকে রামমোহন এইভাবে কল্পনা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম পঞ্চাশোচনা করেছিলেন এবং তারই মধ্যে বেঙ্গলের আশ্রয়ে দর্শনীয় ন্যস্ত উপনীত হতে তাঁর বাধ্য হয় নি। রামমোহন শাস্ত্রবিচার করেছিলেন সত্য, কিন্তু আনন্দিক পদ্ধতিতে নয়, আনন্দের দেশের দুর্ধ্ব নৈরাধিকের পদ্ধতিতে। হৃতরাং রামমোহনের সংস্কৃতি-বিচারপায় শুভ বা চিন্তার প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়। অথচ রামমোহনের মতো বাস্তবদৃষ্টান্ত কর্মবীর বিরল। এইজন্য মনে হয় রামমোহনের আদর্শে তৎ ও কর্মের মধ্যে সাম্য-সাম্যনে গানিকটা অপূর্ণতা আছে; মহাবী সেবেশ্বনাথ ভক্তি দিয়ে সেই অপূর্ণতাটিকে সম্পূর্ণ করলেন। সেবেশ্বনাথ বললেন বাস্তব জীবনের মধ্যেই ত্রুটিকে অম্লভব করতে; হৃতরাং জীবনের দায়িত্বভারকেই অন্ধার সন্ধে তুলে নেওচাই ঘণ্টার মন্ত্রমুগ্ধ। রামমোহন বা সেবেশ্বনাথ কেউই ঐতিহাসিক পদ্ধতির অগ্রগণ্য করেন নি। কিন্তু তাঁরা উভয়েই প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর অন্ধা পোষণ করে গিয়েছেন। সেবেশ্বনাথ রামমোহনের ধর্ম তথ্যে গ্রহণ করেন নি। তিনি ছিলেন ভক্তিপথের পথিক। মিশ্রণ ত্রুটির উপাসনায় তিনি ভুগ্ন হন নি। রুক্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়কুমার বস্তুর প্রভাবে তিনি বেগকে অস্বস্তি মনে না করে উপনিষদ থেকে নৃতন করে ধর্মশাস্ত্র সংকলন করলেন। অর্থাৎ তিনি উপনিষদকে শুধু বিচারের বস্তু করলেন না; তিনি তাকে জীবনধর্মের পরিণত করলেন। সেবেশ্বনাথ মূলতঃ ছিলেন ধর্মপ্রবক্তা। তাঁর ধর্ম ছিল উপলব্ধির ধর্ম। ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি দিয়েই তাঁর মনঃপ্রকৃতি গঠিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থে লৌকিক ধর্ম এবং দেবদেবী-বিবর্তিত উদার আত্মোপলব্ধির ধর্মসংস্কৃতির আলোচনা করেছিলেন। বহুবিস্তৃত তাঁরই সমালোচনার বিনয়গুণে লিখলেন—

"তিনি বলেন যে, ত্রুটোপাসনাই হিন্দুধর্ম। অতএব ত্রুটোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুধর্ম সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ধর্ম— কিন্তু আনন্দের দেশের চলিত ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এমন কথা তিনি বলেন না। যে ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তাৎপর্যেই লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা— সকল ধর্মের অন্তর্গত— সকলেরই সারভাগ।"‡

সেবেশ্বনাথের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাববীজগুলি নিয়ে পরিকল্পিত হয়েছিল, সে কথা বহুবিস্তৃতও অস্বীকার করতে পারেন নি। অথচ ভারতবর্ষের কল্পনাতেও সেবেশ্বনাথের অন্তর অম্লভূতপতাবেই আচ্ছন্ন ছিল। রাজনারায়ণ বসু এই ভারতীয় জাতীয়তা বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের চিন্তা

* The Bengal Spectator, December 1, 1842, p. 161 এবং January 1, 1843, p. 5

† বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩২৮

বন্ধিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি

হলেও জাতীয় গৌরববোধের প্রাথমিক কৃমিকারিত হয়েছিল বেবেঞ্জনাথের ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, বেবেঞ্জনাথই স্বর্ণবোধের অস্বাভাবিক আরম্ভ করেছিলেন, যখন চন্দ্র দত্ত সেই আরম্ভ কর্মটিকে পরের যুগে হৃদয়ঙ্গর করেছিলেন।

বেবেঞ্জনাথের লক্ষ্য ধর্ম হলেও ঘর্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে তত্ত্বাবোধিনী সভার সভাব্য প্রায় সকলেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি-আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অক্ষয়কুমার বসু, ইন্দ্রচন্দ্র বিভাসাগর, রায়নারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই এই সাধারণ মনোভাবে উৎসাহিত ছিলেন। অক্ষয়কুমার দ্বিত্ববাদী মনোবা। ‘ভারতবর্ষীয় উপাঙ্গক সম্প্রদায়’ এবং ‘প্রাচীন হিন্দুধর্মের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিভাগ’ অক্ষয়কুমারের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের দুইটি রূপে উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রচন্দ্রের ‘সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব’ এবং যদুভারতের অস্বাভাবিক ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনী বাংলার অস্বাভাবিক করতে আনন্দোজ্জ্বল ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর নিবিড় অগ্রগণ্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে সাধারণ সংস্কৃত-পণ্ডিতদের মনোভাবেই সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করেন নি, যিনি তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন তিনিই সে কথা জানেন। আসলে তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজের কলহ ও মালিত্য থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন একটি বিশিষ্ট উদার দীপ্ত সভ্যতার মধ্যে। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা তাঁকে সেই অবকাশ দিয়েছিল।

২

বন্ধিমচন্দ্র ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত সংস্কৃতি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা এবং অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে লক্ষ্যীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পূর্ববর্তীদের কোনো একটি পনের অগ্রসরণ না করে একটি সমন্বিত আদর্শ নিয়ে কল্পনায় ব্যস্ত করে নিয়েছিলেন। বেবেঞ্জনাথ ঠাকুরের অধ্যায়-বিভাগের ব্যক্তিত্বাত্মক পদ্ধতির সঙ্গে তিনি প্রত্যয়িত গবেষণার যুক্তিবিচারকেও গ্রহণ করলেন। এক নিকে যুক্তি ও তথ্য, অন্য নিকে একটি বিশিষ্ট আদর্শকল্পনা— দুটিই বন্ধির একাধারে স্বীকার করে নিলেন। ফলে বন্ধিমচন্দ্র সমালোচনার দুই বিশিষ্ট আক্রমণের পথই উন্মুক্ত রাখলেন। কেউ বললেন, তিনি অধ্যায় উপলব্ধিতে মূল্য না নিয়ে শুধুই যুক্তির পথে গিয়েছেন, আবার কেউ বললেন তিনি যুক্তিকেও নিজের কল্পিত আদর্শে লালিয়ে নিয়েছেন।

বন্ধিমচন্দ্রের চিন্তায় কিন্তু আর-একটি নিকের উপরেও জোর পড়ল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে বন্ধিম বাংলাবের ইতিহাসের জট্র ব্যাঘ্রতা প্রকাশ করলেন। বন্ধিমের বঙ্গপ্রীতি বৃহত্তর ভারতচিন্তার বিরোধী নয়, এটা। তাঁর সমগ্র রচনাবলী পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। বন্ধিমের বাংলাবের সমগ্র রচনাগুলি পড়লে তাঁকে সংস্কারমীনা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে বাংলা ও ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বাংলাবের গৌরব যে বৃহত্তর আর্থ-গৌরব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এটা তিনি জানতেন। ‘বঙ্গোপসংস্কার’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

“আধুনিক বাঙ্গালার তাদুণ মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই—স্বার্থকোতিভূমি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এখন সেবা বাইতেছে যে আদ্যর সে কীর্তি ও ধনেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্তিময় পুণ্ড্রগণই আদ্যদিগের পূর্বপুরুষ। সেবে সেবে পাঁচু তেওয়ারীর মত আদ্যর ও ভারতীয় আধুনিকের প্রাচীন ধনের ভাগী বটে।”

বন্ধিমচন্দ্র বাংলাবের ইতিহাস লক্ষ্যে উত্তরভারতীয় আধুনিকের সঙ্গে আদ্যরতার যোগ অস্বত্ব করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির

চর্চা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি আর্থগৌরববোধও খুব ম্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাব্যের ক্ষেত্রে পুণ্য ইত্যাদি তো বটেই, যশোভদ্র, রাজভদ্রাল, রামদাস সেন, রত্ননীকান্ত গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীতেও অতীতচারণের স্বর বেধে ওঠে। বহুমুখস্রের বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করে ভারতসংস্কৃতি আলোচনার একটি পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এই আর্থগৌরববোধের মধ্যে থেকেই বহুমুখস্র বাংলা দেশের ইতিহাসের ক্ষত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন। এটা বিতর্ক মনোভাবের দৃষ্টান্ত নয়, এটা পূর্ণ ব্যক্তিস্বেরই দৃষ্টান্ত। সেই ব্যক্তির কিতাবে গড়ে ওঠে, তার বিশদ ব্যাখ্যাও বহুমুখস্রের ধর্মতত্ত্বে আছে—

‘এই জাগতিক শ্রীতির সঙ্গে আত্মশ্রীতি, স্বজনশ্রীতি এবং স্বদেশশ্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাতত সে বিরোধ আমরা অস্বীকার করি, সেটা এই সকল কৃত্তিকে নিত্যমতায় পরিণত করিতে আমরা চেষ্টা করি না এইজন্য। অর্থাৎ স্মৃতিত অস্বীকারের অভাবে।’^১

বহুমুখস্র দ্বাদশকালে ধীর কাছে শিক্ষানবিসি করেছিলেন, চিন্তাশীল ভাবুক বলে তাঁর কোনো ব্যাতি নেই। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রলম্বে বহুমুখস্র তাঁর বাঙালী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন; এই মনোভাব বহুমুখস্রের তরুণ বয়সকে প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্তু গভীরতর জ্ঞানসাধনার স্বপ্ন বহুমুখস্রের মনোবাঞ্ছা জেগে উঠল তখন তখন ও ইতিহাস-স্মৃতি দ্বিধে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির র্ম অন্বেষণে নিরত হলেন। এখানে আমরা স্বপ্ন করতে পারি ঈশ্বর গুপ্ত মেঘেন্দ্রনাথের তথ্যবোধিনী সভায় সভ্য হয়ে এবং অনেকটা এরই আদর্শে প্রাণোদিত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি আত্মপর্যবেশ হয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস কিংবা ধর্ম-বর্ণনের আলোচনার পটু ছিলেন না। তবে তিনি সাধারণের জ্ঞান আকর্ষণ করতে পারতেন।^২ ঈশ্বর গুপ্তের এই শক্তির একটি সুবৃহৎপ্রকারী ফল দেখা গেল—মনোবোধের চিন্তাকে সাধারণ বাঙালীর সহজবোধ্য এবং গ্রহণীয় তিনিই করেছিলেন। বহুমুখস্র ঈশ্বর গুপ্তের যে বাঙালী মনোভাবের উল্লেখ করেছেন, সেটা তাঁর কোনো মতবাদ নয়। সংবাদ প্রচারকের পৃষ্ঠায় তিনি বাংলাদেশের সংবাদই যে পরিবেশন করতেন তা নয়, ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সকলের সংবাদও তিনি প্রচার করতেন এবং সাময়িক অস্বীকার বশে তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন। ঈশ্বর গুপ্তই বোধহয় প্রথম ভারত-স্মৃতিকে ‘জননী’ সন্মোদন করেছিলেন—

জননী ভারতকুন্ডি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরত্ন ভূখরীণ হয়ে ?
তোমার কুণার বত সকলেই জানহত
দ্বিত্ব কেন হয় তার হয়ে ?

এই কবিতাটি তিনি পড়েছিলেন একটি সভায় বক্তৃতা করার উপলক্ষ্যে। এই বক্তৃতায় ভারতবর্ষের অতীত পৌরবের প্রতি নিবিড় আঁচ প্রকাশ পেয়েছে—

“এই দেশ বন্ধন স্বায়ীন ছিল, অর্থাৎ আমরা স্বাধীনতার স্বাভাবিক অধিকার অস্বীকার করিতাম তখন হিন্দু-জাতির পৌরব ভগ্নরূপে কিংবা বিকৃত হইয়াছিল, আমরাদিগের স্বাভাবিক লক্ষ্যপেছা প্রাচীন স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং

১. অর্জুন, চতুর্বিধিতি অধ্যায়

২. সাধারণের উপায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যয় কি রকম ছিল, তার কবিতা দ্বিধাজন দিল্লার শাস্ত্রী; রামচন্দ্র শাস্ত্রী ও তৎকালীন দ্বন্দ্বসময়, তৃতীয় দফা, পৃ ২০১

আমরাই সর্বোপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতাপে বিখ্যাত ছিলাম, প্রথমতঃ এই বেশ হইতেই বিবিধ বিদ্যার স্বপ্ন হইয়াছে স্রোতিষ বিদ্যা, ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা, রেখাগণিত বিদ্যা এবং বিজ্ঞানবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানবিনীত বিদ্যা প্রবলই অশ্বদেবীত্ব কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তিকে অবলম্বনপূর্বক পৃথিবীতে পদার্পণ করত হিন্দুগণের আদর্শপ্রাপ্ত হইলেন, ঐ সময়ে অবশেষে অস্ত্রাঙ্গ তাবদেখ জ্ঞানান্ধিমিরে আচ্ছন্ন ছিল ...”^{১১}

ঈশ্বর গুপ্তের এই ভারতীয় দৃষ্টির সঙ্গে বাঙালী মনোভাবের কিছুমাত্র বিরোধ ঘটে নি। বহিঃশাস্ত্র সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠা থেকে ছাত্রাবস্থায় যে অল্পপ্রেরণা পেয়েছিলেন, এই দৃষ্টান্ত তাতে বসুন্ধরিত করেছিল, বলে মনে হয়। বহিঃশাস্ত্রের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দ্ব্যবতঃই বৃহত্তর উৎস থেকে পুষ্টিলাভ করেছিল, অস্বতঃ বাংলাকালে তাঁর মনের পরিণতি সাধনে সংবাদ প্রভাকর বাণীর স্বপ্ন না করে আত্মহুলা করেছিল, এটুকু বলা যেতে পারে।

অবশ্য বহিঃশাস্ত্র বাংলার ইতিহাস রচনার সচেতন উদ্দেশ্য দ্বারা যেমন চালিত হয়েছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনাও তিনি সেভাবে ত্রুতী হন নি। ভারতবর্ষ নিয়ে ইতিহাসাশ্রিত প্রবন্ধ তাঁর অস্বতঃ তিনটি আছে—ভারতকলক (বঙ্গবর্নন, বৈশাখ ১২৭২), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (বঙ্গবর্নন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য (বঙ্গবর্নন, আশ্বিন ১২৮০)। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-সাধনা ও মনীষার পরিচয় তিনি দিয়েছেন জ্ঞান, সাংখ্যবর্নন, হিন্দুধর্ম, বেদের সেবতা, Buddhism and the Sankhya Philosophy, Vedic Literature প্রভৃতি প্রবন্ধে। প্রাচীন ভারতের অস্ত্রাঙ্গ দিক নিয়ে তাঁর বিশেষ আলোচনা নেই। সীতারাম উপাধ্যায়ের উদ্ভিদ্ধার শিল্পকীর্তি বর্ণনায় ভারত-সংস্কৃতির শিল্পপ্রতিভার প্রশংসা আছে। শকুন্তলা, উত্তররামচরিত প্রভৃতি প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আছে। বহিঃশাস্ত্র মধ্যযুগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষতঃ বিশেষ কিছু লেখেন নি, যদিও প্রসঙ্গতঃ অনেকবারই তিনি এর উল্লেখ করেছেন। এখানে স্বরসী, তাঁর উপাঙ্গগুণি অধিকাংশই মধ্যযুগীয় পটভূমিতে রচিত। ‘ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা’ প্রবন্ধে তিনি আকবরের শাসনকালের প্রশংসা করেছেন, তা-ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পানিকটা এ যুগের মতোই ভারত-সংস্কৃতি বলতে প্রাচীন ভারতবর্ষকেই তিনি বুঝেছেন। শুধু বহিঃশাস্ত্র কেন, সে যুগের মনব্য ব্যক্তিব্যের সকলেরই ছিল এই মনোভাব। এর একটা কাহণ বোধহয় এই যে, প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যয়নের ফলে মধ্যযুগের চেয়ে প্রাচীন যুগের প্রতিই ঐতিহাসিকদের ঝোঁক পড়েছিল। আর-একটি কারণ অবশ্য সন্দোহবিগত মধ্যযুগের উৎসাহিত্বের তুঙ্গ স্বভাব। দাব্যবোধ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর বোধহয় এমন কেউ ছিলেন না যিনি মূলম্যান শাসনের চেয়ে ইংরেজ শাসনের বরীকতর মনে করেন নি। বহিঃশাস্ত্র জাতীয়তার এত বড়ো উপাত্ত হলেও ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রে চেয়েছিলেন, অনেকের কাছে এ একটা বিশ্বাসের বিষয় সন্দেহ নেই। বহিঃশাস্ত্র সে যুগের পক্ষে সাম্রাজ্যিক স্বাধীনতার চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ফলে মাত্রই তৈরী হলে সাম্রাজ্যিক অধিকার লাভের যোগ্যতা অনায়াসেই আসবে। রবীন্দ্রনাথও আনন্দিক শক্তির বিকাশকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছিলেন। বহিঃশাস্ত্র মন্ত্রতন্ত্রকে অস্বীকার বা সংস্কৃতির স্বাধীনতা লড়াইতে চেয়েছিলেন, এক-টা মতে এর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ঐতিহ্যেই আছে। স্বতন্ত্রাং দেখা দাঙে, বহিঃশাস্ত্র ভারতবর্ষের

ঐতিহ্য বিচার করতে গিয়ে তাঁর যুগের প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখেছেন। তাঁর পক্ষে এটা শুধু গবেষণার মানসই ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির মহৎ ঐশ্বর্যের সম্মানে স্বাভাবিকই তিনি অধ্যাত্ম-গাণনাধার ধ্যানের নিকটই বার দিয়ে কর্ম এবং কীর্তির দিকটাই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্যানের সত্যটিকেই বড়ো করে দেখেছিলেন। তাতেই নিহিত আছে বিশ্বাত্মীয়তার তত্ত্ব। তপোবানের যুগটি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আর-একটি যুগকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন—বৌদ্ধযুগ। উপনিষদের যন্ত্রবাণী এবং বুদ্ধবাণীকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুই যুগের কোনোটিকেই জাতি বা সমাজ-সংগঠনের টকিত ক্ষমিত হয় নি। বহির্মুখ আকর্ষণ হলেন আর-একটি যুগে, যখন মাহুকের মহৎ মানস-সম্পদ মহৎ কর্মে প্রসূত হল। বহির্মুখের মতে সেই যুগ হচ্ছে মহাভারতের যুগ। মহাভারত থেকে তিনি কৃষ্ণচরিত্র উদ্ধার করলেন। মানবতার পূর্ণ বিকাশ থাকে তিনি মনে করেছিলেন, তাঁকে আমরা পাই এক প্রচণ্ড কর্মসংঘাতের যুগে। কৃষ্ণচরিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক বলেই কৃষ্ণকল্পনার বিবর্তনেই জাতীয় মানসেরও বিবর্তন হয়েছে—‘কৃষ্ণচরিত্র’ প্রবন্ধে বহির্মুখের বিশ্লেষণের বিশেষণের সঙ্গে সেটা দেখিয়েছেন।^{১২} তাঁর মতে মহাভারতে আমরা যে কর্মবীর কৃষ্ণকে পাই তিনিই হচ্ছেন মানবতার পূর্ণ আদর্শ। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ রচনায় তিনি নিঃস্বের মনোগত আদর্শ ঘরা চালিত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচনা সত্য। বহির্মুখ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় তাঁর সমসাময়িক সমাজের নির্দেশ বুঝেছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় বহির্মুখ বা আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, ধর্মতত্ত্বে তারই বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। বহির্মুখ তাঁর অহুশীল-ধর্মকে বলেছেন, doctrine of culture। “আমাদের সমাজ দার্শনিক ও মানসিক শক্তি অহুশীল ও পরিচালনাই ধর্ম ও তাহার অভাবই অধর্ম।”^{১৩} কৃষ্ণের মধ্যে তিনি এই ধর্মের পূর্ণতাকে দেখতে পেরেছেন।^{১৪}

০

বহির্মুখ বাস্তব-জীবনকে পরবর্ণনা দিয়েছেন, তাই সেগ্রন্থটিকেও বুদ্ধ করেন নি। বাস্তব-জীবনের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভাবনাটা বহির্মুখ-সাহিত্যের একটি গুরু ও কঠিন দ্বিজ্ঞান। মাহুকে বাচতে হলে তার দেহের পরিপূর্ণতা চাই, দেহের পুষ্টির জন্য সমাজ চাই, সমাজের জন্য ধর্ম চাই। প্রত্যেকটি স্তরের সমতৌল্য সাধনার মাঝেই অহুশীল-ধর্ম। অহুশীল বলতে কর্মপ্রচেষ্টাকেই বোঝায়। কর্মশক্তির চর্চা না হলে অহুশীল হয় না। স্ততঃ বহির্মুখের মতে জীবনের কর্মের বিকাশেই সংস্কৃতির বিকাশ। এই-জন্যই বহির্মুখ ভাস্কর-ইতিহাসের উপনিষদের যুগকে বরণ না করে বরণ করেছিলেন মহাভারত-পুরাণের যুগকেই। প্রাচীন ভারতের নির্জন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজাঙ্গার মহাভারতের যুগের জীবনে প্রকাশমান হয়েছে। বহির্মুখ উনিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জীবনের গঠন-পর্বে স্বভাবতই সেই পৌরাণিক যুগের সাধনারই স্রবণ নিয়েছিলেন।

এর এই যে, বহির্মুখ যে অহুশীল-ধর্মের কথা বলে গিয়েছেন, তাকে ভারতবর্ষের সমাজতাই শ্রেষ্ঠ

১২ বহির্মুখ প্রবন্ধ, বিবিসি। পরিচালনা, পৃ ৩১৫

১৩ ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়

১৪ কৃষ্ণচরিত্র, প্রথমবারের দ্বিজ্ঞান

বহির্মমতঃ ও ভারতসংস্কৃতি

সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করা যায় কি? নবমানবধর্ম প্রচারে বহির্মমতঃ পাশ্চাত্য দার্শনিক কোম্বুতের কাছেই বর্ণী—এ কথাই সকলে জানেন। কোম্বুতের মতবার উনবিংশ শতকের বাঙালী চিন্তাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, সন্দেহ নেই। বহির্মমতঃ করেছিল, কিন্তু বহির্মমতঃ ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থন না পেলে কোম্বুতের সম্পূর্ণ গ্রহণ করতেন কি না সন্দেহ। বহির্মমতঃ বলেছেন, “হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্বুত মতের কোথাও কোন সামান্য ঘটিয়া থাকে, তবে ধ্বন্যস্পর্শযোগ ঘটানোই বলা। হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি?” অবশ্য বহির্মমতঃের এই ব্যাখ্যা যে অসঙ্গত, এ কথা বলা যায় না। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির যে বিশ্লেষণ করে একটি উদার মানবধর্ম পৌঁছেছেন, সেটা অনেকটাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। বহির্মমতঃ তা জানতেন। এই সংস্কৃতির যে দুগোপকোণী রূপ আছে, এই সত্যটিই বহির্মমতঃের গর্বের বিষয়। পাশ্চাত্য দেশ থেকে স্পষ্টতই মানবসংস্কৃতির সম্পর্কে দীক্ষার করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন। বৈদান্তিক ধর্মের সর্বব্যাপী শক্তিই আধুনিক জ্ঞান ও শিক্ষার পথে বাধা ঘটায় নি। মানবমতঃের উপসংহারে তিনি বলেছেন, “অন্তবিষয়ক যে জ্ঞান সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিশয়ক জ্ঞান আগে না; অগ্রিলে অন্তবিষয়ক জ্ঞান অগ্রিমের সন্ধান। নাই।—অতএব ভিন্ন দেশে হইতে বহির্বিশয়ক জ্ঞান অর্জিত হইবে।”

বহির্মমতঃের দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি বাস্তবের সঙ্গে তাঁর চিন্তার গতির তুলনা করে দেখা যেতে পারে, কুসেব মুখোপাধ্যায় এবং শশধর তর্কচূড়ামনি। কুসেব বহির্মমতঃের আঁঠু। তিনি গোড়া আশ্রয় পরিবর্তনের সন্ধান। তাঁর চিন্তাধারা একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই প্রবাহিত ছিল। কুসেবের মতো মুক্তিবিদ্যার মনীষী কমই আছে। হিন্দু সনাতনের বীজিনীতি আচার-অনুষ্ঠানে তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সেই বিধি-নিয়মের মূলা যে এ দুগুণে অশূন্য আছে, কুসেবের বিশ্বাস এ বিষয়ে ছিল অটল। তাঁর সমগ্র পুস্তক বাঙালী হিন্দুর একান্তবর্তী পরিবার প্রথা অব্যাহত ছিল। কুসেব মুক্তি দিয়ে এই প্রথাই হুমস বৃত্তে পেরেছিলেন। কুসেবের মতো মনীষী আশ্রয় সংস্কৃতির স্রেষ্ঠ আদর্শকে অক্ষত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু শশধর তর্কচূড়ামনি আশ্রয় সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শটি অক্ষত করতে পেরেছিলেন বলে বলা যাবে না। বহির্মমতঃ কুসেবের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, যদিও কুসেবের গর্ব মতই তিনি গ্রহণ করতেন কি না সন্দেহ। বহির্মমতঃ পরিবার-জীবনের আসন্ন রূপান্তর এবং তাঁর সঙ্গে সনাতনের পরিবর্তনও বৃত্তে পেরেছিলেন; শুধু তাই নয়, যুরোপীয় সংস্কৃতির সর্বদীপটিও তিনি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শশধর তর্কচূড়ামনির উদ্দেশ্যেও তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না—

“পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামনি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না এবং তাহার বর সফল হইবে না।”^{১০}

বহির্মমতঃ ভারতীয় সংস্কৃতির সেই তথ্যটিকেই জানতে চেয়েছিলেন, যা জীবন্ত, যা নতুন করে বিকাশ পায়, আধুনিক যুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে যার বাধা ঘটে না। তিনি বলেছেন, “হিন্দু ধর্মের সেই সর্বভাগ অবশ্য, চিরদিন চলিবে, মহত্ববের হিতসাধন করিবে, কেননা মানব-প্রকৃতিতে তাহার জিন্তি। তবে বিশেষ বিধিগত সফল ধর্মই সম্যগোচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য ও পরিবর্তনীয়।”^{১১} যেটির সঙ্গে বহির্মমতঃের যে বাহ্যবাদ হয়েছিল, তাঁর উপসংহারেও তিনি

১০ বহির্মমতঃ, বিধি। পরিবর্তন, পৃ ১০৭, পৃথিবী

১১ বহির্মমতঃ, পঞ্চম অধ্যায়

অম্লরূপ উক্তি করেছিলেন। বহুমতস্ত্রের দৃষ্টিতে ভারত-সংস্কৃতি হচ্ছে গতিশীল এবং যুগোপযোগী। এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি সেকালের পাক্ত্য জীবনের প্রবল প্রতিবাদে সংস্কৃতির যে সর্বসংগ্রহ রূপটির ব্যাখ্যা করলেন, মধ্যযুগে ইসলাম সংস্কৃতির কট্টপাথরে তার ঘাটাই করেন নি। বহিন কোনো নূতন ধর্ম প্রচার করতে চান নি, এটাও মনে রাখা দরকার। তিনি যে সমাজে বাস করতেন, সেই সমাজের ভূমিতে পাড়িয়েই তিনি সংস্কৃতির চিন্তা করেছিলেন। এইজন্য তাঁর আদর্শে হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট বর্ণটি লুপ্ত হয় নি। কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতির একটি উদার মানবিক রূপই তাঁর কল্পনার বিষয় ছিল। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যদি তাঁকে সংস্কৃতির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হত, তিনি তাঁর মত রক্ষা করতে পারতেন বলেই মনে হয়। কারণ বহিনের মতে 'মানবপ্রকৃতি'তেই এই সংস্কৃতির ভিত্তি। বিশেষতঃ ইসলাম সংস্কৃতিতেও ইহলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য ও বহিমতস্ত্রের অভিমতের অস্বল্প হত। বোড়প শতাব্দীর চৈতন্যধর্ম প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মদৃষ্টির সঙ্গে নবলব্ধ ইসলামিক সংস্কৃতির বাস্তব-পরায়ণতার মিলন ঘটেছিল। বহিনচন্দ্র এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তাঁর ধর্মতত্ত্বের একটি অম্লরূপ দৃষ্টান্ত রূপে এই তথ্যটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক; কিন্তু বহিমতস্ত্রের আদর্শ হয়তো এতেও তৃপ্ত হ'ত না। কারণ চৈতন্যধর্মের ভক্তিবাদের আতিশয্য তিনি চাইতেন না; তিনি চাইতেন সবগুলি কৃষ্ণরই সমগ্রসীমাত্মক রূপ। গোড়ায় বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নয়, মহাভারতের কৃষ্ণই ছিলেন তাঁর আদর্শ।

জ্ঞান্য বহিমতস্ত্র যে তাঁর ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই উদার সংস্কৃতির কল্পনা করেছিলেন তা স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ অম্লরূপে যেই নির্বিশেষ মানবতার কল্পনা তিনি করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মত সম্ভবতঃ এই যে, হিন্দুধর্মের মধ্যে যদি সত্য থেকে থাকে, তবে সে সত্য অগ্রকে তিরস্কৃত করে নয় অগ্রকে লক্ষ্য বীকার করে নিয়েই সে সত্য। সেইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির উদার এবং শ্রেষ্ঠত্ব। এই উদার রূপ কল্পনা করতে গিয়ে অনেক অনাবস্তককেই তিনি পরিহার করেছেন। আধুনিক পাক্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করতে গিয়ে বহিমতস্ত্র এ যুগের বা অপরিহার্য ভারতই হ'ত লক্ষ্য করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন-সাধারণ। এইজন্যই ব্যক্তিতাত্ত্বিক অধ্যাত্ম-সাধনার তিনি প্রবেশ করতে চান নি। সমাণবদ্য তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য নয়; ভোগলিপ্ত স্বার্থপর জীবনকে তিনি বিস্ময় দিয়েছেন। বহিমতস্ত্রের এই মধ্যম পন্থাটি বিশিষ্টরূপে তাঁরই উপলব্ধি, এ কথাও বর্ণনা দরকার। বস্তুতঃ ভোগ ও ভোগের সনক-সন্তর্পণ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মর্মবাণী। মহাবিবেচনারূপে তাঁর ধর্মের আদর্শে এরই সূত্র; করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পিতৃবৃত্ত সাধনার দ্বিধা গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর কাব্যসাধনা ও জীবনসাধনা এই প্রেরণারই আলোকে আলোকিত। 'ভোগের বেঁচেছি তুমি সংসারের সাথে'— রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই ছিল ভারত-সংস্কৃতির অন্তরের কথা। এখানে মনোবী বিশিন্দ্র পালের একটি কথা উদ্ধৃতিযোগ্য—

"বহিমতস্ত্র হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহার অম্লরূপ ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর মাত্র।"^{১১}

কথাটা পোনায় বিচিত্র, কিন্তু ভিত্তিহীন নয়। নতুন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রভাবে সেকালের মনোবীদের

চিত্তক্ষেত্রে বিচিত্র ভাবের ফসল ফলেছিল; তারা যে একই স্বভাব ফল এটা যেন ভুলে না যায়। নব্য যুগের হুকুরা আর কিছু না মানলেও সত্যকে মানতেন— *Indeed, the college boy was a synonym for truth.*^{১৭} হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই সত্য ছিল নৈতিক। দেবেন্দ্রনাথ যে-সত্যকে আরাধ্য করেছিলেন, সে-সত্য আধ্যাত্মিক, ব্যক্তির উপলব্ধিগম্য ধ্যানের সত্য। এই সত্য জীবনকে আচ্ছন্ন করলেও এর নিবিশেষ ভাবস্থির মহিমা জীবনের উর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে রূপরূপেও অঙ্গভব করলেন। মহাবির কবি-মন রবীন্দ্রনাথেরও লক্ষ্যসিদ্ধ হয়েছে। তাই তাঁর সৌন্দর্যলক্ষী সত্যাবলম্বিনী। বঙ্কিমচন্দ্র নিবিশেষ সত্যের বিপণি আলোচনা করেন নি। কিন্তু তিনি বলেছেন, “সত্য ভিন্ন অদ্বৈত কখনও মরণ নাই। সত্যই ধর্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাহনীয়, সত্যমের অর্থতি।”^{১৮} তথাপি এ কথা ঠিক, সত্যকে নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় সত্যের কোনো নিবিশেষ রূপ নেই। সেপে কালে তার রূপ বিচিত্র। ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনেই সত্যকে বহুরূপে প্রকাশমান দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই প্রণবস্তাই এর গৌরব। এই পরিবর্তনশীল সত্য লাধনায় যাহুব বস্তাই উপযোগী হয়ে উঠবে, ততই হবে মানবতার চরিতার্থতা এবং সেটাই বঙ্কিমচন্দ্রের অস্থায়ী-ধর্ম।

১৭ Thomas Edwards, *Dorozio* (1884), pp. 67-68

১৮ বঙ্কিম স্মৃতিসৌ, বিবিশ। পরিচয় সংগ্রহ, পৃ ৩৯৯

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'বছর আগে আমরা কবি জীবনানন্দ দাশকে এক মর্যাদিক দূর্ব্যতনায় আকস্মিকভাবে হারিয়েছি। আজ আবার কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকালে পোচনীঘভাবে হারালাম। জীবনানন্দের মৃত্যু আমাদের স্তম্ভিত, বিমূঢ় করেছিল। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু এল একেবারে অন্ততাবে : জীবনের শেষ ক'বছর তিনি যেন নিজেই নিজেকে এই অনিবার্য পরিণামের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। অসহায় আত্মবুদ্ধি নীরব বর্ষেকের মতো তাঁর জীবনের শেষ অশ্রুর কণ নৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন। এতবড়ো সচেতন শিল্পীর কেন এ আত্মহারা, এর উত্তর তিনি আনন্দের দিয়ে বানানি, তবু এর অন্ত একমাত্র তাঁকেই ধরো ক'রে আমরাও মনে এতটুকু সাধনা পাব না।

জীবনানন্দের চেয়ে বছর-দশেকের ছোটো ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তর্যর্ষে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও সাহিত্যের নিম্ন-নিম্ন ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের প্রতিভাই ছিল অসাধারণ। আবার দুজনের ভাগ্যই ছিল আত্মীয় অর্ধকষ্ট। জীবনানন্দের একটি অমৃত রসাকবচ ছিল তাঁর বতাবসিত ধ্যানী মন, যা তাঁকে জীবনের নানা বিপর্দয়ের মধ্যেও শান্ত সমাহিত রেখেছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেজী মন ছিল একেবারে অস্ত্র ধাঁচের, যার ফলে ভিতরে-বাহিরে প্রতিকূল শক্তির প্রবল সংঘাত তাঁর সমাজকে একেবারে ছিটকির করেছে। এই প্রণবে মনে পড়ছে আমাদের সাহিত্যের দুটি বিরোধী প্রতিভাকে— নগুপ্তেন ও নজরুল। দুটি প্রতিভাই উজ্জ্বল মতো জলে উঠেছিল। একটি উনিশ শতকের আকাশে হঠাৎ উজ্জল আলোয় চার দিক উদ্ভাসিত ক'রে দেখতে-বেখতে নিজের আগুন জলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, অল্পটুকু বিশ শতকের আকাশে এক সুহৃৎ আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার পর মাধাবর্ষণের টানে ছিটকে এসে মাটিতে পড়ে আছে : অলাড়, নিষ্পন্ন। নজরুল আজ টিকে আছেন মায়, তাঁর প্রতিভা বেচে নেই। সাধনার ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও স্বভাবের দিক থেকে এঁদের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনটি জীবনের পরিণামই মর্যাদিক।

অথচ কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পী কে-কোনো দেশেই গৌরব। তাঁর রচনার মৌলিকতা অসাধারণ, তা একেবারে ভিন্ন ধরনের— যে অন্ত আমাদের সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকে অনেকটা আকস্মিক বলে মনে হয়। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাধনায় পুষ্ট কথাসাহিত্যের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যি এক ব্যতিক্রম। তাঁর একক মানসিক গঠন তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে এক অসামান্যতা দান করেছে। (উত্তর-রবীন্দ্র যুগের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যায় 'কলোলা'-'কলিকলম'-'প্রগতি'র তরুণ লেখকদের মনে সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন পথ সন্ধানের যে স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সেই দুঃসাহসী প্রেরণাই এক নতুন দিগ্‌বলয় আবিষ্কার করেছে। অথচ তাঁকে ঠিক 'কলোলা'-গোত্রীয় বলা চলে না। 'কলোলা'র শেষ লগ্নে বাইরের দিক থেকে তাঁর মানসিকটা মিল থাকলেও মনোভাবিত্তি তিনি স্বতন্ত্র।) তাঁকে 'কলোলাস্তর' বলালে হয়তো ভুল হবে না,

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে 'কলোশীঘ'দের রোমাণ্টিকতাবিরোধী আন্দোলনের পিছনেও ক্রিয়া করেছে তাঁদের অন্তরের একটি সুস্থতর রোমাণ্টিক প্রযুক্তি, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন ছিল বণাসন্যব বস্তুনিষ্ঠ, দৃষ্টি ছিল চের বেশি বাস্তবধর্মী।

এই বাস্তব দৃষ্টি নিয়েই চার দিকের জীবন ও অগুণকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, অসুখ পদ্মাতীর থেকে শহরতলী এবং শহরতলী থেকে মহানগরী পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন ছাত্রেরা মাছের ভিড়ে। তাঁর সুস্থীকৃত মন সর্বত্র সর্বাঙ্গিকভাবেই সমাগ দৃষ্টিতে নিরাক্ষণ করেছে। নানা তরঙ্গের নরনারীর নবের ভিতরে তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর বিরোধী অন্তর্দৃষ্টি, অতি সতর্কভাবে পরীক্ষা করেছেন তাদের স্বভাব ব্যক্তিমাত্র, এবং লক্ষ্য করেছেন সমগ্রজীবনে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। (আমাদের সাম্প্রতিক শহিতে আকলিক কাহিনী রচনায় শৈলরানন্দ এবং মনোবিশ্বলনধর্মী কাহিনী রচনায় ভ্রূগদীশ গুপ্ত পত্রিত্ব ছিলেও এই উচ্চ ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পকৌশলের স্বকীয়তা বিষয়কর। তা ছাড়া মিতানুতন পরিবেশে কত ডির প্রকৃতির নরনারীর অঙ্গজীবনেই না তিনি প্রবেশ করেছেন, বিজ্ঞানীও মতে: সম্মানী আশোর স্বজনবধি ফেলেছেন তাদের অচেতনমনের পঙ্করে, ডেন করেছেন সেখানকার অন্তর্গত রহস্যগুহ। অবশ্য দৃষ্টিসাম্যায় বিজ্ঞানীও হলও সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি স্বার্থ জীবনশিল্পী: মাছের মরচেতনায় তিনি সেসব গোপন গুহাঘর্ষের সন্ধান পেয়েছেন সেসব অজ্ঞাতাচারের মেয়ালে-মেয়ালে স্বত প্রাণিবিজ্ঞানিক প্রাপ্তি, বত জীবজন্তু সর্গীষ, বত রহস্যময় মুখ ও মুখোশ, বত মাধ্যম্ভির ছাত্রনৃত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের প্রত্যেকটিকে রঙে-রোখায় জীবন্ত ক'রে তুলে তাঁর গল্প-উপন্যাসের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় অতি নিপুণভাবে সাজিয়েছেন তাঁর নুতন ধরনের চিত্রশালা।)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে আমকের মাছের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার-হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাস—তুকই মাছের মনের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে ডির স্বভাবের অনেকগুলি মাছ। আমাদের মনের নিষ্ঠান জরে যে বহুকালের বহুপুরুষের সংস্কারজাল গিঁঠ বেঁধে জট পাকিয়ে রয়েছে তাই আমাদের অন্তর্জীবনকে এক রহস্যময় ও বহির্জীবনকে এক জটিল করে তুলেছে, আর ব্যক্তিগত মনের এই জটিলতা সমাজ-জীবনকে ক'রে তুলেছে জটিলতর। জীবনানন্দ যে-সত্যকে হৃদয়কারে বলেছেন—'মানব জটিল চের হয়ে গেছি—বহুদিন পুরাতন এঁহে ঝেঁকে থেকে'—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি তারই বহুবিচিত্র জীবনতত্ত্ব। তা ছাড়া এ মেন এক নতুন ধরনের মহাতারত, যেখানে ভাষ ও শব্দই একট লগে একই সেহে জীবন খায়ন করছে, দু:শাসনই বাইরে সেজেছে ঘৃণিতর।

আবার আরো একটি মারাত্মক সংকট দেখ। যেহ মাছের: তার অন্তরের এই একাধিক সত্তার মধ্যে কোনটি তার শক্তিকার সম্ম। তা সে নিজেই জানে না। কথাবার্তা, কার্যকর্ম, আচার-মাচরণে সে এক-এক সময় সজ্ঞানেই এমন-সব কাণ্ড ক'রে বলে যা তার নিজের কাছেই অসংগত ঠেকে। একটা ইচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গেই বিপরীত ইচ্ছা, একটা চিন্তার স্থর ধ'রেই বিপরীত চিন্তা, একটা কার্য করতে গিয়েই তার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য—এর চেয়ে বিভবনা মাছের পক্ষে আর কী হতে পারে? অন্তত সজ্ঞানমনেও তার অন্তর্ভুক্তি, চিন্তা এবং চেতনার মধ্যে একটা পারস্পরিক ও পূর্ণাঙ্গের সংগতি থাক। বাকনীয়, কিন্তু মাছের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি হচ্ছে এই যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে তার সমগ্রসত্তার উগ্রাংশমাত্র। একটা নিটোল বৃত্তের মণ্ডলাঘিত পূর্ণতা সে নিজের মধ্যে কোনো কালেই খুঁজে পাবে না। আবার কেন্দ্রবিন্দুও

চিরকাল অপেক্ষেই থাকবে। কামেই সারাদিনের ব্যস্ততা ও ছুটোছুটি মধো যখন সে সৈবাং একটিবার নিজের ভিতরটাতে স্তম্ভিত করে তখন সেখানে তার সত্তার কণ্ঠে টুকরো ইতিহাস: বিক্ষিপ্ত ভাঙা বস্ত্রচাপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তবু এই ভাঙা টুকরোগুলিকেই কোনোভাবে জুড়ে নিয়ে তাকে খাড়া করতে হয় নিজের একটা কল্পিত রূপ, আর বিশ্বাস করতে হয় এইটাই তার সত্যিকার চেহারা— অবশ্য সে-বিশ্বাসও বেশি নয় তার নিজের কাছেই যোগে টেকে না।)

মহাশয়ের মনোলোকের এই সমস্তগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার নানা দিক থেকে নানা ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিল্পের কাজ তত্ত্বব্যাখ্যা বা তথ্যসংগ্রহ নয়, বস্তু ও তত্ত্ব কিংবা তথ্যকে সে নিজের প্রয়োজনে সর্বস্বই ব্যবহার করতে পারে। (শিল্পের প্রধান লক্ষ্য জীবনমতের বস্তুত্ব রূপধারণ, যা আত্মবোধের মনে এনে দেবে শুধু প্রতীতি নয়, প্রত্যয়; অহংমান নয়, অহংভব।— যা প্রত্যয় হবে উঠবে আত্মবোধের ভাবকল্পনায়। তাই মহাশয়ের রচনাটির আদিম অর্থ জীবনাবেগ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক তরঙ্গ শরীরী বিগ্রহ ধারণ করে। মহাশয়ের মনের মধ্যে যে আদিম অরণ্যের অন্ধকার বাধা পড়ে আছে সেখানকার জটিল স্তরসংগঠন আরও আনাগোনা করে বিকট হিংসার মূর্তি, ক্ষণে-ক্ষণে চমকে ওঠে শানিত চোখের দীপ্তি, বেরিয়ে আসে ধারালো দাঁত নয়। বিশ শতকের মহানগরীর স্নায়ুতেও সেই আদিম অরণ্যের অহংভূতি ছদ্মনয়ন করে, চার দিকে ঘিরে আসে রাশি-রাশি ছায়াভর— স্নায়ু, ভৌতিক— প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত ব'লে ভ্রম হতে থাকে। ঠিক এমনি সময়ে মহানগরীর অলিগলিতে, শহরতলীর ঘিঠি বহির্ভূতগলিতে, মহাশয়ের মনের আদিম অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে সেই 'প্রাইগতিহাসিক' রাত, মধ্যলেনের নকুমা শহরের এক প্রান্তে অশ্রুলাকীর্ণ পতিত ভাঙাঘ লুণ্ঠানিহত বসিরের ভাঙা কুঁড়ে ঘরের স্তম্ভ ঠেলে খোঁড়া পাঁচার হাত ধরে বেরিয়ে আসে বীভৎসমূর্তি ভিশু— ভাঙার ঝাঁক। জাগরণ খানিকদূর একসঙ্গে হাটবার পর প্রান্ত পাঁচার পিঠে ফুলিয়ে দেয় সে— তার পর শুরু হয় নিরুদ্ধেণ ঘাড়া :

দূর গ্রামের গাছপালায় শিশু হইতে নববীর চাঁদ আকাশে উঠিল আশিরাছে। ইব্বের পৃথিবীতে শান্ত ঘনত।

হৃদয়: ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে বারমহিষ্ণ অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে স্রব্ধ করিয়া ভিশু ও পাঁচ পৃথিবীতে আশিরাহীন এবং যে অন্ধকার তাহার সন্তানের মাসল আবেষ্টনীঃ-মধ্য যোজন রাখিয়া বাইরে তাহা আশিরাহীন, পৃথিবীর আলো আর পথের তাহার মাগল্য পায় নাই, কোন দিন পাইবেও না।

আবার 'সরীসৃপ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জটিল মধ্যবিত্ত মনের উপরকার ছত্র আবরণ পসিয়ে দিয়ে ভিতরের ভীষণের চেহারাটি অনাবৃত করেছেন। কপটতার আড়ালে মহাশয়ের অবদমিত আদিম ত্রিপুঞ্জলী ভাবে তাদের বীভৎস আহ্বার সংগ্রহ করে, এই অস্বস্ত গল্পটি তারই সৌন্দর্য চিত্র। এ-প্রেক্ষীর মাহুত যে ভিতরে-ভিতরে অন্তর চেয়েও হিংস, সাপের চেয়েও জটিল আর বিবাক্ত হতে পারে, গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে তা অস্বাভাবিক লক্ষ্যের সঙ্গে ছুঁতে তোলা হয়েছে। উপসংহারের তীক্ষ্ণ বক্তব্যটি সত্যতাভিমানে মহাশয়ের উপর বেন বিজ্ঞপের শানিত প্রাহার :

ঠিক সেই সময় যখন উপর দিয়া একটা এয়োজেন উড়িয়া বাইতেছিল। বেগিতে বেগিতে সেটা হৃৎকনের উপরে পৌঁছিয়া বেশ, মহাশয়ের সব ত্যাগ করিয়া কনর পত্তরা খেচানে আঁকায় নইল।

কিন্তু অবদমিত আদিম প্রকৃতির গোপন হিংস্রতাই আধুনিক সভ্যতার একমাত্র ব্যাধিলক্ষণ নয়। অল্প এক দিক দিয়ে এক জটিলতর সনাক্ত সৃষ্টি করেছে মহাশয়ের দৃষ্টিও অন্তরপ্রকৃতি। অচেতনমনের অস্তরঙ্গরে

কেন্দ্রস্থান কাননা অহবিন্দু হয়ে আছে তা জানতে না পেয়ে সবচেয়ে অসহায় বোধ করে মানুষ। তার চেতনমনের কাছে এর মূল কারণটি কিছুতেই ধরা দেবে না। ব'লে শত সম্ভাবন চোঁতাতেও সেই ভীষণ বহুশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। ফলে নিজেরই মধোকার এক অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে মানুষকে চলতে থাকে তার, আর সে-বন্ধে তিলে-তিলে সে সত্য অবসর হয়ে পড়ে। শেষ অবস্থায়, চরম পরাস্তের মুখে, আসে এক দুর্বার মুহূর্ত। এমনি এক মুহূর্তে 'দিব্যাত্তির কাব্যের' ঐতিহাসিক পরিণতি আগর হয় : মালতীর মেয়ে আনন্দকে তার জীবনের শেষ রাত্রে এক বিরাট দুর্নি জেলে দেবদেব সামনে নাগতে হয় অকৃত পুনরুত্থা :

‘অকৃত্যে আনন্দের নৃত্য দেখে দেল। আঁচনের আরও দিকটে সে যবক বীড়াল।’ আঁচন এমন তার মাথা ছাড়িয়ে আরও উন্নত চোঁড়ে, আনন্দকেও সন হৃদে আঁচনের দিখা। পরকণে আনন্দ কাত হয়ে সেই নিপুল ব্যাপক বজ্রানলে চলে পড়ল।

হেথ বিপুল হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছু করার নেই। আনন্দ অনেক আগে য'রে গেছে। শুধু চিত্তের উঠবার পতিতুইই তার ধ্বংস দিম।

জীবনানন্দের ভাষায় এও মানুষের ‘অন্তর্গত রক্তের ভিতরে’ ‘আরো এক বিপর বিশ্বের-ই ‘পেলা’। মানুষ এই অদৃশ্য শক্তির হাতে পুতুলনায়। মানুষের মনোভেদনার এই শক্তির ক্রিয়া ঘটেই হৃদয় তার বহির্জীবনের উপরে এর প্রতিফলিত। সেমনি অশোণ, আবার নরনারায়ণ পারম্পরিক সম্পর্কে গড়া সমান্তরালবিনের উপরেও এর প্রভাব সেমনি অপ্রতিরোধ্য। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র এই সত্যটিই অন্তর্ভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

‘নীর বত নিজের বুদ্ধিতে গড়া গরু কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা গালে তার গরি, এক অজানা শক্তির অবিধাৎ ইদিকে। মাথাফর্সনের মত যা ভিরতন, অপরিসর্য।

একে আরো অনেক লম্বা নাম মিহি ‘নিয়তি’— এই অদৃশ্যকেই বলি ‘অদৃষ্ট’। কিন্তু এর দুর্বার শক্তি ঠেলে আগছে আমাদেরই অন্তরপ্রকৃতির নিগূঢ় অধকার থেকে, আর জীবনকে অদৃষ্টাবে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে— কোথায় কে জানে। তাই ‘দিব্যাত্তির কাব্যের’ মাঘিকা আনন্দকে শেষ পদন্ত এমনি ক’রেই আত্মাহুতি দিতে হয়; আর হেরে য?— কিছুদিন আগে আনন্দই তো তাকে প্রর করেছিল :

‘জন্ম করিন ধাঁচে ?’

দেখ বলল, ‘কি ক’রে ফল আনন্দ, বিন জন্মে বলা যায় না। জন্মে-জন্মে জন্মকে গুণে রাখতে হলে মানুষ য'রে যাবে- জন্মে এত চেতনা দেবা।’

অন্ত প্রকৃতির তাঁর উদ্ভাসনার কাছে বৃত্তিশক্তিহীন হেরেও এমনি দুর্বল, অসহায়।

সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রতিভার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যে অবহিত হই : এক, মানবমনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনে তাঁর অনন্তদৃষ্টির ক্ষমতা ও গভীরতা; দুই, ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্রচিত্রাধানে তাঁর অসাধারণ কলানৈপুণ্য ও স্বকীয়তা; এবং তিন, সংস্কারমূল্য মনের স্থিতির বরনিষ্ঠা ও নিলিপ্ততা। এ ছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিতে ভাবার বিবর্তনও বিদ্যমান। শুক থেকেই এ-এ যেন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গল্পরীতি। অকৃত এর বলিষ্ঠতা, তাঁর বলিষ্ঠ জীবনবোধ থেকেই এর জন্ম। বাইরের চাকচিক্য এর পক্ষে শুধু অনাবশ্যক নয়, অনগ্রহ;— এমন-কি সাধারণ ব্যাকরণসম্মত বাক্যরীতিও সব লম্বা যথেষ্ট নয়।

কিন্তু ভাবারীতির কথা বাদ দিয়ে আপাততঃ তাঁর তৃতীয় গুণবৈশিষ্ট্য লক্ষ্যে আরো খানিকটা আলোচনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কাহিনীর অঙ্গ হবে গিয়েছে—কাহিনীর ধারার সঙ্গে তার একটা প্রাথমিক একা স্থাপিত হয়েছে। জা চাড়া তার ময়নাখীণের স্বপ্নটাকে আনন্দের সঙ্গে নিয়ে এক ঝঞ্জে নিজেদের চোখেই দেখে আসি, সেগনকার আইনকানুনগুলো সেগনকার সমাজ-জীবনের উপযোগী করে কেটে-চেটে বেশ মনোমসই করে নেওয়া হয়েছে। শেষের দিকে কী অনিবার্যরূপে এই ময়নাখীণের মুখেই ছুটে চলেছে কাহিনীর উটার টান।

‘পুতুলনাচের ইতিকথা’র কাহিনীর এই প্রবল উটার টানটি অস্বপ্নিত। কুবেরের সঙ্গে কপিলা এক নৌকায় ভেসে যায়, কিন্তু কুহুনের নৌকায় শব্দী ডাক্তারের তে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এখানে ময়নাখীণের স্বপ্নও তো অবাস্তব। কোথায় পদ্মাতীতের কেতুপুতের সেলোপাড়া আর কোথায় ব্যস্তিতপুত্র মহুকুয়ার খালপাতের গাওদিয়া গ্রাম। তা চাড়া শব্দী যেমন কুবের নয়, কুহুনের তে কপিল নয়। কপিলার সঙ্গে তার গোড়ার দিকে বদি-বা বানিকটা মিল ছিল, শেষ পর্যন্ত সেও কি একবারেই বদলে যায় নি? শেষের দিকে একদিন ভালবাসে শব্দীকে কী বলেছিল কুহুয় ?—

‘-চিরদিন কি একরকম যার? মানুষ কি সোহায় গড়া যে চিরকাল যে একভাবে থাকবে, বদলাবে না?’

আবার বলেছিল :

‘-আল টকটকে করে তাতানো সোহাতে কেন থাকল তাকে আরো আরো ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? -কাকে ডাকছেন হোটেল, কে যাবে আসবার সঙ্গে? কুহুয় কি বেঁচে আছে, সে দাঁত গেছে।’

অতি সত্য কথা। কিন্তু আরো সত্য শব্দী ডাক্তারের শতদীর্ঘ মন। এই গাওদিয়া গ্রামে দিনের পর দিন বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশে, আত্মারের মতো তাদের সেবার করে, কতই তো সেবল শব্দী। সুখের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে জীবনের এও এক বাদ। শহরে শিক্ষিত হলেও ‘হুয় ও মনের গড়ন’ আললে তার ‘গ্রাম’। কুহুয় এখানে থাকতে এই গাওদিয়া গ্রামই একদিন তার জ্বলকে পূর্ণ করে রেখেছিল; আর কুহুয় নেই, তবু অন্তরে পরম রিক্ততা নিয়েও শেষ পর্যন্ত এই গ্রামটিকেই সে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আছে। কাহিনীর সমাপ্তি কী সুন্দর! দিন যায়। শব্দীর শ্রমবনে ধীরে-ধীরে নেমে আসে এক স্নাত অবসাদ। দীর্ঘ ছায়া ফেলে এক-পা এক-পা করে তার দিকে এগিয়ে আসে রয়!। গল্পের মিল না থাকলেও এইখানে এসে কেন ছায়া নে মনে পড়ে যায় *Growth of the Soil* -এর শেষ ছবিটা। কানের কাছে কে যেন নিশ্বাস ফেলে বলে : Isak is old :

‘-সোহে আর আনন্দের শব্দী ঠাণ্ডে না, মন্থর গবে ঠাণ্ডে ঠাণ্ডে গ্রামে এসে পড়ে। গল্পপাতা বাড়ির জোড় পুত্র বড়দিয়া গ্রামের নরীক-লক্ষ্য রূপে দিকে নয়, শব্দীর জোড় খুঁজি বড়ায় রাখত। যারা আর তাবের, আর যারা মিল। ইনানের যোক্তার সামনে, বীথানে মক্কতলায়, কামেগাড়া পথে। -যাবের বাড়ী। শুধু গ্রাম কর্তব্যে তবলে, স্ত্রীর বাড়িতেও এখনো পোত আসে নাই। তার ওপরে ভালবাসে। ভালবাসে শব্দী কখনো যায় না। ঘাটের ঠাণ্ডার উপরে উঠা হুয়ত বেগমার শব্দ এ শব্দে আর একবারও শব্দী আসিবে না।

একবারে গোড়ার দিকে লেগা হলেও ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান গল্প। এক হিসাবে বলা চলে তাঁর প্রথম দিকের অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসই নানা ভাবে এই পুতুলনাচেরই খেলা চলেছে, এমন কি পরবর্তী কালের উপন্যাস ‘চকুক্ষেপে’ও তাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধনাকে ঘোঁটাঘুটি হুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি প্রধানত মনোবিশ্লেষণের পথেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনরহস্য উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। 'প্রাণৈতিহাসিক' ও 'সন্ন্যাস' ছাড়া এই পর্বের আরো কয়েকটি ছোটগল্প—উল্লেখযোগ্য: 'টিকটিকি' ও 'হলুপেগোড়া' গল্পে মানুষের জীবনে পৌকিক কুসংস্কারের বিকৃত প্রভাব, 'কুঠিওয়াকীর বো' গল্পে মরনারীর অভিপন্ন দাম্পত্য জীবনের এক তদাবহ রূপ, 'শাস্ত্রহত্যার অধিকার' গল্পে জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানুষের অসহায় আত্মবিলোপসমূহা, 'সমূহের স্বাদ' গল্পে জীবনের অক্লান্তবণাত অভিভূতগণতাত দ্বঃস্বাধ, 'আপিস' গল্পে দৃষ্টান্ত অর্থে মানুষের স্বভাবজাত নেশাপ্রবণতা, এবং 'বিবেক' গল্পে স্বার্থপর সুবিধাবাদীর একপেশে বিবেকবোধকে নিপুণ চরিত্রশৃঙ্গী ও ঘটনাবিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত ক'রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এদের বেশির ভাগ গল্পে লেখক মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়—বিশেষ ক'রে পক্তাশের মরুতর থেকে। এই সময় থেকে তাঁর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বড়ো রকমের পরিবর্তন এল। শুধু বাইরের কারণেই নয়, সম্ভবতঃ তাঁর শিল্পপ্রেরণার দিক থেকেও একটি নতুন ধারার অত্মবর্তন এই সময়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এ-পর্বের মনোবিশ্লেষণের পথ দ্ব'রে তিনি মানুষের মনোলোকের ততই গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ততই জটিলতর সমস্রার সন্ধানী হচ্ছিলেন, এবং এমনও মনে হয় যে, শেষ দিকে এই খাপরোখকারী অন্ধকার তাঁর শিল্পলব্ধকেও যেন শ্বশ্রুভাবে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। এই সময়ে তাঁর মধ্যে মানুষের জীবন সম্বন্ধে এক তিক্ততা ও বৈরাগ্যের ভাব এসে গিয়েছিল—অন্ততঃ মধ্যবিত্ত জীবন সম্বন্ধে তো বটেই। এ-পথে আর বেশিদূর এগলে কী হত বলা যায় না; তাঁর চরিত্রগুলি শেষ পর্বত হরতো ব্যক্তিত্বের কোণ ঐক্যহ্রদেই হারিয়ে কতকগুলি মানসিক সমস্রার প্রতীক হয়ে ধাঁড়াত। এ-পর্বের শেষ দিকের কয়েকটি গল্পে তার কিছু-কিছু অভ্যাস পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্র এ-অবস্থায় এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও যে এই সূত্ৰাবনার কথা এর আগে একেবারেই ভাবেন নি, তা নয়।) সাহিত্যজীবনের একেবারে শুরুতে ১৯৩১ সালে 'দিবারাত্রির কাব্যে'র ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন :

• বিবারাত্রির কাব্য শুরুতে ব'লে দরি কখনো হলে হয় বইখানা বাপস্নান, অথবা বিক—তখন হলে রাক্ষস হলে এটি শুরু হয় উপজ্ঞানও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোকা বাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অস্বভূতি বা ঈড়ার, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।

কাজেই মনোবিশ্লেষণের পথে কেবলি অগ্রসর হতে থাকলে এই টুকরো-টুকরো 'মানসিক অংশ'গুলি যে শেষ পর্বত আরো 'খাপছাড়া', আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে, একথা তাঁর মতো সচেতন শিল্পীর ঘোটেই অজানা ছিল না।

(এই সময়ে তাঁর শিল্পচেতনাকে নতুন পথে মোড় ফেরাবার প্রেরণা দিয়েছিল মার্কস-বাদ। এ-পর্বত তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন মানুষের মধ্যকার অন্ধ জীবনাবর্তকে, এবার লক্ষ্য করলেন কালধারায় প্রদারিত জীবনের বিরাট প্রবাহকে। তাঁর চোখের সামনে তখন মহাযুদ্ধের সমস্রকার বাংলাদেশ—এক দিকে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নরনারীর অস্বহীন দুঃখদর্শনা, অল্প দিকে তারই প্রতীকারের ক্ষমতা বাহুদের প্রাণপণ চেষ্টা। তিনি ক্রমে নিঃসন্দেহ হতে লাগলেন যে বাহুদের অস্তরপ্রসূতির গহনে দস্ত অটলতাই থাক, তাকে বৃহৎ ও ব্যাপক ভাবে চালিত করছে তার অর্থ নৈতিক সমাজত্ববোধ; যেখানেই এর যুগ্ম স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছে সেখানেই ভেগেছে স্বপ্নসংঘাত, ভেগেছে বিস্ময়, দার মধ্যে দিবে পথ বোচন ক'রে আবার বেরিয়ে এসেছে বহাজবনের ধারা। তাঁর বিরাগ হল, সমাজত্ববোধের সামগ্রিক অগ্রগতিই বাহুকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ, অসচেতনার প্রাগৈতিহাসিককে ক'রে তুলছে সমাজগচেতন ঐতিহাসিক নাহয়।

এই নতুন দৃষ্টি নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে গেলেন আত্মকের বাহুদের সবচেয়ে বড়ো অভিপ্যায় তার দুঃখের অর্থ নৈতিক বাণ্য, যা উত্তীর্ণ হতে হলে শব্দগ্রে প্রয়োজন সমাজের একটি বিরাট অংশের অবহেলিত বাহুদের অর্থ নৈতিক মুক্তি। এই রোগ ও তার প্রতীকার-চিন্তাই তাঁর শেষ পথের লেখাগুলিকে এক নতুন রূপ ও বৈশিষ্ট্য পান করেছে। অর্থ নৈতিক পরিবেশ ও তার পরিবর্তন ভাবকে কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৪০-৪১-এ লেখা তাঁর 'সংসারতলা' উপন্যাসে, কিন্তু অর্থনৈতিক পরাবীনতায় বাহুদের দুঃখই বাহুদের ছবি আঁকা হয়েছে মরহুমের পটভূমিতে 'দুঃখাসনার', 'নতুন' প্রকৃতি গল্পে। 'যাকে ঘৃণা দিতে হয়' গল্পে বর্তমান অর্থনীতির আওতার বহির্ভূত বাহুদের নৈতিক অধ্যাপনের একটা দিক উন্মোচিত হয়েছে।

এসব গল্পে অর্থ নৈতিক পরাবীনতায় বাহুদের পরাবহুদের ছবিই আঁকা হয়েছে, লেখক এখানে মূল্যায়ন সমাজের রোগ নির্ণয় করছেন। এর প্রতীকার চিন্তা করতে গিয়ে তিনি অস্বস্তি করলেন, বাহুদের একক চেষ্টায় তা হবার নয়, তার ক্ষমতা চাই একতা; আর এই একতা তখনই গ'ড়ে উঠবে যখন বাহুদের সমাজ-চেতনা তাকে ক'রে তুলবে সংবেদনশীল। অবশ্য এই বিশ্বাসটিতে নিকটস্থভাবে পৌছবার আগে তাঁর মনে কিছুকাল আশা-নিরাশার স্বপ্ন চলছে, এবং তাঁর এই সমস্রকার অনেকগুলি লেখাতেই তাঁর বিস্তার চেতনার ছায়া পড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত এই নাস্তিক্যধর্মী মনোভাবকে জঘ ক'রে তিনি বাহুদের মুক্তিপথের সন্ধান করেছেন বাহুদেরই সংঘেচনায় মগ্ন। 'মাটি-ঘেঁষা বাহুদের' দিকে এবার এক নতুন আশা নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি, তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন প্রাকৃতিক জীবনের এক নতুন বিবর্তিত রূপ। 'বিচার', 'শিল্পী', 'কংক্রিট', 'হারামনের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রকৃতি গল্প এই নতুন আবিষ্কারেরই ফল। 'আজ কাল পরশুর গল্প' এবং 'পরিমিতি'ও এই পথ দিয়ে আসে। সেইসঙ্গে তাঁর 'চিহ্ন', 'সোনার চেয়ে দামী' প্রকৃতি উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য।

বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে শুধু উপরের প্রথম কয়টি গল্পের মূল বক্তব্যটুকু সন্ধান করলেই বোকা যাবে তাঁর আশেপাশের লেখার তুলনায় এগুলি কতটা জ্ঞাত আশাশূন্য। 'বিচার' গল্পে দেখানো হয়েছে শহরতলীর বস্তিবাসী বহুব-মহুর্নয়দের মধ্যেও কী ক'রে গ'ড়ে উঠেছে সমাজচেতনা। ভালো ক'রে চোখ হবার আগেই ভাল নোবায় জন্মে জন্মে কলের কাছে জন্মে হয়েছে তারা। হাইড্রোপের কাছে মানানসীরাও জন্মে এসে এসে-এসে। এসেই একজন প্রবীণ বহুব মতিশালের মায়ান ছেলোটাকে খ'রে নিয়ে গেছে সরকার এবং জেলখানায় আটক ক'রে রেখেছে বিনা বিচারে। কলতলায় এসে এই নিয়ে শুরু হয় জটলা, যার ফলে তাদের নিজেদের গড়া সার-বেঁধে-ধাড়াবোর সর্বসম্মত আইনটা উত্তরনায় বসে শক্তিত হয়ে যায়। কিন্তু আইন তো মনুষ্যের ইচ্ছার সন্ধানেই হবার জগে তৈরি। সেটা ভাঙলে চলবে কেন? তারা

নিজেবাই নিজেদের চেঁচায় আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ায়— যে আগে এসেছে সে আগে পড়াল, আবার পিছনের বুড়োদের, কিংবা যোগ্য মনুষ্যনীর ঘরে অস্থ-বিস্থ আছে তাদের ক্ষত জায়া ছেড়ে দিল সামনের সমর্থ কম-বয়েসীরা।। ক্রমে সহস্র মানবতার ডাব নিয়ে, দশকনের স্বীকৃত অশ্লিষিত আইনে এতদেব মধ্যে চলছে এক স্থল স্থপঞ্চল বিচার, অথচ দেশের স্থগতা সরকারের আশঙ্কিতে বাধা-ধরা সরকারী বিচারের সঙ্গে এর কতই তুল্যতা।

(‘শিল্পী’ গল্পের সঙ্গে ‘থাকে ছুঁ দিতে হয়’ গল্পটি পাশাপাশি রাখলেই আর কিছু বলতে হয় না। মহাবিশ্ব মনের অসংকলিত অর্থলালসায় ছনীরতির পথে স্বার্থোন্মাদের চেঁচা মাছুষকে কতখানি অমাত্র ক’রে তোলে, আর পরিভ্রম্য শিল্পীর আদর্শনিষ্ঠা, আত্মমধ্যম্যবোধ ও ছুঃখবরণের পুচ্ছতা তাকে সেই তুলনায় কতখানি নৈতিক সম্মানের অধিকারী করে, তা বলাই নিশ্চয়োত্তর। সুতোর অভাবে লাড়-লাড়ট। দিন তাঁত বদ্ধ মননের, ঘরে একলক্ষ্যা খাবার সংগতি নেই, তাঁর উপর বোঁটা। তার ন’ মাসের পোষাতি। তবু সে তুলতে পারে না সে জাত-শিল্পী, অবস্থার চাপে প’ড়ে নিজেই ঐতিহ্যকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারে না সে। বাবুদের বাড়িতে এখন তাঁর এতটি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির আবরণ না থাকলেও স্বীকার্য সোতে তখন যোগ্যদের বেগার-বাট-নছুরি নিয়ে শাণা ধুতি শাড়ি গামছা বুন দিতে রাগি হয় না মন। বরং দারিদ্র্যকেই স্বীকড়ে থাকবে সে— তার আরো ক’ ঘর জাতভায়েই মতো— তবু আত্মমধ্যমা খুঁয়ে আত্মবিক্রয় করা চলবে না কিছুতেই।)

‘কংক্রিট’ গল্পের উপসংহারের দিকে রত্নর চরিত্রটি কি বিশিষ্ট। কারখানার পোছাবাবুর গোপন চক্রান্তে রত্নকে তুলিয়ে আনা হয়েছে তাঁর ঘরে। রানী এখন বলল, ‘এবার কত কামে লাগাবে তোমাকে পোছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি’— তখন সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে প’ড়ে যায়, সে নিজের চোখে দেখেছে কেউ বাতাপিকে কী ভাবে হোমলার মেসিনে পিবে খেঁতলে রাধা হয়েছে। চূপ ক’রে ব’লে থাকলে আর চলবে না। পোছাবাবু তাকে কাছে টেনে বেমার মতো ছিদ্রাঘের মতো কাছে লাগাতে চায় ? তা কিছুতেই হতে দেবে না সে। কারখানার শ্রমিকদের সকলকেই সে ব’লে দেবে কেউ বাতাপির মৃত্যুর রহস্য :

‘আর এক মুহূর্তে এখানে থাকলে তার মনে প্রাণটা ধাবে এলিভারে চট ক’রে দিন খুঁজে রত্ন গায়ে লেবে যায়। হন হন ক’রে এলিভে যায় অন্ধকার গলি খ’রে। নেমা তার কেটে গেছে।- আর খেঁচা বাহিল না। কতকবে দিগদেহ কাছে দিগে বললে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—হোমলার মেসিনের ঘটনা। সবাই যে অশ্রুটি মুঁদরে, নিজের কাজ স্বকারণ এক মুহূর্তের বেশি সেটি দৃষ্টিতে রাখার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

(‘হারানের নাতজামাই’ গল্পে বিশ্রাহী কথায় নেতা তখন বতলকে সালিগঙ গ্রামে গ্রেপ্তার করতে এসে স্বাক্ষরিত পুলিশকে কী ভাবে হারানের বাড়ি থেকে বোকা ব’নে কিরে যেতে হল তারই অদ্বুত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বহনায় দা’র উপস্থিতবৃত্তিতে পরিস্থিতির লক্ষ্য সমাধান হয়ে ভালোই হল। অবস্ত তা নইলেও সমাধান হত। ছ’দিন আগে এই-মহনার দা-ই গাঁয়ের মেয়ের দলকে সঙ্গে ক’রে কাঁটা বিটি হাতে ছপুসবেশা পুরুষল্ল গাঁ থেকে পুলিশকে ডাকিয়ে পার ক’রে দিয়েছিল গাঁয়ের দোম।। সেদিন রায়েও ব্যাপারটা সহজে না মিটলে অস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। বাইরের তে-ভাণা চাঁদের আলোর প্রায় সেখ শ’

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চাষী লাঠি সড়কি দা-কুড়াল হাতে গাড়িবেছিল দল বেঁধে,—ভাবের নেতার মতো পুলিশের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ভাড়া লড়তই ।

'ছোট বহুলপুরের বাড়ী' মজুব-বর্ষবটের পটভূমিতে রচিত একটি আশ্চর্য হুম্বর গল্প । বিজ্ঞপ-বৈশ্যনো একটি চাণা কোঠুক গল্পটিকে রপোঅল করেছে । তিন ঘন বর্ষবটী মজুব-নেতাকে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শ' মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এগেছিল টেনে, এবং এ নিয়ে রক্তাক্তর পরে 'ছোট বহুলপুরের' পড়েছে সেপাইয়ের জেদা, ঘর ফল সেখানকার লোকের উপর শুক হয়েছে নিহুং অত্যাচার । এরই মধ্যে বৌ আদা আর একফোটা শিক্তকে নিয়ে রাত্রিবেলা নিশিথে গোন্ধর গাড়িতে চেপে সেই জংকের স্থানে আকৌর-কুটুংদের সঙ্গে দেখা করতে এল কি-না 'মাথা-চাষী আদা-মজুর' দিবারক ! পাহারারত অভিযুক্তি শুভচরেরা কী ক'রে বিখান করবে এ-কথা ? এখানে এরা যে ছাববেশে এগেছে এবং আসলে অতি 'ডেভারাস' লোক, তাতে আর সন্দেহ কী ? বিশেষত ঘন দিবারকের পান-মোড়া ছাপান কাগজটা লঠনের আলোর পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল 'ছোট বহুলপুরের লংগ্রানী বীরদের প্রতি' একখানা ইগুহার । অথচ এতটা আধিবেবিক বিপর্যয়ে 'ভৌক মুখ্য ছোট লোক' হু'টোর হুংপিওর ক্রিয়া যে খেমে যায় নি, এটাই আশ্চর্য ।)

কিন্তু এ-আলোচনা আপাতত এইখানেই শেষ করা দাক । এক-একবার মনে হয় ঐ শহরতলীর বতিবাসী হুশুখল 'মজুব-মজুংনী, গাঁয়ের আভ-শিল্পী যখন তাঁতি, কংক্রিটের কাংখানার প্রতিবোধকানী প্রমিকের দল, লাগিগজের চাষীদের গাঁয়ের হুংগ্রানী শ্রী-পুঙ্ক, আর 'ছোট বহুলপুরের লংগ্রানী বীরের' দল ও তাদের কুটুং দিবারক আর আদা—এরা তো আমাদের লম্বারের সেই স্তর থেকেই এগেছে, মুখ্যত কারিক অয়েই ঘরা নির্ভরশীল : কেউ বাটে বাটে, কেউ কারখানা; কেউ ধান ডানে ঘরে, কেউ খোদা ডাঙে রাত্তার; এদের আপন অনেরাই তো কাং করছে গতে হাটে বাটে, মাছ ধরছে পরানবীর মলে; তবু এখানে কত দৃশ্য, বলিষ্ঠ মনে হচ্ছে এদের; কী দূঢ় পরক্কেপে এরা এক-পা এক-পা ক'রে এগিরে আগতে পদ্মাতীরের কেতুপুর থেকে । এদের এই অগ্রগতি, এই নতুন জীবন-চেতনা, আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনধোখের বিবর্তনকেই স্মৃতিত করে ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের কোন পর্বের লেখা সকল দিক বিচারে সবচেয়ে সার্থক হয়েছে, এ-প্রবন্ধের উত্তরে প্রথম পর্বের কথাটাই বেশি ক'রে মনে আসে । তার একটা প্রধান কারণ দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিকের লেখাগুলিতে অনেক সময় তাঁর বিহীন মনের ছায়া পড়েছে, আর শেষ দিকের লেখায় নতুন ধারার শুধু একটা টুডনাই হয়ে রইল, পরিণতি ঘটল না । কিন্তু মনে রাখতে হবে পূর্ব দ্রুতি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের বিপরীত হলেও গভীরতর অর্থে পরস্পরের পরিপূরক । তাঁর প্রতিভাকে সমগ্রভাবে জানতে হলে দ্রুতি পর্বেরই পূর্ব পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন । একই জীবনসত্যকে তিনি দ্রুতি ভিন্ন দিক থেকে জানবার সাধনা করেছেন ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছ থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন, এ-কথা জোলবার নয় । ব্রহ্মকালে তাঁর বয়স পঞ্চাশও পূর্ণ হয় নি । তবু এরই মধ্যে গড় বাইশ বছরে তাঁর লবঙ্গত লাভারখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, আরো রচনা দীর্ঘই প্রকাশিত হবে । এই অল্পকালের মধ্যে মাংসের জীবনকে তিনি কত রূপেই না দেখেছেন । নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন কাটিয়েছেন, তবু তাঁর

লেখা কখনও একেবারে বন্ধ হয় নি। আরো অবাক লাগে এই ডেবে যে সাহিত্যসাধনার শেষ পর্বে তাঁর পুষ্টিভক্ষির কী আত্ম পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। একে শুধু গোত্রান্তর বললে যথেষ্ট হয় না, তাঁর শিল্পিন্যাসের দিক থেকে এ একেবারে জন্মান্তর। এই জন্মান্তরের বেবনা জন্মে বহন করে তাঁর শিল্পিন্যাসকে কত-যে জুগের অন্তঃস্থ, দুঃস্থ সংকট উত্তীর্ণ হতে হয়েছে তার ইতিহাস চিরকাল অলিখিত থাকবে। যে-বেবনকে তিনি এতদিন বুক জেপে রেখেছিলেন তাকে তিনি বুক করেই নিয়ে গেছেন, পরবর্তীকালে ক্ষতে রেখে গেছেন উন্মাদট্যানি গ্রায়ে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার বিচিত্র ফসল— মানুষের মহাকাব্যের অর্ঘ্যরূপে আমরা তাকে আহরণ করব আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডারে।

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

১৮৮২-১৯৪৭

সমসাময়িক নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের মতো উপেক্ষিত আর কেউ নন। বিশ্বসাহিত্যে যে-সব লেখক সামান্য একটু স্থান লাভ করেছেন তাঁদের বই ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাবার এগারো বছর পরেও শ্রীমতী মিস্ত্রালের কোনো কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ বের হয় নি। এমন কি, স্প্যানিশ কাব্য-সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ-সঙ্কলনগুলিতে শ্রীমতী মিস্ত্রালের কবিতা পাওয়া যায় না। ইংরেজী ভাষায় স্প্যানিশ সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা আছে তাদের মধ্যেও তাঁর উল্লেখ নেই। শ্রীমতী মিস্ত্রালের মূল রচনাবলীর কোনো প্রাথমিক সংগ্রহ এখনো প্রকাশিত হয় নি। তাঁর অনেক রচনা আজ পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। গত ১০ই মার্চ তারিখ মিউ ইংল্যান্ডের উপকণ্ঠে শ্রীমতী মিস্ত্রাল ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁর মহানুভাব-পরিবেশনেও উপেক্ষার ভাবটা হুম্পট। অনেক কাগজ আদৌ এ সংবাদ প্রকাশ করে নি। চিলির আর এক জন কবি পাবলো নেব্রার নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত; অথচ নোবেল পুরস্কার পেয়েও মিস্ত্রালের কাব্য কেন উপেক্ষিত হয়ে রইল সে বিচার স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে ধাঁসের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাঁরই করতে পারেন।

চিলির উত্তরাঞ্চলে এক বর্ধিকু গ্রামে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল জন্মগ্রহণ করেন। এটা তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম লুসিলা গদয় আলকিয়াগা (Lucila Godoy Alcayaga)। সাধারণ নিম্ন-বর্ণাশ্রিত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মিস্ত্রালের বাবা ছিলেন গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক। শিক্ষকতা অপেক্ষা তাঁর কিন্তু বেশি আগ্রহ ছিল গান লেখার। উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গানের প্রতিযোগিতা হত। মিস্ত্রালের বাবা বংবাই ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগী। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্বরে মেয়ে কাব্যপ্রতিভা লাভ করেছিলেন।

বাবা ও দিদির কাছে মিস্ত্রালের লেখাপড়া শুরু হয়। তাঁর দিদিও ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। মুলের পড়া শেষ করে তিনি শিক্ষকতাবৃত্তির পাঠ গ্রহণ করেন। তার পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে চাকরি অগ্রহণ করেন দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। কয়েক বছর যাবৎ পরী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐক্যবীণা কন্যা গৃহীত ফোটো

১৯৫০



গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

ঐতিহ্যবাহু যক্ষোপাধায়েৰ দৌৰতে আৰু

.

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

তাকে চাকরি করতে হয়েচে। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বেবনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেছেন। তাঁর রচনায় এই অভিজ্ঞতার প্রভাব খুব গভীর।

শ্রীমতী মিস্ত্রাল যখন আঠারো বছরের তরুণী তখন তিনি এক বর্ষদ্রু শোকে'র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যে দুঃস্বপ্নকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, বাক্যে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতেন, সে একদিন স্বকস্মাত আত্মহত্যা করল। এই বেবনা থেকেই তাঁর প্রথম কবিতার জন্ম। কিন্তু আরো ছ-শাত বছর পায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাব্যচর্চার কথা অল্প কেউ জানতে পারে নি। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে চিলির লেখক সমিতি সাক্ষিগোষ্ঠিতে কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। মিস্ত্রাল প্রতিযোগী হিসাবে তিনটি গনেট পাঠালেন। গনেটগুলি দৃঢ়তার উপরে রচিত। তাঁর প্রেমিকের মৃত্যু। মিস্ত্রাল গ্রামের ঘরে। খুব লাঞ্ছ। শহরে নিজের পরিচয় দিতে বিধা বোধ হল। ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল। তাঁর দুজন শ্রদ্ধা লেখকের নাম থেকে দ্রুতি অংশ নিয়ে ছদ্মনামটি তৈরী করেছেন। এ দুজন লেখক হলেন ইতালীর কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক Gabriele D'Annunzio এবং ফ্রান্সের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত কবি Frederic Mistral.

প্রতিযোগিতায় ফল-বোধ্যায় দিন সত্য খুব ডিঙ। একদিকে প্রতিযোগী কবিরের ঝালন, অপরদিকে উৎসব জনতার সমাবেশ। মিস্ত্রাল জনতার মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন। তাঁর কবিতা পাঠ করে গোনা'ল অল্প একজন। তিনিই প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, এই বোধ্যায় পরও মিস্ত্রাল লুহুয়ে নিজের পরিচয় দিতে পারেন নি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে শ্রীমতী মিস্ত্রাল বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে পড়াতে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর ব্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বেশিকো থেকে আনন্দ্র এল লেবানকার গ্রামের বিদ্যালয় ও গ্রামাগারগুলি পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করবার জন্ত। এ কাজ তিনি খুব লাঞ্চলোর সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন।

সেপের লেখকদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে অল্প বেশে পাঠাবার রীতি আছে চিলি সরকারের। দুবছর বেশিকোতে কাটাবার পর তিনি লীগ অব নেশনসের ইন্সটিটিউট অব ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশনে চিলির প্রতিনিধি হয়ে আসেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে যুরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রীমতী মিস্ত্রাল চিলির রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তাঁকে স্বদেশ থেকে বহু দূরে থাকতে হয়েছে। ইতিমধ্যে একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে চিলির গভর্নমেন্টে। মিস্ত্রালের উপর সকল দলেরই সমান প্রভা। স্বতন্ত্রা সরকারের পরিবর্তন হলেও তাঁর রাষ্ট্রদূতের কর্তব্য অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মিস্ত্রাল আমেরিকার দৃষ্টদর্শী অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। রাষ্ট্রদূতের বিভিন্ন কমিটির কাজে তিনি সংযোগিতা করেছেন।

কবিতা-প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করবার পর থেকে মিস্ত্রাল বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কয়েক বৎসর ধরে অনেক কবিতা প্রকাশ করেছেন। চিলির কাব্যাদিকদের মধ্যে সহজেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হল। তাঁর আত্মপ্রকাশ পোনা'র জন্ত কাব্যপাঠের আগের প্রোভাতের ডিঙ হত। কিন্তু তবু মিস্ত্রালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সহজে প্রকাশিত হয়নি। কল্যাণীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্যানিশ সাহিত্যের অধ্যাপক

ড. জ. ও. নিল গ্রাণে প্রায়ই মিস্রালের কবিতা আগ্রহী করতেন। ছাত্ররা তাঁর কাব্যগ্রন্থ পেতে চাই। কিন্তু মিস্রালের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা হয় মতো সংগতি নেই। গ্রাণের ছেলেরা তাঁর তুলস। প্রধানতঃ সেই টাকার উপর নির্ভর করে মিস্রালের গ্রন্থ কাব্যগ্রন্থ Desolació ১৯২২ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর পরবর্তী বইয়ের নাম Tenura বা Tenderness। এটি বিশেষ করে ছেলেরের মত রচিত কবিতার সংগ্রহ। সর্বশেষ বই Tala বা Havoc প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৮ সালে। স্পেনে ফ্রান্সের নির্বন আধিপত্যের পটভূমিকায় রচিত কবিতাগ্রন্থিতে লেখিকা বাস্তবমৈত্রিক একনাথকথকে আচ্ছন্ন করেছেন। এখন পর্যন্ত মিস্রালের বই গল্প ও পত্র রচনা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠার ছড়িয়ে আছে।

শ্রীমতী মিস্রাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর কাব্যগর্ভকে প্রভাবিত করেছে। মিস্রাল নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্প্যানিশ অধঃস্রবের অধঃস্রবে তিনি সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির প্রয়োজনীয় ঢাকা লিখে দিয়েছিলেন।

হুইভেনের কবি গুলবার্গ মিস্রালের কবিতা হুইভিন ভাষায় অর্থহীন করার প্রায় লগ্নে লগ্নেই নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৫ সালে মিস্রাল নোবেল পুরস্কার পান। তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয় 'for her lyric poetry, which is inspired by powerful emotions and which has made her name a symbol of the idealistic aspirations of the entire Latin-American World.'

লাতিন-আমেরিকার সমকালীন সাহিত্যে ছুরোপীয় লেখকদেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ছুরোপীয় সাহিত্যের গভীরগতিকতার মধ্যে মিস্রালের রচনা কিছু নিয়ে এল এক নতুন অগতির পরিচয়। ব্যক্তিগত জীবনের স্থল ভূ-অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে তাঁর বিধা নেই। মিস্রালের কবিতায় সর্বত্র গভীর রম্যতাবোধ পরিচ্ছূট; কিন্তু সেই রম্যতা চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কোথাও ক্ষুর করেনি। পাঠক কবির সরল, অকৃত্রিম ও সবার ব্যক্তিত্বের সারিধা অহুভব করে তুলিলাভ করেন। মিস্রালের রচনার পরিধি বিস্তৃত নয়; এক-আপাত দৃষ্টিতে তাঁর রচনা বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হবে। কিন্তু ছোট একটি বাস্তবকে যেমন সবগুলি স্থর বাঁধা থেকে তেমনই তাঁর ছোট ছোট কবিতার মধ্যেও পাওয়া যাবে স্বরের বিভিন্ন অহুভূতির বিভিন্ন সমাবেশ।

মিস্রাল দুঃখের কবি। তিনি বলতেন, জীবন মধুময় বলে থাকে বিশ্বাস তাঁর। যেন আত্মকে কমা করেন। ভাবা স্বাধীর আত্মসংহার ফলে প্রথম যৌবনেই তাঁর ভালোবাসার অপহৃত্যু ঘটেছিল। বিয়ে করার কথা তিনি আর ভাবেন নি। কিন্তু তবু সন্তান ও গৃহস্থের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে লায় জীবন ত্যাগনা করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি প্রকাশ করেছেন অসংকোচে। ব্যক্তিগত বেদনার নির্যাসের প্রকাশকে অনেক সমালোচক বিরণ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে সন্তানহীনা রমণীর বেদনার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানেই পাওয়া যাবে মিস্রালের কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। শিক্ষিত্রী হিসাবে তিনি দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন মনঃসংযোগের সঙ্গে ব্যক্তিগত বেদনা যুক্ত হয়ে এই বিশেষ শ্রেণীর কবিতাগুলিকে স্বর্ণশীর্ষী করেছে।

প্রেমিকের মৃদু ছাড়া পরিবারের একজন প্রিয়পাত্রের আত্মসংহার শোকও মিস্রালকে লইতে হয়েছে।

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

স্রাব্যের অত্যাচারের ফলে যে-সব বালক-বালিকা অনাথ হয়ে পড়েছিল, চিলি তাদের আশ্রয় দিতে সক্ষম না হওয়ায় তিনি গভীর বেদনা পেয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ Tala-র লভ্যাংশ এরের স্বস্তি উৎসর্গ করা হয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, বেদনা তাঁকে জীবনবিস্মৃতি করতে পারে নি। বরং বারং ভ্রম পেয়েছে তাদের প্রতি মাতৃহৃদয় যতদূর তাঁর স্বপ্ন পূর্ণ। মিস্ত্রালের রচনায় মাতৃহৃদয়ের অসুস্থতা প্রাধান্য লাভ করেছে।

মিস্ত্রালের কবিতার অন্তর্য্যবহির্বিবেকী সার্বদিক পত্রের পৃষ্ঠায় পড়েছি। ইন্টার-আমেরিকান অ্যাংগেলস কর্তৃক সংকলিত Anthology of Latin-American Poetry-তে তাঁর দুটি চমৎকার কবিতা আছে বলে মনে পড়ে। এখন সে-সব হাতের কাছে নেই। নিচে যে অশ্রুবাণটি নেওয়া হল তা থেকে মিস্ত্রালের কাব্যপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

NIGHT

Sleep, my child ; because of you
The western skies their light efface ;
There is no glitter save the dew,
Nor any whiteness, save my face.

My little son, because you dream,
The road lies hushed, in peace unfurled,
Nothing murmurs save the stream ;
I am alone in a sleeping world.

A slow mist drowns the silent land,
A blue sigh fades in darkening skies ;
Like a gentle, soothing hand
Upon the earth a quiet lies.

Not my child alone I've sung,
Cradling him, to easy sleep ;
The earth too, as my cradle swung,
Drifted into slumber deep.

সন্তানের অস্ত্র হায়ের অভ্যস্ত বেহা, শৈবিকাির নিঃশব্দ জীবনের বেদনা এবং মিশ্রিত পৃথিবীর চিত্র সার্বক রূপ লাভ করেছে। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমন্ত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু ঘেগে আছে মা। মায়ের বেহা সন্তানকে অভিভূত করে পৃথিবীর উপর প্রসারিত হয়েছে। মৌলনা ঘুমিয়ে গান করতে করতে ছেলেকে ঘুম পাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকেও মা ঘুম পাড়িয়েছে। মায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে পৃথিবী যেচ্ছায় মিস্ত্রা বরণ করেছে, যাতে ছেলে ভালো করে ঘুমাতে পারে। প্রকৃতির

সব্বের এই একাঘরোখ মিস্ত্রালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর পরে আমরা প্রকৃতির মধ্যে মিশে যাব, কিন্তু একেবারে হারিয়ে যাব না, এ কথা তাঁর অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। 'শিশুদের প্রতি' নামক গদ্য কবিতায় এই লাইন কটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য :

Many years hence, when I am a little
heap of silent dust, play with me, with
the earth of my heart and of my bones !

প্রথম ঘোবনে ঘরিতের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত গল্পটির মধ্যেও মাটির স্পর্শ থেকে সাবনা লাভের ব্যাখ্যাতা দেখা যায়। সেখানে শোকাবিষ্টা প্রাণহীনীর মধ্যে মায়ের রূপও দেখতে পাই :

From that cold ledge where they have laid you by,
I shall take down and lay you in the ground,
Where humble and alone myself shall lie,
Where we shall share dream-pillowings profound.
Beside you stretching I shall show you all
A mother's yearning for her child asleep,
So earth shall cradle your pale body's pall,
And sweetness smother half the sobs you weep.

চিলির সাহিত্যে আধুনিক কাব্যের প্রবর্তনের কৃতিত্ব মিস্ত্রালের। তাঁর অলংকারভারমুক্ত বেগবান ভাষা, অকৃত্রিম অহুত্বের গভীরতা এবং আন্তরিক মানবতাবোধ পরবর্তী কবিসের অহুপ্রাণিত করেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ তাঁর কাব্য উপদেশমূলক বলে আধুনিক কবিরা অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগ বিশেষ করে Tala ও তার পরে প্রকাশিত কবিতার বিরুদ্ধে। ইংরেজী অহুবাসের সংকীর্ণ পরিচয় থেকে মনে হয় যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রাধান্যই তাঁর কাব্যপ্রচারণার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিন্তারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্যাভ্রিয়েলা মিস্ত্রাল -এর কবিতা

ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে

রাত্রি

ঘুমো ও বাছা ঘুমোও, তোমার ঘুম আসবে বলে
পশ্চিমের ঐ আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল আলো ;
আলোর কণা নিবলো গবি, শিশির শুধু কলে,
আমার মূবটি গায়। কেবল, আর লকলি কালো ।
ছোট্ট খোকা, তোমার চোখে ষপ্ন নামে, তাই
পথঘাট সব এলিয়ে আছে শান্তিতে নিঃশ্বাস ;
নদীর জলের আওয়াজে ছাড়া শব্দ কোথাও নাই,
একলা আমি রই জেগে, আর বিশ্বভরা ঘুম ।
আন্তে নামে কুয়াশা— সে ডুবায় শুষ্ক ধরা,
নীলাভ এক দীর্ঘনিশ্বাস মিলায় তমিষায় ;
হালকা মুহূর্ত হাতের আদর যেন ভরা,
শব্দবিহীন শান্তি এসে বিশ্বভুবন ছায় ।
আমার গানে ঘুমিয়ে পড়ে আমার খোকনমণি,
একলা সে নয়, গানের বোলায় বেই পে ঘুমে ঢলে,
অমনি দেখি সেই বোলনে সমস্ত ধরনী
গভীর মুখের গহীন গাড়ে উখাও ভেসে চলে ।

অজিত দত্ত

ভাবী স্বামীর আশ্বস্ত্যার পর

ঠাঙা পাথরের ঠাঁকে তোমাকে বে রেখে গেছে ওরা,
তোমাঘ সেখান থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে শোয়াব,
মাটিতে তোমার সঙ্গে একা আমি শরনবিতোরা,
ষপনশিখানে র'ব পাশাপাশি গভীরনিদ্রাত ।
পাশে থেকে তোমাঘ দেখাব সব ধ্বংসের খনি,
ঘুমন্ত শিশুকে ঘিরে হাঘের বৃক্ষের বড় সাথ,
ধরনী দোলাবে ওই ঝগুণ শরীরের আশ্রয়ণী,
স্বপ্নের শিধর নেবে তোমার কাহার অবলাদ ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাণ্ড

শ্রীমুকুন্দরাম পেন

আমরা আর পর্যন্ত যেনে অগছি যে কবিকল্প মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মানসিংহের স্ববেদারির সময়ে পিতৃকৃষি দায়িত্ব ছেড়ে ব্রাহ্মণকৃষিতে চলে গিয়ে তার পর চণ্ডীদল কাবা রচনা করেছিলেন। এ অহুমানের হেতু মুকুন্দরামের কথাতাই আছে। “তন ভাই শতাব্দন” বলে কবি যে আব্দকাহিনী ও গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে প্রচলিত সংস্করণে আছে এই কথা,

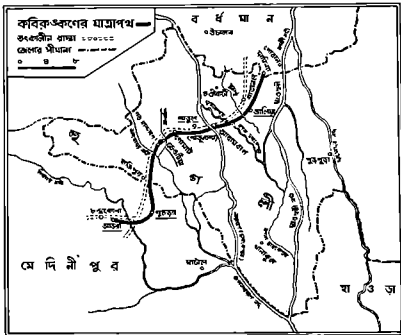
যত রাজা মানসিংহ কুন্দরামকুল-কুল
গৌড়কর উৎকল অধিপ, সোঁতকর উৎকল অধিপ,
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাশের কালে
রাজা হইল মহল সহিব।

এখানে মুদ্রিত বইয়ে শেষ ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়, “জিহিনার মামুন সহিব”। ‘জিহিনার’ পাঠ ভ্রান্ত, যোগল শাসনের সময়ে অথবা তার পূর্বে এতকম কোন শাসক-পদ ছিল না। “শিকদার” পাঠান্তর কল্পিত হয়েছে। ভাঙে খানিকট: সংগতি রক্ষা হয়। কিন্তু প্রাচীন পুথিতে এখানে পাঠ পাওয়া যায় “রাজা হৈল”, “উদীর হৈল”, “রাজা হৈল”, “বিলাত পাইল”, “বিলাত পাইল”। মামুনের পাঠান্তর নিম্নে “রহমদ”। ‘সে মানসিংহের কালে’ পাঠান্তরে “রাজা মানসিংহের কালে”, “রাজা মানসিংহ গেলে”, “অধর্মী রাজার কালে”। দ্বিতীয় ছত্রের পাঠান্তরে—“গৌড়কর উৎকল সন্যাসে”, “গৌড়কর উৎকল সহিব”, “গৌড়কর সকল মোহিত”। এই পাঠান্তরগুলির বিচার পরে করছি।

‘সে মানসিংহের কালে’ বললে অবশ্যই বোঝায় যে, মানসিংহের সময়ে প্রজারা দ্বন্দ্ব রাজনার ও সোটেলমেটের দ্বারা ব্যাভুল ও উদ্ভূত তখন মুকুন্দরাম পাচ-সাত পুরুষের ভিতা ও কৃষি পরিত্যাগ করে দক্ষিণ দেশে চলে যান। এখন মানসিংহের কাল বলতে কি বুঝ? মানসিংহ বিহারের “সিপাহ-সালার” (গভর্নর) নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৬৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৬৯০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আকবর-নমরের অস্তে উড়িষ্যার অভিযান করেছিলেন। ভাগলপুর থেকে তিনি বর্ধমান হয়ে আরামবাগে যান এবং বর্ধমানের সেখানেই কাটান। তার পর কুংলু লোহানির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন এবং জগন্নাথের সম্পত্তির তার বর্ধমান রাজা রামচন্দ্রকে দিয়ে ফিরে আসেন। বহরখানেক পরে আবার তাঁকে উড়িষ্যার অভিযান করতে হয়েছিল। এবার জগন্নাথে। এবারে উড়িষ্যাবিজয়ে মানসিংহকে বেগ পেতে হয়েছিল। বর্ধমান রাজার সঙ্গে বিরোধ হয়েছিল। আকবরের ভৎসনায় মানসিংহকে রামচন্দ্রের সঙ্গে নিটমট করতে হয়েছিল। রামচন্দ্র তাঁর এক কন্যাকে মানসিংহের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। মানসিংহ বাংলা-উড়িষ্যার গভর্নর ছিলেন ১৬৯৪ থেকে ১৬৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর মধ্যে শুধু একবার (১৬৯২ সালের শেষ থেকে ১৬৯৩ সালের শেষ পর্যন্ত) তিনি বাংলা দেশে অস্থগ্নিত ছিলেন। তখন তাঁর এক সহকারী শাসনকার্য চালিয়েছিল।

ସୁକୁନ୍ନରାୟେର ସେଷତାଗକାଳ

এখন উল্লিখিত পাঠান্তরগুলি বিচার করি। “রাশা বানসিংহ বেলে” পাঠ মিলেছে ১৯১৭ সালে লেখা পুথিতে। এ পাঠ সরাসরি অগ্রাহ্য করতে হবে। আমরা পরে দেখব যে, বানসিংহের অধিকারকাল শেষ হবার আগেই মুকুন্দরামের কাব্যরচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। ‘অদমী রাজার কালে’ পাঠ বীকার করলে বুঝতে হবে যে বানসিংহ বাংলা-উড়িয়ার সিংহাসনের নিহৃত্ত হবার আগেকার কথা মুকুন্দরাম বলছেন। তবে বেশি আগেকার কথা নয়। এই পাঠ বীকার করলে দ্বিতীয় ছত্রে এই পাঠ অবশ্যবীকার্য—‘গৌড়াসিং



উৎকল মহিম", অর্থাৎ তিনি গোড়াধিপ হয়ে উৎকলে অভিযান করেছিলেন। এই পাঠেরই দ্বারা পাঠ্যকার "গোড়বর উৎকল সম্বন্ধে", "গোড়বর উৎকল মহিম", "গোড়াধিব সকল বোহিত" (প্রাচীনতম পুথির পাঠ)। রামসিংহ উৎকলে অভিযান করেছিলেন দু'বার, ১৪২০ আর ১৪২১ সালে। কিন্তু তখনো তিনি ষ্টিক গোড়াধিপ নন।

আত্মকাহিনীতে মুকন্দরাম বা বলেছেন তাঁর মায়ের এই। অনেক পুত্রকে থেকে তাঁদের বাস দামুড়া (বা দামিড়া) গ্রামে। এক পুত্রপুত্র মাথা ওকা কোন রাজার (?) ধর্মাদিকরপিক ছিলেন। তাঁর সময় থেকে কবির কং দামুড়ার ঠাকুর চক্রবিভোর সেবক। মাথবের নথ ছেলে, কনিষ্ঠ (?) জগন্নাথ মহামিত্র। জগন্নাথ মহাপণ্ডিত এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। হৃদে-মাংস ভাগ করে দশাকর ময়ে গোপালের উপাসনা করতেন। তিনি শিবপূজাও পরিত্যাগ করেন নি। জগন্নাথের পুর জ্বর। ইনিও বড় পণ্ডিত ছিলেন, উপাধি বা নামাঙ্কর গুণরাজ-মিত্র। তাঁর তিন ছেলে, স্রোষ্ঠ কবিচন্দ্র, যথায় মুকন্দরাম।

কবিরা ছিলেন সেলিমাবাদ শহরের গোপীনাথ নন্দীর প্রজা। গোপীনাথ ছিলেন রাজকর্মচারী অথবা জাগিরদার, পদবী নিরোধী। বিশােক পড়ে গোপীনাথ নন্দী বন্দী হন; পরিভ্রমণের কোনো পথ ছিল না। তখন মহম্মদ (বা নামুস) সচিব অধিকার পেয়েছে। (রাজা হয়ে, শিকদার হয়ে অথবা নতুন জাগিরদার হয়ে।) তার (১) উজীর (রাজমন্ত্রী) হল রাজাধা। টাকার জন্তে পীড়ন চলল। বাৎসরী-মহাঘন ("বেপারি-কত্রি") উৎসাহপ্রায়। ব্রাহ্মণ-বৈক্য ধরতে পার না। জমি নতুন করে জরিপ হতে লাগল। কোণাহুপি মেগে বৈধ্য ধরা হল, পনেরো কাঠাও বিথা। প্রজাদের আবেদন নিবেদনে কেউ কান দেয় না। সুরবেল (জরিপকারী কর্মচারী) সাক্ষাৎ শমন, পতিত সূহিকে ভালো চাবের জমি বলে লেখে, কোনো কিছু না করে ঘুষ নেয়। পোতদারও ঘরের সোলায় ভাই, টাকা ভাজলে আজাই আনা বাটা লাগে। কড়ি দিলে দিনমজুর বেলে না। ধান গোলা কেনবার খরিসদার নেই। খাজানার জন্তে প্রবল উৎপীড়ন। ঘারে ঘারে পেছা, পাছে খাজানা শোধ না করে লোক পাগিয়ে যায়। ধান সূহিখে গেছে, ঘরঘরমা গোলাসুহুর বেচা ছাড়া উপায় নেই। এদিকে এক টাকার জিনিসের দাম দশ আনার বেশি ওঠে না। মুহুম্মদাবাদের সেই দায়। (মনে হয় গোপীনাথ নন্দীর ভালুক বাজেয়াপ্ত হওয়ার মুহুম্মদাবাদের সম্পত্তি বেরখল হয়েছিল।) গ্রামের নাতল্লারদের সঙ্গে হুঁকি করা হল। তাঁদের একজন চণ্ডীবাটার ভালুকদার শ্রীমন্ত দান। তাঁদের পরামর্শ অহুসারে ভিটা ছাড়াই ঠিক হল। (তখনকার বাংলাদেশের সীমান্ত ছাড়াই পড়ত আধুনিক মেদিনীপুর জেলার বাটাল সবভিভিন্ন। সেখানে ব্রাহ্মণহুনি পরগণার রাজা বাঁহুড়া রায় স্বয়ং ব্রাহ্মণ এবং কংসারক্সে ব্রাহ্মণের পোতা। তাঁর আশ্রয় গ্রহণের সংকল্প বেধে হয় গোড়া থেকেই ছিল।)

নগম টাকাকড়ি বা কিছু ছিল নিয়ে স্ত্রী, শিশু পুত্র, ভাই (সবানাম বা রামনাম বা রামনিধি) ও তলপিনার ভামাল (বা আনোদর) নন্দীকে নিয়ে একদিন মুহুম্মদাবাদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ মুখে। ক্রোণ-খানেক পরেই ভেলিরা গ্রাম পাওয়া গেল। সেখানে রূপ রায় টাকাকড়ি সব কেড়ে নিলে। (ইনি কি রাজকর্মচারী অথবা জাদুয়ার ছিলেন?) অকস্মাৎ সফলহীন পবিত্র-পরিবারকে আশ্রয় দিলেন বহু বৃগু। জাতি ভেলি। তিন দিন এঁর ঘরে কাটিয়ে মুহুম্মদাবাদ আবার রাহী হলেন। পরে মড়াই নদী পড়ল। নদী পেরিয়ে বানিকটা গিয়ে ভেটুটিয়া গ্রাম পাওয়া গেল। এ গ্রাম ছেড়ে ঘারিকেশ্বর পেরিয়ে মুহুম্মদাবাদ পৌঁছলেন পাড়ুলি গ্রামে। (গ্রামটির নাম পাওয়া এই রকম—“পাড়ুলি পুরী”, “মাতুল পুরী”, “পাতাল পুরী”, “বাতন গিরি”। শেষ পাঠ পরিত্যাগ। “মাতুল পুরী” পাঠ ঠিক হলে বুঝতে হবে যে পাড়ুল কিংবা ঐ অঞ্চলের কোন গাঁয়ে মুহুম্মদাবাদের দামার বাড়ি ছিল।) পাড়ুলি গ্রাম (বা মাতুল পুরী) ছেড়ে গিয়ে আনোদর পড়ল। পরাগর ও আনোদর নৌকার পার হতে হল। (“নায়ার পরাগর এড়াইলাই আনোদর”—এই পাঠ খাটি হলে বলতে হবে যে পাড়ুলির পর মুহুম্মদাবাদ পর পর তিনটি নদী পেরিয়েছিলেন। কিন্তু নায়ার ও পরাগর নামে নদীর চিহ্ন থাকলেও উল্লেখ নেই—রূপনারায়ণের মধ্যে “নায়ার” আছে। “না বাহে পরাগর”—এই পাঠ ঠিক হলে পরাগর নৌকা। বেবে আনোদর পার করে দিয়েছিল। পরাগর কি তবে মাতুলবাঈর কেউ?) আনোদর পেরিয়ে মনেকদূর গিয়ে পড়ল গোড়াটিয়া গ্রাম। তখন মুহুম্মদাবাদের চরম দুর্গত। গ্রাম ছাড়িয়ে একটু দূরে মুহুম্মদাবাদ আশ্রয় নিলেন এক পুত্রের বাড়ায়। (মতান্তরে আজা নামক পুত্রের পাড়ে। “আশ্রম পুত্রি আজা” স্থানে “রপড়া পুত্রি আজা” পাঠও আছে। এ পাঠ ঠিক হলে বুঝে রপড়া গ্রামের পুত্রের বাড়ায়।) পুত্রের কণ্ঠ শান করে মুহুম্মদাবাদ ঠাকুরের

মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল

পূজা করলেন শালুক ফুল দিয়ে। নৈবেদ্য দিলেন শালুকের মাড়া। (“শালুক পোড়া” অত্যন্ত গ্রামাদিক পাঠ।) পুত্রের মল ছাড়া খাবার কিছু নেই। শিশু তা মানবে কেন? ভাত খাব বলে তার কাহ্ন। “স্বা ভয় পরিভ্রমে” মুকুন্দরাম দু’মিঠে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন যেন দেবী চণ্ডী তাঁর মাথের তপ ধরে এসে তাঁর মাথার কাছে বলে ওকে তালপাতা কালি কলম ছুঁগিয়ে দিয়ে “সঙ্গীত” লিখতে বলছেন। দেবী রত্নও দিলেন নিভা মণ করবার মন্ত্রে। সে মন্ত্র মুকুন্দরাম কখনো শোনেন নি। চণ্ডীর স্বপ্নাশেষ পেয়ে চাক্ষা হয়ে তিনি আবার পথচলা শুরু করলেন। শিলাই নদী পেরলেন। অবশেষে (চন্দ্রকোণার কাছে) আরড়া গ্রামে উপনীত হলেন।^১ সেখানে কুমারী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য, বীর-গাংড়া রাহ। মুকুন্দরাম তাঁর সভায় হাম্বির হয়ে কবিতা পড়ে রাজাকে সন্তোষ করলেন। তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁর শকল দায় স্বীকার করে দিলেন এবং তখনই দশ বারো মণ ধান বেবার হস্তস্থ দিলেন। মুকুন্দরামকে নিযুক্ত করলেন ছেলেকে পড়াতে। ছেলে রঘুনাথ গুরুকে সানন্দে বরণ করে নিলেন।

আরড়ার মুকুন্দরামের দিন স্বাক্ষরো কাটতে লাগল। তামাল নন্দী স্বপ্নের কথা জানত। সে নাক্ষে যাকে স্বরণ করিয়ে দেয় দেবীর “সঙ্গীত” রচনার আদেশ। রঘুনাথ রাহ রাজা হলেন। তিনিও বলেন “সঙ্গীত” লিখতে। কিন্তু মুকুন্দরামের জড়তা কাটে না। জ্যোত পুত্রের দৃষ্টি হলে তাঁর চেতন হল। তিনি একমনে “সঙ্গীত” রচনার প্রবৃত্ত হলেন। “সঙ্গীত” লেখা হল, গানও হল। কবিকে রাজা গ্রাচীন প্রথামত পুরস্কার দিলেন— কানে সোনার মাকড়ি, হাতে সোনার বালা, গলায় স্বর্ভামাল, হাতে ইন্দাবানো আংটি, মাথায় পাগড়ি, সঙ্গে উত্তরীয় ও অধোবাস, আর চড়বার বোড়া। গায়নেরাও যথোপযুক্ত অলংকার পেলে।

“সঙ্গীত” যখন লেখা হয় তখন পুত্র শিবরামের জন্ম হয়েছে। জনিতার শিবরামের সঙ্গে আরো তিনজনের নাম আছে— চিত্রলেখা, যশোদা ও মহেশ। কবি এঁদের জন্মে দেবীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন। এঁরা কবির কস্তা-জামাতা হতে পারেন, কস্তা-পুত্র হতে পারেন, পৌত্রী-পৌত্রও হতে পারেন। একটি জনিতার পাঠ্যস্তর খাটি হলো (“রুক পুত্র পৌত্রে ত্রিময়ান”) বুঝতে হবে ১৩তমবর্ষ রচনার সময়ে কবির নাতিনাতনী হয়েছিল। জনিতার এক-আধ বার কবি নিরেক্রে “দৈবকীনন্দন” বলেছেন। দৈবকী তা হলে মাথের নাম।

এই তো গেল মুকুন্দরামের আশ্রয়জীবনী।

এর থেকে এই অমুখান অপরিহার্য যে কবির আরড়া পৌছানো ও কাব্যরচনার মধ্যে কাল-ব্যবধান বহু বৎসরের। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত বৎসরের। এ প্রশ্নের উত্তর ধৌরবার আছে কাব্যরচনাকালের নিয়তম সীমা বিবেচনা করি। রঘুনাথ রাহের রাজ্যকাল ১৪২৫ থেকে ১৫২৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭১-১৬৭৩ শাল। রঘুনাথ রাহের পুত্র চক্রবর ১৫২৬ শকাব্দে কেশিরাড়ীতে দেবী-প্রতিমা স্থাপন করেছিলেন। এর প্রমাণ উড়িষা অক্ষরে খোদাই এই লিপি,^২

ঐমানসিঃ মহারাজা গুডারাজা নিরুত্থন কুহুনন্দন

ঐন ঐরঘুনাথ নরী কুহিল হুত ঐচক্রবর নরী

একানিন্দে নরীকলা এতিবা দিতি। শকাব্দ ১৫২৬।

কামিলা রঘুপুত্র।

১ কবিকবির যাত্রাপুথের নকশা ১৫৭৭।

২ ঐহুত বিনর-খাণের লবণ খেঁক উচ্চ, কুয়াড়া, ২৩ আশ ১৩৩৮।

এই রঘুনাথ বে মুকুন্দরায়ের শিল্প ও পোষ্টা তাতে সন্দেহ নেই। “এক সময়ে” কেশিয়াড়ীর আশেপাশে বারোটি শিব মন্দির ছিল। “এই বারোটি মন্দিরকে বারো মাজো বলা হত। এক সময় বিশেষ সমারোহের সঙ্গে এই বারো মাজোতে গায়ন উৎসব হত। প্রত্যেক দেবালয়ের স্বতন্ত্র প্রতীক সহ ক্ষমা থাকত, কারও শিং, কারও বাঘ, কারও জন্তু, কারও কুম্বীর ইত্যাদি। সেই সব ক্ষমা উড়িয়ে প্রত্যেক মন্দির থেকে ভক্তারা শোভাযাত্রা করে বেরত।”^{১০} এর সঙ্গে তুলনা করুন চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনা,

মন্দির-সময়ে গোষ্ঠী দেখা সেই দেশে,
অনন্তর পূজা লগ্না কলিহের দেশে।
বিষ্ণুর নিকটে গৌর বস পদ্মল,
শিব বাইতে চণ্ডীর পাইন মরন।
কেশরী শাহুল পতা তুম্বার বাহন,
দায়ক করত দম মহিম দুর্জন।
বস পদ্ম একে একে কত শিব নাম,
চণ্ডীর চরণে সঙ্গে করিল অগাম।

চণ্ডীমঙ্গল-রচনার সময়ে রঘুনাথের পুত্র অগ্নাথ নি। তা হলে ভনীতায় তার নিকটই উল্লেখ থাকত। বহু ছেলে যে তখনো ছবি নি তারই ইঙ্গিত আছে। কাব্যের শেষের দিকে ভনীতায় রঘুনাথের প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে “অভয়া পুত্র তার কাম”। এ কাহিনী পুত্রের জন্ত বলেই মনে করি।

১৮-৪ সালে রঘুনাথের পুত্র রাজা হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স খুব কম ধরলেও বারো-ডেরোর নীচে সম্ভবত নয়। তা হলে কাব্যরচনাকালের শেষ সৌন্দর্য ১৮২১-২২ সাল হয়। মানসিংহের উল্লেখও অসংগত হয় না, যেহেতু মানসিংহের “উৎকল মহিম” ঘটেছিল ১৮২০ ও ১৮২১ সালে। প্রথম বারে মানসিংহ স্থলপথে গিয়েছিলেন বখমান দিয়ে দক্ষিণ মুখে এবং আরামবাগে কিছুকালের অজ্ঞে শিবির গড়েছিলেন। আরামবাগ থেকে আরড়ার ঘূরায় বেশি নয়। সেই সময়েই কবি মানসিংহের বহুতর ও বিফলরায়ণতার পরিচয় পেয়েছিলেন। তবে তিনি ভুল করেছিলেন যে, মানসিংহের শাশন এসময়ে চিরকাল ছিল না। তাঁর মেশত্যাগকালে তিনি রাজা ছিলেন প্রথম যে তাঁর বনলে মানসিংহের নাম করে ফেলেছেন।

মুকুন্দরায় আরড়ার গিরে রঘুনাথকে পড়িয়েছিলেন। তখন রাজা “পালবি” গ্রামীণ বীর-মাধবের পুত্র বীর-বাকুড়া রায়। বহন কাব্য রচনা করেন তখন বাকুড়া রায় বেঁচে নেই, তবে হুলাশিংহের কন্যা পাটরাণী রাজমাতা দনাবেরো জীবিত। রঘুনাথের রাজ্যকাল ১৮১০ থেকে ১৮৩০ সাল। ইতরায় মুকুন্দরায়ের আরড়ায় আগমন ১৮১৩ সালের বেশ কিছু আগে। কিন্তু কত আগে?

এ প্রশ্ন বিচারের আগে একটা বিষয় ডাববার আছে। ১৮২০ সালে রামজয় বিজ্ঞাপনর মুকুন্দরায়ের কাব্য প্রথম প্রকাশ করেন। আর পর্বত কাব্যটির দত্ত সংস্করণ রেখিয়েছে তার মধ্যে এটি নিঃসংশয়ে স্রেষ্ঠ। এতে কাব্যসমাপ্তি-অংশে রচনাকালজ্ঞাপক এই দু ছত্র আছে,

যাকে রস রসে লক্ষ্য গণিত,
“কত দিনে হিলা সীত হরের বনিতা।

এই ছত্র দুটি-একটি ছাড়া কোনো পুথিতে পাওয়া যায় নি। যে পুথিতে পেয়েছি সেটির লিপিকাল

মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল

১৮৪৮ সাল। কিন্তু পুথিটি রায়ব্রজ বিভাগগরের ছাণা বইয়ের নকল নয়। পুথিটিতে এমন অনেক দীর্ঘ পাঠ্যভর আছে যা অন্তর পাই নি এবং দ্বার মধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে প্রাচীনত্বের অংকার আছে। স্তত্রীয়া বীকার করতে হবে যে, রায়ব্রজ বিভাগগরের অবলম্বিত পুথি ছাড়াও অন্তর ছয় দুটির অস্তিত্ব আছে। কবিকল্পদের কাব্যরচনা-কাল নিয়ে ধারা আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই ছয়-দুটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার কারণ মানসিংহের কালের সঙ্গে কিছুতেই এই ছয়-দুটিনির্দিষ্ট কালের সংগতি রক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ মনে নেওয়া তত সহজ নয়। প্রশ্ন উঠবে, কে প্রক্ষেপ করলে? কেন প্রক্ষেপ করলে? কোথা থেকে নিয়ে প্রক্ষেপ করলে? কবে প্রক্ষেপ করলে? প্রথম তিন প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, না গহ্বরের না কহ্বরের। শেষ প্রশ্নের অব্যবহ বলাতে পারি যে, প্রক্ষেপ যদি হয়েছে থাকে তো অষ্টাদশ শতকের প্রথম পানের পরে নয়। সাহিত্যপরিব্রাজ পত্রিকা প্রকাশিত 'বিশাল-লোচনার গীত'-এ ছয় দুটি উদ্ধৃত আছে।

বালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম ৪৩ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৮) লেখবার সময়ে ছয় দুটি সময়ে আমার সংশয় ছিল। বীকার করতে পারি নি, সরাসরি অগ্রাহ্য করতেও বন সরে নি। তাই অর্থহরতীয় দ্বাদ অবলম্বন করে আমি দুর্বাখ্যা করেছিলাম 'রস' অর্থে 'নহ' ধরে। কিন্তু এটা খেয়াল হয় নি যে, ১৯২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৭৭ সালে রঘুনাথ রাজা। তাঁর চের আগে কবি আরভায় গিয়ে বাঁকড়া রায় কর্তৃক "হতপাঠে-নিয়োজিত" হয়েছিলেন।

মোট কথা 'রস' শব্দের এখানে মানে 'ছয়' ছাড়া হতে পারে না। কেউ কেউ অষ্টদশের কথাও বলেছেন। যেমন গীতাধরনাথের 'অষ্টদশাবাখ্যা', কিন্তু এখানে অষ্টদশ বলতে অষ্ট নারিকর ভাবরণ। কোনো পুরানো বাঙালী কবি 'রস' বলতে 'ছয়' ছাড়া আর কিছু করেন নি। স্তত্রীয়া "শাকে রস রস বেম শশাৎ" মানে ("অন্তর বাখ্য গতিঃ" ধরে) ১৪৯৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৪৪-৪৫ সাল।

মুকুন্দরাম বলেছেন যে, শশাৎ-বেম-রস-রস শাকে বেরী চণ্ডী তাঁকে গান দিয়েছিলেন অর্থাৎ এই বছরে তিনি পুতুর-আড়ায় ঘুমিয়ে পড়ে শ্রমে দেবীর আদেশ পেয়েছিলেন। অতএব ১৪৪৪-৪৫ সালে তিনি পৈতৃক ভিটা ছেড়েছিলেন। এ কাল মানতে আপত্তি কি?

আপত্তি সেই "মানসিংহের কাল"! কিন্তু আমরা দেখেছি যে, মানসিংহের কালে মুকুন্দরামের দেশত্যাগ এবং কাব্যরচনা কিছুতেই ঝাঁটে না। ঘটনা দুটির মধ্যে বেশ কিছু সনদের কাগজ ছিল—বন বিশ ত্রিংশ চরিত্র বছরের ফরাক হতে পারে। গৃহত্যাগকালে মুকুন্দরামের সঙ্গে কটি ছেলে ছিল বলেন নি। "শিও কামে ওনদের তরে"—থেকে মনে হয় একটি চার-পাঁচ বছরের মত ছেলে ছিল। "গীত না করিয়া বৈল ছাণ্যা"—এই উক্তি থেকে মনে হয়, ছেলের মরণ মুকুন্দরাম নিজের অপরাধের শাস্তি বলে মনে নিয়েছিলেন। এ ছেলে সঙ্গের শিওর বিশেষ মনে। তাই হলে "বংশধর" অর্থাৎ কাব্যরচনাকালে জীবিত একমাত্র পুত্র শিবরামের জন্ম আরভাতেই হয়েছিল। কাব্যের মধ্যে ভনিতায় একাধিকবার পৌত্রের উল্লেখ আছে ("রক্ষ পুত্র পৌত্রে বিনয়ান")। হতরায় আরভা পৌত্রবার অত্যন্ত পশিষ বছর পরে কাব্যরচনা হয়েছিল। ঊর্ধ্ব পক্ষে চরিত্র বছর খরলেও হানি নেই। শুধু হানি নেই নয়, লাভ আছে। কেন তা একটু পরে বিবেচ্য।

দেশের বে অবস্থা হওয়াতে কবিকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল সে অবস্থা মানসিংহের সময়ে হয় নি,

ভোড়ল মল বহন ভরিপ করে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন তখনো হয় নি। সে হয়েছিল পাঠান-অধিকারের শেষ অবস্থার আর হুহুংপীর আফগান-অধিকারের কালে। অর্থাৎ : ১৩৭ থেকে ১৪৬৪ সালের মধ্যে। ডাইপো বিরোধ শাহাকে হত্যা করে গিরাহুদীন মামুদ শাহ! গোড়ের হলতান হন ১৪৩৩ সালে। যোগেন শাহার পুত্র ইনি, নসরৎ শাহার ভাই। নিরুদ্ভিতার কলে ইনি বাংলা বেশে পাঠান-রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। শের শাহার মত প্রবল শত্রুর সন্মুখ লড়াই করে মামুদ শাহা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। মুহম্মদদের আত্মকাহিনীতে “যেহ রাজা মামুদ শরিফ” এই পাঠ খাটি হলে রাজা মামুদ নিশ্চয়ই গিরাহুদীন মামুদ শাহা। সমসাময়িক ইতিহাসে ইনি নিবোধ অকর্মণ্য বলে উল্লিখিত। হুতরাং “শরিফ” বিশেষণ সার্থক। রায়জাদা নামে কোনো ব্যক্তি এর উল্লেখ (রায়সমরী) ছিল বলে জানা নেই। মামুদ শাহার জামাই খিজির খান তুর্ক বাংলা দেশের শাসনকর্তা ছিলেন শের শাহার আমলের গোড়ার দিক পর্যন্ত। মনে হয় মুহম্মদরায় রাজজাদা (রাজার জামাই?) বলে একেই নির্দেশ করেছেন। তা হলে কি মূলে পাঠ ছিল “খিজির হল রায়জাদা”? দিল্লীর তত্বে আলীন শের শাহাকে অস্ত্রমনস্ত মনে করে খিজির খান স্বাধীন হবার উত্তোগ করেছিলেন। শের শাহা এসে তাঁকে দমন করলেন (১৪৪১) এবং তার পরে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার ক্ত বাংলা রাজ্যকে ভরিপ করে বিভক্ত করলেন এবং নিজের শ্রিহপাত্রদের মধ্যে জাগীর বেঁটে দিলেন। এই হুত্রেই বোধ করি মুহম্মদরায়ের প্রত্ন গোপীনাথ নন্দী নিয়োগী বিপাকে বন্দী হয়েছিলেন এবং তাঁর তালুক অস্ত্র লোকের অধিকারে এসেছিল। মুহম্মদরায় যে-বিপর্দয়ের মধ্যে মেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা মোটেই স্বানীয় ব্যাপার নয়। সে বিপর্দয় সমস্ত দেশময়। “ব্যাপারি-ক্ষেত্রের খেলা” মামুদরায়ের সন্মুখ হতে পারে না। জাম্বন-বৈকব-বিবেষও তাই। পাঠান হলতানের জাম্বন-বৈকবযেবী ছিলেন না। কিন্তু নূতন আফগান হলতানের জাম্বন-বৈকবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবার কথা নয়। মুহম্মদরায়ের উল্লিখিত বিপর্দয় এই সময়ের (১৪৪১-৪৪) নিশ্চয়ই। কেননা তখন উচ্চিচ্চা আফগান-অধিকারের বাইরে এবং মুহম্মদরায় যেখানে গিরে আশ্রয় নিলেন সে দেশ তখন গোলহালের বাইরে। যোগল-শাগনের কালে হলে আরডায় যাওয়া নিরর্থক হত।

আত্মতরীণ বিচারেও মুহম্মদরায়ের সেশত্যাগের এই কাল (অর্থাৎ ১৪৪৪ সাল-) সমর্থিত হয়। কবির পিতামহ জগন্নাথ মাহ-বাংল যাওয়া ছেড়ে বৈকব হয়েছিলেন। দশাক্ষর গোপাল-মত্রে তাঁর নীক্ষা। এ নীক্ষা পেয়েছিলেন কোনো বৈকবের কাছে পঞ্চদশ শতকের শেষে অথবা ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে। তার পরে হলে শুক্ল নাম থাকত। মুহম্মদরায় নিজেও বৈকব ছিলেন। ভূনিভাষ পুনঃ-পুনঃ দেবীর কাছে “গোবিন্দ ভকতি” বেগেছেন। কাব্যরসে চৈতন্ত-বন্দনা আছে, নবযৌবের ও নীলাচলের ভক্ত অহুসারের নাম আছে। রূপ-সনাতনের নাম নেই। অর্থাৎ বৃন্দাবনে গোপাবতীর কার্ণ তাঁর জানা ছিল বলে বোধ হয় না। ধনশক্তির বাণিজ্যাত্মক তাকে নবযৌব চৈতন্তচরণে প্রণাম করিয়েছেন। কবি পিতা জগৎ মিত্রকে সাধারণত গুণরায় মিত্র বলেই উল্লেখ করেছেন। ‘গুণরায় (বা গুণিরায়)’ ইত্যাকার উপাধি পাঠান হলতানদের আমলেই দেখা হত। ধনশক্তির সমুদ্রযাত্রা-প্রসঙ্গে কবি পোতুগীষ অলদহ্যর অধিকার নির্দেশ করেছেন,

কিরাদির বেশখান খায়ে কর্ণগারে,
বাক্ষিত বাহিরা বাঃ হার্মায়ের ভরে।

মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল

হার্ভারের এ আমল সাতগাঁ-হুগলীতে নয়, বাংলার উপকূলে হিমালীতেও নয়, এ আমল কুবনেশ্বর-পুরী ছাড়িয়ে। উড়িষ্যা-গঙ্গাম উপকূলে কিরিন্দির সৌরাস্ত্র্য বোড়ন শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু হয়েছিল।

এইভাবে সব দিক বিবেচনা করে দেখলে কবিকল্পের দেশত্যাগ ও স্বপ্রাণেশ প্রাপ্তিকাল ১৪৯৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৪ সাল সংগত বলে মানতে হয়।



বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

ঐশ্বর্যশিষ্য দাশগুপ্ত

এ কথা বহুবিদিত যে বাংলার অনেক মুসলমান কবি রাখা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছেন। ধর্মের ভাব বা সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে যে এই কবিতা বা গানগুলি সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য তাহা বলা যায় না। কয়েকটি গান ব্যতীত অন্তর্য্য আমরা খানিকটা একটা প্রথাবদ্ধপথে বিচরণ, খানিকটা অঙ্কুরণ বা অংশুরণ, খানিকটা পূর্বতন আকারপ্রকারের উপর মূল-মূল হস্তাবেলেন লক্ষ্য করিতে পারিব। স্মৃতরাং সেই দিক হইতে বিচার করিলে আমরা এই গানগুলির হৃদয় যথেষ্ট মূল্য দিতে স্বীকৃত নাও হইতে পারি; কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতীয় মনের ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করিতে এই গানগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

যে-সকল মুসলমান কবি রাখা-কৃষ্ণকে লইয়া প্রেম-কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহারা সকলেই বৈষ্ণব-কবি বা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি ছিলেন—এ-কথা আমরা স্বীকার করি না—যেমন করিয়া স্বীকার করি না এই কথা যে হিন্দু কবিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সকল রাখা-কৃষ্ণ-প্রেম-কবিতা রচনাকারী কবিই বৈষ্ণব ছিলেন। দেখা যায় কোনও কোনও ধর্মের ভাবধারা তাহার ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা তাহার সাম্প্রদায়িক একটি ধর্মের রূপ পরিভাগ করিয়া সমগ্র জাতির একটি চিত্তপ্রবণতা রূপে একটি সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে। কোনও একটি বিশেষ-জাতীয় সাহিত্যও যখন এইরূপ ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা জাতীয় চিত্তপ্রবণতায়ই নিয়ন্ত্রণ হইয়া দাঁড়ায় তখনই সাহিত্য সাংস্কৃতিক গভীররূপ ধারণ করে। সাংস্কৃতিক রূপে পরিণত এই জাতীয় ধর্ম ও সাহিত্যকে জাতি অনেক লম্বা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একটা সামাজিক উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করিতে থাকে।

বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্মবিশ্বাস এবং তদান্বিত সাহিত্য এইরূপ একটা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে বৃহৎ বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে যে সমাজ তাহার লম্বে এই কথাটি স্মৃতি মনে রাখিতে হইবে যে তাহা একটা বড় 'বাঙালী সমাজ'; তাহা 'বাঙালী লম্বা' এই মত যে সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত জনগণ তাহাদিগকে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জীঠান রূপে অভিহিত করে পরস্পর-বিবোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লয় নাই; অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস রূপে যে সম্প্রদায় যে মতই গ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন সাংস্কৃতিক ভাবে আজন্মরূপ চিত্ত-প্রবণতার বিচারে তাহাদের একটা অংশ 'বাঙালী' পরিচয় ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈষ্ণব-ধর্ম ও সাহিত্য, মাধব-ধর্ম ও সাহিত্য ও বিভিন্ন লক্ষ্মণ-ধর্ম ও সাহিত্য এইরূপে বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তাহার কলে বৃহৎ বাঙালী সমাজ যখন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জীঠান আদি রূপে নিম্নের ধর্মের ক্ষেত্রে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল তখনও তাহার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেহই পরিভাগ করিল না তাহার সেই সাংস্কৃতিকপ্রভাবিত চিত্তপ্রবণতাকে পৃথক পৃথক ধর্মের ক্ষেত্রেও সক্রিয় করিয়া লইল। সেই কারণে দেখিতে পাই বাংলাদেশের হিন্দুও যেমন 'বাঙালী হিন্দু', বাংলাদেশের মুসলমানও তেমনই 'বাঙালী মুসলমান', বাংলাদেশের বৌদ্ধ জীঠানগণেরও তাই একটা বিশেষ বাঙালী পরিচয় আছে।

বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু ঐতিহ্যের যে একটি 'কৃষ্ণচৈতন্য' রূপে, অর্থাৎ একটি বিশেষ ভগবৎ-চৈতন্যের মূর্তিবিশ্বরূপে আবির্ভূত হইলেন, বাঙালীর সমগ্র জাতীয় জীবনের ইতিহাসেই তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। প্রভুপ্রবর্তিত ধর্মের মূল কথা হইল এই যে, ধর্মকে স্পষ্ট সিদ্ধান্তহীন জ্বালের তরুণালের মধ্যে আবৃত এবং বন্ধা করিয়া রাখিলে চলিবে না, ক্রতিস্থিতি-নির্ধারিত আচার বিচার, ধারণাগুলির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা বিশেষ ক্রিয়াবিধিতে পরিণতি করিয়া রাখিলেও চলিবে না; ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এমন একটি ভগবৎ-চৈতন্যের উপরে যাহা সহজভাবে জীব ও ভগবানের ভিতরকার একটি প্রেম-সম্বন্ধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য করিয়া তোলে। চৈতন্যমন্ডলের জীবন ও বাক্যকে অবলম্বন করিয়াও শাস্ত্র পড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার ধর্মের মূল কথা বেটি তাহা সহজ বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়িল অসংখ্য গানে গানে। তাই তাহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব সজ্জ্ব হইয়া উঠিল সর্বত্রের বাঙালী জাতিরই মনের উপরে— অনেকখানি জাতিধর্মনিরপেক্ষ ভাবে।

* বাঙালী-চিত্রের উপরে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রভাব তাহারও জাতিধর্মনিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক রূপ আছে। মহানব, বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাখাক্ষের প্রেম ও তাহার প্রকাশভঙ্গি আনন্দিগকে এমন ভাবেই পাইয়া বসিয়াছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চারি-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া একটি সমগ্রজাতি তাহার মনের ঘত প্রেমের কথা তাহা ই রাখাক্ষের ঠাধুনিতে এবং সেই ত্রলীলার ছন্দে ভাবায়েই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির দিক হইতেও জয়দেব বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস সর্বত্রের বাঙালী কবিগণকেই কতখানি প্রভাবিত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই সমগ্র শতাব্দীর মুসলমান কবি দৌলত কামির 'সত্যি বয়ান ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে। যেন—

আত দনী ফুলনী কি যোক জনাওসি
যে উকতি নহে পাঠে ।
দাশ উপায়ে দিটাতে কে পারয়
যো যিবি লিখিল ললাটঃ ।
না বোল না বোল, বাই, অসুচিত বাই ।
ধর না চাহিলি তেজি সত্যি মতি
লোক-প্রেমে কড়াওসি হানি ।
বোহর হবারক জ্বের পালক
বধু হুজি মুখ কেন ।
সো বধু তেরিয়ে কল্লাওসি বিখ-পান
জান, বাই, কহ উলেকাঃ ।
দুস্ত হুজি হুজি হুতীপনা ঘুর করি
চিন্তর মোর কল্যাণ ।
কাজি মোহুত রূপে, বাজা হনোঅ মনে
ঐশ্বর্য আশরক ধানঃ ।

১ 'সত্যি বয়ান ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের ঐদোক্তবর্ণনাখ বোঝান কর্তৃক লিখিত কুটিকা, সাহিত্য-প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড (বিশ্বজ্যোতি), ১৯-২০ পৃ।

অন্যেব কবির 'সীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত পদও দেখিতে পাওয়া যায় এই কাব্যের মধ্যে। যেমন—

ভাঙ্গাশে চন্দ্রদ্বী
হৃদয়িতা একাকিনী
বসতি ত্রিবিধ অতি যোহা।
অবর বহুরী
ভাঙ্গুল কিনা ধূসরী
বিলস চকোর আধি কোর।
রাশি শো বজ্রাবতী, তের বিধ মান পরিবেশ।
দুরত বিরহানল
হৃদয়িতা অবর
অবাগি ন চেনন যজ্ঞা চেত।
বকুল নরী
কিহিতি অতি সীত
সলিল অঙ্গন যুগ ভেদ।
বিযুক্ত বিলসনি
সকল দিন বাসিনী
অবিরত বিকস বিশেষ। ইত্যাদি।'

উক্ত পদগুলির কাব্যমূল্যের কোনও কথা বর্তমান প্রসঙ্গে উঠিতেছে না, অহঙ্করণ হিসাবেও এগুলি হৃদয় অস্বার্থক; কিন্তু অত্র একটি দিক হইতে ইহার। সার্থক, প্রাচীন বৈকুণ্ঠ কবিতার প্রভাব কিরূপ সর্বাভিসারী ছিল তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রূপে।

ঐশ্বর্য বতীক্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গলার বৈকুণ্ঠ ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নাম দিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে এই জায়গায় ১০২ জন মুসলমান কবি লিখিত ১০২টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদোদ্ধৃতির পরে তিনি এই সকল মুসলমান কবিরূপের যে লক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে এই কবিরূপের মধ্যে দুই-চারিজন কবি কিছু প্রাচীন হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু অবিকাশই হইলেন উনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। এই সময়ের মধ্যে ধর্ম্মনবনের ক্ষেত্রে কতগুলি ভাব বাঙ্গলার অনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে। উক্ত কোটির বিশেষ বিশেষ সম্ভারের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও কতগুলি ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বাভিসারী জননবের ভিতরে একটা আকর্ষ ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব-চিন্তাগুলির প্রকাশের ক্ষেত্রেও কতগুলি বহুবাক্য পদ্ধতির অনুপ্রয়োগ ও প্রদর্শন বিশেষভাবে লক্ষ্যীয়। সেই ভাবৈক্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গির দ্বারা কিভাবে এই মুসলমান কবিরূপ লিখিত রাধাকৃষ্ণ-কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই কথাটাই আমরা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

এ কথা নিঃশেষে বলা হইতে পারে যে বাঙ্গলার মুসলমান কবিরূপ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈকুণ্ঠ ধর্ম্মের আওতায় রচিত নহে। ফলে বেশা যায় বাঙ্গালার যে অনুপ্রাণিত ভক্তিবর্ধ বাঙ্গলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও সেই ভক্তিবর্ধই প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাতে এই মুসলমান কবিরূপরচিত রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচলিত

রাধাকৃষ্ণের লীলা হইতে অনেকগানি পূর্বক হইয়া বেগা দিয়াছে। আমরা জানি, বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে যে প্রেমলীলার অসংখ্য কবিতা বা গান রচিত হইয়াছে সেই গানে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানকার বহু প্রেমলীলা ভাষার ভিত্তিতে মাতৃবেশ কোনও স্থান নাই। লীলা হইতেছে নিত্যকাল অপ্রাকৃত কৃষ্ণাবনে (বঙ্গ-ধানে) কৃষ্ণ এবং তাঁহার ক্লান্তিহীন স্বরূপশক্তি প্রায়ঃ সৰ্ব্বত্র; জীব সেখানে লীলা-পরিচরিত হইয়া থাকে, সে বহু হইতে লীলা-ধর্ম ও আশ্রয় করে এবং কথায় যত্নে সেই লীলার কীর্তন করে। শ্রীরাধা এবং স্বরূপকৃত নিত্যশুদ্ধ গোপগোপীগণ বাতীত অল্প কাহারও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলার কোনও অধিকার নাই : শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-বাসনাও বৈষ্ণবদ্বন্দ্বাবলম্বিত। সুতরাং আমরা সাধারণভাবে উক্তিগতকৈ অবলম্বন করি যা যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক হইয়া মিলিবার আকাঙ্ক্ষা করি ইহা আমাদের মনঃসম্মত হইলেও বৈষ্ণবসাধনায়ত্ত নহে। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় পাকিস্তানের আসবার ভরসাও দেখে নিজেদের ন্যায়িকভাবে পরিচালিত করিয়া পরম্পর ভগবানের প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছেন এবং মধুরসঙ্গীত সাধনাকে অবলম্বন করিয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কোথাও তাঁহার আভাস মিলিবে না। হিন্দীর ভক্তকবি বীরা যেমন করিয়া নিশিদিন প্রেমবিহ্বল হইয়া তাঁহার পরম 'শ্রীভক্ত' গিরিধারীলীলার মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, অথবা হিন্দীর অষ্টছাপের কবিগণও স্থানে স্থানে যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণাবন লীলার অন্তর হইবার ব্যাকুল বাসনা জানাইয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় তাঁহার কোথাও আভাস নাই, থাকিবারও কথা নহে : বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনা হইল লবীর লবী যে মজরীগণ তাঁহাদেরই 'অহুগা' ভাবে ; লবীগণেরই কখনও কৃষ্ণের সহিত মিলন নাই, সে ক্ষেত্রে মজরীর 'অহুগা'-গণের কৃষ্ণ-মিলনের তো কোনও কথাই উঠিতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্মের 'সাধা' ও 'সাধন' সম্বন্ধে এইসব তত্ত্ব বাংলাদেশে দ্বাদশ-ষোড়শ শতকে গড়িয়া উঠিয়াছে কৃষ্ণাবনস্থিত গোপামিগণের দ্বারা মনে ; কিন্তু আত্মবৃত্তি-বলে লক্ষ্য করিতে পারি যে বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই ভাবদৃষ্টি চলিয়া আসিয়াছে দ্বাদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে। তখনই তাঁহার সমগ্র 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে লীলা-কীর্তন করিয়া শুধু লীলার অর্থ-অর্থকারই বোধ্য করিলেন, নিজে কোথাও সেই লীলার অন্তর হইতে চাহিলেন না। বিজ্ঞানভিত্তি চর্চাশীল সম্রাট আমরা সেই একই সত্য লাভ করিতে পারি। খ্রীষ্টাব্দ ১৫০০ অব্দের আবির্ভাবের পরবর্তী কবিগণের তো কথাই নাই। কবিগণ কোনও ধার্মিক বা ধার্মিক সচেতনতা লইয়াই যে এইভাবে রাধাকৃষ্ণের গান রচনা করিয়াছেন তাগ নহে, এইটাই বেগা দিয়াছে বাংলাদেশের চলতি ভক্তিরূপে। হযত এই চলতি ভক্তির প্রভাবিত করিয়াছে বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং ধর্মব্রতকে।

কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ইহাই বাংলার কবিগণের চলতি ভক্তি বটে, বৈষ্ণব ধার্মিক এবং ধার্মিকগণেরও ইহাই তত্ত্বসম্মত আদর্শ এবং সাধন-প্রণালী বটে ; কিন্তু বাংলার বৃহৎ জনগণের রাধাকৃষ্ণ-লীলার ফলপ্রসূতি কি ? কোনও আসরে যখন একটি বিশেষ লীলা-সম্বলিত কীর্তনপদাবলী গীত হয় তখন নৈতিক বৈষ্ণব সাধক যিনি তিনি নিজেকে একজন কৃষ্ণাবনের পরিচরিত পুত্রীভাবিত করিয়া লইবেন এবং লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মানন্দ-অনুভবের যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সম্ভাবনাকেই কি করিয়া তিনি আশ্রয়ন করিতেছেন তাহা মনঃসম্মত হইয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে এই লীলা-কীর্তনের ফলপ্রসূতি দেখা যায় ভিন্নভাবে। শ্রোতা যখন আসে

ধর্মবাসিত্তি নহেন, সেখানে ফলপ্রসূ সম্পূর্ণ পুথক্, তাহার কথা ছাড়াই দিতেছি। যেখানে ধর্মপ্রবণতা আছে সেখানে তাহার সকল প্রেমের আতি কষ্টকরচিত্তি পরমভক্তের দ্বন্দ্ব-আতি মিলিয়া গুণীত হইবে; তাহার সকল প্রতিফল অবস্থার মধ্যে সকল বিষয়াদিকে অভিক্রম করিয়া যে কক্ষমিলনাকাজ্য তাহা প্রেমের পথের পথিক সাধকের প্রেমসাধনার প্রতিচ্ছবিতেই পূরীত হইবে। বাস্তবীকরণের ক্ষেত্রে এই ফলপ্রসূ ভিত্তি নিজেই বিত্ত কথিয়া প্রেমের জন্ত সর্বব্যয়াদিনি তাহার আদর্শ উৎস হইয়া উঠিবার প্রেরণা পূর্বস্বিত হইবে।

৭. বাচালী হিন্দুগণের মধ্যে বস বৈকব কবিত হইয়াছেন তাহারা সম্পূর্ণভাবে বৈকবদর্শনসম্মত বৈকব হোন বা না হোন, একই ঐতিহ্যবাহী দ্বারা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রভাবিত হইয়া তাহারা মোটামুটিভাবে সেই মূখ্য দ্বারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু অল্পতপ পরিণতির সত্তাবনা দেখা দিল মূলমান কবিগণের ভিতরে; কারণ তাহারা ভৈরবপ্রবর্তিত একটা সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সাময়িক উত্তরাধিকারস্বত্রে লাভ করিলেন, একটা সাহিত্যিক বিষয়-বস্তু এবং প্রকাশজনক উত্তরাধিকারস্বত্রেই পাঠলেন, কিছু পাইলেন না সাধারণকলীশা লব্ধে কোনও বিরুদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাংলায় জনসাধারণে যে সাধারণ ভক্তিবর্ধ ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল এই সকল কবিগণ সাধারণের প্রেমশীলকে সেই সকলের সঙ্গেই মিশ্র করিয়া লইলেন।

৮. বাঙ্গালেশ্বরের প্রেমপন্থী মূলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই হৃদীপন্থী। হৃদীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই ভগবৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আত্মারনের স্রষ্টা এক পরমবস্তুপের বহুরূপে লীলা, ইহাই হইল হৃদীর ভাবপার্থ। জীব হইল এই 'এক'ের সৃষ্টি-লীলায় প্রদান দ্বিক—লীলা-যোগ। কিন্তু লীলার পক্ষে পড়িয়াও 'এক' তাহার সেই পরম প্রেমবস্তুপতাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই—কিন্তু জীব তাহার প্রেম-স্বরূপতাকে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবকে তাহার আপাতপূর্ণ সত্যকে ভুলিয়া যাউতে হইবে—ইহাই তাহার বড় সাধনা। যিনি মূল প্রেম-স্বরূপ তিনিই ত হইলেন পরম দ্বিত—সেই পরম দ্বিতের 'প্রেম-দ্বিতানী' হইয়া উঠিতে হইবে জীবকে। প্রেম-সমাধিতে ('দান') যে আত্মবাস্তবের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি তাহাই যুগের কথিয়া দেব অনন্তের সঙ্গে নিত্য মিলনের পথ।

বাংলার যে হৃদীধর্ম—শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষেরই যে হৃদীধর্ম—ইহা একটি বিশদর্শ; ইহার ভিতরে পারস্পরিক প্রেমধর্মের সহিত ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের কাহিনী-উপাখ্যানও হৃদীধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। হৃদী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সংস্করণ লাভ করিয়াছে বাঙ্গালেশ্বরের মূলমান কবিগণ সেই সমগ্রজাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত সাধারণকে অনেক স্থলে দিশাইয়া লইয়াছেন। কলে তাহার যে পূর্বভাগ অসুহাগ বিরোধের আতি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দ্বিতের স্রষ্টা নিখিল প্রেমসাধকগণের পূর্বভাগ অসুহাগ বিরোধের আতিতেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবং সেই আতির ক্ষেত্রে কবি নিজেই শুধু দর্শক বা আত্মদেহ-রূপে থাকিয়া দূরে দূর হইয়া লন নাই, নিখিল আতির সহিত নিজের চিত্তের আতিক্রমে মিশাইয়া দিয়াছেন। ইহারই কলে সৌভাগ্য বৈকব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বাকী মূলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থানে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু বৈকব কবিগণের ভাবদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাদের পদের ভণিতায়; এই ভণিতাগুলি বৈকব কবিগণ নিজেদের কিছু কিছু মন্তব্যাদি যোগ করিয়া দিয়াছেন—তাহার মধ্যেই

বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

আমাদের ভাবগুটির ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা সৃষ্টকীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবগুটির ইঙ্গিত পাইব। আমরা শ্রীমুক্ত যতীন্দ্রনাথের ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে পদ-সংগ্রহের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার ভিতরে প্রথমেই দেখিতে পাই কৃষ্ণকে বলা হইতেছে—

তোমার কইন হিরা, ভর নানা নারী সৈরা, ✓
কোণা কোণা যদি বৈতু আমি।
পালক সাড়াই নারী, ভাবিয়া কানিয়া পুড়ি,
নিশি বেশ বা আসিয়া তুমি।
কহে সৈরন আইনজিনে, প্রভু ভাব রাম্বিনিমে,
মাগমায়ে না করিও হেলা।
আমারে অবাধ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা। ৩ সংখ্যক

ইহার ভিতরে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, বাহার ভগ্ন পালক সাড়াইয়া কানিয়া ভাবিয়া কানিয়া পুড়িতে হইয়াছে তিনি কিছু পরেই এক শার্বজনীন 'প্রভু'রূপ ধারণ করিয়াছেন। বাংলাভাষ্যের এই 'প্রভু'টির একটি বিশেষ ভাবপূর্ব আছে। বৈষ্ণবগণের 'কৃষ্ণ', সাধারণ হিন্দুগণের 'হরি', মুসলমানগণের 'মোহাম্মদ' এবং খ্রীষ্টানগণের 'গড' ভাঙিয়া বাংলাভাষ্যের এই স্তব্ধজনীন 'প্রভু'র উৎপত্তি হইয়াছে। স্বতন্ত্রাৎ কৃষ্ণ-কথা করিতে করিতে আসিয়া এই 'প্রভু ভাব রাম্বিনিমে' কথা বলার বিশেষ ভাবপূর্ব আছে— অর্থাৎ কৃষ্ণকে এখানে দার্শনাত্মিক বৈষ্ণবতার গভী হইতে লইয়া আসিয়া বাংলার জনমানুষের সাধারণ পরমবসিতের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল; এই যুক্তির ফলে রাধাও ব্রজকৃত-নিমুক্ত হইতে মুক্তি পাইয়া সকল 'প্রেম-দ্বিতানী' সাধকের সহিত এতদ্বারা হইয়া গেল; তখন আর এই রাধার স্থান কবির নিজের গ্রহণ করিতে কোনও বাধা রহিল না, তখন কবি স্পষ্টই দ্বিজদাস করিতে পারেন—

আমারে অবাধ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা।

কবি আকবর আলীর পূর্বস্রাগের (স্বপ্নবর্ণন) যে পদটি রহিয়াছে সেখানেও লক্ষ্য করিতে পারি এই একই সত্য—

এক ক্ষরে উইয়া থাকি, হৃদিয়ে মনন বেধি।
ত আমার কর্ণধোনে না পাইলাম আশি।
ভাটান আকবর আলী বলে, শিরিতে যা অব জলে।
ও ফলে মানে হাইল ক্ষেত্রে কোথা বিজ। ৫ সঃ

এখানেও বলা যাইতে পারে, 'ভাটাল' আকবর আলী অতি সহজভাবেই কৃষ্ণ-লীলায় শ্রীরাধার স্থান দখল করিয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ বলিতে পারি নিজেই রাধা-স্থানীয় করিয়া লইয়াছেন। কবির নিজেকে এই রাধা-স্থানীয় করিয়া লইবার গুণাধ বহু কবিতায় দেখাই লক্ষ্য করিতে পারি। নিজেই রাধার স্থান প্রেম-দ্বিতানী মনে করিয়াই কবি প্রসন্ন করিয়াছেন এই প্রেমপথের পরম-অভিজ্ঞা রাধাকে—

তোমারে নিম্ন কবি, চরণ বঁধ, বৈদ্য যে কো হাই;
জন্মের দন রতনখনি, কোথার খেলো পাই।

যুগে যুগে দেশে দেশে সকল 'প্রেম-পাগলিনী'গণের সঙ্গে রাখা যে একটি সাক্ষাত্য রহিয়াছে, অথবা রাখা যে নিখিল-প্রেমপাগলিনীর প্রত্যেক এই সত্যের ব্যাচনা অনেক পন্থেই লাভ করি; এই ব্যাচনাকে অবলম্বন করিয়া এই পরগুলিতে রাখা ও পদকর্তা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নিয়ে যে কবিগণের ভণ্ডিতাসহ পদাংগগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই এই সত্য লক্ষণীয়।

যে বাইথ ঘরের ঘাটে নতুন বোঁধন চাইয়া।

ঐ ভবের চরণে দ্বিধা কুলমান সঁগিয়া।

আঁখুল চক্কে কল সে ভ্রম না পাইয়া।

বয়ানের পলক হারি, বেঁকিয়ায় ভাবিয়া। ১১ নং

যেহা দিগা না দেয় বেধা এতি বিদ্যে আলা।

অহর বৈদ্যি বোঁধন পতি বাইয়ে চিকণ কালো।

অখন আসন্নক কলে কি হুহ নন পাই।

বহুয়ার ভেদ মিনে উপায় নাই দেখি। ১২ নং

কালার গিরিতে ছুঁই গুটাইয়াছি কুলমান।

গ্রেবের গোড়া, আহার কাল, কালো গো কালার।

চক্কের পুত্ৰো কাল আর যে আহমান।

উপায়ায় অল্প কালো না গুইয়া তোহার নিধান। ২২ নং

বন্দন গিরিতে কৈলা, বিবাহামি আইল দেলা,

জিরতাব না আছিল মনে।

মাঝি আদম কাল, কুলেতে হাঝি লাগ,

কিহিয়া না চাহ আদি কোণে।

তুই হক্কের বটনি দিয়া, আনলেতে তুণ দিয়া,

কোথা দিয়া হক্কিলা কুলিয়া?

হীরা কাসাবী ভণে, কল চাপ সে আনলে,

নিবাও লো গ্রেবের দিগা। ৩০ নং

চাঁদকাহী কলে বীণী শুনে হুয়ে বরি।

জীহুনা জীহুনা আদি না দেখিলে ছরি। ৪০ নং

বোরে কয় বরা, মেহ পল-হার

তনব পল-কাহু।

কুলদীল মন, ভানাইলু কলে

এগ না রহে তোরা বিহু।

সেহর কুলুয়া ভণে, কাহুর চরণে

নিবেশন শুন ছরি।

সকল হাফিরা, রহিলু তুয়া পায়ে

জীবন-মরণ জরি। ৭০ নং

বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

✓ আরম্ভ হ'ল একটি পদে বেধিতে পাই, বণিতাভাবের পদের ভিতরে রাখায় বাস্যতার স্থলে মিনতি দেখা দিচ্ছে।

আম নিশাকালে রে লাব, আর নিশাকালে
আবারে হাড়িমা ভাল কায় কুন্ডে বসিলে।
হরের বাতি, মারা রাত্রি, ছুড় পান্দরে ধলে,
হরা জগে আগ লু আইস রাখার হলে।

কিন্তু এই পদটির শেষেই যখন বেধিতে পাই—

পাশল আরহুন বলে, শিওকালে, মেঘ না করিলে,
অ; আশিষ আপনস্থ হামি নিশাকালে।

তখন এই ভণিতা ও মস্তব্য সমস্ত পদটিরই পারিপার্শ্বিকতা এবং অধ্যাত্মবাস্তবতা বদলাইয়া গিল। শিওকালে প্রেম না করিলে রাত্রিনিশাকালে প্রাণবদ্ধকে পাওয়া যায় না কথার ইমিত কোন্ দিকে? জীবনের প্রত্যন্ত হইতে প্রেমের পথে না চলিলে, প্রেম-সাধনাকে সমগ্র জীবনব্যাপী না করিয়া লইলে, জীবন-নিশাতে কখনও সেই প্রাণবদ্ধের দেখা মেলে না। এই অর্থের আলোতে দেখিতে পাইব, রাখার যে 'আম নিশাকালে' তাহার জীবনকূটে আমকে আত্মান ইহার হৃদয়ের মিল বৈষ্ণব কবিতার বাসক-সম্মত, বণিতা, কলহাস্তরিতা প্রভৃতির পদের সাধারণ হৃদয়ের সঙ্গে নহে।

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণশীলার বস্ত বিস্তার ঘটঘাচে তাহার মধ্যে নৌকা-লীলা বা নৌকা-বিলাসের লীলা-বিস্তারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে দ্বন্দ্বের আমাদের জানা আছে তাহাতে এ-জাতীয় লীলা বাংলা বৈষ্ণবসাধিতোই পাওয়া যায়, অস্ত সাহিত্যে পাওয়া যায় না, পুরাণাদিতেও বিশেষ পাওয়া যায় না। আমাদের বিশাল নদীমাতৃক বাংলাদেশের কু-প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেই বাংলাদেশের কবিমানসে ইহার উৎপত্তি ও বিস্তার। নিষ্ঠাবান গোড়ার বৈষ্ণবগণের মূর্তিতে ইহা রাখা-কৃষ্ণের অনন্ত অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্যের একটি প্রকারভেদ মাত্র—ভক্ত সাধককে ইহাকেও লীলা-পরিবর্তনভাবে গ্রহণ হইতে শর্মন ও আশ্বাসন করিতে হইবে। কিন্তু একটা মিনিম লক্ষ্য করিতে পারি, এই যে প্রত্যন্তবেলা ওপার হইতে এপারে আসিয়া সাত্বাদিন বিবরকর্মে রত থাকিয়া বেলা শেষে আবার ওপারে ঘাইবার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষার 'পাড়ী'র জন্য যেঘাঘাটে বসিয়া থাকে—এই ঘটনাটি বহুদিন পূর্ব হইতে বাঙালীর কবিতাতে এক উৎকল অধ্যাত্মভাব উদ্বিক্ত করিয়া আসিয়াছে; পাড়ের জন্য অপেক্ষা বাজালীচিহ্নে ভবপারের ব্যাকুলতা, পরপারের অজ্ঞাত রহস্য এবং অজানা 'পাড়ী'র কাছে আশ্বদগর্পণের ভাবকেই উদ্বিক্ত করিয়াছে। 'উষর' কবি রচিত একটি পদে দেখি—

আনি তোমার লাগি হইলাম অরে বার।
মেঘ লক্ষের খলান গো পাড়ি না জানি সাতার।...
উষর পান্দরে কর হুবি ছুবি রসায় গো।
একো দিয়া তরি শ্রী করি এখন মরে কর পার।
আনি তোমার লাগি হইলাম অরে বার। ২০ সং

পদটি নৌকা-বিলাসের ভিত্তরেই বাঙালীর সেই স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব বলিতেছি এইমত পদকর্তৃগণ যেভাবে অবলম্বন করিয়াই পদ-রচনা করিয়া থাকুন না কেন,

কীৰ্ত্তন-পদাবলীর শ্রোতাগণকে পরগুলি সেই অখ্যাতিবাতনাতেই মূঢ় করে। কীৰ্ত্তনীচাগণ যখন আশ্রয়ের দ্বারা পরগুলির জীব-সম্প্রদায়গণ করিতে থাকেন তখন তাঁহারাও এই অখ্যাতিকভাবেই পরগুলির অর্থের বিস্তার করিতে থাকেন। কৃষ্ণ রাধার নিকট যখন পাড়ের কড়ি চায় রাধা তখন এক আনা ছু আনা করিয়া বহু কথাকথি করিতে থাকে; গায়ক তখন নিজেই শুধু রাধা নয়, আসন্নস্থ লক্শের প্রতি উপদেশ দিয়া হুবে বলেন, 'বোল আনাই চেষ্টে দাও—গোবিন্দায় নমঃ বলে বোল আনাই চেষ্টে দাও'। আসনের শ্রোতৃমণ্ডলীও এই উপদেশ পাইয়াই হুঁখী। সমস্ত বিনিময় লক্ষ্য করিলেই বোকা যায় কীৰ্ত্তন-আসনেও নৌকা-বিলাসের আখ্যাতিক ইকিত কোন্ দিকে। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ পদকর্তা জ্ঞানানন্দেও একটি পদ উদ্ধার করা হইতে পারে; তিনিও নৌকা-বিলাস লীলা-গানের মধ্যে যে ইকিতটি দিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পদটি এই—

যাবন পহার মল ঘন করে কল কল
হুসন বহিরা যায় ডেউ।
সকলে উঠিল বেথ পরনে বাড়িল বেথ
ভরলি রাকিত মাঝে কেউ।...
অকারে নিবন সেল নৌকা বাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাণ।
জানহান করে সখি ঘির হৈল বাক সেধি।
এখনি না ভাবহ বিঘন।

অষ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগের চট্টগ্রামবাসী আলিরাঙ্গা (ওহরু কাহু কবির) প্রেম ও বোগবর্ষ মিশ্রিত কথেকথানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থখানিতে অনিশ্চিত হিন্দুধর্ম ও অনিশ্চিত মুসলমান ধর্মের ভাবধারণার একটি চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করিতে পারি। এই আলিরাঙ্গার একটি পদ আছে—

কল সখি হার কথা শোয়।
কুলবধু আদি হুবে সে কেনন জোয়।
সে নাথর চিত্তচোরা কালা যায় নাথ।
ছিতা রাখি আদি হুবে বড় চৌধ কাশ।
যোর জিউ সে কি হুতে লই সেল হরি।
দুত হুবে প্রেমানলে পুড়ি আদি বরি।
জগদগে আলিরাঙ্গা সায়ে শ্রেয় করে।
শ্রেয় খেলে বানানলে প্রতি হুতে ঘরে।

এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, ক্রমের নাগর 'কাল'র যে 'কুলবধু আদি' হরণ করা নীলা তাহা যে গুরুবোমের ওপারে কোন অপ্রাকৃত বৃদ্ধাবনেই সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে, প্রতি ঘরে ঘরে—অর্থাৎ প্রত্যেক বাহুরের ভিতরেই চলিতেছে 'নাগর কাল'র এই প্রেমলীলা, জগদগে আশ্রয় করিয়া চিত্তবিস্তার সাধনায় অগ্রসর হইলেই এই সত্য উপলব্ধি করা হইবে। এই সত্যই প্রকাশ পাইয়াছে ইরশাদ কবির একটি পদেও—

হাগল সা উঠগলে কইন কলু আবার বণ্ডিয়ারী।
ওরে বাঝাইল মোহন ধানী আবার ধানী মৈল চুরি। ২০ সা

আদিরাজ্যের পূর্বোক্ত পদটিতে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে মূল্য বিলাসিত হোসেনের (ইনি কালীপ্রসন্ন ভণ্ডার জামাতাশ্রী ও বৈষ্ণবশ্রী রচনা করিতেন) একটি পদেও সেই ভাবের সন্ধান পাই।—

প্রেম কি পাতেব ফল পাড়িব করিলা বল।

সেই প্রাণ করিলে নাপ যিলে সে চিত্তন কলো।

কালীপ্রসন্ন এই বলে, বর্ণ মর্ত্য কুমণ্ডলে

চলিতেছে কালে কালে সকলি গীত লীলাখেলা।

কুম্ভের মাঝার লীলাখেলা স্বর্ণ-মর্ত্য-কুমণ্ডলে চলিতেছে বৈষ্ণব পার্শ্বনিকগণ সে কথা স্বীকার করিতে পারেন ; কিন্তু তাহার প্রেমের লীলাখেলাও স্বর্ণ মর্ত্য কুমণ্ডলে চলিতেছে গোড়ায় বৈষ্ণবগণ এ কথা স্বীকার করিবেন না (সহজিয়াগণ ব্যতীত)। কিন্তু গোড়ায় মুসলমান কবিগণের সে কথা বলিতে কোনই বিধা ছিল না,— কারণ—

সবের চেয়ে নিচমতে কর আমি না যেনি উপায়।

সমুদ্রতীরে আমার মূর্শির প্রাণহার। ৫৪ সঃ

স্বাম্যায় যে শুধু অপ্রাকৃত কুম্ভাবনের লীলা-নাগর নয়— সে যে ব্যক্তিব্যবহারের 'মূর্শিদ'। মূর্শিদ-ভবনেও জামরাঙ্কে পাওয়া যায়, আবার পরম মূর্শিদও হইল স্বাম্যায়। মহুসর কবি বলিয়াছেন—

নয়ানে নারিল রূপ আমি আত্মবিত।

আগিতে হারাতিহুঁ হরি শোক কহে চিত।

কি যেদিহুঁ কি হইল শলক অস্তর।

তর গুরু পাইবে পুনি করে মহুসর। ৭২ সঃ

বিরাগনের একটি গানে রাখাভাবে ভাবিত কবির বিরহ-আতি ক্ষমার প্রকাশ লাভ করিয়াছেন—

আমি লক্ষিতা বরা বাও গো বন্ধুরে আনিয়া নাও তরা।

আমি দানী চির দোষী প্রায় পিড়িতের বরা।

কহুরে আনিয়া লাও তরা। ৭৪ সঃ

বিহাঙ্গ কবির তাহার একটি গানে প্রেমপাণ্ডল শাখক চক্রে প্রেমপাগলিনী রাখার প্রতিক্রিয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন। নব 'পিরোতে'র চিহ্নই হইল এই, সে 'দগায় বাকি উদাসিনী'— আর এই উদাসিনীর মলিন ভাবেই তাহার 'দিবানিশি বেকরার'—দিবানিশিই তাহার অনীম ব্যাকুলতা।

কুখা নিয়া বাই তার ঘনে

মলম'রা হই নহবে গো

এগো দ্বির ঘুরে প্রেমমুক্ত

দ্বিবানিশি তিরিয়ার।

হাদি খুদি নাই তার ঘনে

সফার থাকে ঘোর নহবে গো

এখো লাভের নাই তার

কলর তার অলসার। ১০৮ সঃ

আমরা বৈষ্ণবগণের রাখার এই বর্ণনা পাটয়াতি, আর পাটয়াতি ত্রিষ্টোতসদেবের এইরূপ বর্ণনা ; সুকী কবিগণের মধ্যে 'প্রেম দিল্লানী'র এই বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় বাংলায় বাউল কবিগণের বর্ণনাতেও। এখানে বাউল বর্ণনার সহিত বৈষ্ণবের রং লাগিয়াছে।

বাংলাদেশের সহস্র শ্রম সাধনার উপরে যোগতন্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। সে প্রভাব সর্বাঙ্গের ন্যায় বড় হইয়া দেখা গিয়াছে একটি সাধারণ বিষয়ে যে পরম সত্যরূপ যে পরম দয়িত সে শুধু বাহিরে নয়—সে 'ঘরে'র মধ্যেই বহিয়াছে, আমাদের দেহেই হইল সেই 'ঘর'। বৌদ্ধ মহিম্মাগণের গানগুলির মধ্যেই আমরা এই ভাবটির প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার। বার বার বলিয়াছেন, 'সেহি' বুদ্ধ বলন্ত
 'নামই'—'এই সেহেই বাস করিতেছেন বুদ্ধ—পণ্ডিতেয়া সে কথা জানেন না'। তাহার। বলিয়াছেন—

অশরীর কোই সরীরি মুক্তা।

যে তহি জানই সে তহি মুক্তা।

'অশরীরী একজন আছে এই শরীরের ভিতরেই লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সে-ই বর মুক্ত।'

আবার—

অই অচ্ছই বাহিরে মুচ্ছই।

পই সেকখই পড়িবনী মুচ্ছই।

'সে আছে (সেই) ঘরে—তাহার কথা ভিজালা করিতেছ বাহিরে! পতি যেহিতেছ, (তাহার কথা) ভিজালা করিতেছ প্রতিবেশিগণের নিকটে।'

বৈষ্ণব মহিম্মাগণেরও মূলমন্ত্র ছিল—'বস্তু আছে সেহ বর্তমানে'—সব বস্তু বা তত্ত্বই আছে সেহের মধ্যে। ভারতবর্ষীয় হুজী সাধকগণও এই সত্যটি গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙালার বাউলরাও সেহেকেই সেউল করিয়া লইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া বাংলার মূলমন্ত্র কবিগণও এই ভাবটির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই কবিগণ বলিয়াছেন যে রাধা-কৃষ্ণ অজেনতব—দুই-ই এক—ঘর-ঘরীণী রূপে দুইয়ের লীলা,—কে ঘর কে ঘরীণী বলা শক; রাধা যদি ঘর হয়, কৃষ্ণ হইবে গৃহী, আর কৃষ্ণ যদি ঘর হয়—রাধা তবে ঘরীণী। মোটামুটি ভাবে একই অর্থবোধের ঘর-ঘরীণী রূপে লীলা।

রাধা কাহু এক ঘর কেহ নহে জিন্দ।

রাধার নামে বাধান দিয়া চাশায় দ্বার দিন।

কাহু রাধা এক ঘর লগায় করে বাস।

চলিয়া যাইব নিহুঁর রাধা কাহু হইব মাপ।

ইহার পরেই কবি বলিতেছেন—

রাধা কেবা কাহু কেবা চিনিবারে চাপ।

তনে কবে রক্ত হইব দুর্গিন ধাতী যাও।

এই যে সেহ-সেহী—মূর্ত ও অমূর্তের—সীমা ও অসীমের লীলা ইহা যদি বুঝিতে হয় তবে সঙ্গতকর আশ্রয় ছাড়া অন্য উপায় নাই। অনেক কবি বলিয়াছেন, নিজের সেহই হইল রাধা—তাহার মধ্যে যিনি 'রহণ' তিনিই ত হইলেন কৃষ্ণ। বাহিরের এই রূপ হইল রাধা—তাহার ভিতরকার বস্তুপই ত কৃষ্ণ। রূপ চায় সেই স্বরূপের প্রেমের মধ্যে আপন সার্বকতা, তাহিত রাধার কৃষ্ণাধেয়। ঘরের মালিককেই যদি খুঁজিয়া বাহির করা না গেল তবেই মৃত ঘরের আর কি সার্বকতা। আবার এতদ ভাবও যেহিতে পাই যে, সেহ হইল ঘর, এই ঘরের মধ্যে জীব হইল রাধা, আর পরমাত্মাই হইল কৃষ্ণ। সেই ইঙ্গিত রহিয়াছে ওহাবের একটি গানে—

বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

কবুরে হার কট্টন বধু,
কট্টন তোমার মন রে,
রাখ এটি বরশন দিয়া ।
আমি নারী তুমি রে পতি
একই মৃগেতে বশতি,
ঘরের পুতী না পাই দুইজা । ২৬ স:

এই ভাবটিও বেশন পাওয়া যায়, তেমনই এ-ভাবটিও পাওয়া যায় যে সেহ-খাচাষ কৃষকই হইল সেই বাড়লবের বণিত খাচার ভিত্তরকার 'অচিন পাখি'। মন-পবনই হইল সেই অচিন পাখির পিঙ্কর। বলিল কবি বলিষ্ঠাছেন, যতই প্রেম করিতে চেষ্টা করি, 'চকল কাহুরাহ'; কখন যে পাখি কোথায় ছুটিয়া পালাইবে ঠিক নাই।—

সখী কো অমর বলিলে কল শিখিত করি ঢকিও না,
মন পল শিখিবার পানী দুটিলে বরা দিবে না। ৩০ স:

বদিহুদ্দিন বলিষ্ঠাছেন,—

তোমার কুপার বলে,
বোহার ভাগের বলে,
আসিয়ায় অবলা মন্দিরে ।
এই ঘর আশ্রয় করি,
একদিন ঘাইবা ছাড়ি,
কেনে বেথা না বেও রাখারে ।
তুমি অস্তরে পশি,
মহুয়া রহিলে বসি,
কিরূপে ভজিলে বেথা পাই ।
কহত বদিহুদ্দিনে,
ভক্তর আসনে গিলে,
বেথিবারে আর লক্ষ্য নাই । ৩১ স:

এখানে 'অবলা মন্দির' বা রাখার মন্দির হইল যেহ, এই 'তুমি অস্তরে' রহিয়াছে 'মহুয়া'—ভপের অস্তরে স্বরূপ। বহুদূর কবির গানেও দেখি, এই সত্যের প্রতিধ্বনি—'বেহার মাঝে কালাচান ভাবে চিন না।' নিরস্তর কবির গানে সেবি, এই 'ঘরের গোআবী'র (সানীর) যে লক্ষ্যন পাওয়া গাইতেছে না, সে যে অস্তরের মধ্যে দেখা দিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে না, ইহাই শু চরম বেদনা।

সই সই কি ঘোর নিশি
কি ঘোর নিশি
কি ঘোর এ রনি পশি ।
অর গোআবী
হাসিয়া ন গোআবী
যুঁকি অগাধী হুয়া ।
সই সই ন জানি কি ঘোরে
শিখ ঘোরে ঘোরে
বিহুলা জন এ শিউ ।
কহে দিহতাবে
গোআবী ইফেবে
সহজে তেজি দুট । ৩২ স:

প্রেমধর্মের সঙ্গে বোগদর্শের বিজ্ঞানের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু বাংলাদেশে নয়—সমগ্র ভারতবর্ষেই এই জিনিষটি লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্বে বলিয়াছি, হুফোরাও প্রেমসাধনার সঙ্গে বোগসাধনা মূল্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই বোগসাধনা হইল মূল্যত: সেহবিশুদ্ধি ও চিত্তবিশুদ্ধির ক্ষত। এই বিশুদ্ধি

সাধনের দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হয়; বৈকুণ্ঠবাণ বলিষ্ঠাছেন,—‘প্রাণ মন ঐক্য ক’রে ডাক যোগেশ-সুধারে।’ এই প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করিবার ক্ষমতাই হইল প্রেমসাধনার যোগসাধনার প্রয়োজন। মুসলমান কবিগণের সাধনিক প্রেমসীলার গানের মধ্যে অনেক সময় যোগ-সাধনার বিভিন্ন কথা নানাভাবে চড়াইয়া আছে। গোলাম হুসেনের একটি গানে আছে—

আকাঠা কাঠের নাওখানি ঘন্থা যাব।
কালাকুয়া কালো নিশান যুগু রাখার সার।
আখির মাঝে আখি গুলি রাই নিরখিয়া চাও।
নাচের মাঝে আছে হরি চক্রে নেপথ্য দিও।
কর্ণের মাঝে কর্ণ থিরা রাই নানিকর ধাঁড় বাইও।
মুখের মাঝে মূখ থিরা রাই হরির মূখ খাইও।
কন্ঠের মধ্যে নাচের পদ রাই লগ্নমুখে ধার।
দুঃখের চঙ্গিল রাখা হরির লাগ পায়। ৩৮ সা

এখানে ‘নাওখানি’ হইল যেহ নাওখানি, ঘন্থা এখানে কাল-প্রবাহ। ‘আকাঠা কাঠের নাও’ অর্থাৎ বাজে কাঠের নাও হইল যোগের দ্বারা বিতঞ্চ হয় নাই এমন যেহ (অপক যেহ)—স্বতন্ত্রাং তাহার ‘কুয়া’ অর্থাৎ নৌকা ঠেলিবার লগিও ‘কালা’—অর্থাৎ কীচা বাণের (অমৃতভূত); কালো নিশানও সেই অবিশুদ্ধিরই প্রতীক; বোটের উপরে যেহমনের কোনও বিতর্ক লাভ ঘটে নাই, বাহিরে শুধু ‘রাখার সার’। ‘আখির মাঝে আখি গুলি’র ইঙ্গিত ‘আনুতচক্’ ইহবার দিকে, ‘কর্ণের মাঝে কর্ণ’ প্রকৃতির ইঙ্গিতও এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্ভূততার দিকে; ‘নাচের মাঝে আছে হরি’ কথার তাৎপৰ্য সেহের মধ্যে পরম প’ত্ৰতকে আবিষ্কার করা এবং উপলব্ধি করা। ‘না’সিকার ধাঁড় বাইও’ কথার ইঙ্গিত আসে যাহে ভপের প্রতি। ‘মুখের মাঝে মূখ থিরা’ কথার ইঙ্গিত একেবারে ত্যাস্যোয়ার দিকে। ‘লগ্নমুখের মধ্যে নাচের পদ’ সেহমধ্যম নাকী-চক্র-সাধনার ইঙ্গিত করিতেছে; আখ ‘সর্গমুখে ধার’ কথাটি সাধকগণের উল্টা-সাধনা বা উর্ধ্বসাধনার বাণীনা দিবেছে। এই কবিরই অপূর্ণ গান আছে—

আখের পতন ঘর থাকের কখন।
তার মাঝে করে বেলা শেষ নিরঞ্জন।
পদনে ঢালাইয়া দাগ আত্মসের পানি।
রসের টুকুনি ঘর মনের পাখনি।—
ছই মুখে ছুটে কুল ঘর দিল বলে।
শ্রেয় নিরখিয়া সেখ গোলাং কখন বলে। ৩৯ সা

পদটির ভিত্তরকার সকল ইঙ্গিত স্পষ্ট করিয়া ধরা যায় না (অনেক সময় পদকর্তার মনেও হয়ত সব কথা স্পষ্ট নয়)—তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত গ্রহণ করা হাইতে পারে। ‘আখের (জলের) পতন (পতন, ভিত্তি) ঘর থাকের (ঘাটির) কখন (বন্ধন)’ হইল পঞ্চভূতাত্ত্বিক যেহ; ‘পদনে ঢালাইয়া দাগ’ প্রকৃতির ইঙ্গিত শ্বাস-নিঃশ্বাসের দ্বারা যোগসাধনার প্রতি; ‘রসের টুকুনি ঘর’ সম্ভবতঃ মস্তকচিত্ত চক্র; ছইমুখী কুল বোধহয় সম্ভারস্থিত ‘বিশ্বপদ’ের (উভয়মুখী পদ) পত্রিকল্পনার ইঙ্গিত করিতেছে; ‘দিশ (দীপ) কুলে (জলে)’ বিদ্যাস্থাপিত বা ‘নূরে’র সন্ধান দিতেছে।

ছৈয়দ আলীর একটি গানে দেখি—

এই তরে জাশিগ হইলে সেই বরন ।...

জপের ঘরে জপ বলতেই বিদ্য চক্ষে বরনন ।

কাঁদল ককির তৈয়দ আলী জিতে না হইল বরন ।

আঁঠার বোকার খুঁড়ি হিমুগিতে বরনন । ৪৩ পঃ

'জপের ঘরে জপ'ই হইল বরনন, তাহাকে 'বিনা চক্ষে বরনন',—ইন্দ্ৰিয়ের অগোচর সেই বরন— শুধু বিতর্কচিন্তে সংবেদ্য। জায়ন্তে মহা না হইলে, অর্থাৎ বাস্তবের সেধর্ম সম্পূর্ণ নিবস্ত না হইলে এট সাধনা হয় না : সেহ্ম জিনাফীর (ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্য—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী) সংগর বেগানে সেখানেই ত্রিধারা নিমিত্তা উর্ধ্বম্রাতা একধারা হইয়া যায়— সেই ত্রিবৌতেই ত বৌদ্ধাধর কৃষ্ণের দর্শন মিলে ।

যোগসাধনার মধ্যে নাম-নাথন মধ্যম্ভের অনেক প্রেমসাধক সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন । নাম সাধনের মধ্যে অনাহত-ধর্মিতত্ত্ব একটি প্রধানতত্ত্ব । কোন কোন মুসলমান কবি শ্রীকৃষ্ণের কংকীরনিব সহিত এই অনাহত নামতত্ত্বকে বিলাইয়া লইয়াছেন, জালালউদ্দীনের গানে সেই তত্ত্বের আভাস পাই ।—

আম না রে কই শুনি

অশ্রুগ জপধরনি

কতরে বালিহে দিনারবী ।

কে বাজার কোণার বসে

চলো বাই তার উচ্ছেপে

জন কাছাইয়া সেই দেশে তারে দিনি নি । ৪৪ পঃ

রহিমুদ্দিনও বলিয়াছেন—

হিমুগিয়ার (= হিমুগি) ঘাটে ধনি

কালাতায়ে বাজার ধাঁধি গো

এসো ধাঁধি ঘরে এখি হুয়ে করিল ঘোরে উদাসিনী ।...

গমে নামে মিলন করি

বাশির উপর ধান করি গো

এসো দেশ চাইয়া কোর লা মোকামে (= দেখে) বিরাজ করে নীলমনি । ৮০ পঃ

আমরা আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ কতক রচিত সাধক-প্রেমলীলা বিষয়ক এই পদগুলির সাহিত্যিক মূল্য হ্রস্ত খুব বেশি নয় ; কিন্তু বৈষ্ণব ডাবনুটি মুসলমান কবিগণের ভিতরে গিয়া কি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহা সত্যই আমাদের লক্ষণীয় । বাংলার সামগ্রিক ধ্যান-ধননের পরিচয়ে এই পদগুলির মূল্য অবতরবীকার্য ।

গ্রন্থপরিচয়

সাতবাহন নরপতি হালের গাথা-সমুদয়। ঐরাধাগোবিন্দ বসাক। জেনারেল প্রিন্টার্স আও পাবলিশার্স। মূল্য ৮শ টাকা।

বুর্জী়া শাসনের প্রারম্ভ সময়ে অঙ্গুবেশে সাতবাহনবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশীয়েরা ২৪০-৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২২০-৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে অনুমানিত হয়েছে। এই বংশেরই নরপতি হাল সাতবংশী প্রাকৃত কবিতা বাছাই করে 'সত্তপদ' বা 'সপ্তপদী' নামে একখানি কৌশগ্রন্থ বা কাব্য-সংকলন গ্রন্থিত করেছিলেন বলে লোকপ্রসিদ্ধি আছে। সাতবাহনবংশীয় কোনও রাজার দ্বারা সংগৃহীত একখানি কাব্য-কৌশলের উল্লেখ বাণভট্টের হর্ষচরিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত নানারূপ প্রবণ বা বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ্যার্থ থেকে পাওঁতেরা অনুমান করেছেন যে 'সত্তপদ' গ্রন্থের সংকলনিতা হাল সাতবাহন বা শালিবাহন কণ্ঠে আবিস্কৃত হয়ে বুর্জী়া প্রথম শতাব্দীতে অঙ্গুবেশে রাক্ষস করেছিলেন, ইনি স্বয়ং কবি ছিলেন এবং 'কবি-বংশল'এই উপাধি ছিল। ইনি কুন্তল-অনগদের প্রভু ছিলেন এবং এর রাজধানীর নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। হাল বলেছেন, শালঙ্কার কোটি গাথার থেকে তিনি মাত্র সাতবংশী বেছে নিয়েছেন। এর থেকে অনুমান করা চলে যে আশ্রম থেকে দু' হাজার বছর আগে বক্ষিণ-ভারতে (এবং সত্তবন্ত অস্ত্ররও) বহুজনগোণা প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লেখার খুব প্রচলন হয়েছিল এবং তা সংকৃত কবিতার চেয়ে কম সমাদর পেত না। সপ্তপদীতে সংগৃহীত একটি কবিতার একজন অজ্ঞাতনামা কবি বলেছেন,

অমিমং পাউম-কসং পটিং পোউং অ মে ন আপত্তি।

কামদল তন্ত-ভক্তিঃ সুপত্তি তে ঐহ ন লক্ষ্যন্তি ৪১২

'দ্বারা অন্ত-সমূহ প্রকৃত কবিতা পড়তে বা শুনতে জানে না, প্রেমের তত্ত্ব চিন্তা করতে তারা লক্ষিত হয় না কেন?'

বস্তত, এখনকার মতো তখনও অধিকাংশ লোক নিজেদের মুখের ভাষার লেখা কবিতার প্রতিই বেশি আকর্ষণ বোধ করত, এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। নতুবা একজন রাজা সংকৃতে কবিতা রচনা না করে প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখতে উৎসাহিত হতেন কি না সন্দেহ। এবং তিনি কোটি কোটি গাথা থেকেও তাঁর নির্বাচন সংকলিত করবার সুযোগ পেতেন না।

হালের সংকলিত গাথাগুলির থেকে অঙ্গু ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত তাম্রকাদিক বহু রীতিনীতির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই সে-সময়কার অঙ্গু ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের ভৌগোলিক সীমানারও একটা ইঙ্গিত মেলে। 'সপ্তপদী'র কবিতাগুলির মধ্যে উত্তরাংশের হিমালয় পর্বত বা গঙ্গা প্রকৃতি নদীর নাম একেবারেই পাওয়া যায় না; কিন্তু বিভ্রাটপর্বত, গোদা বা গোদাবরী, নর্মদা বা রেবা এবং ভাদ্রী নদীর নাম বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই 'সপ্তপদী'র অঙ্গুভূক্ত কবিতাগুলি আঞ্চলিক কবিদের লেখা বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, কবিতাগুলিতে বর্ণিত সমাধ-চন্দ্র ও কৃষ্ণ-গোদাবরীর মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগের সমাধ থেকে আহরিত। কবিতাগুলিতে বর্ণিত পরিবেশ ও

গ্রন্থপরিচয়

পাত্রপাত্রীদের থেকে এতপ অহুমান হওয়া স্বাভাবিক যে তখনও কাব্যের উপকরণ নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্য-বিশাশে সীমাবদ্ধ হয নি।

গাথা-সপ্তপত্তীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল কবিতারই নাটক-নাটিকা গ্রন্থবাসী দূরক-দূরতী অথবা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। কবিতাগুলির মধ্যে যে-সমাজের ছবি পাওয়া যায়, তা কৃষিপ্রধান পল্লীসমাজ। চরিত্রগুলির অধিকাংশই পায়র-পায়রী (চারী-পরিবার), হালিক ও গ্রামবী (মোড়ল)। পল্লীবাসী সাধারণ গৃহস্থেরও উল্লেখ আছে। দক্ষিণ-ভারতের গ্রাম, ক্ষেত, পথঘাট, দেবদেবী, আচার-ব্যবহার, গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের স্বাভাবিক-স্বভাব, ধর্মবুদ্ধি, চরিত্র ও আচরণ সব্বদে বহু বর্ণনা এবং উল্লেখ 'সপ্তপত্তী'তে থাকলেও সমুদ্র, নগর, নাগরিক জীবন, বর্ণাশ্রম অথবা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি প্রভাবিত আচার-ব্যবহার ও নিষ্ঠা-নিয়মের বর্ণনা এখানে একেবারেই পাওয়া যায় না। মনে হয়, তখনও দক্ষিণ-ভারতে নাগরিক সভ্যতা তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি, এবং ব্রাহ্মণ্য নগরে অধিষ্ঠিত থাকলেও নাগরিক সভ্যতা এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর নিষেধ ও আচার অনুসাধারণের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

হালের কাব্যসংকলন 'সপ্তপত্তী' যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল, এর বশেষে প্রমাণ আছে। হালের গ্রন্থের অধিকরণেই পোষকনাচার্যের 'অর্থাসপ্তপত্তী' সংকলিত হয়েছিল বলে পত্রিকার অহুমান করেন। এ ভিন্ন 'অমর-সত্যক' ও পরবর্তী কালে রচিত 'বিদ্যারী সপ্তপত্তী'তে হালের সংগ্রহে প্রাপ্ত কাব্যের তেতি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী অনেক কাব্যও হালকে অহুসরণ করে রচিত বা গ্রন্থিত হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন।

'সপ্তপত্তী'র কবিতাগুলি আর্থ্য ভেদে নিবিড়। এ-ছন্দে প্রথম ও তৃতীয় পাদে বারো মাত্রা, দ্বিতীয় অষ্টাদশ ও চতুর্থ পদকল মাত্রা থাকে। ছুটি মাত্রা পংক্তিতে আখ্যগুলি যুগলক। প্রাক্তে এই আখ্যকে গাথা বলা হয়। গাথার ধ্রুপদিসের তৎকালীন কবির। কিন্তু হালর হালর বর্ণনা দিয়েছেন ও ইতি-বাতনার সাহায্যে কিন্তু রসপূর্ণ করতে পেরেছেন তা সভ্যই বিশ্বয়কর।

'সপ্তপত্তী'র প্রায় সমস্ত কবিতাই যৌবতার আদি-রশমিক। দূরক-দূরতী থেকে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া দলদেরই প্রেমের কথা কবিতাগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। নানারূপ অভিধার-সংকেত, প্রেমাবেগ, মিশন ও বিবহ বর্ণনা, অপূর্ণ প্রণয়ের দুঃখ ও সন্তোষের মানন্দ, অবৈধ প্রণয়ের ছলা-কলা, এই সবই কবিতাগুলির প্রধান বিষয়। সংস্কৃত কবিতা প্রায়শ নারীসেহ ও প্রেমসন্তোষ বর্ণনায় নির্লজ্জরপে প্রসঙ্গত। 'সপ্তপত্তী'র গাথাগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এক হিসেবে প্রাপ্ত কবিতাকে সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তুলনার অনুসাধারণের কাব্য বলে বর্ণনা করা যায়। সংস্কৃত কাব্য এখন নগরে স্বাধুপুঠপোষকতার বহু অলকার ও শিল্পাত্মক বিহীন হতে উচ্চশিক্ষিত নাগরিক ও বিশদ অভিজ্ঞতাবর্ণের মনোরঞ্জে ব্যাপ্ত ছিল, তখন পল্লী ও জনপদবাসী কবির প্রাপ্ত ভাষায় প্রাপ্তভবনের ক্ষত তাদেরই জীবন ও মনের কথা সহজ স্বরে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। সংস্কৃতের দীর্ঘ সর্গবদ্ধ কাব্যের তুলনায় এই ছোট ছোট গীতিধর্মী প্রাপ্ত কবিতাগুলি আধুনিক যুগে অনুসাধারণের চিত্তকে যে বেশি আকর্ষণ করবে এটা স্বাভাবিক। কারণেই বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত কবিতার চর্চা হলে এবং তা পঠন-পাঠনের হযোগ হুবিধা পাওয়া গেলে এ-কবিতাগুলির লহম শৌখণ কাব্যরসিক পাঠক সমাজে খুবই সমার লাভ করার সম্ভাবনা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণ ভারতীয় পাঠকের পক্ষে এ হযোগ কমই আছে। যদিও প্রাচীনকালে প্রাকৃত কবিতার বহু সংকলন নানা সুরে গ্রন্থিত হয়েছে, তবু এতদিন পর্যন্ত তার কোনোটিরই প্রাণেশিক ভাবায় কোনো অধুবাৎ হয় নি। প্রাকৃত কবিতার প্রধান সংকলনগ্রন্থ 'গাথা-সপ্তশতী'র ব্যাতি ও জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত হলেও এতাব্যকাল কোহলী কাব্যপাঠকের পক্ষে এহু রূপাধারন করার কোনো উপায় ছিল না। হুবিখ্যাত জর্মান পণ্ডিত জেবর (Weber) 'সপ্তশতী'র একটি জর্মান সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেটি সাধারণ ভারতীয় পাঠকের অবিগম্য ছিল না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের 'নির্ঘণ-সাগর প্রেস' থেকে গঙ্গাধর ভট্টের টীকা সম্বলিত 'সপ্তশতী'র একটি ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইট সম্পাদনা করেছিলেন কেশবনাথ ও বাহুবৈব শর্মা। এরা অল্পখর থেকে সংস্কৃত টীকা ও সংস্কৃত ছাড়া সম্বলিত দুটি পুঁথি, আলোচ্যের একটি পুঁথি ও কোটার একটি পুঁথি, এই চারটি পুঁথির থেকে তাঁদের গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এই পুঁথিগুলির কোনোটিই অতিশুদ্ধ ছিল না, একথা সম্পাদকের স্বীকার করেছেন। শুধু, বঙ্গাধারা শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করে এবং গঙ্গাধর ভট্টের টীকা ও গাথাগুলির সংস্কৃত অর্থবাদ ও মন্তব্যাদি পরিবেশিত করে সম্পাদকেরা। এই গ্রন্থটিকে সংস্কৃত পাঠকগণের অবিগম্য করেছিলেন। ১৯৩০ সালে ওই 'নির্ঘণ-সাগর প্রেস' থেকেই অল্পখরের ভট্ট মধুনাম্ব শাস্ত্রীর একটি দীর্ঘ সংস্কৃত ভূমিকা এবং তাঁর স্বরচিত 'ব্যাক্য-সংকথা' ব্যাখ্যা সংবলিত, 'গাথা-সপ্তশতী'র আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় এ-সংস্করণটিরও ব্যাখ্যা ও ছাড়া সংস্কৃতই রচিত বলে সংস্কৃত পণ্ডিত ভিন্ন অঙ্গের পক্ষে এর মধ্য দিয়ে 'সপ্তশতী'র রূপাধারন করা সম্ভব ছিল না। 'ব্যাক্য-সংকথা' নামে একটি আধুনিক টীকা রচনা মধুনাম্ব শাস্ত্রী অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, তবু ইনিও গঙ্গাধর ভট্টকে অহুসরণ করেছিলেন বলেই মনে হয়।

মধুনাম্ব শাস্ত্রীর নিজস্ব টীকা বাগ বিলে 'গাথা-সপ্তশতী'র আরো আঠারোখানা টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। কেশবনাথ ও বাহুবৈব শর্মা তাঁদের চারখানি আদর্শ পুঁথির একটিতে কুলবালম্বের টীকা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে টীকা তাঁরা প্রধানভাবে গ্রহণ করেন নি। এর পর লাহোরে হরিতান্ত্র-পীতাম্বরের 'গাথা-সপ্তশতী প্রকাশিকা' নামে একটি এতাব্য অপ্রকাশিত টীকা আবিষ্কৃত হয়, এবং মধুনীলাল শাস্ত্রী কঙ্ক সম্পাদিত ও একটি ইংরেজী ভূমিকা সংবলিত হয়ে ১৯৪২ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় পীতাম্বরের এই অবাবিষ্কৃত টীকার পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়েছিল। চতুর্থ শতকের শেষ পনেরটি, পঞ্চম শতক সম্পূর্ণ, ষষ্ঠ শতকের ৫৫টি এবং সপ্তম শতকের ২৮টি মাত্র গাথার টীকা এই পাণ্ডুলিপিটিতে ছিল। কাজেই এতাব্য কাল প্রধানত গঙ্গাধরের টীকাই প্রচলিত আছে, এবং অত্রাট টীকার মধ্যে কতকগুলি গোপীনাথ কবিরাজের মতে "really good and useful" হলেও আধুনিক ব্যাখ্যাতারা কেউই সে সব টীকা গ্রহণ করেন নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে জেবরের জর্মান সংস্করণ বিলে আধুনিককালে প্রকাশিত 'গাথা-সপ্তশতী'র দুখানি সংস্করণই সংস্কৃতে রচিত। অতএব জর্মান বা সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপন্ন না হলে এই উপায়ে কৌশল-গ্রন্থের রূপাধারন করা কোনো ভারতীয়ের পক্ষেই এতকাল সম্ভব ছিল না। এ-গ্রন্থের কোনো ইংরেজী সংস্করণও এতদিন প্রকাশিত হয় নি। একারণে সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক জীরাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের সংস্কৃত ছাড়া এবং বাংলা টীকা ও গঙ্গাধারন সম্বলিত গাথা-সপ্তশতীর সংস্করণটি বাঙালী

গ্রন্থপরিচয়

কাব্যোৎসাহীদের কাছে প্রাচীন সাহিত্যের একটি সরল ও অপরিচিত অংশের বারোদশটন হয়ে দিল। অধ্যাপক বলাক তাঁর সংস্করণটিতে পূর্ববর্তী সম্পাদকদের অনেক ভ্রান্তি সংশোধন করেছেন। এই তুল্য প্রধানত কবিগণের নামকরণেই ছিল। এ ডির একটি তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ অবতরণিকার অধ্যাপক বলাক হাল-সপ্তশতী-বর্ণিত বেশের অবস্থান; এর কাল; এতদসম্বন্ধে গাথাগুলির থেকে প্রাপ্ত নানা ভৌগোলিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যবহারিক তথ্য; সামাজিক ও অর্থশাস্ত্রবিবরণ নানা রীতিনীতি; সপ্তশতীর সমকালীন বা তৎপূর্ববর্তী কালের দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত ধর্ম, বর্ণন ও দেবদেবী পূজারি সংস্কে বহু তথ্য এবং আরো অনেক কৌতূহলপ্রব ও জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশিত করে গ্রন্থটিকে ছত্রি, পণ্ডিত ও সাধারণ পাঠক সকলেরই শিক্ষণীয় ও মনোরঞ্জনরূপে গঠিত করেছেন।

অধ্যাপক বলাকের গ্রন্থের সূচকে সব চেয়ে প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য কথা এই যে অতি-প্রাচীন প্রাকৃত কাব্যকোশ 'গাথা-সপ্তশতী'র এইটিই প্রথম প্রাশ্ননিক ভাষ্য সংগ্রহ। কাব্যগ্রন্থ বাঙালী পাঠকের কাছে এই অমূল্য গাথা কোষখানির রূপ অগ্রহণযোগ্য করে দিয়ে অধ্যাপক বলাক বাঙালী মায়েই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

বইখানিতে বলাক মহাশয় প্রথমে বাংলা হরফে মূল প্রাকৃত গাথাটি, তৎপর ছন্দোবন্ধে সংস্কৃত অগ্রহণ, অতঃপর গড়ে বাংলা অগ্রহণ এবং পরিণেয়ে টীকা সন্নিবেশিত করে সংস্কৃত বা প্রাকৃত অনতিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও দুর্বোধ্যতার কোনো অবকাশ রাখেন নি। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সংস্কৃত ও বাংলা ছাড়াই রূপোপভোগের সম্ভাবক হতে পারে, টীকার প্রয়োজন তার কাছে সামান্যই। বিশেষ করে শব্দকোষেই ধ্বন বক্তব্য, ভাব বা ইঙ্গিত সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয় না। কিন্তু স্পষ্টই যোগ্য। যাহা যে, হাল তাঁর নির্বাচনে যে-আবর্ন বা নীতিই গ্রহণ করে থাকুন না কেন, পূর্ববর্তী পণ্ডিত ও টীকাকারেরা মনে করতেন যে এর প্রায় সবগুলি কবিতাই প্রবরের (প্রধানত অবৈদ) অস্পষ্ট বা অনতিস্পষ্ট ইঙ্গিত অথবা শব্দভ্রান্তক। টীকাকারগণ তাই আপাত-সহর কবিতাগুলিরও অস্তরালে গুঢ় ও সরল কোনো প্রবরব্যক্তনা আবিষ্কার করে, তাই পরিবেশন করতে অগ্রসর হয়েছেন। যত লঙ্ঘন করার মধ্যে যত গুঢ় সংস্কৃত তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, ততই যেন তাঁরা অধিক কৃত্তিম অর্জন করতে পেয়েছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যের প্রাচীন টীকাকারগণের আনিসের নিকে এই আত্মত্বিক ষোক আধুনিক বিদ্যার কচিৎসংগত বা স্রীতিপ্রব মনে হয় না, বরং বহু ক্ষেত্রে মূল কাব্যের সংগ্রহ দৌলধিক ক্ষুর করে বলেই মনে হয়। যেমন, নিম্নলিখিত কবিতাটি একটি হুম্বর উপহার মধ্য দিয়ে একটি প্রাকৃতিক নৃত্যের বর্ণনা বলেই পাঠকের পক্ষে গ্রহণ করা স্বাভাবিক।

বোধিস-মচিত কবিতাটি এই :

উচ্চ নিমল-নিমল্যা ভিসিণী পত্নিয রেহই বলাখা।

নিমল-মরগম-ভাষ্য-পরিট্টিয়া সংখ-স্রুতিক্স।

যার পড়াহুবা কহা চলে—

যেখো নিমল বক বলে আছে পরম্পর 'পরে।

যেন মরকত খালায় শুভ্র শম্ব বিরাগ করে ১১৩

এই কবিতাটি বাখ্য। করে টীকাকার বলেছেন : "সংস্কৃতস্থান পরপুলিনে নাথকের অনাগমন লক্ষ্য করিয়া

নাট্যিকার উক্তি।" সত্ত্বন্ত এ-আতীষ চীকার উপর ভিত্তি ক'রেই মথট্রট তাঁর "কাব্যপ্রকাশে" ধ্বনি-পরম্পরার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মতে নিম্নলিখিতরূপে বকের অবস্থান ঘরা: নির্জনতা, এবং তথ্যরা স্থানটির অভিনায়যোগ্যতা সূচিত হয়ে কবিতাটিতে অভিনায়-সংকেত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক পাঠকের মনে হতে পারে যে, কবিতাটিকে স্বভাবোক্তি মলংকারের একটি স্থলর দৃষ্টান্ত হিসাবে নিতেই বা বাধ্য কি?

এ-প্রসঙ্গে আরো একটি গাথা উল্লেখযোগ্য। ঐচৈতন্ত্যচরিতামৃতের মধ্যাঙ্গীয়ার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাম নীচের গাথাটি উদ্ধৃত করেছেন:

কইঅব-বহিঅং পেঙ্গং নহি হোই মাহুবে সোএ।

জই হোই কঙ্গ বিরহো হোজমি কো জিমই।

চলনা-চাতুরি বিরহিত প্রেম পৃথিবীতে নেই সে তো।

থাকলে বিরহ হত না নতুবা বিরহে জীবন যেত ১৩১৪

—সাঁথ।

এই গাথাটি সপ্তশতীর দ্বিতীয় শতকে সামান্ত পরিবর্তিত আকারে (প্রথম পংক্তিতে 'মামি' সোধান বৃদ্ধ রূপে) পাওয়া যায়। এর ব্যাখ্যায় চীকার বলেছেন, "পতির প্রেম সত্ত্বন্ত কৃত্রিম এই আশঙ্কা করিয়া প্রোথিত-ভট্টকা বমণী স্বামীর আগমনে বিলম্ববশত: মাতুলানীর নিকট বন:কষ্ট নিবেদন করিতেছে।" এখন, এই কবিতাটির উপভোগের দ্বারা ঐচ্ছিক ব্যাখ্যায় কি প্রয়োজন আছে? বরং প্রেম সত্ত্বন্ত একটি সাধারণ মর্মশালী উক্তিকে বিশেষ ঘটনা বা উপলক্ষে সীমাবদ্ধ ক'রে এর বলকে বর্জিত করা হয়েছে বলেই তো। সাধারণ পাঠকের ধারণা হবে। চৈতন্ত্য-চরিতামৃতকারও এই উক্তিটিকে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থেই নিয়েছেন এবং বলেছেন—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাহ্নব হেম

সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।

বাই হোক, পাঠক-সাধারণের বিচারের অঙ্গ, এবং কিন্তু স্থলর স্থলর কবিতা এই গাথা-কোশটিতে ছড়িয়ে আছে তাঁর উদাহরণস্বরূপ আরো কয়েকটি গাথা উদ্ধৃত করা গেল—

জেন্তিম-বক্তা তাঁরই নিম্নোক্ত দেখে জেন্তিম পণহং।

এ অণো বিপিনন্ত-পসম-দুষ্ক-সহণ-ক্বেয়া সন্ধ্যা।

নি:শেষভাবে বটটুক প্রেম বহা যায় শুধু সেটুক সিহো।

প্রেম-বিরতির বেদনা বহিতে সকল লোকেই পারে না প্রিয় ১৩১৭

—হৃদয়ীল।

উষ পোশরাম-মরণম লংলিমা বহ-অলাও ও-অরই।

বহ-সিরি-কষ্ট-বটটুক কষ্টিয়া কষ্ট-দিক্খোলা।

আকাশের থেকে উড়ে নেমে এসে এক তাঁক টিঙ্গাপারি।

নভোলক্ষ্যার গলা থেকে বলা মরকতমালা নাকি ১৩১৮

—নাম অজ্ঞাত।

সো পাম সংভরিষ্যই পব্‌ভসিও জো স্বপং পি দ্বিঅসাই ।
 সংভরিষ্যসং চ স্বপং গ অং চ পেঅং নিরালম্‌বং ॥
 ছন্দর থেকে যে কখনো হারায় কথা ওঠে তারে মনে রাখার ।
 প্রেম হয় হবে স্বরণযোগ্য অবলম্বন হারায় তার ॥১২৫

—বাণ (বধ ?) ইত্যম্ ।

হসি এহিঁ উবাসন্ত। অচ্‌পচারেহিঁ বিজ্জিঅসাইং ।
 অংহুহিঁ মণপাইং এসো মগ্‌গো হুমহিলাপং ।
 হাসি দিবে ভংগনা, বাধা পেয়ে দেখানো অধিক প্রীতি ।
 অচ্‌কটুণ রচনা, মানিনী কুল-ললনার রীতি ॥১২৬

—নাম অজ্ঞাত ।

হসিঅং অবিহুঁই-মজ্জং ভমিঅমণিঅসং-সেহলী-সেসং ।
 দিহুঁইমণ্‌কুণ্ডিও-মুহং এসো মগ্‌গো কুল-বহুণং ।
 হাসিতে দস্ত হবে না প্রকাশ, ভ্রমণে সেহলী হবে না পার ।
 মর্শন-কালে মুখ নীচু হবে, কুলবধূদের এই আচার ॥১২৭

—নাম অজ্ঞাত ।

বাস্যাই কিং ভণিঅউ কেত্তিঅং-সেজ্জং ব লিক্‌খএ সেহে ।
 তুহ বিরহে অং দুক্‌খং ভঙ্গু ভুং চেঅ গহিঅখো ।
 কথা ব'লে আর ভিট্টি লিখে লিখে কেনে বোঝাব কী যে ।
 তুমি ছাড়া কত দুঃখ আমার যদি তা না বোঝো নিজে ॥১২৮

—নাম অজ্ঞাত ।

জ্ঞেণ বিণা এ অবিজ্জই অণুণিঅসো কআবরাহোবি ।
 পত্তে বি পমরহাহে ভণ কস্সো এ বরহো অণ্‌গী ॥
 যারে বিনা এই জীবন বিফল সব সোধ ক্ষমি তার ।
 আঙনেরে বলো কে না ভালোবাসে, হোক গ্রাম ছারখার ॥১২৯

—গোহা ।

এহিসিং তুমং স্তি পিসিং ব অণ্‌গিসিং জামিনীঅ পচবন্তং ।
 সেসং সংভাব-পরকসাই বরিসং ব বোলীপং ।
 অর্ধরাত্রি জেগে কেটে গেল নিমেষে প্রিয়ার-প্রতীক্ষায় ।
 এলো না সে তাই বাকি অর্ধেক আগরণে কাটে বর্ষপ্রায় ॥১৩০

—অন্ন ।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে আশা করি একথা স্পষ্ট হবে যে 'গাথা-সপ্তশতী'র সমগ্র কবিতাই অতিমাত্রায় প্রেম-প্রগল্ভ নয়। তবে, টীকাকারগণ সম্ভবত তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রায় প্রত্যেকটি গাথার মধ্যেই প্রেম-বাত্তনা আবিষ্কার করার চেষ্টা করায়, এবং সেই প্রেম-সন্তোষের কথাই বেশি ক'রে পরিচুত করতে সচেষ্ট হওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতাগুলি অতিমাত্রায় erotic ব'লে ধারণা স্ফূর্তে পারে। অধ্যাপক বলাক তাঁর অনুবাদ ও ছাড়া-রচনায় গাথার উট্টেই অগ্রসর করেছেন, তাঁর ব্যাখ্যা বা টীকার গুরুত্বভাষা অল্প ক্ষেত্রেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো স্থলে তিনি কুলবালনেবের টীকা ও পীতাম্বরের টীকা উল্লেখ করেছেন সত্য, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা করেন নি। অধ্যাপক বলাকের গভীর পাণ্ডিত্য সর্বত্র অবিসৃত। তিনি যদি সেই পাণ্ডিত্যের প্রয়োগে এ-টীকা ও ব্যাখ্যাগুলিকে বিচার করতেন, অথবা অন্তত টীকার সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ করে নিতে পারতেন, তবে আমাদের মতো বহু অপণ্ডিত রূপ-দৃষ্টান্ত পাঠক আরো অধিক পরিমাণে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হত। এ-প্রদর্শে একথাও উল্লেখ করা চলে যে, মূল গাথাগুলি রচিত হওয়ার অনেক কাল পরে আবিষ্কৃত হয়ে টীকাকারগণ সর্বক্ষেত্রেই যে রচয়িতার উদ্ভিষ্ট অর্থ দৃষ্টিগোচর করতে পেরেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া, সংস্কৃতে স্থপণ্ডিত এই পরবর্তী টীকাকারেরা প্রাচীন মহারাষ্ট্র প্রাকৃত ভাষায় আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের মতো দক্ষ ছিলেন কি না কোনো কোনো স্থলে এ সম্বন্ধেও অবকাশ থাকে। কারণেই অধ্যাপক বলাক গাথা-সপ্তশতীর ভাষার দিকটা নিয়ে বিদ্বততর আলোচনা করলে এই সংস্করণটি আরো মূল্যবান হত বলে মনে করি।

'গাথা-সপ্তশতী'র সংস্করণিতা বা রচয়িতা হালের সম্বন্ধে আরো বিদ্বততর আলোচনার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়। সপ্তম শতকের শেষ গাথাতে 'হালেন বিরইআইং' (হালের বার। রচিত) এই কথাগুলি পাওয়া যায়। জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ লুডার্স ও জ্যাকোবি (Luders and Jacobi) দেখিয়েছেন যে এই সাত শ গাথার মধ্যে মাত্র চার শ ত্রিশটি গাথা সকলগুলি সংযোজিত সংস্করণে পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক recension-এ ৭০০ ক'রে গাথা থাকলেও এর মধ্যে ৪০০টি হচ্ছে সাধারণ, অর্থাৎ সকল পাণ্ডুলিপিতেই আছে। এর থেকে 'গাথা-সপ্তশতী'র বর্তমান আকারের মধ্যে বহু প্রক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে অনুমান করা চলে। কীধ, প্রমুখ পাক্তান্ত পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করেছেন যে, যুব সম্রাট প্রথমে বা কবি হালের রচনারই একটি সংকলনমাত্র ছিল পরে তাতে অন্তান্ত কবির কবিতা সংযোজিত হয়ে বহু কবির রচিত সপ্তশত গাথার একটি কোশগ্রন্থ হয়ে পড়ায়। এ প্রদর্শে মনে রাখতে হবে যে, প্রথমত, বইয়ের শেষ কবিতাগুলিতে হাল এ-গ্রন্থটি তাঁরই রচিত বলে উল্লেখ করেছেন; দ্বিতীয়ত, সাত শ গাথার মধ্যে ৩০৮টি মাত্র গাথার রচয়িতার নাম পাওয়া গেছে, বার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক (চুয়ালিশটি) গাথাই হালের রচনা; এবং ৭০০-র মধ্যে ৪০০টি গাথাই মাত্র সাধারণভাবে সকল পাণ্ডুলিপিতে (recension-এ) পাওয়া গেছে, অতএব অন্তঃগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বারা সংযোজিত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া চলে। সুস্পষ্ট ও জ্যাকোবি-র কথা সম্পূর্ণ মেনে না নিলেও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মূল গ্রন্থ রচিত বা সংকলিত হবার অনেকদিন পরেও এই কোনো বহু পরবর্তী গাথা সংযোজিত হয়েছিল।

এ-ছাড়া গাথা 'সপ্তশতী'র ভাষা এবং যে আকারে এখন গ্রন্থটি পাওয়া যায় তার কাল সম্বন্ধেও বিদ্বততর

গ্রন্থপরিচয়

আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল। 'সপ্তশতী'তে যে মহারাষ্ট্র প্রাকৃত ব্যবহার হয়েছে, তাকে ভাষাতত্ত্ববিদেরা অতি প্রাচীন বলে মনে করেন না। সমসাময়িক কালে মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে রচিত শিলালিপিশৃঙ্গির ভাষায় গবে তুলনা করলে সপ্তশতীর প্রাকৃত অপেক্ষাকৃত অর্ধাচীন বলে মনে হয়। অধ্যাপক বলাক এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "প্রাচীন মহারাষ্ট্রবিশেষ নান্যেট ও নাসিকাদির তুহামন্দিরসমূহে প্রাপ্ত পোষিত শিলালিপির প্রাকৃত ভাষা ও হালগড়লিত সপ্তশতীর মহারাষ্ট্র প্রাকৃত ভাষার মধ্যে যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহার কারণ গণ্যে অনাবের এই মত যে, একই সময়ে অনাধাঃগণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে শিলালিপিসমূহের প্রাকৃত গড়-রচনাতে প্রাচীন রীতির (অর্থাৎ প্রায় পালিভাষা সঙ্গ) ভাষাই ব্যবহৃত হইত, এবং পণ্ডিত মহাশয়ে ব্যবহৃতব্য স্থিতি ও অস্ত্রান্ত গড়ময় রসকাবেয় রচনাতে ব্যাকরণগত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই অত্রই হাল-নরপালের সমসাময়িক এবং তাঁহার কিছু পূর্ববর্তী ও কিছু পরবর্তী শতাব্দীসমূহের শিলালিপির প্রাকৃত ভাষা সপ্তশতীর প্রাকৃত ভাষা হইতে এতট। বিভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হয়।" কিন্তু অধ্যাপক বলাকের এ-স্থিতি পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণ নেনে নেবেন কি না সন্দেহ। কেননা, 'সপ্তশতী'তে মহারাষ্ট্র প্রাকৃতে যে দুপটি পাওয়া যায় তা পরবর্তীকালের শিলালিপির ভাষায় চেয়ে অর্ধাচীন বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। সকল দিক বিচার করে লুজার্ণ ও অ্যাকোবি মনে করেন যে ২০০ থেকে ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে 'সপ্তশতী' তার বর্তমান আকার লাভ করেছিল।

এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতি শতকের শেষ গাথাটিতে 'সিরি-হাল' (ঐহাল), 'কই বজল' (কবি-বংসল), প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়, কিন্তু নরপতি হাল বলে কবি কোথাও ভণিতা দেন নি। 'কবি-বংসল' গ্রন্থে স্তববিশেষে দ্বারা এই গাথাকোশ নিমিত্ত হয়েছিল, গ্রন্থ থেকে এ কথাই মাত্র জানা যায়। 'সপ্তশতী'র একটি দ্ব্যর্থবোধক গাথাতে (৫১৭) আপন কুলের উন্নতিবিধায়ক এক সাতবাহন বা শাপিবাহন -বংশীয় রাজার (সালাহৎ-পরিষো) প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু তাঁর নাম যে হাল ছিল, কিংবা তিনিই যে গাথাকোশের সংকলয়িতা এখন উল্লেখ নেই। সাতবাহন বংশের এক রাজার নাম হাল ছিল এ কথা সত্য হলেও, তিনি এবং গাথা-রচয়িতা কবি-বংসল হাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কি না, তা পণ্ডিতদের বিচার। তবে হাল নরপতির আবির্ভাবকাল ও গাথা-সপ্তশতীর ভাষা বিচার করে হাল-নরপতির মূল গ্রন্থ পরবর্তীকালে বহু সংযোগ ও প্রক্ষেপাবির দ্বারা পুষ্ট হয়ে বর্তমান আকার লাভ করেছিল বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

যাই হোক, অধ্যাপক বলাক তাঁর গ্রন্থের অবতরণিকায যে প্রচুর তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন, তার দ্বারাও বর্তমানে এ-জাতীয় বহু প্রশ্ন উপাধনের হযোগ ঘটবে। এই অতি প্রাচীন প্রাকৃত কাব্য-সংকলনের প্রথম প্রাথমিক সংস্করণের সম্পাদক হিসাবে অধ্যাপক বলাক যে অত্যন্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা ভাষন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহু পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের দ্বারা যে রত্নভাণ্ডার তিনি আমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন, পরবর্তী সংস্করণে আরো তথ্যপ্রমাণ ও আলোচনাদি যোগ করে তাকে সম্পূর্ণতার আকারে তিনি উপস্থিত করবেন বলে আশা করি।

প্রকাশকের প্রতি নিবেদন এই যে, বইটির ছাপা ও কাগজ আশাহতগত উৎকৃষ্ট হয় নি, এবং ছাপা মিহলও নয়। এ-জাতীয় গ্রন্থে ছাপায় তুল থাকা অব্যাহনীয়। এ-ভিন্ন, প্রতি পৃষ্ঠায় গাথা-শতকের

উল্লেখ না থাকতে প্রয়োজনীয় গাথা খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এ-সকল একটি সংশোধিত হলে বইটির মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

অম্বিত দত্ত

পিছু ডাকে। দ্বিত্তেন্নাথ চক্রবর্তী। শান্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা ২। মূল্য তিন টাকা।

‘পিছু ডাকে’ বইখানার কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই মৃত্ত হইয়া গেলান। পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে অনেক কাল পরে দেখা হইলে যেমন মাঝখানকার সময়টা হঠাৎ লোপ পায় তেমনি ঘটিল। বইখানা আরো মন দিয়া পড়িবার ক্ষমতা তৈয়ারি হইয়াছি, এমন সময়ে সেদিনাম বে কখন খুঁজির উপাত্তে আসিয়া উপস্থিত। শেষ পাতা কখনার চক্রগুলি সঙ্গুগতিতে পড়িয়া চলিলাম, পাছে শেষ হইয়া যায়। এত মনোযোগে অবশেষে শেষ হইয়া গেল। একটি আশ্চর্যের দাঁড়বাঁদ পড়িল— ইতিমধ্যেই শেষ! তখনই আবার শাসনা পাইলাম— আবার পড়িলেই চলিবে। পিছু ডাকে বার বার পড়িবার মতো বই। এমন কথা কথানা বই সম্বন্ধে বলা চলে?

বই তো শেষ হইল, কিন্তু এখান কোন্ শ্রেণীর বই? উপক্লাপ গল্প নিষ্ঠুর নয়, কাহিনীর ধারাবাহিকতা নাই; প্রবন্ধ বা ইতিহাস নয়; ভঙ্গীস্বৰ্ণ ক্ষীণবক্তব্য রসায়নচর্চা নয়। তবে কি? বইখানাকে কোনো শ্রেণীতে ঘনিষ্ঠে ফেলিতেই হয় তবে ইহাকে এক শ্রেণীর পুথান বলা চলে: পৌরাণিকের পুথান। সংস্কৃত পুথানগুলিতে কি নাই? গল্প কিম্বদন্তী ইতিহাস ভূগোল গভীর জ্ঞানের কথা ও নিত্যজ্ঞ হেলেমাছুবি বিষয় সবই আছে— অথচ কোনোটাই আশায়া হইয়া নাই, সবস্বচ্ছ মিলিয়া একটি বিশিষ্টরূপের আধারে আছে। পিছু ডাকে বইখানাতে পুরাণের এই গুণ বা ধর্ম থাকতে তাহাকে পুথান বলিলাম।

দেশবিভাগের পরে ছেড়ে-আসা গ্রামগুলিকে অবলম্বন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে একটি বৃহৎ পিছু-ডাকা সাহিত্যসাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলিও পুথানশ্রেণীর রচনা। তন্মধ্যে ভালো মন্দ থাকারি সব রকম গ্রন্থই আছে। বর্তমান গ্রন্থও তাহাদের অন্ততম। তবে প্রভেদ এই যে, পিছু ডাকের প্রেরণার মূলে দেশবিভাগগত ইতিহাসের বেরনা নয়। যে-বালক খটনাচড়ে শৈশব ও কৈশোরের লীলাকুসুম ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে তাহারই স্মৃতিবেদনায় বইখানার স্মৃতি-প্রেরণা। তাই এ বইটিতে রাজনৈতিক চাপা তর্জন একেবারেই নাই। সেদিনের বালক-কিশোর বাঁধা দেখিয়াছে আশ্চর্য্যের দিনে পকাশোত্তোর্য্য প্রোড় তাহা বলিতে বসিয়াছে। যে ছিল দর্শক সে হইয়াছে কথক। সে নায়ক নয়। নায়ক নীলানবী-ভীরবর্তী ধানসোনা গ্রাম।

পিছু ডাকের প্রকৃত নায়ক নীলানবীর ভীরবর্তী ধানসোনা গ্রাম, কিংবা আরও বিস্তারিতভাবে বলিলে ধানসোনায় সর্বজন— বইগনিব নায়ক। নায়ক ধানসোনার সর্বজন। ঠাট্টা ও বক্তা আনন্দ মণ্ডলের শিষ্য একটি বালক-কিশোর। তাহার দর্শনের ও অহুত্বের দ্বারা সর্বজনের জীবনকাহিনী জোড়াবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ড শিল্পকর্মে পরিণত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই বইখানার কঠোব্য ও নকশা। কাজেই ইহাকে পুথান পর্থাৎ ফেলিতে হয়— গভাঙ্গতিক অর্থে গল্প বা উপক্লাপ বলা চলে না।

গ্রন্থপরিচয়

কিন্তু তাই বলিয়া বইখানার আকর্ষণ কম নয়—দুরন্ত পাছাড়ি নদীর মোতের ভোড়ে পাঠককে দ্রুত পরিণামের মুখে লইয়া যায়। একটির পরে একটি অধ্যায়ে চিত্রের পরে চিত্র, কাহিনীর পরে কাহিনী আসে, সর্বমুখের জীবনযাত্রার স্বথদ্ভুগমোতের উপরে কেনার মতো জাসিয়া গঠে, হাসি-অশ্রুর ঝললো কণকালের জন্ত চোখ খাঁধাইয়া দিয়া। পরবর্তী কেনস্তবকের দ্রুত আসার ছাঁড়িয়া দেয়।

নিমিষুড়ি, কেইসদাঁর কর্তৃক ‘হৃদির হৃদে’ দ্রুত নিমিষুড়ির পা খোঁচাইয়া দেওয়া; নিমিষুড়ির তাত্ত্বিক পুত্র ডানচন্দ্র ও তত্ত্ব প্রকৃতি হিমি, গেহু চক্রবর্তী, কতুর গ্রহিবারের জমিদারি অভিনয়, শিবচরণ উট্টাগাধ ও তাহার কস্তা বাহু, বাহুর কবলচক্র গোপাল ও শমু, সেবনাথ সর্গার ও শাওতালগণ, ভানৈচাঁর বৈরাগী ও তাহার ছই পত্নী, রাধা ও রাধাকান্ত; মধু চৌধুরীর বেঙ্গাবাহিনী ও অর্পূর রণকোশল, তারানাথ কবিরাজের পায়র বন্ধন—আর সর্বশেষে বালক কিশোরের informal গুরু আনন্দ মণ্ডল। কোনো একখানি পুস্তকে এতগুলি সজীব চিত্রাকর্ষক নরনারীর সমাবেশ নিত্যন্ত বিরল। কোনো বিশেষ অধ্যায়কে চিহ্নিত করিতে হইলে ‘বালক-কিশোরের উলুখড়ের মরীচিকা-বর্ণন, শাওতালগণের উৎসব ও হাব্যার মানসকুহুমদর্শন’ অধ্যায়গুলির উল্লেখ করিতে হয়। অধ্যায়গুলি কল্পনা ও কবিত্বের অদ্রুত ইন্দ্রজাল। লেখকের কলমেই ছাড়তে ধানদানো গ্রামের মুখে পল্লী-বাংলার হাজার হাজার গ্রাম কথা বলিয়া উঠিয়াছে—সে কথা দ্রুতের, সে কথা হৃদয়ের, সে কথা বাঙালীর অস্তরের, সে কথা বাংলার একান্ত নিম্নর। এমন যিনি লিখিতে পারেন তিনি আগে আর লেখেন নাই, এবং পরেও আর লিখিবেন না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

ঐপ্রমথনাথ বিলী

বিজ্ঞানের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড : প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে রোমক সভ্যতা পর্যন্ত। ঐসময়প্রনাথ সেন। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, কলিকাতা। প্রান্তিস্থান এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, কলিকাতা ১২। মূল্য সাড়ে দশ টাকা।

উদযোগী ও তরুণ লেখক ঐযুক্ত সময়প্রনাথ সেন ১৯৭৭-৪৯ সালে ইউনেস্কোর দপ্তরে যখন ‘আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব ও সম্পর্ক’ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও প্রচারকার্যে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন এইরূপ একখানি প্রাথমিক গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা করেন। দৈনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিব্রকোষ রচয়িতা ডক্টর নীতহ্যাম এবং বাংলার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই এই স্বকণ্টক সাধু প্রাথমে লেখককে উৎসাহ ও হৃদোগ দিয়াছেন। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার প্রকাশনে অর্থগাহ্য্য করার কলে বইখানি শতাধিক রেখাচিত্র ও হান্‌স্টোন ব্লকে সমৃদ্ধ হইলেও হ্রু ল্যা হয় নাই।

বিজ্ঞানের সজ্জার সম্বন্ধে নানারূপ মত দেখা যায়। লেখকের মতে অধ্যাপক ক্রাউথারের সজ্জাটি বিশেষ সুস্বোবদনক; বিজ্ঞান এমন-এক ধরনের তৎপরতা যাঁহার সাহায্যে মানুষ প্রতিবেশের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে। এইরূপ ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানচর্চা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইয়াছে বলা যায়। বরতঃ, প্রাগৈতিহাসিক অতীতে আধুনিক মানবের কর্মতৎপরতা ক্রমশঃ কি ভাবে বেশ

ও কাল-পরিবর্তনের কথা দিয়া বোঝান শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল, তাহারই সমাজ আলোচনা সমগ্র গ্রন্থাবলির উদ্দেশ্য। তদ্ব্যতীত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভকালীন রোমক সভ্যতার যুগ পর্যন্ত প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

আদিযুগ বা প্রত্নযুগ প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়, পুরা প্রত্নযুগ ও নব্য প্রত্নযুগ। পুরা প্রত্নযুগে লক্ষ্যাত্মক বর্ষাবাদী অনির্দিষ্ট কাল মাহুয কেবল বিচারের দ্বারা খণ্ড সংগ্রহ করিত, এবং তদ্ব্যতীত পান্থের টুকরা হইতে নিষ্কৃতি ধরনের স্রষ্টা নিবহ পরিভ্রমে প্রস্তুত করিত। দশ হইতে বারো হাজার বৎসর পূর্বে নব্য প্রত্নযুগের আরম্ভে এই সকল স্রষ্টার নির্মাণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রথম দেখা যায়, এবং ক্রমশঃ মাহুয কৃষি পণ্যপালন স্থপিল ও বহনবিদ্যা আদিত করে। এইভাবে খণ্ডযুগের আরম্ভ সমাধান হওয়ায় তখন মাহুয অস্ত্র দিকে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়।

প্রথমে ধাতুর ব্যবহার উদ্ভবযোগ্য। স্বর্ষ তাম্র কাঁচা ও পিতল ব্যবহৃত হয় পাঁচ হইতে সাত হাজার বৎসর পূর্বে। স্বর্ষ আদি হইতেই স্রোতেরে মলঃকারের স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহা স্রষ্টারই স্রষ্টার। কালের অবিকার ও স্থাপত্য। লৌহযুগের আরম্ভ আধুনিক তিন হাজার বৎসরের মধ্যে। চাকার প্রচলন, স্রষ্টারব্যবহার পণ্যক্রিয় ব্যবহার ও নিম্নমিত নবীঃপ্রবাহের দ্বারা সেচব্যবস্থা এই যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

নব্য প্রত্নযুগের শেষে আধুনিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে নীলনদ তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস এবং সিঙ্কুসের উপত্যকায় যে তিনটি বৃহৎ তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই বস্তুতঃ আধুনিক সভ্যতার আদিরূপ। তখন আর মানবপ্রজাতি দুই-পাঁচ কাঁঠা মনিস্থলিত গোষ্ঠিতৎপরতার মধ্যে নিবদ্ধ নয়, মাহুয ভিন্ন ভিন্ন সম্মুখ্যে বিভক্ত ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। এই সভ্যতার প্রধান ভারতীয় নিদর্শনগুলি মধ্যপ্রদেশে ও হরপ্পার আবিষ্কৃত হইলেও বস্তুতঃ এই সভ্যতা উত্তরপশ্চিম ভারত ও গান্ধার উপত্যকায় বহুদূর বিস্তৃত ছিল।

পূর্বাংশে লিপিলিখন একপ্রকার চিত্রাক্ষর ছিল না। সিঙ্কুস-সভ্যতার লিপিক্ষেও আংশিক চিত্র-লিপি বলিতে হয়। দুই-তিন হাজার বৎসর পূর্বে পশ্চিম-এশিয়ার কোনো অঞ্চলে প্রথম বর্ণমালা লিপি উদ্ভাবিত হয়। পূর্ববিকার গণিতে প্রায় সহস্রবর্ষ লাগে। ভারতীয় আর্ধগণ্যতার আদি-লিপি তাম্রী-বর্ণমালা। স্বকীয়তা ও উচ্চারণসৌকর্য্যে এরূপ স্রষ্টার বর্ণমালা অগতে বিরল।

বৈজ্ঞানিক তৎপরতার স্রষ্টা হইতেই মানবজাতির মধ্যে একটি স্রষ্টারনীতি লক্ষিত হয়। যিনি আধুনিক বিজ্ঞান বহুলাংশে ইউরোপীয় শব্দপ্রয়োগ, ভাষা এ কথা কৃষ্ণে চলিবে না যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চার হাজার বর্ষাবিক কাল বিজ্ঞানচর্চা ইউরোপে ও এশিয়ায় প্রায় সমভাবে চলিয়াছে, কখনও মিশর যেরূপ বা গ্রীসে, কখনও আরব পারস্য বা ভারতে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে এই ভারতীয় বিপ্লব হয়, তখন প্রাচ্য মহাদেশে বর্তমান হারাইয়া অতীতকে স্মরণ করে এবং ইউরোপ ক্ষতবেগে উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হয়।

গণিতের প্রবর্তন হয় কৃষিনির্ভর মাহুযের কাল ও ঋতু নির্ণয়ের প্রয়োজনবোধ হইতে। গণনার মধ্যে শূন্যের প্রবর্তন হিন্দুনির্ভর আবিষ্কার। গ্রীক প্রতিভার স্রষ্টা জ্যামিতি অপর উন্নত হয়। মিশরীয়েরা গ্রীকদের প্রধান শিক্ষক, সম্ভবত তাহারাই গণিতের স্রষ্টা। হিন্দুদের গণনাপদ্ধতি মিশরীয়দের দ্বারা

ঐশ্বর্যপরিচয়

দশমিক এবং সবিশেষ উন্নত ছিল। যজ্ঞাহুতানের বিশেষ বিশেষ বেদী নির্মাণের পত্রিকল্পনার ভক্ত বীজগণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ ও উৎকর্ষ ঘটে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদি ইতিহাসেও ব্যাবিলন মিশর ও ভারতবর্ষের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদিক চিকিৎসাপদ্ধতি একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শলাবিজ্ঞান ভারতীয় চিকিৎসকগণ অদ্বৈতপূর্ণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। চৈনিক চিকিৎসকদের হব্যগুণ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। অবশ্য পরবর্তী গ্রীকবিজ্ঞানের উদ্বেগ ও উন্নতি এইসকল প্রাচীন অবদানকে নিশ্চয় করিয়া দেয়।

বর্তমান বাঙালী জাতির দ্বারা প্রাচীন গ্রীক জাতি এক মিশ্র জাতি ছিল। তাহাদের মানবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেবসেবীর স্বাতির পরিবর্তে মানবের ও মানবতার স্বর্গদানে তাহাদের পক্ষপাত। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই গ্রীকদের বিজ্ঞানপন্থিয়া জন্মলাভ করিয়া থাকিবে। তথ্যের পাছাড় স্মৃতি না করিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম ও সৃষ্টিকে অস্বাভাব্য করার চেষ্টা এই জ্ঞানোন্মেষের বৈশিষ্ট্য ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বর্ষকাল এই গ্রীকজাতি অপর উদ্ভীপনার সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানে বাহ্যের জাতীয় লব্ধি করে—গণিত ও পূর্ববিজ্ঞান খ্যালেস, জুগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান আনাক্সিমান্ডাস, জ্যামিতিতে পিথাগোরাস, অ্যুত্রেব লিউসিমাগ ও ডিমোক্রিটাস, চিকিৎসাবিজ্ঞানে হিপোক্রেটিস ইত্যাদি। অ্যাপিস্টল্‌স্‌ আদিও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তানায়কদের মধ্যে গণ্য।

আলেক্সান্দ্রারের মৃত্যুর পর গ্রীকসাম্রাজ্যে গৃহবিবাদ বেধা দেয়, ফলে বিজ্ঞানভারতী জননঃ পুণ্য গ্রীকভূমি ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া নগরে প্রতিষ্ঠিত হন। এই গ্রীক-প্রতিষ্ঠিত নতুন পরিবেশে, বিশেষতঃ টলেমী-সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক বিজ্ঞান পুনর্জীবন লাভ করে, এবং ইউক্লিড জ্যামিতিবিদ্যে হিপার্কাস ইফাটোয়েনিস স্কলিয়ার প্রভৃতি মনোবিগণ বিজ্ঞানের নব সৌধ গড়িয়া তোলেন। আলেক্সান্দ্রারের গ্রীকরাই সম্ভবতঃ প্রথম স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, একই ব্যক্তির দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে চেষ্টা করার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞের পুঙ্খ প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের অধিকতর অগ্রগতি সম্ভবপর।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি আদি গ্রীকদের একপ্রকার আস্থাশ্রি বিমূঢ়তা ছিল। আলেক্সান্দ্রার বিজ্ঞানের যুগে কিছু ব্যতিক্রম বেধা যায় বটে, তথাপি ফলিতবিজ্ঞানকে তাহারা উচ্চ স্থান দেয় নাই। এই বিষয়ে পরবর্তী রোমক সভ্যতা ইহার বিপরীত। বিজ্ঞানের যে বিভাগেরই কিছু ব্যবহারিক শার্ককতা আছে, সেই সিকেই রোমকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলে বেধা যায় গণিতে ও জ্যোতির্বে উনাসোন হইলেও তাহারা স্বাধিকতা স্বাধিকতা ও পূর্ববিজ্ঞান তৎপর, এবং দ্রাবিড় ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কত না হইলেও জনস্বাস্থ্য হাসপাতাল ইত্যাদির পত্রিকল্পনার প্রাচীন জাতিবিরে মধ্যে অগ্রগণ্য।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সহস্রবর্ষব্যাপী গ্রীক, আলেক্সান্দ্রার ও রোমক বিজ্ঞানের ধারাবাহিক অগ্রগতি অশেষকৃত সমিত্রারে আলোচনা করিয়া লেখক প্রধান ধর্মের পরিসরান্বিত করিয়াছেন। এই বর্ষসহস্র বিজ্ঞানের অপাধ্যবের ইতিহাসে অতীত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উদ্বুদ্ধ পঞ্চম ও ষোড়শ শতাব্দীতে নব্যবিজ্ঞানের অত্যাশ্রয় ইহারই মূরেক্ষিত অগ্রবর্তন। মধ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী ইউরোপের অন্ধকারযুগ যুগের ব্যবধান। এই যুগ অশেষ রাজনৈতিক অশান্তি, অচল সামাজিক রীতি ও ব্যবস্থা, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও ক্রোড়নাস-প্রচার কলমে মণীলিপ্ত।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে একটি নিগূঢ় সত্য ক্রমবঙ্গম হয়, বিজ্ঞান সর্বমানবিক সম্পদ, সকল মানুষের কল্যাণে বাধ্যতামূলক পরিপূর্ণ নিয়োগে তাহার প্রধান উৎসর্গ। যখনই এই অহুঃশ্রয়ণীয় বিজ্ঞান বঞ্চিত হইয়াছে, তখনই তাহার অগ্রগতি মন্দ হইয়াছে, কখনও বা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায় আণবিক বোম্বার শত্রুতার যুগেও ইহা সত্য। সত্যের বিনাশ নাই।

জগন্নাথ শুক্ল



বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭

সম্পাদক শ্রীগুপ্তবিনোদী সেন

বিষয়সূচী

গান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
রবীন্দ্রশ্রুতি	শ্রীশিবপ্রসাদেবী চৌধুরানী	
প্রিয়দর্শী অপেক্ষ	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	
কৃত্তবংশ	শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	
যৌকবা মেঘ	শ্রীহরীতিসুন্দর চট্টোপাধ্যায়	
ফল		
অগ্নীশ গুপ্ত	শ্রীপ্রবোধ মিত্র	
দক্ষিণারজন মিত্রনন্দন	শ্রীশীলা মহম্মদ	
অনির্বচন	শ্রীশ্রীশ গাথ	
দেবক্স ও এণ্ডারলিং	শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত	৩৫৮
প্রবাসিচন্দ্র	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	৩৫৩
	শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়	৩৫৭
	শ্রীহরীতিসুন্দর সাগরাল	৩৫৩
ব্যাকরণ-প্রদর্শ	শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র মাইতি	৩৫২
বহুলিপি	শ্রীপ্রদ্বন্দ্বসুন্দর দাস	৩৫৬

চিত্রসূচী

বাণীবাসিনী	শ্রীমদলাল বসু	২৮৩
রবীন্দ্রনাথ, অরেন্দ্রনাথ ও শ্রীশিবপ্রসাদেবী		২৮০
রবীন্দ্রনাথ		২৮২
পশ্চিম-আফ্রিকার ব্রহ্মভূতি		৩২২
ইফে। কর্নেল রেট, ওনি, লেখক		৩২৩
টফের ওনি স্তর আমেসোজি আমেসোজি এবং লেখক		৩২৩
অগ্নীশ গুপ্ত		৩৩৪
দক্ষিণারজন মিত্রনন্দন		৩৩৫
অনির্বচন		৩৩৫

মূল্য এক টাকা



श्रीमद्भागवत
श्रीमद्भागवत



গান^১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কী ধনি বাজে

গহনচেতনা-মাঝে !

কী আনন্দে উচ্ছ্বসিল

মম তম্বুবাণী

গহনচেতনা-মাঝে ।

মনপ্রাণহরা

সুধা-স্বর

পরশে ভাবনা উদাসীনা ॥

১ দ্বিগুণিত বিলি বৈঠকী গানের আবেশে রবীন্দ্রনাথ আত্মবানিক ১০১৮ বঙ্গাব্দে বাংলা গানটি রচনা করিয়া ইতলী অধিগা ট্রাঙ্ককে পিথাইয়াছিলেন। ওহার সৌন্দর্যেই গানের কথা ও ছন্দ পাওয়া গিয়াছে। বিলি গানও ওহার কাছের পাওয়া; নিখুঁত রূপপেত্র ব্যব্যাপাখ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির পরমিতি কর্তৃকই অন্তর্য্য দ্বিত্বিত হইল।—

পূরুষী। আড়াঠেকা

এ ধনি ধনি চরণ পরস্তু

এ আনন্দ সুখ ভরো যেহে তনু মন ।

স্বলভান করা অবি করা

বকন্ত নিঃস্বাসিয়া ॥

আইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

ছেলেবেলা থেকেই আনন্দের গানবান্ধার আবহাওয়াতে বাস্— দেশী বিলিভী ছ'রকমেরই। ঠাকুর-বাংলা সেনতে পাই পুরুষাচর্যে এই ছুই ধারাই অল্পবিত্তর চলে আসছে। ধারা বাংলা দেশের সেকালের সংগীত-ইতিহাসের খোঁজ রাখেন, তাঁদের এই স্মৃতি স্বভাবতই পাথুরেবাটার শৌরীজমোহন ঠাকুরের নাম মনে পড়বে। তাঁর ছেলে প্রমোদকুমার ঠাকুরের রচিত কতকগুলি বিলিভী স্বরলিপিতে লিপিত ও বিলিভী স্বরসম্মিলিত (harmony) দেশী বাগরাগিনীর ছোট গং আনার কাছে এখনও আছে। শৌরীজমোহন বা ছোটসাহার গুরুদাস নামে এক নাতিও সেকালের কলকাতার রকমকে কোনো বৈদিক ত্রোত্রের স্বরলিপি করে গান গাওয়াবার পরীক্ষা করেছিলেন।

আমার বিলিভী সংগীতশ্রীতি অবশ্য লম্বাটো কন্ডেটের শিক্ষাজনিত। সেখানে সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের অর্গানিস্ট, মি: স্ট্রেটারের কাছে পিয়ানো, এবং হান্সাটো নামক একটি ইতালীয় বেহালা-শিক্ষকের কাছে বেহালা শেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনকার কালে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক থেকে গানের ঔপন্যাসিক প্রগ্র এসে পঠানো হত। তাঁর ইন্টারমিডিয়েট পর্ব-পর্বত আদি পাশ করেছিলাম।

রবীন্দ্রস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বিলিভী সংগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা বড়টো আশ্চর্য মনে হতে পারে বস্তুত তা নয়। কারণ তাঁর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সম্মানে আমাদের ভাইবোনের প্রথম পরিচয় হয় বিলাতপ্রবাসে। সেখানে আমমা মায়ের সঙ্গে অস্থান ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিয়ে পৌঁছাই, পরে বাবা ও রবিকাকা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আসেন। সেই সময় থেকেই বিলিভী সংগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং স্নেনেছি তাঁর সুরেলা, স্তোরালো তারসম্প্রকের চড়া গলা থাকে শুধু বলে "টেনর"— স্নেনে শুধু মুখ হত। সে বয়সে অবশ্য এর সুশৃংখলিত রসগ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে,

"Won't you tell me, Molly darling."

"Darling, you are growing old."

"Good-bye sweetheart, good-bye."

প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন। আইরিশ কবি টমাস মুরের Irish Melodies তখন বৃহৎ লোকপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে "The Last Rose of Summer" নামে একটি গান আমি নিয়মিত-বেলায় আধাজন্মের কাগজকে গেয়ে শুনিয়েছিলাম, একটু একটু মনে পড়ে।

রবিকাকা দেশে ফিরে আসার অনতিকাল পরেই কালদ্বন্দ্বা গীতিনাটিকা রচনা করেন। তাতে আর বাস্তবিক প্রতিভাতে কতকগুলি গানের সুরে তাই বিলেতপ্রবাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। কতকগুলি গানে ধূধা বা কোরালের প্রবর্তনকে বিলিভী গানের পরোক্ষ প্রভাব বলা যেতে পারে। যেমন "অনগনমন অধিনায়কে"র "জ্য যে জ্য হে"; "বাতুম্বির পুখা অমনে"র "জ্য অম নরোত্তম পুখলগতম" "ভাগোবেসে যদি স্থব নাহি"র "তবে কেন তবে কেন" অংশ; "মন যৌবন-নিকৃষ্টে"র "গবি জাগো জাগো জাগো" আর "যদি

রবীন্দ্রস্মৃতি

ভোর ডাক শুনে কেউ না আসে”র “একলা চল রে”। বাবার “মিলে সব ভাবতলস্থান” গানে “হোক ভায়ভের অর্থ” ইত্যাদি যে দুখ আছে, আনিনে রবিকাকা তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কি না।

পরবর্তী জীবনে আমি অবশ্য রবিকাকার অনেক বিশিষ্ট গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছি, সে-সব এখনও সেদিনের মূক সাক্ষীস্বরূপ আমার গানের বাঁধানো বইয়ে পড়ে আছে, যথা— “In the gloaming,” “Then you’ll remember me,” “Good night, good night, beloved”, “সুইনবার্নের “If” etc.। এ ছাড়া বেন্ জনসনের বিখ্যাত গান “Drink to me only with thine eyes” ভেঙে গিয়েছিলেন “কতবার ডেবেছিছ”। প্রলম্বক্ৰমে অনেক বছর ডিডিয়ে এখানে বসছি যে, সম্প্রতি ১৯২৬ সালে বহুকাল পর বাক-দম্পতি শাহিনিকেতনে এলে আমি তাঁদের এই ভাড়া গানের কথা বলি। বাকের শাহেব আমাকে দিয়ে গানটি গাইয়ে তৎক্ষণাৎ টেপ্ রেকর্ডারে তুলে নিলেন। আর একটি গান, রোমান ক্যাথলিকদের বিখ্যাত স্তব “আডে নারিরা”, রবিকাকা পিয়ানো ও বেহালায় মৃদল সংগতে গাইতেন, সেটি আমার বড় ভালো লাগত। ইহানীঃ কত চেষ্টা করেছি এই বেহালা সংযুক্ত গানটির স্বরলিপি সংগ্রহ করতে, কিন্তু এখনও কৃতকাৰ্য্য হইনি। তবুও আশা ছাড়িনি। ওদের সংগতের বিশেষত্ব এই যে, তা আমাদের মত কেবল মূল স্বরকে অহরণ করে না, কিন্তু ভিন্ন পথে চ’লেও সংযোগ রক্ষা করে, তাতে একটি অন্তরিক্ত মাধুর্যের সন্ধান হয়। আমি অবশ্য উক্ত সংগীতরসে বঞ্চিত শ্রোতাদের কথা বলছি, কারণ তাঁদের স্বানে এটা বেহুয়া লাগতে পারে— সেরকম রসবোধ আমি শুনেছি। এখানে অবাস্তব হলেও বলবার সোজা সংস্রব করতে পারছি, যে, আমাদের দৃশ্যসংগীতে এই নিয়ে পরীক্ষা করবার বিতর্ক ক্ষেত্র পড়ে আছে। কেনি একটি গৎ বহু শ্রোতার প্রতিগোচর করতে হলে কেবলমাত্র স্বরের সংখ্যা বাড়ানো। বই অল্প কোনো বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা আমাদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত হয়নি। এখন অবশ্য শুনতে পাই সিনেমা, রকমক ও বেতারে দৃশ্যসংগীতে নানা প্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সব সময় সেগুলি খুব প্রতিমধুর ও শাস্ত্রান্বিত হয় কিনা সন্দেহ।

আমার অনেক সময় আশ্চর্য বোধ হয় যে, রবিকাকা কখনো কোনো বহু বাজানোর মিকে মনোযোগ করেন নি। যদিও পিয়ানোয় বলে বসে এক আঙুল দিয়ে ঠুকে গানে স্বর বসানোর চেষ্টার কথা মনে পড়ে। তবে তিনি সব-কিছু নতুন ও স্থলর বিনিমকে সমাদর করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। আমি অল্প কোথাও লিখেছি যে, তিনি তাঁর পরিবারের ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে অপটু প্রচেষ্টাও কোনোদিন নিঃসংলাহ করেন নি। মনে আছে আমাকে, আমার দাশা স্বরেনকে আর সরলাদিগিকে রবিকাকা একবার “নিউয়ের স্বপ্নভঙ্গ” কবিতাটির উপর একটি স্বরলিপিযুক্ত পিয়ানোর গং রচনা করতে বলেছিলেন। কথা ছিল যার সবচেয়ে ভালো হবে, তিনি তাকে পুরস্কার দেবেন। আমাদের মধ্যে একমাত্র স্বরেনই উৎসাহ এবং পরিশ্রম করে এই অল্পপ্রোথ রক্ষা করেছিলেন এবং আমার পুরনো খাতার পাতায় তার সাক্ষী এখনো বর্তমান। তাঁর জীবিতকালে কেউ যদি দেখে স্বরলিপি-সংযোগে কৃত্তিম সেখানে পারতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি নিজেই সর্বদা এ তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন।

রবিকাকা ছোট ছেলে স্বভাবতই ভালোবাসতেন— আমাদের ভাইবোনকে দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর হাতে খড়ি হয়। বিশেষত গিয়ে আমাদের সঙ্গে সেই যে তাঁর ডাব হবে গিয়েছিল, সেটা শেখরীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। ছেলেদের মন ভালোবাসে তাঁর একটি উপায় ছিল, নানারকম বস্তু করে গান গাওয়া।

যেমন “আজু ঘোরণ বন বোলে” গানটি মধ্যগরে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেয়ে যখন “তুমি সুন হুম হামল কর হমকে হমকে খোপে” গাইতেন তখন শেষকালে তাঁর টোটকটি বেন কেবল কাঁপত, আর আমরা হেসে ফুটি ফুটি হতুম। “Darling, you are growing old” প্রজ্জ্বলিত ইংরিজি গানের স্বরও মজা করে টেনে টেনে গাইতেন, কিন্তু সে স্বর বয়লিশিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। জেঠাবশাই আবার আফ্রিকার প্রদেশ নামগুলিতে স্বর বসিয়েছিলেন, যথা—

না র্গা -১ র্গা | থা পা গা রা | থা -থা -১ না | র্গা
ই জি ষ্ট্ ছা | বি আ আ বি | সি . . নি | যা

রবিকাক্য আবার রেলওয়ে লাইনের অকরেও স্বর বসিয়েছিলেন, যথা—

গা | পা | পা -১ | জা পা -১ | থা পা -১ | গা রা -গা |
E | I. R. -- | G. I. -- | P. R. -- | D. M. -- |
রা সা -১ | -১ সা | রা সা -১ | না -সা -১ | রা -গা -১ |
S. R. -- | . S. | E Ex. . | ten . . | sion . . |

তখনকার কালে আমাদের মধ্যে অস্পষ্ট পাশ্চাত্য প্রভাবের মতো হারমোনিয়ম ও পিয়ানোথ্রের খুব চল ছিল। আগেই বলেছি রবিকাক্য কখনো দূর বাজানোয় মন যেননি; কিন্তু অবনমার। এগরার বাজাতেন এবং ডাইসের মধ্যে অকণেশ্রনাথ আর আবার রাধা সুরেশ্রনাথ কিছুদিন একেবারে নাড়া খেয়ে গরার বিখ্যাত এগরাজী চৌধুরীর শিল্পর গ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিকা মহাপ্রবোধ পিয়ানো বাজনার সঙ্গে রবিকাক্যর গান রচনার কথা তো সকলেই জানেন। সেকালে আমি ত্রাশ্রনমাঝে দুই থাকের একটি হৃদয়ের সর্গীয় দ্বন্দ্ব ছিল। তার উপরের থাক পিয়ানোর মত, আর নীচের থাকটা হারমোনিয়মের মত বাজত। একদমই আমি ত্রাশ্রনমাঝে প্রতিমাসেই উপাসনা হত। সেই মাসিক সমাধে রবিকাক্যর গানের সঙ্গে আমি হারমোনিয়ম বাজাতাম মনে আছে। “ভোরের বেলায় কখন এসে”, “ডবকালাংশ ছাড়িয়ে”, “তবে কি কিরির জানমুখে”, “নাও হে ফলর ভরে পাও”, প্রজ্জ্বলিত গানগুলি স্বত ভালো লাগত।

তখনকার দিনে রবিকাক্যর জনপ্রিয় গানগুলির পরিচয় তাঁর ১২২২ সালে প্রকাশিত গানের বহি ও বাঙ্গালী-প্রতিভা দেখলেই পাওয়া যাবে। রবিকাক্য দু-একটি হিন্দী গানও লগ করে গাইতেন—যেমন “ক্যারনে কাটোনি হমন শো পিহা বিনে” (বেহাগ), “জন ছুঁয়া মোরি বইয়া নগরওয়া” (রাহকেল)।—এই গানটি থেকেই “আবিষ্মল মুছাইলে জননী” ভাঙা, এবং “যন কি কমল দল গোলিয়ার” (বাহার) ভেঙে “এই যে হেরি গো সেবী” রচিত। আর একটা চুটকো মনে পড়ে গেল—“লাইরি মোরি ত্রাম ইমোরিয়া” গানটির স্বর পুরবী এবং এর কিছু আভাস নিয়ে বহুদিন পরে “সমুখে শান্তিপারাবার” গানটির স্বর বেন। তাঁর একটি খাতায় “সমুখে শান্তিপারাবারের” কথা আর সেই পাতার কোণে “লাইরি” শব্দটি লেখা দেখে তাঁর সংগীতগবেষকরা এই ইকিতের মর্ম বুঝতে পারেননি। আবার সেই কথা বলার আমি তাঁদের এই সমস্রার সমাধান করে দিলাম। স্বতকগুলি নিধুবাবুর টঙ্গাও গাইতেন, “যে বাতনা নতনে”—এর সঙ্গে “থাম্ থাম্ কী করিবি যদি পাখিটির প্রাণ” গানটির সুরের মিল লক্ষ্যকর। আর দুটি গানও গাইতেন, “যনে রইল সেই মনের বেদনা” ও “ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে”; শেষ গানটি ত্রিধর কণকের।

অনেকে তাঁর প্রথম-বয়সের গান বেশি পছন্দ করেন, তার ভাষা ও ভাব সরল ও স্বর্যস্পর্শী বলে। তিনি

নবীন্দ্রস্মৃতি

নিজে আমাকে বলেছেন, “আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারগুলি ইন্সপেরেটিভ।” এর স্বরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় মাধার খেলার দুটি-একটি গানের সেকালের ও একালের রূপের তুলনা করলে। যেমন সেকালের—“আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুকেছি তোমারে” (বেহাগ। এর সঙ্গে অন্যর চৌধুরীর “কেনই বা তুলিবি তোমার” গানটির কিছু মিল আছে)। গানটির একালের পরিবর্তিত রূপ “যে ছিল আমার স্বপনচারিত্রী”। এইখানে বলে রাখি কারণেই আমার সঙ্গে থাকাকালীন কতকগুলি কানাড়ী গান ভেঙে বাংলা গান রচনা করেছিলেন। রবিকাকা প্রচোদনামূল্যে নানা পুঁথি গানের হুঁত্রে অত্র কথা বসিয়ে অমূল্যবল করে নিয়েছেন। যথা, চিত্রাঙ্কনার “কন্না কর আবার, আমার” গানটির হুঁত্রে নেওয়া হয়েছে—“ময় ময় ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ” নামক অতি পুরনো ব্রহ্মসংগীত থেকে। বান্দ্যকি প্রতিভার “মহো আশ্বর্ষা একি তোমের” গানটির হুঁত্রে “চরাল স্কলি মিছে বাধা” গান থেকে নেওয়া। ভ্রামার “হার একি লমাপন” গানটির হুঁত্রে বান্দ্যকি প্রতিভার “হাঁ কি মশা হল আমার” থেকে নেওয়া। এই হুঁত্রে মূল আবার কৰ্ত্তালাদামশায়ের মুখে শোনা একটি ফার্সী গান—“হালমে রবে যব”। বান্দ্যকি প্রতিভার “আর মা আমার সাথে” গানের হুঁত্রে বিবাহোৎসব নাটিকাধীতার পুঁথি গান “মা একবার পাড়া গো তেরি চজানন” গানটির স্বরূপ। কালদুগয়ার “কে জানে কোথা সে” তাঁর আর-একটি পুঁথি গান “সেই না বাতনা”র হুঁত্রে বসানো। ভ্রামার আরেকটি গান “কাদিতে হবে রে পাণিষ্ঠা”র হুঁত্রে পুঁথি ব্রহ্মসংগীতের “আগিতে হবে রে” (শব্দরা) থেকে নেওয়া। মাধার খেলার “কী হল তোমার বৃত্তি বা লবী”, তাঁর একটি পুঁথি গান “কী হল আমার বৃত্তি বা লবী”র কেবল “আমায়” টুকু পরিবর্তন করে “তোমায়” বসানো হয়েছে। বান্দ্যকি প্রতিভার “জীবনের কিছু হল না” গানের মূল ঠাই একটি পুঁথি গান “প্রবোনে ঢালিখা দিহু মন”। বান্দ্যকি প্রতিভার “মরি ও কাহার বাছা”, মাধার খেলার “আহা আমি এ বসন্তে”, এবং কালদুগয়ার “হানা না মানিলি”র হুঁত্রে “Go where glory” নামে একই আইরিশ মেলডি থেকে ভাঙা।

তেলেনা গানের অর্থহীন শব্দগুলি নিয়ে, যথা “ওয়েব্তানা দিতাহু তাহু সেবে না” কেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করে রবিকাকা গাইতেন মনে পড়ে— উপরোক্ত শব্দগুলি একবার খুব উত্তেজনাপূর্ণ ভাবে গেয়ে বীররস, আবার টেনে টেনে কোমলভাবে গেয়ে কল্পরস প্রকাশ করতেন।

আমাদের সংগীতশাস্ত্রে বাহার রাগিণীটিকে বসন্তকালের নববিকাশ প্রকাশের উপযোগী বলে মনে করা হয়। কিন্তু রবিকাকা এই বাহার রাগিণীকে অনেক গানে মনের আবেগ প্রকাশের বাহনরূপে নতুন রূপ দিয়েছেন। যেমন “গেল গেল নিয়ে গেল”, “রাখ রাখ ফেলু খহ” প্রভৃতি। সিদ্ধুর মতো করণ কোমল রাগকেও কেমন উদ্দীপনা প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন, সেটা “আমার বোলো না গাহিতে বোলো না” গানে লক্ষ্যকর। অবশ্য লয় ও গায়কী দ্বারা গায়কেরও সে ভাবটা হৃদয়ে তুলতে হবে। আমার মনে হয় এ-সকল ক্ষেত্রে নাট্যরস নামক একটি নবতর রসের অবতারণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমাদের সংগীতে উদ্দীপনার অভাব রবিকাকা নানারকমে পূরণ করেছেন, তাঁর সংগীতভক্তগণ চেষ্টা করলে আরও এমন দৃষ্টান্ত মনে আনতে পারবেন।

বাবার কাছে বোম্বাই থাকাকালীন সাহেবদের মহলে এক সময় মাধার খেলার গানের খুব আদর হয়েছিল এবং উচ্চারণ করতেন না পারলেও তাহা “ভালোবেলে যদি হুঁত্রে নাহি” গানে “টোবে কেন, টোবে

কেন" বলে ধূমের অংশে যোগ দিত। এর থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, কতকগুলি ছর সার্বজনীন স্বার্থে কোনো বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ নয়। আমি যখন বলি আমাদের দেশের সংগীতও স্বরগতির ব্যবহারের একবারে অযোগ্য নয়, বরং এতে তার ঐশ্বর্য বাড়বার সম্ভাবনা— যা নিয়ে অনেক সময় সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে মতভেদ হয়— তখন এই ধরনের সার্বজনীন ছরের কথাই আমার মাথায় থাকে।

বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে কয়েকটি গান রচিত হয়েছে। যেমন বঙ্গতন্ত্র আন্দোলন উপলক্ষে "বাংলার মাটি বাংলার জল", এবং আরো অনেক গান; তার তারকনাথ পালিতের বাড়ি নিমন্ত্রণে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে উদ্যোগী ধারা, তাঁদের প্রতি ভূষণা হিসেবে "আবার বোলোনা গাহিতে বোলো না"। কয়েকটি বিয়ের গানের ইতিহাসও এখানে উল্লেখযোগ্য, যথা— "সুখে থাক আর সুখী কর" গানটি শ্রীমতী বেহলতা সেনের বিবাহোপলক্ষ্যে এবং "নবজীবনের যাত্রাপথে", "দুঃখের বিলাসের সত্যসাক্ষী যিনি" ও "সুখলী বধূ" গান ক'টি শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর বিবাহোপলক্ষ্যে রচিত। "ওহে নবীন অতিথি" গানটি কোনো বন্ধুকগ্নার অগ্রপ্রাশনের জন্ত রচিত। একবার মনে আছে আমি নববিধান সাধারণ, এই তিন সমাধের মিলিত উৎসব উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ধর্মগড়া হয়। সেই সভার জন্ত রবিকাক। "পিতার দুচারে পাড়াইয়া গবে ভুলে যাও অতিমান" গানটি রচনা করেন।

ছেলেবেলার গানের স্মৃতির সঙ্গে গানের সার্বীণ অবিস্মৃতভাবে জড়িত। আমার দিশী বিলিতি সংগীতের সর্বদা সন্ধান সার্বীণ ছিলেন সরস্বতীদেবী। আমরা কাকিছু শিখেছি, জিনিও সঙ্গে সঙ্গে শিখেছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি দক্ষিণাত্য থেকে অনেক হুম্মর সুর সংগ্রহ করেছেন, নিজেও বহু সংগীত রচনা করেছেন। আমার সেমকাক। হেমেন্দ্রনাথও খুব নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর ঘরে দিশী বিলিতি সংগীতের সুগল স্রোত অবিরাম হয়ে চলেছিল। তাঁর বড় মেয়ে প্রতিভাদিগিকে তিনি সর্বাঙ্গাঙ্গীকারশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর চতুর্থ কন্যা মনোবা "ভনীধরাণা" বেগমমতী এবং রবিকাকার কতকগুলি গানে, যথা "পাগপ্রায়ে রাখ দেবকে" প্রভৃতিতে পিয়ানোর সংগত বসিয়েছিলেন। সেগুলি তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করেনি। তাঁর সেম মেয়ে অভিজ্ঞা রবিকাকার প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। তার হুম্মর গলা ও অভিনয়ের ক্ষমতার কথা তাঁর রচনাও উল্লিখিত আছে। সেমকাকার পরিবারের ছেলেরাও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তীকালে তার নাতনৌ অধিষ্ঠানদেবী হুর্ক ও শিক্ষাণ্ডে রবীন্দ্রসংগীতে নাম করেছিলেন। সেমকাকার নাতনী শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায় এখন পর্যন্ত বংশের ধারা বক্ষা করে চলেছেন।

জ্যৈষ্ঠমাসে হিমেন্দ্রনাথের ঘরে দেবকন্যভাবে গুপ্তান রেখে গান শোণাবার পদ্ধতি না থাকলেও, হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু-একখানা গান না করত পাবে এমন ছেলে তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিল না বললেই হয়। তাঁর সেম ছেলে অকস্মাত রীতিমত এলরাগ শেখবার কথা আগেই বলেছি। তাঁর বড় মেয়ে সরস্বতীদেবীর যেমন হুম্মর চেহারা তেমনই মিষ্টি গলা ছিল। ছোট মেয়ে উষাও দলের সঙ্গে গাইতেন। নাতিনের মধ্যে সৌন্দর্য্যহীন এখানে বংশের ধারা বহন করে চলেছেন। তবে হিমেন্দ্রনাথই একাধারে যেমন তাঁর সর্বমোহা তেমনই সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ নাতি, ধীর ব্যাতি শান্তিপূর্ব পর্যন্ত চলে এসেছে। বিহু তিন বছর বয়স থেকেই যে-সব গান গেয়ে বেড়াত ছোটসুখে বড় কথা হিসেবে তা শুনে আমাদের হৃদয় পেত—যেমন "নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন, কাটো হে কাটো হে এ যাত্রাবন্দন।" আর

রবীন্দ্রস্মৃতি

কিছুদিন পরে নাকি জ্যোতামণার পাশের ঘর থেকে শুনেছেন, দিহু গাইছে—গানটি জ্যোতামণারই রচিত—
“সবন ভিঙ্গিল নয়নঘলে, ওলো। সবনি।” অমনি তাকে ডেকেছেন, “দিহু, এদিকে এস।” দিহু এসে
অধোবহনে গাড়িয়ে বইল। “এ গান তুমি কার কাছে শিখলে?” দিহু নতমস্তকে নিকম্বর। “ধবদধার,
এ গান আর গাবে না।” ধবনিকা পতন। দিহুর সঙ্গে রবিকাকার গানের স্বর সখড়ে আমার তর্ক
হলে এই একটি চুক্তি ছিল যে, নতুন গানের স্বর সখড়ে তার কথা মানব, কিন্তু পুরনো গানের
বেলার নয়।

আমি রবিকাকার কাছে আলাশা ক’রে বলে কখনো গান শিখেছি বলে মনে পড়ে না। কেবল
বাড়ির হাওয়ায় হাওয়ায় যে গান ভেসে বেড়াত, তাই শুনে শুনে শিখেছি। পরবর্তীকালে বরং
আমার বাসিগতের কমলালয় বাড়িতে পিয়ারনোর কাছে বসে তিনি আমাকে দু’একটা গান শেখাতে
চেয়েছেন বলে মনে পড়ে, যেমন, “কে গো অন্তরতর সে” প্রভৃতি। আর আমার গান শিখতে গেরি
হয় বলে মস্তব্য করার আমি একটু ভয় হয়েছিলুম। দিহু এবং খুহু (অমিতা দেব) যেরকম তড়াতাড়ি গান
শিখত শুনেছি, তার তুলনায় আমারের যে টিমে তেতাল্লা মনে হবে তার আর আশ্রয় কি। খুহুর সম্মুখে
কীবনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়নি, তবে কলকাতায় কোনে। যুয়ে তার গান
শোনবার সুযোগ হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদ নামক একটি সভা উপলক্ষে আমি আহূত
হয়ে সেখানে একটি ছোটো প্রবন্ধ পড়ি। রবিকাকাও নিমন্ত্রিত হয়ে খুহুকে সঙ্গে করে আসেন এবং খুহু
তার পাশে বসে শুধু গলার “আমার মল্লিকাবনে” গানটি হৃদয় গায়। তার অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতনে
দুদিনের ক্ষুদ্র এসে উত্তরাধরণের সামনে টেনিসকোর্টে বলে দেখেছি খুহু চার-পাঁচ বায় ক্রমগত শ্রমশীতে
রবিকাকার কাছে বাতায়ত করছে। পরে শুনেছি যে, সেই সময় রবিকাকা তাঁর বড় বড় কবিতার স্বর
সেওয়ার নতুন রীতি প্রবর্তন করছিলেন, সেই গান শেখবার ক্ষুদ্রই এত ছোটোছুটি।

যতদূর আমি সংস্কৃত স্তোত্রে স্বর রবিকাকাই প্রথম নিতে আরম্ভ করেন। সেই থেকে আর পর্যন্ত
একরকম নিয়মই হয়ে গেছে যে, মাঘোৎসব আরম্ভ হবে একটি বেদগান দিয়ে। তার পরে
তাঁর পরিবারের দু’একজন তাঁকে অংশগ্রহণ করে সংস্কৃত স্তোত্রে স্বর বসিয়েছেন। বং, বিখ্যাত “হৃদ্যদিনেব
পুরুষগুণায়” স্তোত্রটিকে প্রতিভাদিগি কেমার রাগিণীতে স্বর বসান। “গংগজ্জরম” স্তোত্রে স্বর
“আনন্দলোকে”র সুরেরই রূপান্তর; এই সুরটি সরলাদিগি মহীশূর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। পরে
বিষয়স্বত্রে শুনেছি সেটি মহীশূরের আতীয় সংগীতের স্বর। সংস্কৃত স্তোত্রের দীর্ঘ ব্রহ্ম বরের উচ্চারণের
রীতিরকার প্রতি রবিকাকা খুবই সতর্ক ছিলেন। প্রতিভাদিগির স্বর বেওয়া গীতাস্তোত্রটি মাঘোৎসবে
গাওয়া হবে বলে মোড়াগাঁকের উঠানে মহড়া চলছে। রবিকাকা অহুহ হয়ে তেতলার ঘরে শুয়ে শুয়ে
শুনছিলেন। মনে আছে তিনি আমাকে উপরে ডেকে পাঠিয়ে এক আধপার সুরটা ঠিক করে দীর্ঘ ব্রহ্ম
উচ্চারণের সঙ্গে মিলিয়ে বসাতে বলে দিলেন।

আত্মীয়বন্ধনের সঙ্গে সংগীতচর্চার কথা বাগ দিলে বাইরের বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রথমই মনে পড়ে
অক্ষয় চৌধুরী এবং বিহারী চক্রবর্তীর কথা। শেখোক্তের সঙ্গে আমার চাক্ষু পরিচয় ছিল না।
পরে অবত তাঁর ছেলেরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি। সোকে বলে যে, তাঁর রচনার প্রভাব রবিকাকার
কবিতায় লক্ষিত হয়, বিশেষত বান্দীকি প্রতিভার সয়যতী-বন্দনাদিতে। সন্তবত রবিকাকার কাছেই তাঁর

কতকগুলো গান শুনে শুনে শিখেছিলুম, যা আমার গানের খাতায় লেখা আছে। সপরিবার অক্ষয় চৌধুরী সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর রচিত কতকগুলি গান শুনতেই রবিকাকার গীতিনাটো স্থান পেয়েছে—যেমন, “হাডা পদপদ্মংগ” ও “এত বধ শিখেছ কোথা”। বেবন বিহারী চক্রবর্তীর “নন্দন-অকুতরাশি প্রেমলী আবার,” তেমনি অক্ষয় চৌধুরীরও একটি প্রেমের গান “কেন গো তুলিব তোমায়” লোকালে খুব জনপ্রিয় ছিল।

গাথক বন্ধুদের মধ্যে বিশ্বেশ্বরলাল রায় আর অতুলপ্রসাদ সেন বনামধন্য। তাঁদের কাছে তাঁদের নিজের গান শেখবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। এইখানে কৃষ্ণনগরের একটি ছোট্ট খটনার কথা বলে নিই। অনেকেই শুনেছেন যে রবিকাকা এবং সত্যানন্দা যখন জিউরবার বিলেত যাত্রা করেন, তখন দাখগণে মাস্তান খেতেই কিরে আসেন। এ যাত্রা এক হিলেবে নিফল হলেও, আর-এক দিক থেকে আমাদের পরিবারের পক্ষে স্বফলপ্রসূ হয়েছিল। কারণ এই জাহাজেই শুনেছি আমার বড় ভাইর আওতায়ে চৌধুরী সঙ্গে রবিকাকার প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন থেকেই রবিকাকা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কুটুম্বিতাপ্তরে আবদ্ধ হবার কল্পনা মনে পোষণ করেন। পরে প্রতিভাসিদ্ধির সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রবিকাকা কৃষ্ণনগরে এসে বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। কৃষ্ণনগরে তখন রামতল্লা লাহিড়ীর ছেলে সত্য লাহিড়ীকে কেন্দ্র করে একটি উচ্চাঙ্গ গানের আশর ছিল, আমার বাইও তাতে যোগ দিতেন। পরে তাঁর কাছেই শুনেছি যে, সেই আসরে রবিকাকাকে গান গাইতে বলায় তিনি “বাশরী বাজাতে চাছি বাশরী বাজিল কই” গানটি গেয়েছিলেন। এবং সেইসব উচ্চাঙ্গসংগীতপ্রিয় প্রোতাবের কাছ থেকে নাকি অনেক কাফাওয়ান তাঁর উপরে বসিত হয়েছিল, যেমন, “হ্যা, বাশরী অনেকেই বাজাতে চায়, কিন্তু বাশরী বাজাতে চাইলোই কি বাশরী বাজে। বাশরী বাজাতে হলে শিক্ষা চাই” ইত্যাদি। কারণ সে সরল স্বরের ভিতর তাঁদের অভ্যস্ত তানকর্ভব তাঁরা খুঁজে পাননি।

বাইরের মেয়েদের ভিতর গায়িকা হিসেবে অমলা দাসকে আগে মনে পড়ে। এখনও গ্রামোফোনে তাঁর স্বন্দর চড়া গলায় “একি আকুলতা তুবনে” এবং “চিরসখা হে” শুনে লোকের শিক্ষা ও আনন্দ দুই পায়। তাঁর একটি হিন্দী গান “সৈরা বাও বাও” ভেঙে “পিপাসা হায় নাহি মিটিল” গানটি রচিত। বড়িমবাবু মৃণালিনীর “বধুনারি জলে মোরে” এবং “মধুবাগিনী মধুরাগিনী” গান দুটি তিনি খুব গাইতেন। কলকাতার কোনো এক কংগ্রেসে অমলা দশ হাজার লোকের সভায় একলা “বন্দেমাতরম্” গানটি বিনা বাইকে সুরিয়েছিলেন। তাঁর গলা যেমন মিষ্টি তেমনই সন্তোষ ছিল। এদিকে গৃহস্থালীতেও তিনি হুণটু ছিলেন। নাটোরেব মহারাজার সংসারে যখন মহারানীর সহচরী হিসেবে ছিলেন, তখন রাজবাড়ির দেয়ন্তরে তাঁর রাশা খেয়ে কত তৃপ্তি লাভ করেছি।

ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি পরিবারের সঙ্গে রবিকাকার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন চিত্তরতন দাসের পরিবার, ভ্রায় কে. বি. গুপ্তের পরিবার, ডাঃ নীলরতন সরকারের পরিবার ইত্যাদি। এঁদের লকলেরই ঘরে স্থায়ী ছিলেন, ধারা রবিকাকার কাছেই তাঁর গান শেখবার সুযোগ পোয়েছেন। যেমন ডাঃ নীলরতনের বড় কন্যা নসিরা, তাঁর অপর এক কন্যা অরুণভা, সুহৃদায় রায়েব স্ত্রী সুপ্রভা, কনক দাস, সাহানা বহু। ডাঃ নীলরতন সরকারের মেয়েরা এখনো পর্যন্ত দেশ-বিশেষী সংগীতের একসঙ্গে চর্চা রেখেছেন।

ঝোড়ানাকোর বাড়ির পিছনের বাগানে প্রথম যে বর্ষাষল হয় তাতে বড় বৃহৎ সাহানা বহু ও ছোট

রবীন্দ্রস্মৃতি

রুহ চিরলেখা শিখাস্তের দ্রুত গান “বাদল-বেশে দাদল বাজে” আর “ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে” কী অসূৰ্ মন্দর লেগেছিল— যেন মধুঢালা।

এ পৰ্বন্ত রবিকাকার শাখানিকেতনবাসের পূৰ্ব্বেকার সংগীতশ্রুতির কথা বলেছি। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গার সঙ্গে রবিকাকার তখনকার কালের গান রচনার স্মৃতি, স্মৃতি আছে। একবার দাঙ্গিলিঙ বেড়াতে গিয়ে এক ঝাঁক গান নিয়ে এলেন, “বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে” ইত্যাদি; আবার শিলাইদহের ঘাটে বসে দয়তো আরেক ঝাঁক রচনা করেছেন। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাবার পরে যে গান রচনা আরম্ভ করলেন সে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে নয়, যেন ধারাবাহিক স্রোতের মতো বইতে লাগল। সে স্রোত গ্রাম জীবনের শেষ পৰ্বন্ত হয়ে চলেছে।

শান্তিনিকেতনে ঐক্য আশ্রম স্থাপনের পরেও রবিকাকা কয়েক বছর কলকাতায় ঘনঘন দাতাঘাত করতেন। তাই সেখানকার রবীন্দ্রজন্মদিবস তাঁর নব নব সংগীত ও সাহিত্যরস উপভোগে বঞ্চিত হত ন। এই মধ্যাহ্নী সময়ের উল্লসযোগা ঘটনার মধ্যে মনে পড়ে প্রতিভাবিশিষ্ট স্থাপিত “সংগীতসংঘে” রবিকাকা তাঁর ‘সংগীতের স্মৃতি’ নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। উদাহরণগুলি নিয়েই গেয়েছিলেন। এখনকার বিশ্বভারতী এখনবিভাগের বাড়িতে “বিচিত্রা” আসরের কথাও অনেকের জানা আছে। তাতে তিনি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার দিয়েছিলেন। তাঁর অভ্যস্ত মেহের পাত্রী পুত্রবধূ প্রতিমাকে একটি ঘরির কিতে দিয়েছিলেন— আসরের বন্ধুদের ঘাতে গৌরব আর স্রীতির জোরে বেঁধে রাখতে পারেন, তারই প্রতীকস্বরূপ। এক আসরে একবার মনে আছে সৌম্যোজ্জ্বল স্রী শ্রীমতী রবিকাকার “জন্ম আমার নাচে যে” আবৃত্তির সঙ্গে নিজস্ব আঙ্গিকে রচিত একটি নাচ দেখিয়েছিলেন। আর-একবার রবিকাকা বিলেতে বাজনার সঙ্গে কবিতা আবৃত্তির পদ্ধতি শুনে এসেছিলেন, সে পরীক্ষা এখানেও করেন। আশ্রমকাল সেতারের গানের সঙ্গে গান করবার যে ধারা প্রচলিত হয়েছে তারও বোধ হয় প্রথম নমুনা আমরা বিচিত্রার আসরে শুনিয়েছিলাম “বধুর মধুর ধানি বাজে” গানটির সঙ্গে একটি কুপালীর গং জুড়ে।

প্রিয়দর্শী অশোক

প্রবোধচন্দ্র সেন

ইন্দুমতীর স্বয়ংবরদাতার বর্ণনা উপলক্ষে কালিদাস মগধেশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন—

কামঃ নৃপাঃ সত্ত্ব সহস্রশোভতে

রাক্ষসতীর্নাকরণেন কুম্ভিন্ ।

নক্ষত্রতারা গ্রহণঃ কুলাপি

জ্যোতিষতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ।—রঘুবংশ ৬।২২

গত। বটে পৃথিবীতে হাজার হাজার নৃপতি আছেন, কিন্তু একমাত্র মগধেশ্বরের দ্বারাই ধরণী রাক্ষসতী হয়েচে, যেমন অসংখ্য নক্ষত্র তারা এবং গ্রহ থাক। তবেও রাত্রি জ্যোতিষতী হয় একমাত্র চন্দ্রের দ্বারাই। পৃথিবীর ইতিহাসগণনের একমাত্র চন্দ্রমা মগধরাজ প্রিয়দর্শী (ভাদুকলিপি) অশোক সম্বন্ধে এইচ. জি. ওয়েলস সাহেব অসুস্থরূপে উক্তি করেছেন—

Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history... the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star.

—The Outline of History 24/4

ভারতবর্ষের রাজকীয় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ হচ্ছেন অশোক, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে অশোক সম্বন্ধে যে শুকতরার মতভেদ দেখা যায় তা বিস্ময়কর। শুধু মতভেদ নয়, মতবিরোধ। এই বিরুদ্ধতার ফলে অশোকের শ্রুতি পর্বত কালক্রমে ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐর মহত্বের দীপ্তি এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল ও ঐর অনন্তসাধারণ ব্যক্তিত্বগৌরব আধুনিক কালেও সমগ্র বিশ্বে পুনঃখরিত ও অতিবিস্তৃত হয়েছে তাঁর শ্রুতি ও প্রভাব ভারতীয় ইতিহাস থেকে লুপ্ত হতে বহু বৃণ লেগেছিল, এ অস্বাভাবিক নয়। আমি অন্তত (ধর্মবিজ্ঞানী অশোক, জুমিকা পৃ ১৭-২২) দেখিয়েছি যে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত গ্রাথ বেড় হাজার বছর ধরে অশোকের শ্রুতি ও আদর্শ ভারতীয় মনে আগ্রহক ছিল এবং যুগে যুগেই ভারতীয় জীবনে ধর্মপ্রাণতার প্রেরণা জোনাচ্ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে অশোকের প্রভাব সম্পর্কে এখানে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

অশ্বগ্রাসেশের অভ্যর্গত নাগার্জুনিকোও নামক স্থানে গ্রাণ্ড খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে যে, বান প্রেক্ষিত পুণ্যকর্মের ফল এইকি ও পারমিত্রিক উত্তরপ্রকার কল্যাণ-প্রদ (উভয়লোক-হিতসাধন) হয়। এই লিপির ভাষা ও বক্তব্য অতি সহজেই কোনো কোনো অশোকলিপির (বদা, পঞ্চ ও একাদশ পৈললিপি) কথা স্বরণ করিয়ে দেয়।^১

১ বসিনাক বস, Early Monastic Buddhism, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০০), পৃ ১০০

প্রিয়দর্শী অশোক

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিএন (৪-৫-১১) তৎকালীন ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিখে গিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায়, ত্রিষ্ঠীর্থ পূজন শতকেও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে অশোকের প্রভাব স্বত্বানি সক্রিয় ও ফলপ্রসূ ছিল। পাটলিপুত্র নগরে অশোকের শিলায় বিপুল রাজপ্রাসাদ তখনও বিরাজমান ছিল। এই প্রাসাদের বিশালতা দেখে ফা-হিএন এত বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি এটিকে যাত্রার তৈরি বলেই বিশ্বাস করতে পারেননি। মগধবাসীদের ধর্মপ্রাণতা দেখেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মগধে পাঠশালা প্রভৃতি অনেক কলাগপ্রতিষ্ঠান ছিল। এসবের মধ্যে পাটলিপুত্রের চমৎকার ভেদমন্ডপটি ফা-হিএনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। এটি পরিচালিত হত বিস্তারিত উদ্যোগ নাগরিকদের অর্থাহকুলো। নানা স্থান থেকে দরিদ্র বোগীরা এখানে এসে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক দ্বারা চিকিৎসিত হত। শুধু তাই নয়, আদ্যোগ্যাত না করা পুষ্কর তাদ্য ওই সম্রাট বাণ করত এবং ঐশ্বর্য ও পথ্য দুই পেত বিনামূল্যে। এই সব দানপ্রতিষ্ঠানের মূলে ছিল সম্রাট অশোকেরই প্রেরণা। ছয় লাখ শো বছরের ব্যবধানেও সে প্রেরণা যে নিষ্কিয় হয়ে যায়নি তার স্মৃষ্টি প্রমাণ পাটলিপুত্রের এই ভেদমন্ডপটি। এ সবকে ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথের অভিনব উদ্ঘাতিবোধ্য।—

It may be doubted if any equally efficient foundation was to be seen elsewhere in the world at that date; and its existence, anticipating the deeds of modern Christian charity, speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius of the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease.

—The Early History of India, চতুর্থ সংস্করণ (১৯২৪), পৃ ৩১২-১৩। বহুলিপি লেখকের।

অতঃপর প্রথম শতকে সম্রাট হর্ষবর্মনের (৬০৬-৪৮) কার্যকলাপেও ধর্মশোকের স্মৃষ্টি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনিও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অশোকের স্তায় পথিকদের জন্য ধর্মশালা ও বোগীদের জন্য ভেদমন্ডপ প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। এই সব কারণেই ঐতিহাসিক স্মিথ হর্ষবর্মন সবক্ষেত্রে বলেছেন—

He obviously set himself to imitate Asoka, so that the narrative of the doings in the latter years of Harsha's reign reads like a copy of the history of the great Maurya.—ঐ, পৃ ৩২৭

উৎকীর্ণলিপির প্রমাণেও এই উক্তি সত্যতা প্রমাণিত হয়। বংশধর ও মধুবন-নামক স্থানে প্রাপ্ত দুটি তারিখানব্দই (৬৩৮ এবং ৬৩১) সম্রাটের শবাসের স্মৃতিভাষ্য এই স্মোকটি পাওয়া গিয়েছে—

কর্মণা মনসা বাচ্য কর্তব্যঃ প্রাপ্তিভিহিতম্।

হর্ষগৈতৎ সমাখ্যাতঃ ধর্মার্জনমহুতমম্।

অর্থ্যাৎ হর্ষের মতে কার্যমনোবাক্যে সর্বপ্রাণীর হিতসাধনই সর্বোচ্চ ধর্ম। এই স্মোকটিকে অশোকের বহু উক্তি সারসংকলন বলে গণ্য করা যায়। বস্তুতঃ এটিকে 'নাশ্চি হি কংবতঃ সর্বলোকহিতংপা' (বড় নৈলাহুশাসন) অর্থ্যাৎ সর্বলোকের হিতসাধন অপেক্ষা বহুস্তর কর্ম নাই, বিশেষ করে এই অশোকবোগীটির প্রতিষ্ঠানের মতো শোনায।

দ্বর্ষবর্ণনের সময়ে অর্থাৎ নগ্ন শতকেও যে অশোকের মূর্তি এসেণের মনে সন্মুখ ছিল তার প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএনসাঙএর ভ্রমতবিবরণ। ওই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঘট্ট শতকের শেষদিকেও মগধরাজ পূর্ববর্ধী অশোকের বংশধর বলে আশ্বপরিচয় দিতেন। তা ছাড়া হিউএনসাঙ ভ্রমতবর্ণের প্রায় সর্বপ্রান্তেই অশোকের মূর্তিবিজড়িত কত ভূপুত্রভাদি দেখেছিলেন আর কত কাহিনী শুনেছিলেন তা তাঁর ভ্রমতবিবরণের বিভিন্ন অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। নগ্ন শতকের উত্তরার্ধে আর-এক জন চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ ভ্রমতবর্ণের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন (৬৭০-৮৫)। তিনি শুনেছিলেন বুদ্ধদেবের নির্বাণশাভের এক শত বৎসর পরে (এটা ভুল, আসলে সম্ভবতঃ ২১৮ বৎসর পরে) অশোক সমগ্র অকুবোণের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তা ছাড়া ই-ৎসিঙ অশোকের একটি ভিক্ষুবেশী মূর্তিও দেখেছিলেন বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় অশোকের মূর্তি ও আদর্শ দেশের অনতিদূরে তখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

একাদশ শতকে আরও একজন চৈনিক পরিব্রাজক চিয়াঙ হ্সিয়া-পিয়াস (Chiang Hsia-Pias) বুদ্ধগয়াতে এসে (১০২১) কন্তুখানি প্রভৃতির সহিত মহারাজ অশোককে স্মরণ করেছিলেন তাঁর প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই প্রশংসিতিতে—

The Fragrance of his fame has travelled afar ;

He lived in wonderful perception of the Truth.*

তাঁর রচিত এই পাংক্তি-দ্বিটি থেকেই বোঝা যায়, একাদশ শতকে অশোকের ব্যাতিসৌন্দর্য ভ্রমতবর্ণের সীমা ছাড়িয়ে দূরদূরান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

ষাটশ শতকেও যে অশোকের মূর্তি ভ্রমতবাসীর মনে সজীব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কান্টোয়ী কবি কল্‌হণের রামতরঙ্গিনী গ্রন্থে (১১৪০-৫০) এবং গাছড়বালবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সারনাথলিপিতে। রামতরঙ্গিনীতে মৌর্যবংশ তথা চন্দ্রগুপ্ত কিংবা বিক্রমাদিত্যের উল্লেখবাক্যও নেই, কিন্তু পরম্পরায়িক ও সত্যসঙ্গ রাজ্য অশোক সম্বন্ধে গভীর প্রাণ প্রকাশ করা হয়েছে।* কল্‌হণ তাঁকে জিনশাসনাপ্রাপ্ত অর্থাৎ বৌদ্ধ-

২ চৈনিক রচনার ইংরেজি অনুবাদ। কৌশাংব বড়ুয়া, *Gaya and Buddha-Gaya*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২৪), পৃ ৩৭, ৪০ ; *Asoka and His Inscriptions* (১৯৪০), পৃ ২২২, ২, ৩০১। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভুল খাটয়া ছিল যে, বুদ্ধদেবের মন্দিরটি অশোকের নির্মিত।

৩ রামতরঙ্গিনী ১১২৭-২০, ১১৩০-১৭, ১১৪০২১

...অথাবহমশোকাকাব্যঃ সত্যসঙ্ঘো বৎসরায়াম্ ।

যঃ পাতবুজিনো রাজাঃ এপত্রো জিনশাসনম্ ।...

ন ধরত্যা খেদন্যঃ সঙ্কলন্যৌদমুখ্যসেঃ

পরীক্ষ্যো পূর্বো ইতিাক্ষত্রে ইনপরীঃ নৃপঃ ।

ওর্ধ্বঃ ইতিজ্ঞেয়তঃ বিনিবার্যঃ প্রবাসম্ ।

বিক্রমদেবোদয়নঃ প্রাকারো যেন কারিতঃ ।

সত্যায়ঃ বিজ্ঞেয়তঃ সর্বোপে চ বিনির্বনে ।

পাণ্ডাবদ্যাকঃ প্রাসাদাবশোকবরদঃ জিতৌ ।

প্রিয়দর্শী অশোক

ধর্মাবলম্বী কাশ্মীরপ্রতিপত্তি এবং প্রাগাধর্মী রাজধানী সীনগরী ও বহু বৌদ্ধ চৈতন্যবিহারানির নির্মাতা বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, কলঙ্কের হাতে অশোক কর্তৃকটি দেবমন্দিরও নির্মাণ ও পুনঃসংস্কার করিয়েছিলেন। সুতরাং সেখা থেকে, বুদ্ধচক্র হওয়া সত্ত্বেও অশোক যে অত্র ধর্ম সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ছিলেন না এ ধারণা কাশ্মীরে দাম্পন্য শতকেও বিলীন হয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে নিজে শৈব হওয়া সত্ত্বেও কলঙ্ক যে বৌদ্ধপন্থিত অশোকের প্রশংসা রচনায় স্ফুটিত হননি, তাতে তাঁরও উপারতাই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যে; এরকম দ্বিতীয় পৃষ্ঠান্ত আছে বলে মনে হয় না।

রাজতরঙ্গিণী রচনার প্রায় সমকালেই গাছবাড়িরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সারনাথলিপি স্ফুটিত হয়। এই লিপি থেকে জানা যায়, বাংলার রাজা রামপালের (আনুমানিক ১০৭৮-১১২০) মাতুলপোতী কুমারদেবী ছিলেন গোবিন্দচন্দ্রের (১১১৪-৪৪) অঙ্গভৃত্যা মহিষী। এই কুমারদেবী ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বিনী এবং তিনি ধর্মশোক-নয়াদিগের আদর্শে অহিংসপ্রাণিত হয়ে সারনাথে একটি বৌদ্ধবিহার ও ধর্মচক্রপ্রবর্তনরত বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। এর থেকে অনুমান করা যায়, পালবংশীয় বৌদ্ধরাজাদের আয়ত্তে (৭৫০-১১২০) বাংলাদেশেও ধর্মশোকের আদর্শ নিম্নত হয়ে যায়নি। অতএব দেখা গেল সম্রাট অশোকের তিরোধানের প্রায় দেড় হাজার বছর পরে খ্রিষ্টীয় দাম্পন্য শতকেও তাঁর স্মৃতি ও আদর্শের পূণ্যপ্রভাব বাংলাদেশ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সমগ্র উত্তরভারতেই সেশবালীর চিত্রে সজীব ও সক্রিয় ছিল।

অশোকের সাম্রাজ্য ও ধর্মবিধ্বয়ের প্রভাব যে সুদূর দক্ষিণভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ আছে তাঁর শৈলাংশুগনগুলিতেই। সে প্রভাব যে বহুশতবৎসরস্থায়ী হয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের চালুক্য ও দামব রাজবংশের কতকগুলি স্কোলিনলিপিতে।^১ আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য দম্পণালের রচনায়; তাঁর রচনা থেকে জানা যায় যে, অশোকের মৃত্যুর বহুকাল পরেও দক্ষিণভারতে নেগাপটন-নামক স্থানে ধর্মশোক-মহারাজ-বিহার^২ নামে একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারটি কোন সময়ে নির্মিত হয়েছিল এবং কতদিন অবস্থিত ছিল তা জানা যায় না।

ধর্মশোক-বিহার প্রতিষ্ঠার কীতি কখন বিলুপ্ত হয়েছিল জানা না গেলেও মহারাজ ধর্মশোকের স্মৃতি যে ভারত-ঐতিহ্যে ভুঙ্ক-মার্বিভাবে পরেও বিলুপ্ত হয়নি তার প্রমাণ আছে। কিছুকাল পূর্বে আর্থ-মহেশ্বরকর নামে একটি অদ্ভুত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (১৯২০-২৪)। এই গ্রন্থে বহু বিচিত্র বিবরণের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পারস্পর্য্য রক্ষিত না হলেও সে সব তথ্য একেবারে মূল্যহীন বা উপেক্ষণীয় নয়। ও গ্রন্থে এক দিকে যেমন ক্রোধদিত্ত মন্ত্রী চাপকা, সভাপঞ্চ চন্দ্রগুপ্ত, ধীমান্ বিম্বসার, বিখ্যাত পার্শ্ব অশোক প্রভৃতি বহু প্রাচীন ব্যক্তির নাম প্রাণ্ডা যায়, অপর দিকে তেমনি ভুঙ্ক^৩ ও মহাভুঙ্ক নামের উল্লেখও পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থখানির শেষ সংকলন-কাল হচ্ছে ঊর্ধ্বপক্ষে দাম্পন্য শতকের শেষ বা জয়োদয় শতকের প্রথম অংশ, এ অনুমান অসংগত নয়। অশোক সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে—

১. হেফজ রাজচৌধুরী, *Political History of Ancient India*, ২য় স্ক (১৯২৭), পৃ ২২৩

২. বৌদ্ধাবলম্বী, *Asoka and His Inscriptions*, পৃ ৩৬২ পাদটীকা

৩. ভুঙ্কনাম যে রাজা উত্তরাপথবাদ্য।—আর্থমহেশ্বরকর (পদপতি শাস্ত্রী-সম্পাদিত), পৃ ৪২২

তপ্তি: কালে মহাবোরে কুহল্যসে নগরে তদা ।
 অশোকো নাম বিখ্যাত: পার্শ্বিবা ভূবি পালক: ॥
 ভূবীপ ইমং কুংসং তুপাল: কৃতকৃৎনম্ ।
 কারয়ন্ত উত্তরো বৈ ধাতুগতাঃ বহুতরাম্ ॥...
 অনেকস্তস্তসংলাপি গোপদামাস তে তদা ।

—আর্যমহর্ষিস্মৃতকর্ম, তৃতীয় খণ্ড (১২২৫), পৃ ৬৩৬-৬৩৭

এই গ্রন্থেরই অষ্টম (পৃ ৬১০) আছে—

রাজে সৌ শোকমুখস্ত পৃষ্ঠতে ত ভবে নৃপ: ।
 বিশোক ইতি বিখ্যাতো লোকে ধর্মাহুচারিণ: ॥

এই অংশটুকুর পাঠ স্পষ্টতাই বিভক্ত নয়, হুতরাম্ তার অর্থও অনিশ্চিত । তথাপি মনে হয় (অ)শোকমুখ্য ও বিশোক নামের দ্বারা সম্ভবত: অশোক বৌদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে । -বিখ্যাত এবং ধর্মাহুচারী, বিশেষণ-চুটির দ্বারা এই অহুমানই সন্নিহিত হয় । এই গ্রন্থে অশোকের সম্ভ্রান্তত উল্লেখও আছে (পৃ ৬০৮)—

শোভনে মেদিনীঃ কুংসং জিনধাতুধরৈস্তদা ।
 প্রণিধিং চক্রিরে রাজা ধর্মশোকো মহাস্ববান্ ॥

অর্থাৎ মহাস্বা রাজা ধর্মশোক বুদ্ধের সেহাবশেষদ্বারা (জিনধাতুধর) তুপের দ্বারা মেদিনীকে শোভিত করেছিলেন । এর পরের স্লোকেই আছে ‘মহাস্বাসৌ ধর্মশোকো নরধিপ:’ । পূর্বোক্ত সায়নাখলিপিতেও ‘ধর্মশোক-নরধিপ’ কথাটি আছে । অতএব কোনো সম্ভেদ নেই যে, উত্তরভারতে বুদ্ধ-আবির্ভাবের পরেও অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকেও কোনো কোনো ভারতীয় মহলে, বিশেষত: বৌদ্ধ মহলে, অশোকের সম্রাট বৃত্তি জাগ্রতক ছিল । লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রধানত: বৌদ্ধরাই অশোকের বৃত্তিকে প্রভা সহকারে রক্ষা করছিল ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত । এর থেকেই অহুমান করা যায়, তৎকালে অস্বাচ্ছন্দ্য মহলেও অশোকের নাম একেবারে অজ্ঞাত থাকবার কথা নয় ; তবে সম্ভবত: প্রচার অভাববশত:ই অস্বাচ্ছন্দ্য সাহিত্যে অশোকের নাম কালরহী পুস্তকেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না ; কলহপের রাজতরঙ্গিণীই তার একমাত্র প্রকাশনীর ব্যতিক্রম একথা পূর্বেই বলেছি ।

দ্বাদশ শতকের পরেই ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অতি ক্ষণকালিতে লোপ পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে রাজা অশোকের স্মৃতিও ভারতীয় মন থেকে মুছে যায় । ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল সে বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে ; এখানে সে প্রশ্নের পুনরুত্থান নিম্নয়োজন । কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মহানুপাতি অশোকের স্মৃতিও কেন ও কিভাবে লোকচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করবার আবশ্যিকতা আছে ।

একথা প্রথমেই স্বীকার্য যে, ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে অশোকের স্মৃতি লুপ্ত হবার প্রথম ও প্রধান কারণ তার বৌদ্ধত্ব । তিনি যে একজন বৌদ্ধনৃপতি, একথা ভারতবর্ষ কখনই এবং কিছুতেই ভুলতে পারেনি ।

প্রিয়দর্শী অশোক

অর্থাৎ ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে তাঁর নৃপতিত্বের চেয়ে তাঁর বৌদ্ধত্বই প্রাধান্য পেয়েছিল। তাই ভারতীয় চিত্রে তাঁর বর্ণনা মহাব কখনও বৌদ্ধত্বলাভের স্বেচ্ছা পায়নি। কেননা, একথা মানতেই হবে যে, অশোকের জীবন-ইতিহাসে তাঁর বৌদ্ধত্বের চেয়ে তাঁর নৃপতিত্বই বড় কথা; কিন্তু তার চেয়েও বড় তাঁর মহৎ মহত্বের কথা। মহাব অশোকই রাজ। অশোককে বড় করেছে এবং তাতেই বৌদ্ধ অশোকের মহিমা-বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিহাসে অশোকের অদৃষ্টে তাঁর জীবনবিবর্তনের ইতিহাসকে পড়া হয়েছে উলটে। হিন্দু থেকে। কলে তাঁর বৌদ্ধত্বই দেখা দিয়েছে সব চেয়ে বড় হয়ে, তাঁর রাজকাণ্ডই মহিমা ওই বৌদ্ধত্বের কাছে হুই মান হয়ে গিয়েছে, আর তাঁর মহত্বের গৌরব একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ওই মহিমাহানির বলে।

বিপরীত মুখে তাকে পড়েছি, তাই

বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ হুঁকি নাই।

কবির এই উক্তি অশোকের জীবনচরিত্র তথা তাঁর ভারতজোড়া লিপিমালার পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। ওই লিপিমালার হচ্ছে বস্তুত: অশোকের স্বরচিত জীবনচরিত্র। এই সত্য উপলব্ধি করেই ঐতিহাসিক বিশ্ব বলেছেন—

His imperishable records constitute in large measure his autobiography written in terms manifestly dictated by himself.

—Oxford History of India (১২২০), পৃ ২৪

প্রাচীন ভারতে আর কেউ এমন অক্ষয় রেখার আশ্চর্য্যিত রেখে যাবার কল্পনাও করতে পারেননি। সুতরাং অশোকজীবনের গুরুত্ব বুঝতে হলে তাঁর অশ্বশাসনগুলির ভাষাও উপলব্ধি করা চাই। শুধু অশোকজীবনের নয়, ভারতবর্ষের সত্যকে উপলব্ধি করতে হলেও এই লিপিমালার আলো নিতে হবে। কেন না, ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষতাই অশোকলিপিসমাকীর্ণ, অশোকলিপির গৈরিক নামাবলী অর্ধে ধারণ করেই ভারতবর্ষ বিশ্ব-ইতিহাসের রত্নকে অবতীর্ণ করেছে। আর বিশ্বের ইতিহাসেও এমন আশ্চর্য্য লিপিমালার আর কোথাও নেই। তাই অশোকের এই লিপিগুলি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিনা বিধায় বলেছেন—

His numerous and wonderful inscriptions... may be fairly considered the most remarkable set of inscriptions in the world.

—Oxford History of India (১২২০), পৃ ২৪

বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের যে পরিচয় ও ভাষাও প্রকাশ পেয়েছে তার উপনিষদের গীতাও ধর্মপদে, তারই আর-এক প্রকাশ ঘটেছে অশোকলিপিমালার। উপনিষদের গীতাও ধর্মপদে তার প্রকাশ তব ও নীতিরূপে তারই প্রয়োগাধারার দিকটি ভাষা পেয়েছে অশোকের অশ্বশাসনমালায়। সুতরাং অশোককে তথা ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে এই অশ্বশাসনগুলির গুরুত্ব ও ভাষাও উপলব্ধি করা চাই।

নেপাল থেকে কর্ণাট (মহিষ) এবং গুজার (পেশবার) থেকে কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), এই চতুঃসীমার মধ্যে ভারতবর্ষের একত্রিংশটি বিভিন্ন স্থানে বত্রিশটি অশোকাস্বশাসনের অন্তত: ১৪খটি স্বতন্ত্র পাঠ আর্য্য পূর্ণত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। আধুনিক কালে অশোকলিপির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ১৭৫৩ সালে,*

* প্রিন্সিপাল হুইট ও কল আফান্ডার, *Edicts of Asoka*, দ্বিতীয় খণ্ড (১২৫১), পৃ ২১১

আর শেষ আবিষ্কার হয়েছে ১৯৪৬ সালে।* ঐতিহাসিকেরা অস্বমন করেন আরও আবিষ্কারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া, অনেকগুলি লিপি যে ঐতিহাসিক বিপর্কয়ের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাও জানা গিয়েছে। স্বতরাং এক কালে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই অশোকলিপি ছড়ানো ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের রাজত্বকাল (খ্রি-পূ ২৭২-২৩২) থেকে প্রায় বাইশ শো বছর ধাবৎ এগুলি কালের আক্রমণ সযেও টিকে রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম করেক শত বৎসর যে এই অমুশাসনসমূহের লিপি ও ভাষা শিক্ষিত জনসাধারণের বোধগম্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সময়েও অশোকের অমুশাসনগুলির ভাষাপূর্ণ তাঁর সম্মতবাসীরা যে বার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, বার্থক্যে তা দেখাতে চেষ্টা করত। কালক্রমে এগুলির লিপি ও ভাষা উত্তরোত্তর দুর্বোধ্য হয়ে একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেল। বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির অবসানে সপ্তদশ-অষ্টদশ শতক থেকে এগুলি পুনরায় শিক্ষিতজনের দৃষ্টিগোচর হতে লাগল, কিন্তু বোধগোচর হতে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হল। বহু সাধকের বহু প্রয়াসের পরে অবশেষে ১৮৩৭ সালে জেমস্ প্রিন্সেপ্ অশোকলিপির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন। সে সময় থেকে আর পর্বত প্রায় সপাদ শতাব্দীকাল ধরে নতুন নতুন অশোকলিপির আবিষ্কার, তার বার্থ পাঠনির্ণয় ও অর্থনির্ণয় এই ত্রিবিধ কাজের দ্বারা চলছে অবিশ্রান্ত গতিতে। এই উপলক্ষে কত যে গবেষণা এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে, তার ইহুতা নেই।* তথাপি এখনও অশোকামুশাসনের বার্থ ভাষাপূর্ণ নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয়নি; কতকগুলি ছোটখাট বিষয়ের অর্থনির্ণয়ে সন্দেহ তো আছেই, কয়েকটি প্রধান বিষয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়।

মতভেদের মুখ্য বিষয় দুটি, অশোকের ধর্মনীতি ও অহিংসানীতি। আচর্মের বিষয় এই যে, আধুনিক কালের মতো প্রাচীনকালেও মতভেদ দেখা দিয়েছিল মুখ্যতঃ এই দুটি বিষয়কে আশ্রয় করেই। প্রথমে আধুনিক মতভেদের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

আধুনিক যুগের অনেক ঐতিহাসিক অশোককে একান্তভাবে অহিংসাপরাধ বোধদুপলভিত্বপেই দেখেন; কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে প্রধানতঃ এই দৃষ্টিতেই দেখা হত। ১৯০১ সালে হিন্‌সেট শ্বিৎ অশোকের বে জীবনবৃত্তান্তখানি প্রকাশ করেন তার নাম Asoka, the Buddhist Emperor of India। এই নামেই প্রকাশ যে, অশোকের বোধদ্বয়ই তাঁর দৃষ্টিতে প্রাধান্য পেয়েছে। অতঃপর ১৯২২ সালে প্রকাশিত Cambridge History of India গ্রন্থে ডক্টর টমাস বলেন, "The degree of Asoka's appreciation of Buddhism is not very easily definable" (প্রথম বও, অধ্যায় ২০, পৃ ৫০৪)। তাঁর এই মন্তব্যের অন্ততম প্রধান কারণ অশোকলিপিতে চার আর্দ্রত্যা, অষ্টদ্বর্ম, নির্বাণ প্রভৃতি বিশেষভাবে বোধদ্বয়চক ভাষার সেন্নমাত্র প্রয়োগও দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে বক্তব্যবী আদ্যাদ্যর বলেন—

* অলোচন সেল, Asoka's Edicts (১৯৫৬), পৃ ১, ৩০

১০ যথ বিখ্যাত্যায় প্রকাশিত M. A. Mehtadale প্রণীত Asokan Inscriptions in India-নামক গ্রন্থ (১৯৪৭) অশোকবিষয়ক রচনায় একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে। তাতে ১৮৩৪ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ১০০টি গ্রন্থ ও গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই তালিকাও অসম্পূর্ণ।

This might lead one to conclude that Asoka could not be correctly described as a Buddhist. But that would be an extreme view and go against other evidences. It is undeniable that he became and remained a Buddhist but of a tolerant and unexclusive type.

—তিনিবাস মূর্তি ও কৃষ্ণ আয়াসার-প্রণীত *Edicts of Asoka*, ভূমিকা, পৃ xxx

অথচ অশোক প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—

The idea that it was a special Buddhist term *Dhamma* and stood both in its substantive and adjectival forms only for the idea peculiar to Buddhism is incorrect. Asoka's *Dharma* is in fact only the Brahmanic concept in its wide range of application.

—ই, পৃ xxiv-xxv

সেবা দাচ্ছে অধ্যাপক দ্বন্দ্বানী আয়াসার অশোককে বৌদ্ধ অথচ তাঁর প্রচারিত ধর্মকে ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। এই অল্পই টমাস সাহেব অশোকের বৌদ্ধত্বের স্বরূপ সহজনির্ণেয় (easily definable) নয় বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

খ্যাতনামা বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ পরলোকগত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের অভিমতও এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন—

‘অশোক যে বৌদ্ধধর্মের দিকে ঘুর ফুঁকে পড়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অশোকার-
দানের কাহিনী বিবাদ করলে স্বীকার করতে হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বেশ ব্যাড়াব্যাড়িই করেছিলেন।...
তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে ব্যাড়াব্যাড়ি করে থাকলেও কিছু অস্ত্রায় করেন নি।... তাঁর চোঙাতেই বৌদ্ধধর্ম
অগ্রগতিসম্পন্ন হয়ে অল্পকালের মধ্যেই একটি মহানানবীর সভ্যতায় পর্ববসিত হয় এবং সমস্ত এশিয়ার
উদ্ভূত করে।’

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র, ১:৫৭), পৃ ২০০-২০১

অধ্যাপক বাগচী স্পষ্টতই অশোকসিঁথির চেয়ে বৌদ্ধশাসিত্যের (প্রধানত: অশোকারদানের) উপরে
অধিকতর আস্থা স্থাপন করেছেন; কলি তিনি অশোকের নৃপতিত্বের চেয়ে তাঁর বৌদ্ধত্বকেই বড় করে
দেখেছেন। তাঁর মতে অশোক রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে চেষ্টিত হয়েছিলেন এবং ‘তাঁর
চোঙাতেই’ বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হতে পেরেছিল। হাওয়াচিত নিরপেক্ষতা রক্ষা না করে অশোক
যে বৌদ্ধধর্মের দিকে ‘ঘুর ফুঁকে পড়েছিলেন’ অর্থাৎ ওই ধর্মের প্রতি পক্ষপাত্তি করেছিলেন সেটা কিছু
‘অস্ত্রায়’ হয়নি। কেননা তাতে মহানানবীর সভ্যতার সহায়তা হয়েছিল। এক কথায় অধ্যাপক বাগচীর
মতে অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্মই রাজধর্মের (state religion-এর) স্থান অধিকার করেছিল।

এবার আর-এক জন বৌদ্ধশাস্ত্র পণ্ডিতের, পরলোকগত অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়ার, অভিমত
উদ্ধৃত করা যাক—

Buddhism was not made a state religion by Asoka. It was Asoka's personal religion, and he publicly stated that it was so. But the principles of the

Dharma that he had advocated were *neither propounded nor promulgated in the name of the Good Faith or any other religion.*

—*Asoka and His Inscriptions* (১২৪৬), পৃ ৩২৪ । বক্রলিপি লেখকের ।

Good Faith বানে সত্ব, আর স্বত্ব হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের নামাঙ্কর । বৌদ্ধরা নিজধর্মকে বলত সত্ব, অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকেই বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত করত । যা হক, যেখা যাচ্ছে অধ্যাপক বড়ুয়ার মতে অশোক বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্মরূপে গ্রহণ করেন নি এবং বশেষে কিংবা বিশেষে তিনি যে ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন তা সত্ব নয় কিংবা স্বত্ব কোনো বিশেষ ধর্মও নয় । অর্থাৎ সর্বধর্মের সার চিরন্তন (পোরানা পবিত্র) ও বিশ্বজনীন মানবধর্মই অশোকের অহুশাসনাবলীর লক্ষ্য । তবে অধ্যাপক বড়ুয়ার মতে ব্যক্তিগতভাবে অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, যদিও রাজা হিসাবে তিনি সে ধর্ম প্রচার করেননি । অশোকের প্রচারিত ধর্ম হচ্ছে অতীত তিনি আরও স্পষ্ট করেই বলেছেন—

It is *non-credal* in its stress and *non-sectarian* in spirit...non-sectarian in the sense that it nowhere intends thrusting any man's views and beliefs upon another.

—ঐ, পৃ ২৭১

আরও একজন বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ ঐতিহাসিকের অভিমত উদ্ধৃত করা যাক । অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত বলেন—

That Asoka was an out and out radicalist and a rationalist is clearly revealed in his edicts. He cared neither for the Brahmanical rituals and traditions nor for the Jaina or Buddhist forms of ceremonies and observances... He had his *own ideal of religion* an ideal that *would not bear a sectarian name.*

—*Early Monastic Buddhism*, দ্বিতীয় খণ্ড (১২৪২), পৃ ২৪৮-৪৯ । বক্রলিপি লেখকের ।

বোকা। বাজে অধ্যাপক দত্তের মতেও অশোকের ধর্মমতকে কোনো সাম্প্রদায়িক নামেই অভিহিত করা চলে না, হুতরাং তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন একবার কোনো সার্বকর্তাই থাকতে পারে না । বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশোকের মনোভাব লক্ষ্যে অধ্যাপক বড়ুয়া ও অধ্যাপক দত্তের অভিমত প্রায় একই প্রকার ।—

Asoka as the emperor showed toleration to all religions, although he had a *personal fancy for Buddhism* and very probably he became a Buddhist *upasaka.*

—ঐ, পৃ ২৬৩

ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অহুত্ব ছিলও অশোক ওই ধর্মকে নির্বিচারে ও সর্বতোভাবে গ্রহণ করেননি । তাঁর মতো radicalist ও rationalist-এর পক্ষে কোনো কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না । এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দত্তের আর-একটি উক্তি (ঐ, পৃ ২৪৮-৪৯) উদ্ধৃত করা প্রয়োজন ।—

There are ample evidences to show that Asoka had a *great, if not the highest, regard for Buddha* and his teachings...In forming the conception

প্রিয়দর্শী অশোক

of his ideal he was undoubtedly influenced by the Buddhist and Jaina teachings, but he was not enamoured of the Buddhist or Jaina ideal of retirement from worldly life.

সুতরাং এই মতে অশোক নিষিদ্ধারে ও সর্বভোভাবেই বৌদ্ধধর্মকে মেনে নিয়েছিলেন, একথা বলা চলে না। অর্থাৎ অশোকস্বীকৃত ধর্মে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল একথা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে ধর্মকে একান্তভাবে বৌদ্ধ আখ্যা দেওয়া চলে না। এই যে সম্ভ্রামাধিনিরপেক্ষ বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ, এ হচ্ছে আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এ হিসাবে বলা যায়, অশোক ছিলেন তদানীন্তন যুগের অনেক অগ্রবর্তী।

বা হোক, যেথা গেল অশোকের বৌদ্ধত্ব সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতভেদ রয়েছে। বখাস্বানে সেপাতে চেষ্টা করব, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এ বিষয়ে আরও গুরুতর মতভেদ বেশা নিয়েছিল।

এবার সেথা যাক অশোকের অহিংসানীতি সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত কি। সাধারণ ও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, অশোক একান্তভাবেই অহিংসানীতিকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু অশোকের অশ্রমশালনগুলি থেকে ম্পষ্টই প্রতীয়মান, শুধু প্রতীয়মান কেন, প্রমাণিত হয় যে, এই প্রচলিত ধারণা একবারেই ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে আমি ‘ধর্মবিম্বী অশোক’ গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ওই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে পরলোকগত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেন—

‘আমার বিশ্বাস অশোক সম্পূর্ণরূপে হৃদয়বিরোধী নীতি ও অহিংসানীতি অবলম্বন করেছিলেন।’

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৭), পৃ ২০০

এই মতভেদের প্রধান উপলক্ষ অশোকের ত্রয়োদশ নৈলম্বাহুপাসনের ব্যাখ্যা। অধ্যাপক বাগচী বলেন, ‘প্রবোধবানু ত্রয়োদশ নৈলম্বাহুপাসনের যে অর্থ নির্ধারণ করেছেন তা সর্ববাকীলম্বত নয়’। ওই সিপির একটি অংশ এই—

‘যো পি চ অপকরেষ তি ক্ষমিতবিরমতে ব দেবনঃপ্রিয়ঃ স্বঃ শকো ক্ষমনয়ে। যপি চ অটবিহো দেবনঃপ্রিয়ঃ বিম্বিতে ভোতি ত পি অহুনেতি অহুনিকপেতি, অহুতপে পি চ প্রভবে দেবনঃপ্রিয়ঃ বৃতিতে তেব কিত্তি অবত্রপেষ্, ন চ হংক্রোধস্থ।’

আমি এর প্রথম বাক্যটির মর্মার্থ দিচ্ছেছিলাম এভাবে, “যদি কেউ আমার অপকার করে তবে লজ্জা পূর্ণত্ব ক্ষমা করা চলে ততক্ষণই আমি তাকে ক্ষমা করব”। এর তাৎপর্য এই যে, ওই অপকারেজুগের লক্ষ্য করে অশোক বলেছেন যে, ‘তীরও বৈধ এবং ক্ষমার একটা গীমা আছে, ওই গীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি অশ্রমধারণ করে তাঁদের শান্তিবিধান করতে কুণ্ঠিত হবেন না’। উদ্বৃত্ত অংশের বিতীর্ণ বাক্যের মানে এই যে, ‘অশোক তাঁর সাম্রাজ্যাত্তর্গত অটবীরাট্যের অধিবাসীদের জানাজ্ঞেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের ক্ষত অহতপ্ত হলেও তিনি শক্তিহীন নন, তাঁদের কৃতকার্যের ক্ষত তরা যদি লক্ষ্য প্রকাশ না করে তবে তাঁদের হনন করা হবে’ (‘ধর্মবিম্বী অশোক’, পৃ ৩২-৪০)। অধ্যাপক বাগচীর মতে প্রথম বাক্যটির আমার কৃত ‘অর্থনির্ধারণ’ ‘সর্ববাকীলম্বত নয়’ এবং ওই অর্থ থেকে আমি যে ‘অহুমান’ করেছি তাও ‘চলে না’। আর বিতীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন—

‘কৃতকার্ণের ক্ষুদ্র আটবিরামোদ্য লোকের। অমৃতপুত্র না হলে অশোক তাদের ‘হনন করবেন’ এরকম কথা শুনে যেন হত। অশোকের উক্তি ওরকম অর্থ করলে তাঁর জয়োল্লাস শৈললিপির সমস্ত মর্মবাণী ক্ষুদ্র হয়ে যায়।’

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ঐ, পৃ ২০১

কেননা তাঁর ‘বিশ্বাশ’ অশোক ‘সম্পূর্ণরূপে’ই দুঃখবিরোধী ও অহিংসা নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর মতে ওই বাণীটির অর্থ এই—

‘সেবানামা-প্রিয় অটবির অধিবাসীকেও অস্ব করছেন ও (নিম্নের ধর্মব্রতের) অহুগামী করেছেন। তাদের বৃত্তি দেওয়া হয়েছে যে, অমৃতপুত্র হওয়াই প্রধান (নীতি), ক্ষুদ্রতা তাঁরা যেন অমৃতপুত্র হয় ও (জীবনের অথবা নিম্নের) হনন না করে।’

এরকম অর্থ করা অশোক সম্বন্ধে হুজিরগোষ্ঠিত বিশ্বাসের অহুতুল বটে; কিন্তু অশোকের ভাষায় এই অহুবাদ একেবারেই অসঙ্গত, কষ্টকল্পনার আশ্রয় না নিয়ে,—একথা স্বীকার করতেই হবে। স্বতীকৃত কথাগুলিই কষ্টকল্পনার নিঃসংশয় পরিচয়। অশোকের ভাষায় সহ্য ও স্বাভাবিক অহুবাদের পথে না গিয়ে প্রচলিত বিশ্বাসের অহুতুল করে অহুবাদ করবার ফলে ‘ন চ হংকোরহু’ অংশের কর্মবাণীটি কর্তব্যচ্যে পরিণত হয়েছে। ন হংকোরহু নামে ন হস্তেরন (হস্ত না হয়), ন হহা: (হনন না করে) নয়। তিনশেট শিখ প্রবৃ সব ঐতিহাসিকই এই ক্রিয়াপদটিকে কর্মবাণীতেই গ্রহণ করেছেন। আর আধুনিক বিশেষজ্ঞরা সবাই অশোকের এই উক্তিটির তাৎপৰ্য নির্ণয় করেছেন ভাবার স্বাভাবিক অর্থের পথ ধরে, প্রচলিত বিশ্বাসের পথ ধরে নয়। ভাষারকর এবং বড়ুয়া-প্রবৃ ঐতিহাসিকরা কেউই এই অংশের ব্যাখ্যায় প্রচলিত বিশ্বাসের পথে চলেননি এবং কলে অশোককে সম্পূর্ণরূপে অহিংসাপন্থী বলে মনে করেননি। অশোকানুশাসনের আধুনিকতম ব্যাখ্যাকার অমূল্যচন্দ্র সেনও করেননি। উল্লিখিত অংশটির ব্যাখ্যাগ্রন্থে তিনি বলেন—

‘যদিও তিনি কলিঙ্গযুদ্ধের কলে অমৃতপুত্র হইয়াছেন তথাপি ওঁহার এমন প্রজাব (শক্তি) আছে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাত্যচারিদিকে দমন করিতে পারেন।... ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজন হইলে যুদ্ধও পর্যন্ত বলপ্রয়োগ অশোক সম্পূর্ণ বিসর্জন করেন নাই।’ —অশোকলিপি (১৯৫০), পৃ ৮৮

There is a veiled threat in Asoka's solicitude for the Antas as well as the Atavis... Asoka not only did not preclude but clearly anticipated circumstances under which his descendants and successors might have recourse to armed conquest or resistance. All that he insisted on was that even as belligerents, they should avoid excesses as for as practicable in acts of reprisal.

—Inscriptions of Asoka, দ্বিতীয় বও (১৯৫০), পৃ ৩২০-২১

অর্থাৎ, অশোক নিজে প্রত্যক্ষবাসীদের তথা সাম্রাজ্যবৃত্ত আটবিকদের সংঘত থাকবার অহুরোধ জানিয়েছিলেন, অরপায় তাদের বওবিধানের ভয়(threat)-ও দেখিয়েছিলেন। তা ছাড়া, নিম্নের রাজত্বকালে না হোক, তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময়ে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথাও তিনি ভোলেননি; তাই তিনি তাঁদের যুদ্ধ থেকে সর্গতোভাবে নিরস্ত হবার উপদেশ না দিয়ে বিজিতদের প্রতি দৃশ্যসংগ-

প্রিয়দর্শী অশোক

পরিহার ও লুণ্ঠণবিধানেরই উপদেশ দিয়েছেন। হতরাস অশোককে সর্বতোভাবেই হৃদয়বিরোধী বলে বর্ণনা করা যায় না। এই প্রগমে অধ্যাপক বড়ুয়ার আর-একটি উক্তি এই—

There is not the slightest hint in the edicts and legends of Asoka that he either disbanded the army or was not fully prepared to cope with the menace to the security of life and property of the citizens arising from the mischievous action of the Atavis (RE XIII) or to his territory arising from the inimical action of the independent neighbours (SRE II).

—*Asoka and His Inscriptions* (১৯৪৬), পৃ ২৮১-৮৬

পঞ্চাশের কাশ্মীরসাগর স্রাবসবাল এবং অধ্যাপক দেবদত্ত রায়চন্দ্র ভাণ্ডারকর ও হেমচন্দ্র দায়চৌধুরীর স্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকরা মনে করেন অশোক একান্তভাবেই হৃদয়পরিহারের নীতি গ্রহণ করেন এবং ফলে বিশাল নৌবলসামর্যের সামরিক শক্তি দুর্বল হয় ও তার আশ্রয়বিধানের পথ রচিত হয়। এই মত অধ্যাপক বাগচীর শিক্ষান্তের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধ্যাপক রতনাবী আয়াসার-প্রমুখ ঐতিহাসিকরা অধ্যাপক বড়ুয়ার মতেরই পক্ষপাতী। অধ্যাপক আয়াসারের মতে অশোকের রাজত্বকালেও বিখ্যাত মৌর্য সৈন্যবাহিনী ও তার সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণই ছিল।—

The great army, the largest of the time and created by Candragupta, apparently continued to be maintained. Peace and pacific intentions do not imply disarmament. The experience of Macedonian invasion and of the invasion of Seleucus as well as the Kalinga episode must have made the retention of the vast army necessary.

—হুতি ও আয়াসার-প্রস্তুত *Edicts of Asoka*, ভূমিকা, পৃ xxxiv

ডক্টর অম্বাচন্দ্র শেনের অভিমতও এমুলে উল্লিখিতযোগ্য।—

‘অনেকে মনে করেন হৃদয়বিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অশোক অন্তর্ব্যবহার, বলপ্রয়োগ প্রভৃতিও সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ধর্মপ্রচারের ভাবপ্রবণতার ভাগিদা নিজেও দুর্বল অহিংস ‘বৈষ্ণব’ হইয়াছিলেন, রাজশাসনও বলহীন ও বিনুশূল করিয়াছিলেন। তাহা ঠিক নয়, কারণ অপরাধীর মৃত্যুও পশু শাস্তি, দুর্গত অবস্থা দুনীতিপরাধগণকে সশস্ত্র বলপ্রয়োগে বন্ধন, প্রয়োজন হইলে বিনাশ পর্যন্ত—সবই তাঁহার শাসননীতিতে পরিচলিত হইয়াছিল।’

—অশোকলিপি (১৯১৩), পৃ ৪০-৪১

সেখা গেল অশোকের অহিংসা এবং হৃদয়পরিহারনীতি সন্দেহও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে দৃষ্টের মতভেদ আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন কালেও এ বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিবেছিল বলে মনে করবার হেতু আছে।

৬

এবার প্রাচীনকালে অশোক সন্দেহে সেন্যব্যাপী মতভেদের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক মতভেদের সঙ্গে প্রাচীন মতভেদের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, যদিও বিষয়গত পার্থক্য নেই। মতভেদের প্রধান বিষয় দুটি, অশোকের ধর্ম ও অহিংসা-নীতি।

এখানে অশোকের বর্ষ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। অশোক পুরোগ্রহি বৌদ্ধ ছিলেন কিনা, আধুনিক যত্নেবের বিষয় হচ্ছে তাই। কারণ হতে অশোক ছিলেন পুরোগ্রহি বৌদ্ধ, কারণ হতে তিনি ছিলেন অন্ততঃ বৌদ্ধ, কারণ হতে সম্পূর্ণ অসম্ভাব্যিক। কিন্তু কোনো পক্ষেই অশোকের সংঘে সংঘ ও তাঁর প্রতি প্রভাব অজ্ঞান নেই। আর সন্তোষেরই আলোচনার একমাত্র না হোক, প্রমাণ অবলম্বন অশোকের সিপিমালা। পক্ষান্তরে প্রাচীনকালে অশোকের বৌদ্ধত্ব লক্ষ্যে কোনো পক্ষেই কোনো সংঘ ছিল না; সংঘ দেখা দিয়েছিল তাঁর বহু লক্ষ্যে এবং তাঁর প্রতি প্রভাবাংশ লক্ষ্যে। আর তখনকার আলোচনা ও যত্নেবের অবলম্বন ছিল অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর অশোকের সিপিমালা যে তখনকার অবলম্বন ছিল এমন মনে করবার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, বরং তাহতাতোড়া সে সিপিমালায় অর্থ যে শিক্তিত সম্প্রদায়ও বৃত্তে পাঠেনি এমন মনে করবার হেতু আছে।

আধুনিক যুগের একজন মনোবী বৌদ্ধ, অধ্যাপক বেনীমায় বহুত্ব, অশোকের সিপিমালা অবলম্বনে তাঁর বর্ষিত লক্ষ্যে যে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন তা এই—

The Maurya emperor welcomed the lofty teachings of Buddha,...because its underlying principles and spirit were found *accidentally* to be in harmony with his own perception as to the nature of human good and his *own original* vision as to the nature and course of human progress. Whatever good thing Asoka had learnt from the exponents of Buddhism and other men of religion he made it his own.

—Asoka and His Inscriptions, পৃ ৩২২-৩০ বহুসিপি লেখকের।

এই অভিমতের সঙ্গে অধ্যাপক মলিনাক হকের পুরোগ্রহিত অভিমতের অনেকাংশে মিল আছে। অশোকের বাহন শৈলাস্থাপনের থেকে জানা যায় তিনি সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন এবং সব সম্প্রদায়েরই বাতে 'সারস্বতি' হয় সে বিষয়ে তিনি সন্তোষিত ছিলেন। অতঃপরে নিম্নবর্ণের প্রশংসা ও পরমর্ষের বিচার হত না হয়ে সব ধর্মের সৌকর্য্য বাতে সমবেত হয়ে পরম্পরের বর্ষিত প্রভাবস্বাক্ষরে তখন ও আলোচনা করে 'বহুত্ব' (অর্থঃ বহুসম্প্রদায়) হয়, এই অভিমতের অশোক বর্ষিতস্বাক্ষর প্রকৃতি স্বাক্ষরস্বাক্ষরের নিয়োগ করেছিলেন। এর থেকে সম্বন্ধেই অস্বাভাবিক কথা আর অশোক নিজেও বৌদ্ধ প্রকৃতি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিপ্রশংসা না করে সব বর্ষিতই অবলম্বন হয়ে বাহুত্বতা** লাভ করেছিলেন। আর তাঁর হত বহুত্ব পুঙ্খ যে নিজেই কোনো বিশেষ ধর্মের পত্তী মতো আবহ না রেখে সব ধর্মের 'শান্ত' অবলম্বনে বহুত্ব পট্টন করবেন, তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। এই কথায় প্রকাশ পেয়েছে, অধ্যাপক বহুত্বের উপর-উপস্থিত শেষ দাব্যকিত। আর এইকথায় অধ্যাপক মলিনাক বহুত্ব বলেছেন অশোকের বর্ষিত তাঁরই স্বকীয় হত, তাকে কোনো সাম্প্রদায়িক নাম দেওয়া যায় না (that would not bear a sectarian name)।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ কোনো সম্প্রদায়ই অশোককে এই স্তূপে দেখেনি; তারা হয় অশোকের বাহন শৈলাস্থাপনের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি, না-হয় সে অস্থাপনাতিকে তারা উপেক্ষা বা

প্রিয়বর্নীর অশোক

প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে কোনো পক্ষই অশোককে বিরোধক বা অসন্তোষনক বলে মনে করতে পারেনি, উভয় পক্ষই তাঁকে পরম বোধ বলে মেনে নিয়েছিল। তার কারণ তাঁর রাজত্বকালেই বৌদ্ধবর্ষ প্রচারলাভের সুযোগ পেয়েছিল সব চেয়ে বেশি। প্রথমতঃ, বুদ্ধের ও বৌদ্ধভাবের প্রতি অশোকের অস্বাভাবিক ছিল অতি পটীয়া, একথা ভাবনাকার মনেও সুবিধিত ছিল। তদন্তেও প্রজাধিকারের যথো বৌদ্ধবর্ষ প্রচারের আহ্বান দেয়িতল স্বেচ্ছা নেই। দ্বিতীয়তঃ, সবচেয়েব্যাখী পাতি এবং বৈবেদিক হাভোর স্বেচ্ছা স্বেচ্ছাও বৌদ্ধবর্ষের বিতরণপ্রবণতার সহায়তা করেছিল, একথাও স্বেচ্ছা অস্বাভাবিক কবা যায়। অধ্যাপক মলিনাক বসু বলেন—

It was on account of the peaceful state brought about by Asoka's rule that it was possible for Buddhism to reach all the parts of India and to become a dominant force in the history of religions in India.

—Early Monastic Buddhism, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২১০

তৃতীয়তঃ, অশোকের বিরোধকতা এবং সহায়িতাও স্বেচ্ছা বৌদ্ধবর্ষকে ব্রাহ্মণ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্ত করে অস্বাভাবিক বিতরণলাভের সুযোগ দিয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে বৌদ্ধরা অশোককেই তাঁদের ধর্মের সবচেয়ে পুণ্যপাথক বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। অপর দিকে ব্রাহ্মণ্যের দৃষ্টিতেও তিনি সত্যরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারেননি। রাজার স্বেচ্ছা বা বিরোধকতা নয়, তাঁর ঐকান্তিক পক্ষপাত ও অসম্মান অস্বাভাবিকতা ছিল ব্রাহ্মণ্যসমাজের বিশেষ দাবি। রাজা হবেন বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক এবং বিশেষ করে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রতিপালক (এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয়, পরবর্তী কালে শিবাজী 'মোহাম্মদপ্রতিপালক' উপাধি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন), এই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অস্বাভাবিক বিধান। কিন্তু অশোক এ বিধান পালন তো করেনই নি, পক্ষান্তরে তিনি যে অস্বাভাবিক ব্রাহ্মণ ও প্রবণ উভয় স্বেচ্ছাই প্রতিপালকের দাবি গ্রহণ করেছিলেন তার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে তাঁর অস্বাভাবিকতায়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বসু বলেন—

There is nothing in the edicts to indicate that Asoka intended to be the upholder of the Brahmanical system as such.

—Asoka and His Inscriptions, পৃ ২০৭

সুতরাং অশোক যে তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের দৃষ্টিতে স্বাভাবিকজনক অস্বাভাবিক রাজা বলে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, তা কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাই তাঁরা অশোকের বিরোধকতাকে অস্বাভাবিক করে তাঁকে বৌদ্ধপক্ষপাত বলেই গণ্য করতেন। এইভাবে অশোক বোধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় পক্ষের দৃষ্টিতেই বৌদ্ধপন্থিত হয়েই পরিচিতি হন। বলা বাহুল্য কোনো পক্ষের দৃষ্টিই অস্বাভাবিক ছিল না; উভয় পক্ষই অশোককে স্বেচ্ছা বুদ্ধ এবং তাঁর স্বাভাবিক ব্রহ্মণ্য বা অস্বাভাবিক হ্রাস দেন।

অশোক বোধ, ঐতিহ্যে দুই পক্ষই একমত। কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে বাহুল্য তাঁর সহায় নিয়ে। এই স্বতন্ত্ররূপের দৃষ্টে অশোকের সহায়কে অতিদ্বন্দ্বিতা করে তাঁর সত্যস্বপ্নকে প্রমাণ করে দিল। তাই হতে অশোকের সহায় হ্রাসের দৃষ্টেই ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধবর্ষ। এই বিষয়কে সত্য প্রতিপন্ন করবার প্রবল আশ্রয়ে তারা একমত অশোকের পূর্বসূরীকে অতিদ্বন্দ্বিতা এবং অপরদিকে তাঁর উত্তর-সূরীকে অতিপ্রাকৃত করে অতিদ্বন্দ্বিতা করে দিল। তাই ফলে দেন যে, বৌদ্ধবর্ষই অশোককে সহ-

করেনি, তিনি মহৎ ছিলেন বলেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর মহৎ জগতের প্রসঙ্গতা লাভ করার ফলেই বৌদ্ধধর্ম অগাধবাপী প্রতিষ্ঠানোজের স্বযোগ পেয়েছিল। যা হোক, একথা আশ্চর্য্যের স্বাক্ষর করতেই হবে যে, বৌদ্ধধর্মের এই উদারবিশ্ব অতিক্রান্তির মিথ্যাবরণ অপসারণ করে অশোককে সত্যের মুক্ত আলোকে প্রকাশ করা আজও সম্পূর্ণ সম্ভব হয়নি। আর এই সত্যপ্রকাশের একমাত্র অবলম্বন অশোকের অশ্বশাসনাবলী।

অপর দিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতেও অশোকচরিত্রের মহৎ অবলম্বিত দিকে অগ্রসর হল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবজ্ঞা ও বিরুদ্ধতার কথা স্থবিধিত, তার পুনরুজ্জীবিত নিশ্চয়োদয়ন। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যথায়ূগে চৈতন্যপ্রভাবের কালশে সে বিরুদ্ধতার তীব্রতা কিছুমাত্র কমেনি। সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের (যোড়ন শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) একটি উক্তি এই—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয ত নাস্তিক,

বেদান্তে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক।

—চৈতন্যচরিতামৃত, যথালীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণ্য সমাজের দৃষ্টিতে অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁদের চিরন্তন বিরুদ্ধতার অবমাননা থেকে তিনিও নিষ্কৃতি পাননি। অশোকের প্রতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরাগ ও বিমুগ্ধতা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করার বিশেষ গাণ্ডিকতা আছে। তৎপূর্বে একথা বলা প্রয়োজন যে, এক দিকে বৌদ্ধ সমাজের অতিক্রান্তি, এবং অপর দিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবজ্ঞা, এই দুই বিরুদ্ধ ও অসত্য দৃষ্টির ফলে অশোকচরিত্রের যে বিকৃতি ও কল্প পরিণতি ঘটেছে তাই হচ্ছে ভারত-ইতিহাসের শোচনীয়তম ইয়াত্রোভি। বৌদ্ধব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধের নিদাক্ষতম বলি হলেন ভারতবর্ষের সুপণ্ডিতময় প্রিয়বর্শী অশোক। এই বলির হৃদয়গ্রন্থী সুপ্রভাব থেকে ভারতীয় ইতিহাস আজও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

৭

বৌদ্ধব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধের ফলে এই যে অশোকের জীবনসত্য দীর্ঘকাল ধরে বিকৃতি ও বিবৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকল, যেন হয় তাঁর বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল যেন তাকেই নিরন্তর করে ভাবী কালের কানে নিজের জীবনবাণীকে পৌঁছে দেওয়া। 'কালোহয়ং নিরবধিবিপুল্য চ পুত্রী' এই কথা মরণে যেনে এবং 'সত্যদেব জয়তে' এই ভারতবাণীকে আশ্রয় করে তিনি তাঁর জীবনধর্মের বাণীকে যোমাই করিয়ে রাখলেন অক্ষয় শৈলপৃষ্ঠে ও শিলাস্তম্ভের গায়ে, অকুল কালসমুদ্রের অগ্নান্না তীরের প্রতি লক্ষ্য যেনে বাহ্যিক বলসেন, 'চিরস্থিতিক হোক' এ বাণী। সত্যসুখ শাস্তাবলাদ মহাবিপত্তির অজ্ঞাত জীবনসাধনা পূর্ণ হয়েছে, তাঁর ভারতবাণী মুক্ত শিলাশিপিহাল। বহু শতাব্দীর যৌন পরিহার করে আজ সংসা মুখরিত হয়ে আনন্দের জগতের কাছে ধনিত করে তুলেছে তাঁর জীবনবাণীকে। দীর্ঘ নিশীথের স্থিতি অবসানে আমাদের মুক্ত দৃষ্টির লক্ষ্যে প্রিয়বর্শী অশোককে আশ্রয় করে মূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের সেই ভূপ থাকে সোধান করে কবি বলেছেন 'রাজা জুনি নহ, হে মহাতাপন', যার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

দাও আমাদের অন্তরময়, অশোকময় ভব।

দাও আমাদের অন্তরময়, দাও পো জীবন নব।

প্রিয়দর্শী অশোক

প্রাচীন ভারতের বাণীবর রূপ দুইবার দুই ব্যক্তিগুরুত্বকে আশ্রয় করে জীবনসত্যো বিকশিত হয়ে উঠেছিল ; একবার আশ্রয় করেছিল সৌত্য সিদ্ধার্থকে, দ্বিতীয় বার প্রিয়দর্শী অশোককে। এই দুই ব্যক্তিদ্বার অমিতপ্রভাভেই ভারতবর্ষ জগৎ-ইতিহাসে চিরভাষ্যর হয়ে বিরাজ করছে। প্রাচীন ভারতের কাছে কবির অন্তরের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে অবিস্মরণীয় ভাষায়—

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজ্যগনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ডরিয়া লব।

ভারতবর্ষের যে মুক্ত মহাজীবন ভগবান্ বৃদ্ধের তপশ্রাঘ উদ্ভব হয়েছিল যুগথেকাশলাদি জনপদের বেগুন আম্রবন ক্ষেতবন প্রভৃতি তপোবনে, প্রিয়দর্শী অশোকের সাধনায় তাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সমগ্র জঘূষীপের রাজসিংহাসনে। এই রাজতপবীর জীবনসাধনার কথা অক্ষয় নিলাব্রোষায় বিস্তৃত হয়ে থাকলেও তা বহুকালব্যাপী মৃত্যুর বনাঙ্ককারে আবৃত হয়ে ছিল। স্বদীর্ঘ বোহরজন্মীর অবসানে ইতিহাসহর্ষের অন্ধ-কিরণসম্পাতে সেই মহাজীবনের অপূর্ব রূপ আশ্র আবার ডাঙ্ঘর রেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নবীন ভারতের সমুখে রাজধি অশোকের বোহন মূর্তিতে। তাই আশ্র আমরা ভারতবর্ষের সেই রাজমূর্তিকে কবির ভাষায় সযোজন করে বলতে পারি—

হে রাজতপবী বীর, তোমার সে উষার ভাবনা
বিধির ভাঙারে
সজ্জিত হইয়া গেছে, কাল কন্তু তার এক কথা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, বদেধলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত হয়ে গেছে চিরদুঃখগাঙ্ঘর-ভরে
ভারতের ধন।

ঋতুসংহার

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ঋতুসংহার কি কালিদাসের রচনা ?

ঋতুসংহার কাব্যটি পড়াই কালিদাসের রচনা কি না, এই প্রশ্ন লাইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে আত্মও পর্যন্ত বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। তবে, যেটামুটিভাবে, ইহা কালিদাসেরই নবীন বয়সের রচনা, ইহাই প্রচলিত সিদ্ধান্ত। ইহার ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে স্কুডিত, তাঁহারের কয়েকটি যুক্তি উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, মলিনাথ তাঁহার রত্নবংশ ও কুমারসম্ভব এই দুইটি মহাকাব্যের ব্যাখ্যায় প্রায়শ্চৈ অবতরনিকা স্নোকে বশিষ্ঠাছেন—

ভারতী কালিদাসস্ত দুর্বাখ্যাবিবৃদ্ধিতঃ।

এবা পল্লীকনী ব্যাখ্যা ভাকডোম্মৌবচিচ্চতি।

কালিদাসের বাণী আৰ দুর্বাখ্যাত্তম নিবচিনাং সূক্ষ্মগ্রন্থঃ; আহার এই 'সল্লীকনী' ব্যাখ্যাই তাহাঃ; ক উচ্ছাবিত্ত করিয়া তুলিবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

মলিনাথকবি সোহঃ মল্লারাশ্রমিচক্ষরা।

চ্যচাই কালিদাসীঃ কাব্যগ্রন্থমহাশ্রমঃ।

মলিনাথকবি ঋতুসংহার পারিকল্পণের অনুগ্রহের জন্য কালিদাসের 'কাব্যগ্রন্থ' নির্ণয়ভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সুতরাং মলিনাথ নিজেই স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, তিনি কালিদাসের 'কাব্যগ্রন্থ'র উপরই লজ্জাবনী ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভব, রত্নবংশ ও মেঘদূত—এই তিনখানি কাব্যই মলিনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ঐগুলি যে কালিদাসের রচনা সে বিষয়ে কোনও বতর্ভেদ নাই। ঋতুসংহারের উপর মলিনাথের কোনও টীকা নাই—সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে এই অস্থান যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয় যে, মলিনাথের মতে ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা নহে।^১ কিন্তু এই যুক্তির ভিত্তি খুব দুঢ় নহে। মলিনাথ কালিদাসের সেই তিনখানি কাব্যেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন, যেগুলি 'দুর্বাখ্যা-বিষের দ্বারা সৃজিত' হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঋতুসংহারের ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন ছিল না, তাই মলিনাথের টীকা রচনারও কোনও আবশ্যকতা ছিল না—এইরূপ অস্থানই অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হয়।

বিরোধী পক্ষের দ্বিতীয় যুক্তিটিও সর্বাধিকারযোগ্য মনে হয় না। কালিদাসের অন্ত্যস্ত কাব্যের তুলনায় ঋতুসংহারের রচনামূলক দ্রবল, কবিশ্রমিকতার ন্যূনত্ব ও অপরিপক অবস্থাও বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া

১ তুলনীয় "In a MS. taken to China at some comparatively early date, and written, according to Dr. Nobel, about 1200 A.D., the scribe has copied out the beginnings of the *Kumārāsambhava*, the *Meghadūta* and the *Raghuvamśa* and adds some obscure Akṣaras which may possibly be read as *traya kāvyaṃ vīṣa traya kāvyam*. Hence it is deduced that the scribe desired to give the beginning of the *Kāvya* of *Kālidāsa* and knew only three. The argument is really too preposterous to need refutation."—A. Berriedale Keith: *The Authenticity of the Ritusamhāra in JRAS*, 1912, pp. 1066 ff.

ঋতুসংহার

ঋতুসংহারকে কালিদাসের কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যাইবে না কেন? ঋতুসংহার কবির নবীন বয়সের রচনা, দৃশ্যকবোহর ক্ষেত্রে যেমন মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক। অতএব বয়সের নবীনতাটি ভাষা ও ভাবের অপরিণত অবস্থার একমাত্র সংগত কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। ইহা ছাড়া, কালিদাসের অত্যন্ত রচনাশিল্পির মধ্যে বেসকল বৈশিষ্ট্য ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ঋতুসংহার কাব্যখানির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিস্তারিত। প্রকৃতিপ্রীতি কালিদাসের প্রতিভার একটি বিশেষ ধর্ম— ঋতুসংহারের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত তাহাই মূল হ্রঃ। কালিদাস তাহার পরিণত রচনাবলীর বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন— কালিদাসের দৃষ্টিতে এই মর্ত্য ভূবন যেন একটি হৃদয়বর্তী 'ঋতুরবশালা'। ঋতুসংহারে তাহার পরিণত কবিমানসের সেই বিশিষ্ট দৃশ্যভীরই যেন পূর্ণাভাষ আচ্ছন্ন পাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—

"In *Meghadūta* he describes the rainy season, in *Sakuntalā* the summer, in *Vikramorvasī* the winter, again, in *Kumārasambhava* the antimealy spring, in *Mālavikāgnimītra* the spring in a royal garden and in *Raghuvamśa* almost all the seasons. He describes the summer in the 16th, the rains in the 12th, the autumn in the 4th, and the spring in the 9th Canto. But the germs of all these magnificent descriptions are to be found in the *Kūṣaśinhāra*. There cannot be the least shadow of a doubt that all the seven poems are by the same great poet and it is a matter of congratulation that with a careful and deep study of his works the number of those who held that all the books were not by one man is diminishing rapidly."

এখন কি, ম্যাকডোনেল্ সাহেব তাহার 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' নিবন্ধে ঋতুসংহার সম্বন্ধে নৃকণ্ঠে প্রচার করিতে স্মৃতিত হন নাই যে—

"Perhaps no other work of Kālidāsa's manifests so strikingly the poet's deep sympathy with nature, his keen powers of observation, and his skill in depicting an Indian landscape in vivid colours."

ঋতুসংহার কাব্যখানি এতদূর উজ্জ্বলিত প্রশংসার বোধ্য বিবেচিত না হইলেও কালিদাসের রচনার মূল লক্ষণগুলি যে ইহাতে অপরিণত অবস্থায় বিদ্যমান, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ বাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমনই সারবান্ তেমনই সার্থক—

"In the absence of external evidence, which is in itself of little value unless received from definite and contemporary or almost contemporary sources, the test of personality is all important. In the *Seasons*, Kālidāsa's personality is distinctly perceived as well as his main characteristics, his force of vision, his architecture of style, his pervading seasonousness, the peculiar temperament of his similes, his characteristic strokes of thought and imagination, his individual and inimitable cast of description. Much of it is as yet in a half-developed state, crude consistence, not yet fashioned with the masterly touch he soon

১. Kālidāsa : *Chronology of his Works and Learning*, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. II, Pt. II, p. 184.

২. *Sanskrit Literature*, p. 317.

manifested, but Kālidāsa is there quite as evidently as Shakespeare in his earlier works, the *Venus and Adonis* or *Lucrece*.”*

অজ্ঞাত বৃত্তিগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রব। অশংকার নিবন্ধসমূহে ঋতুবর্ণনের উদাহরণ প্রসঙ্গে ঋতুসংহার হইতে কোনও স্নোহ উদ্ধৃত হয় নাই, ইহা সত্য বটে; কিন্তু একই কবির পরিণত রচনা হইতে উদাহরণ উদ্ধার করিয়া দেখানো যেখানে সম্ভব, সেখানে তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনার অল্পক্ষেত্র কি অমৌলিক? তাহার দ্বারা ঋতুসংহার কালিঙ্গাসের রচনা নয়— ইহা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা যায় না।

ঋতুসংহারের কাব্যবস্তু

‘ঋতুসংহার’ নামটিই বিবরণের পরিচায়ক। কবি এই অল্পপরিমিত খণ্ডকাব্যে ছয়টি প্রধান ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন—গ্রীষ্ম বর্ষ। শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত। কবি নিদাঘতপ্তা বিতৃষ্ণশোভা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়া তাঁহার কাব্য শুরু করিয়াছেন, যেন বসন্তপুষ্পাভরণ। প্রকৃতিরাতীকৈ কাব্যের অবসানে পাঠকের মৃদুগুপ্তির সমুদ্রে উপস্থিত করিবার অস্ত্রই।* প্র৫৩২৬, স্পৃহীঘটচন্দ্রমা নিদাঘবাস উপস্থিত হইয়াছে; বাহিরিয়ারনিবৃত্ত তরুণ-সুসঙ্গীতের বাহুল্যকালনে শরৎবরের বিতৃষ্ণপ্রাণ জলরাশি সর্বদাই আন্দোলিত হইতেছে।

এই নিদাঘের দিবসাবসান কিন্তু বড়ই রমণীয়। বসন্তের কামোদ্রক্ততা প্রশান্তপ্রাণ। এইভাবে কবি নিদাঘের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন—

* Kālidāsa, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, Second Edition, 1950, pp. 29-30.

‘ঋতুসংহারে’র ধ্বংসপ্রতির বর্ণনার সহিত তুলনায় ‘মেঘদূত’ের বর্ণনাকলা অনেক পরিণত। কিন্তু ‘ঋতুসংহার’ তাই বলিয়া কালিদাসের রচনা নহে, এইও ধোঁয়ার মনে করেন, তাঁহার কবিত্বের অভিজ্ঞতার সত্যবোধই যুক্ত: অস্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ডাঃ কীপের সত্য উদ্ধারযোগ্য—“The difference between the *Eclogues* and *Georgics* of Vergil are much more marked, and yet their ascription to Vergil is in both cases beyond all doubt. Again, the poems of Catullus show a variety much greater than that found in the case of Kālidāsa's poems.”—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1912, p. 1069, footnote 3.

* তুলনায় ‘ঋতুবর্ণন—মৃদু-ব-হরিবর্ণ-শিতা-প্রলম্বনো’—জলধারতিলক, পৃ ১৫। অপিচ—‘ভর ঋতুবর্ণনে শরৎ-বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-নির্ণয় সেতুবন্ধ-হরিবর্ণ-মৃদু-ব-হরিবর্ণনো’—সদ্য:কারুচূড়ামণি, পৃ ১৫।

* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু বলেন: “He begins with the summer because in Northern India the astronomers always began their year with the vernal equinox ushering in the hot season.”—*JBORS*, Vol. II. 1916. পৃ ১১২, ব্রাহ্মদেশের তাঁহার ‘কাব্যবীথ্যাংগ’-এ ‘কালবিশেষ’ শিরক কঠোর অধ্যয়ে ‘বর্ষাকতু’ হইতেই ধ্রুবলা সৌক্যবাহারাদিত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন—“আমৃতুবা: পরিধর্ষ: সঃবন্দর:। স চ চৈত্র্যবিধিত বৈশাখা, শ্রাবণাবিধিত শোকরাশ্রাবি:। ভদ্র নভা নভস্ততঃ বর্ষা:...”—কাব্যবীথ্যাংগ, পৃ. ২০-২১ (Gakwad Oriental Series Edn.) ‘কাব্যবীথ্যাংগ’র উল্লিখিত-অধ্যয়ে ঋতুবর্ণনবিষয়ক অনেক প্রাক সঙ্গৃহীত হইয়াছে, এবং ‘ঋতুসংহারে’র সহিত সেগুলির ভাষা, ভাব ও বর্ণনাক্রমের দিক্ দিয়াও বেশ সাধা আছে। ঋতুবর্ণি যে সাক্ষত কবিসংগে একটি বিশেষ শ্রিয় বিধি ছিল তাহা ব্রাহ্মদেশের বিদ্যোক্ত গ্রন্থটি হইতেই স্মৃতিতে পাওয়া যায়—

“এক-বি-স্মৃতিভেদেব সাক্ষ্যোবাখ্যো ঋতু:।

অক্ষজ্ঞ নিবর্তিত্যং জনৈঃ স্মৃতিভেদেব বা।”—ঐ. পৃ. ১১২

কতুসংহার

এতওহর্যঃ শৃংখী-চন্দ্রম্যঃ

সখ্যবাহুস্বতবারিদক্যঃ ।

দিনাত্তরম্যোঃস্থাপাঙ্কনখো

নিরাধকাশোঃস্থপাঙ্কতঃ প্রিয়ঃ ।

কামিগণ নিবাসের সুযোগসেবা নিম্নলিখিতকালে সুবাসিত প্রাসাদপুটে সীতোৎসবে ময় ; প্রিয়ার স্নগদ্ব্যাসিত
মুগুপানে তাহার্য মত হইয়াছে । কামিনীগণের বেহুদ্রিও আশ্রয় আভরণে ভূষিত । স্তনময় চন্দ্রনপকচচিত,
নিতম্বদেশে হেমমেষল। ও উন্নতবক্ষোদেশে চীনাংগুকের তত্ত্ব আবরণ—

সদৃশতলেচিত্তাশ্রমক্যো

বিক্রো বাসাদি ওরুণি শাস্ততম্ ।

কনক কনকতরুতরনা

নিবেশবহিঃ প্রদাঃ সখ্যবনাঃ ।

কবি এইভাবে যেমন একদিকে অস্ত্রপুত্রে প্রমোদোৎসবের বর্ণনা বিবাহছেন, অপরদিকে নিবাসতপ্ত মৃগ
বিভাগেরে কক্ষ স্ততির চিত্রও আশ্রমের সপুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন । রবিকরতপ্ত ধনী আশ্রম শরুতা
কুলিয়া ময়ুরের প্রসারিত পুচ্ছের স্ত্রিয় জায়গা আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ; মৃগপতিও আশ্রয় হতোতম, অদৃশিত
গজমুখকে উপেক্ষা করিয়া সে অলপ মধ্যাহ্নে বিলোলমুখি হইয়া অবস্থান করিতেছে ; বরাহমুখ উগ্রপ-
প্রশমনের উদ্দেশ্যে মুখাগ্রভাগ দ্বারা প্রোথিত কর্ণমণ্ডল্যাব লুপ্ত হইতেছে ; মহিষকুলও ক্রুদ্ধ হইয়া
অত্রিকন্দরনিঃসৃত জলধারার দিকে ধাবিত হইতেছে । দাবাগ্রিমুখ বনকুন্ডির ভ্রামলতা শুকপ্রায় ; দাবদাহভীত
বিহগকুল পর্বত কৃষ্ণের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে ; কপিকুল অত্রিকুলের আশ্রয়গ্রহণে উন্মত্ত ;
গজমুখ জলাশয়ে ইতস্ততঃ প্রোথিত । নিয়োক্ত প্রোথয়ে দাবাগ্রির বর্ণনা দ্বারপর নাই বাস্তব—

জগতি পদমুখঃ পর্বতানাঃ দ্যৌঃ

শুচিতি গহনিবাসে গুহ্যঃশালৌ ।

এসরতি তৃণবধ্যঃ লক্ষ্মীঃ কংগে

প্রসরতি মুখর্ষঃ প্রাতলদ্যো দ্যাবিঃ ।

বহতর ইব দ্বাতঃ শালীন্যঃ বনে

শুভতি কনকসৌরঃ কোটমৌ ক্রদাপান্ ।

পরিভ্রমলাভ্যামুৎপত্তঃপ্রোক্তবান্

জগতি পদমুখঃ পর্বতান্যাবিবাহারে ।

ঐশ্বরবিশ্বের মতে কতুসংহারের ছয়টি সর্গে কবি যে ছয়টি স্বতন্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে
প্রথম সর্গে বর্ণিত নিদ্রাবর্ণনাই শ্রেষ্ঠ । কালিদাসের উদ্ভিষ্টমান কবিত্ত্বভার পূর্ণ সৌরভ যেন এই সর্গেই
আবরা পাই—

"In the poem on Summer we are at once seized by the marvellous force of imagination,
by the unsurpassed closeness and clear strenuousness of his gaze on the object; in the
expression there is a grand and concentrated precision which is our first example of the
great Kālidāśian manner, and an imperial power, stateliness and brevity of speech which

is our first instance of the high classical diction. But this Canto stands on a higher level than the rest of the poem.”*

দ্বিতীয় সর্গের বর্ণাবর্ণনের প্রারম্ভিক শ্লোকটিও বড় মধুর—

সঙ্কটবাতোবধবতুচ্ছতঃ
তদ্বিংগতাকোংপনিশবদমলঃ ।
সমাক্ষেপঃ স্বাক্ষরমুদ্রবর্ণনি-
বর্ণনাম্বঃ কামিনীস্রিয়ঃ প্রিয়ঃ ।

বর্ণাকরু যেন স্বাক্ষরমারোহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—ঘনকক মেঘরাশি যেন গজসৈন্ত, ইত্যন্ততঃ স্তুপিত তড়িলেবাসমূহ যেন পতাকার মত শোভা পাইতেছে, বজ্রবোম যেন ঝলস্ফলি। বর্ণার আড়ম্বর বর্ণনার মধ্য দিয়াই বেশ সূচিত হইয়াছে।^১ আজ তুচ্ছাৰ্জ চাতককুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী আজ বরফকুণ্ডিতা বরফনার মত শোভা পাইতেছে—চতুর্দিকে নবোদগত তৃণাক্ষরের ভ্রামল সমারোহ পৃথিবীতলকে যেন বৈদূর্ঘ্যমণিকূষিত করিয়াছে; ইন্দ্রগোপকীটসমূহ রক্তবর্ণ প্রবালখণ্ডের মত সেই জামশোভাকে আরও শোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। নিদ্রাঘের খরতাপে শীর্ণ তটিনীসমূহও আজ ক্ষীতকায়া, বিব্রনবিলাগিনী রমণীগণের মত যেন তাহারা মত্তবেগে সমুদ্র-নাটকের সজ্জানে ধাবিত হইয়াছে—

নিপাততচ্ছাঃ পরিতপটচক্ষান্
অকুচবেদ্যঃ সলিলৈরনিঃস্রৈঃ ।
প্রিয়ঃ প্রুষ্টা ইব জাতকিপ্রাঃ
প্রাভি নক্ষত্রিকঃ পরোনিবিন্দিঃ ।

ঘনাক্ষকারাকৃত বর্ণারম্বনীতে মেঘের গর্জন উপেক্ষা করিয়া অভিসারিকাগণ কিন্তু প্রিয়গৃহ অভিমুখে অভিসারে চলিয়াছে—

দ্বতীশ্চমুঠৈঃ সন্তাং পরোমুচ্ছাঃ
ঘনাক্ষকারাকৃতলবণীযপি ।
তদ্বিংগতাকপিতসার্ককুলমঃ
প্রাভি স্বাক্ষরমুদ্রবর্ণনিঃ প্রিয়ঃ ।

বর্ণার নববারি গিরিগায় বিদ্রোহ করিয়া সপিলগতিতে নির্যাতিমুখে প্রবাহিত হইতেছে—নানাবিধ বস্ত্রকীট, ধূলিকণা ও ত্বণখণ্ডে সেই ঝলধারা আবিল, এবং ডেককুল তন্তভাবে সেই খরলোভা নির্বাহিত দিকে চাহিয়া আছে। কামিনীগণও আজ বর্ণার অম্লরূপ বেশভূষায় তাহাদের বেহ হৃৎকম্পিত করিয়াছে—তাহাদের কেশদামে কষ, নবকেশর ও কেতকীর মালা, কর্ণাভরে কুটজকুম্ভের মঞ্জরী। কালাঙক ও চন্দনের অংশেপনে তাহাদের অঙ্গ চর্চিত—এইরূপ দৃষ্টিবিরোহন ভূষায় প্রস্রাবিত হইয়া তাহারা বর্ণাপ্রদোষ অভীত হইতে না হইতেই গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া প্রিয়সংগমকান্ড হইয়া দম্যাপুণে প্রবেশের দ্বার উন্মুখ হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকটিতেও তরল কবির নারীর বেশোভাবর্ণনার অভিনবতরীটি বেশ লক্ষণীয়—

* Kālidāsa, pp. 35-37.

“In all eight varieties of metre are used in the six cantos of *Ritusamdhāra*. And some of the meaning is in the sound.”—R. S. Pandit.

বর্ষতি কৃতদ্ব্যগ্নৈরকস্মৈতর্ধারবর্ষঃ
 অতনু-বিতরুত্বলাভার্যতঃ শ্রোণিধিযৈঃ ।
 নবরসকপদেকাদুগ্রহতাঃ রোমধারীঃ
 ত্রিধিলিঙ্গিতশোভাঃ ঘঘোমৈলক নার্যঃ ।

এতদিন পরে দাববদ্ধ বিছাপর্বতের শূণ্যরাজি বর্ষার ধারাসারের বিন্দু সম্পর্ক লাভ করিয়া যেন শান্তিলাভ করিল—

কলভরনবিতানার্যাক্ষোঃশ্রাকমুঠৈঃ—
 রয়মিতি কল নৈকুন্তোভার্যোয়নর্যঃ ।
 অস্তিনয়নপ্ৰধাতিদ্রৌহবহুঃ শিখাতিঃ
 সমুপদ্রনিতপাণঃ স্ফায়তরৌব বিছান্ ।
 বর্ষাপগমে শরদ্বর্ণনাও যনোভা । শরৎ প্রকৃতি আজ নববধুর স্তায় অস্তিনব সজ্জায় সজ্জিত—
 কাশ্যাত্রক্য বিকচপদ্যনোজ্ঞবন্ত ।
 সোমায়-হংসকট-নুগুণোদগম্য ।
 আগক্যালিঙ্গিতানতপাঃবর্ষীঃ
 গ্রোহা পরমবধূরির রম্যরূপা ।

আকাশ আজ শ্রান্তবর্ষণ লঘু শুভ্র মেঘপংক্তির দ্বারা শয্যাক্রম— শুভ্র মেঘবতগুলি যেন ঋতুরাজ শরতের রায়চক্র চামরপতের স্তায় প্রভীয়মান হইতেছে । নদীবক্ষে কারওবহুল সানন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তীরভাগ কাদম্ব ও সায়নপংক্তির দ্বারা শয্যাক্রম, এবং চতুর্দিক হইতেই হংসের স্ববধুর নিনাদ মর্শকের শ্রোত্রস্থর বিধান করিতেছে । কুহুমশোভা করম-কুটম-অকুট-শর্ক-নীপভর্যাজিকৈ পরিভাগ্য করতঃ ত্রিভুজায় সপ্তক্লমবৃক্ষক আশ্রয় করিয়াছে । উপবনপ্রবেশ শেকালিকা কুহুমের গন্ধে স্তম্ভিত, তল্লপাখ্য-নিবহ পক্ষিগণের স্ববধুর কাকলীগানে মুগ্ধিত । কুহুমভারাবনতা স্ফালালতা স্ফল্লুরী রমণীর বিচুপনুবিবিত পেলব বাহুর শোভা ধারণ করিয়াছে । কামিনীগণের শায়ন প্রসাধনও লক্ষণীয়—

কোমলিতাপ্রবনৌদ বিকৃতিভাঙ্গান্
 আশ্রয়ায় যবিতা বন্যলতীভিঃ ।
 কর্ণে চ এচমতাকলকুণ্ডলৈ
 নীলোৎপলানি বিধিধানি বিবেশয়ন্তে ।
 হাট্টে সচন্দনরসৈঃ ঘনবৎসানি
 ব্রোণীভটঃ হবিসুকাঃ রসবাকলাপৈঃ ।
 পাখ্যাবুকাঃ কবনুপুপশেখরৈল
 নার্যঃ অকটকলশোভন্ত বিচুপয়ি ।

ঋতুসংহারে প্রত্যেক সর্গে কবির দৃষ্টি মুখ্যতঃ দুই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়— প্রথমতঃ, সেই ঋতুর উপযোগী প্রকৃতির বর্ণনা ও কামিনীগণের শরীরশোভা ও প্রসাধন বর্ণনা । প্রকৃতি ও নারী—কবির দৃষ্টিতে যেন এ দুইটি অবিচ্ছেদ্য ।* তল্লপ কবি নারীগণ ও নারীর কামবিলাস—কোনটির

* এইখানে “One thing is certain. The one great peculiarity of Kālidāsa's early poetry is that he admires nature more ardently than the fair sex.”—Haraprasad Sastri, JBORS. Vol. II. 1916, p. 160.

বর্ণনাতেই কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত রঞ্জিত পণ্ডিতের 'কতুসংহারে'র ইংরেজি অনুবাদের কৃমিকা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

The poet depicts the woman's world, her love-life and the sphere of the eternal feminine. The detailed description of her dress and decoration, jewellery and flowers, beauty aids and toilet accessories, the make up of eyes, face and lips, the use of subtle perfumes and cosmetics sound familiar and modern and the centuries are obliterated. Some women are portrayed in dishabille, stretched in the mild winter sun like a kitten, and others in bedroom scenes. The description is 'near the bone' and leaves nothing ambiguous as far as frankness goes; it is sometimes startling in detail, and in its casual implications. No painter can paint a portrait with his eyes half-closed. Yet the Eve portrayed in these lyrics can remain naked and the beholder is not compelled to lower his eyelids^{১১}

'কতুসংহারে'র হেমন্ত ও শিশির ঋতুদ্বয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে বর্ণিত পণ্ডিতের উপরি উদ্ধৃত মন্তব্যের বাধাধা ক্ষয়ক্ষয় করা যাইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ কানিনীগণের দেহগ্রাসন ও লুণ্ঠনকলির আবরণলেশহীন বর্ণনার ভরপুর। কালিদাস যে সত্যই লুণ্ঠারী কবিরূপের বৃদ্ধাতিবিক্ত ছিলেন, তাহা কতুসংহারে এই দুইটি সর্গ পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবে কবির দৃষ্টি সর্বদাই উন্নত, উদার, সংকোচলেশশূন্য—প্রকৃতির গোভাববর্ণনাতে যেমন কোনও সংকোচ নাই, নারীর দেহশোভা ও লুণ্ঠনচেষ্টা-বর্ণনেও তেমনি কোনও গোপনীয়তার ছেঁড় নাই। সেইজন্য 'কতুসংহার'কে সাধারণ pornography'র সহিত তুলনা করা সযতীন হইবে না—'কতুসংহার' কামপ্রধান বটে, কিন্তু এই কাম সত্য-উদ্ভির তাকবোয় উজ্জ্বলিত প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভি. এইচ. লয়েলের কথায় বলিতে পারা যায়—“What is pornography to one man is the laughter of genius to another.”^{১২}

যদি সর্গে বাসন্তী প্রকৃতির বর্ণনাও বেশ যথোক্ত। বসন্তাগমে বনকুমি যেন রক্তাংকুশলক্ষিতা নববয়স্ৱ জায় শোভা পাইতেছে—

আকীর্ণবহিস্পৃগৈরিণি পারিহাস্যৈঃ

সর্বং কিংকরুণৈঃ কুংহরনৈঃ।

সক্কা বনকুলকরে সন্ধ্যাস্ততে চ

রক্তাংকুশা নববয়স্ৱি ভাতি কুচিঃ।

কিংকরুণারিণি কুংহরনায়নত, ধীতবহিস্পৃগৈরিণি পারিহাস্য-কুংহরানি শব্দব্যাঘ্র; কন হইতেই যেন বনকুলকরে অকর্তিত আকর্ষণে আর পুৰি রক্তাংকুশলক্ষিতা নববয়স্ৱে আকর্ষিত হইয়াছে।^{১৩}

১০. *Ritusaṃhāra or The Pageant of Seasons*. Translated from the Original Sanskrit lyrics of Kālidāsa. By R. S. Pandit. Bombay, 1947. p. 18.

১১ এই প্রসঙ্গে কতুসংহারের উক্তিও বিশেষ আশীষ্যযোগ্য; “Ilia (Kālidāsa's) sensuousness is not coupled with weak self-indulgence, but is rather a bold and royal spirit seizing the beauty and delight of earth to itself and compelling all the senses to minister to the enjoyments of the spirit rather than enslaving” the spirit to do the will of the senses.”—*Kālidāsa*, p. 35.

১২ কুচনার

বালেশ্বরসংসদ্বিধানভাষ্যকু পলাপালাভিলোহিতানি।

সক্কা কলকর সখ্যভাণা নবকলানী নবলীলায়।

—হুমায়ুন ৩০

কবুসংহার

তির্ধক্ প্রাণিঅগন্তের মণ্যেও বসন্তের প্রভাব স্পষ্ট—

পুংখোদিসক্ তরসেন্ মন্ত
সিয়ারুখঃ চুপ্তি ন্যরোহয়ৎ ।
উত্তরখিরোহোং পানমূলঃ
সিগঃ সিয়ারাঃ একরোতি চাহুৎ ।

চতুসময় পুংখোদিস সাধরে সিয়ার মূল চূন করিতেছে ; এবংও পশ্চিমকরখো অথবান করতঃ নখর ওজনলনি করিয়া যেন সিয়ার চাহুচবায় তৎপর হইয়াছে ।^{১০}

কবুসংহার ও কবুসংহার বিলাসেন

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থলে বসন্তের বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা লক্ষিত হইয়া থাকে । কবুবেবের নানা নৃত্তে বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর বর্ণনা বেশ মনোহর ভাৱে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তবে ‘প্রামাণ্যে’ মহাকবি বাস্কাকির নিপুণ লেখনীতে বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত প্রভৃতি ঋতুর যে জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কবু সন্তব কালিদাসের ‘কবুসংহার’ গ্রন্থে তাহাই মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

A perusal of Mandasore inscriptions shows that description of seasons was a fashion among the poets in that part of the country. The inscription of 404 A. D. describes the rainy season; the inscription of 423 describes the autumn; the inscription of 437 describes the winter; the inscriptions of 473 and 533 describe the spring. So in early youth Kālidāsa caught the fancy of describing all the seasons and in no other part of India are the traditional six seasons so well defined and so well marked as in Western Malwa.

শাস্ত্রি মহাশয়ের মতে কালিদাস ছিলেন পশ্চিম মালবের অন্তর্গত মনপুরের অধিবাসী, এবং মনপুরের প্রাচীন শিলালেখসমূহে কবুসংহারের যে প্রথা পুষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহাই উদীয়মান কবিকে ‘কবুসংহার’ রচনা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ।^{১১} এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতবিদ ও প্রবৃত্তিবিশারদ অধ্যাপক কীলহর্নের মতেও কতটা মিল আছে—বহিঃ তাঁহার মতে কালিদাসই উত্তম, তাঁহারই প্রভাবে মনপুরের শিলালেখসমূহে কবুসংহার প্রথা স্থাপিত । বস্তুতঃ, ‘কবুসংহারে’র পঞ্চম সর্গে শিশিরবর্ণনের অন্তর্গত—

১০ তুলসী মনু বিরকঃ কুহমেকপারে পল্লী সিয়ারাঃ যামহুবর্তমানঃ ।

সুপেণ চ শরদিবীপিতাকীঃ কুহমকওদন্ত কুসমায়ঃ । কুসার ও

‘কবুসংহারে’ দস্তুকনির সহিত ‘কুসারসমুদয়’ তৃতীয় সর্গে অকালসমুদয় অধিবাসী-বর্ণনার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় । ‘আনুসো নিরুদয়পত্নাঃ দুল্লকঃ পুশ্চয়ঃ ধনানঃ । কুহমলোকাঃ কনয়ঃ সলোকাঃ নিরীকখণাঃ বক্যোবিনানান্’—কবুসংহারের এই প্রোক্তির সহিত কুসারসমুদয়—‘অনুত সন্তঃ কুহমলোকাঃ কনয়ঃ অন্তোবঃ সপদ্যাবি’—এই প্রোক্তির তুলনীয় ।

১১ ‘Kālidāsa : Chronology of his Works and his Learning’ শীর্ষক গ্রন্থেও শাস্ত্রি মহাশয় লিখিয়াছেন—

“Kālidāsa passed his novitiate in writing the *Ritusamhāra*. He was indeed induced to write on the seasons, because he found all round the country he inhabited, descriptions of seasons almost in every inscription. He thought perhaps it would be doing a service to his country, if he could describe all the seasons together. So he undertook to write the *Ritusamhāra*”—
JBORS. Vol. II. 1916, p. 179.

নিরুদ্ধবাতঃশব্দমশিঃ স্যদহঃ

হ্যতাপনো ভাপ্রধাতা পতন্তঃ ।

ভ্রুশ্চি বাশাঃস্তবলাঃ পঃখাধন্যঃ

এভ্যন্তি কালেষুঃ অনন্তং সবাভাম্ ।

ন চন্দনঃ চন্দ্রবরীতিউতলঃ

ন হর্ষাপুঃ পঃকিঞ্চিৎকিন্

ন বায়বঃ শঃজঃ-তুয়াঃ-ঈতদ্য

অনন্ত চিত্তং রয়তি সান্দ্রতম্ ।

এই দুইটি শ্লোকের সহিত বৎসভট্টের মন্দরশপুর প্রশস্তির অন্তর্গত নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির বিশেষ সম্বন্ধ আছে—

সামান্যভবনোদয়ঃ^{১৫} ভাবরাস্ত-

বহিঃপ্রাপ্তভবে মলীনবীনে ।

চক্রাভ্যুদয়তলচন্দনতালমুহু-

হারোপতোধরহিতে হিনবভসয়ে ।

রোহঃ-প্রিত্তমুতল-মুন্দরতঃ-দিকোপ-

মুন্দাসন-অনুদিতাভিক্ষাভিরায়ে ।

কালে তুহারকপকশস্তিতবাত-

বেশপ্রভুতলবীনমৈকপাথে ।

মন্দরকলশজনবরভাবনা-মুন্দরভাবনোদ-

দনমন্দরবালিন-নির্মল নিতহুহিনহিন্মাতে ।

অধ্যাপক কীলহর্নের মতে বৎসভট্ট প্রশস্তিতে শিশিরবর্ণনা ঋতুহংসারের শিশিরবর্ণনার দ্বারা অল্পপ্রাণিত ।^{১৬} কালিদাসের কালনির্ণয় এমনও সম্বন্ধগ্রস্ত ; অতএব কালিদাসই যে ‘মন্দশোর’-প্রশস্তির নিকট গই— এইরূপ নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর । তবে কালিদাসের বৌলিকতা সন্দেহ একথা অবশ্যই বলা চলিতে পারে যে, সামান্য-মহাভারতে অথবা বিভিন্ন শিলাশেখে ঋতুবর্ণনের যে সকল নিবর্ণন আমরা পাই, সেগুলি বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের দ্বারা অল্পপ্রাণিত । কালিদাস ছাড়াও বিভিন্ন ঋতুকে কামাহুচিহ্নিত করণের এক অভিন্ন নবীন দৃষ্টিকোণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ফলে, কালিদাসের এই ঋতুকাবে একটি

১৫ শ্রীচের ‘গুপ্তলেখমালা’ (Gupta Inscriptions) বিষয়ে ‘সামান্যভবনোদয়ঃ—’ এইরূপ পাঠ আছে । কিন্তু অধ্যাপক কীলহর্ন কর্তৃক সংশোধিত সংস্করণে ‘সামান্যভবনোদয়ঃ—’ এইরূপ পাঠই প্রচলিত হইয়াছে । উদ্য : Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität des Göttingen, 1890.

১৬ “Prof. Kielhorn's point is, that the composer of the inscription must have had these verses running in his mind; and consequently that the *Ritasahhara* must have been composed before A.D. 472. This seems likely enough. And we know already, from the Aihole Megati inscription that the fame of Kālidāsa, as also of Bhāravi, was well established far to the South of Mandsāor, before A.D. 634.”—Notes and Queries: *Indian Antiquity*, Vol. XIX. p. 285.

কতুসংহার

বিশেষ অভিপ্রায় ছয়টি সর্গকে এক সংহতিমুখে বিগত করিয়া রাখিয়াছে।^{১৭} প্রকৃতিবর্ণনা এই ক্ষুদ্র কাব্যটিতে আপাতদৃষ্টিতে মূখ্য বলিয়া মনে হইলেও, বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন দৃশ্যবর্ণনার দ্বারা উৎকৃষ্ট কানিষকের চিত্তবৃত্তির নিপুণ প্রতিকলনই যেন তরুণ কবির গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়।^{১৮} রবীন্দ্রনাথ 'কতুসংহারে'র এই মূল বার্তাটিই তাঁহার 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের নিম্নোক্ত চতুর্থশ্লোক কবিতাটিতে অল্পমাত্রাভাৱে প্রকাশ করিয়াছেন—

হে কবী কালিদাস, কতুসংহারে
বিকৃত বলে আর প্রেমীর মনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-নিঃসঙ্গ-পরে।
দরকত পাখীরা বহুসংহারে
রক্তের সপন ধরা, সপন পদ
করিলক্ষ্য উৎসর্গ করেছ দার
শুভ্রতোষার 'পরে। স্বপ্ন সেবাসী
হয় কতু কিরে কিরে নৃত্য করে আদি;
নব নব পায় তরি ঢালি বেগ তারা
নব নব বর্ষার স্বর্গদার দার
তোষার তুষ্টি যৌবনে। ক্রিষ্টবন
একদিন অশ্রুপূর্ণ, দারদার।
নাই গ্রন্থ, নাই দৈত্য, নাই জনসঙ্গী—
তুমি শুধু আর রাবা, আর শুধু রাবা।

কতুসংহারের কাব্যোৎসর্গ

সর্বগত রঞ্জিত পণ্ডিত তাঁহার 'কতুসংহারে'র ইংরেজি অর্থবোধের ভূমিকাধ মতাই বলিয়াছেন—

Kālidāsa is both a painter and a poet; the painter to whom the world is a pageant
the poet for whom the world is a song.

কালিদাস তাঁহার সবচেয়ে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মুগ্ধ করিয়া দিয়া এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবীর মাধুর্য অত্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সেই অল্পকৃত সঙ্গীতের দ্বারা বিমোহিত ভাবায় বাক্য করিয়াছেন। অক্ষ ও চেতন অগতের উপর কোন কতুর কোন প্রভাব, ইহা তিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে 'বেদান্তে' প্রকৃতিবর্ণনার কালিদাস অবিকৃত বস্তুতর পরিচয় দিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক। কেননা, 'বেদান্ত' কালিদাসের পরিণত বচন। 'কতুসংহারে' কবি যেন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তিনি যেন একজন হৃদয়পূর্ণ অথচ উন্নত বচন। বচন—যেমন যখন দৃষ্ট দেখিতেছেন, তখনই তিনি প্রিয়

১৭ কতুসংহার

১৮ কতু সর্গ ক'রে

১৯ কতু সর্গ ক'রে

২০ কতু সর্গ ক'রে তাঁহার ইতি কবে গাথা।—'সেবাস' : রবীন্দ্রনাথ

১৭ কতুসংহার "The title is perhaps a little misleading, as the description is not objective, but deals with the feelings awakened by each season in a pair of young lovers. Indeed, the poem might be called a Lover's Calendar."—A. W. Ryder: *Kālidāsa* (Translations of *Shakuntala and other Works*. Everyman's Library), p. 211.

নিকট তাহার হৃদয় বর্ণনা দিয়া চলিয়াছেন ; কবি তাঁহার নিদেহ সত্তা এখনও প্রকৃতিসত্তায় সীন করিয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু 'মেঘদূতে' পূর্বযেবে প্রকৃতির যে জীবন্ত বর্ণনা পাই তাহা পড়িয়া মনে হয়, যেন কবি প্রকৃতির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। "কাম্যর্থা হি প্রকৃতিরূপবাস্তবচেতনেনু"—ইহা শুধু কামোদিত মনের মূর্খে-কথা নহে ; উহা যেন কালিদাসের পরিণত কবিত্বমানসের একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে। 'মেঘদূতে', 'রঘুবংশে' বা 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে কবি সত্যই জড় ও চেতনের মধ্যে বিভেদ যেন বিস্তৃত হইয়াছেন। একজন ব্যাভিনাব্য পাকাত্য সমালোচক বথার্থই বলিয়াছেন—

It is hardly true to say that he (Kālidāsa) personifies rivers and mountains and trees; to him they have a conscious individuality as truly and as certainly as animals or men or gods. Fully to appreciate Kālidāsa's poetry one must have spent some weeks at least among wild mountains and forests untouched by man; there the conviction grows that trees and flowers are indeed individuals, fully conscious of a personal life and happy in that life. ^{১২}

আর-এক দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, 'কৃতুসংহার' কালিদাসের কবিপ্রতিভার অপরিণত অবস্থার লক্ষ্য বহন করে। কালিদাস শূদ্রার কবিগণের মূর্ত্ত—ইহা সত্য বটে ; কিন্তু তাঁহার পরিণত রচনায় বৈকল্য ভক্ত ও পদকারগণের মত, কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য স্নানপূর্ণভাবে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। 'শকুন্তলা'য় যৌনকামের এই দুইটি রূপ যেমন ভাবে কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আর কোনও কাব্যে ততখানি স্নানভাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু 'শালবিকারিমিত্র' ও 'মেঘদূত'—এই দুইটি রচনাকে বাস দিলে, কালিদাস যে কাম ও প্রেমের পরস্পর বিভেদ সম্পর্কে অভিন্ন জাগরক ছিলেন, ইহা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 'কৃতুসংহারে' কামই প্রধান, রূপতৃষ্ণা ও ভোগশুস্বাই নাথকের চিত্তের আর সব বৃত্তিকে যেন ছাপাইয়া উঠিয়াছে ; প্রেমের উচ্চতর আদর্শ, সন্তানলাভে বাহার পরিপূর্ণতা, সে বিষয়ে কবি যেন এখনও সচেতন হইয়া উঠেন নাই। 'কৃতুসংহারে' কাম এখনও পার্থিব ভোগলালসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ— উহা এখনও অপার্থিব প্রেমের ঘরে উঠিত হয় নাই।

ঐশ্বর্যবিশ্ব তাহার স্বভাবলিঙ্গ অস্তৃষ্টির সাহায্যে কৃতুসংহারে কবিপ্রতিভার আর একটি বিশেষ নানতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা হইতেছে, কৃতুসংহারের মূল লক্ষ্যের সহিত কাব্যবস্তুর অসংগতি। প্রকৃতির উপর কৃতুত্বের দৃষ্টমান প্রভাবের বর্ণনাই কবির মূল লক্ষ্য। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নারী ও প্রকৃতি কালিদাসের কবিত্বগুণিতে বিশিষ্ট মিথ্যাছে। 'কৃতুসংহারে'ও তাই দুইয়েরই বর্ণনা আছে। প্রথম তিনটি সর্গে ঐশ্বর্য বর্ণা এবং পরতের বর্ণনায় নারীও প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে একটি স্নানপূর্ণ ভারসাম্য আছে ; কিন্তু পরবর্তী সর্গদ্বয়ে হেমন্ত ও শীত কৃতুসংহারের বর্ণনায় নারীর শরীরশোভার ও বিলাসলীলার বর্ণনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, প্রাকৃতিক-দৃষ্টাবলীর মধ্যে কবি যেন আর নবীনতার সন্ধান পাইতেছেন না। তৎকণ কবিকে যেন হেনস্ত ও শীতের প্রেরণকর বস্তুর প্রকৃতি আর প্রসূদ্ধ করিতে পারিতেছে না, তাই তাঁহার দৃষ্টি নারীর সেহস্রবার দিকে নিবদ্ধ। জন্তব্য গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি সঘর্ষে কবির সচেতনতা সন্ধান তীরতা ও নবীনতা বক্ষ্য করিতে পারে নাই, তাহা যেন ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এবং অন্তিম

কতুসংহার

সর্গে বসন্ত বর্ণনে আসিয়া তাহা বেন আপনায় সমস্ত গতিবেগ ও গভীরতা নিঃশেষে ব্যয়িত করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে—

The closing canto should have been the crown of the poem. But the poet's sin pursues him and, though we see a distinct effort to recover the old pure fervour, it is an effort that fails to sustain itself. The poem on Spring which should have been the finest, is the most disappointing in the whole series.

কিন্তু ‘কতুসংহারে’র সকল নানতা সবেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই স্বল্পপরিণত ঋণকাব্যে এমন একটি নতুন স্বর বাজিয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতি সৃষ্টিতে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাহ্য সংস্কৃত সাহিত্যের অস্ত্র কোনও কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না এবং বাহ্য কেবল কালিদাসেরই পরবর্তী পরিণত রচনাবলীতে আমাদের অল্পভবেগে চর হইয়া থাকে— বসিও সে স্বর এবং সে দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ অধিকতর পরিপূর্ণ ও গভীরতা অর্জন করিয়াছে।

ঐশ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬ই আগস্ট ১৯৪৪, শুক্রবার। ইবাদান শহর থেকে বেরোতে বেলা সাড়ে-দশটা বেজে গেল। আমাদের বাজা হ'ল অতি স্বন্দর সবুজ-ভরা উচু-নীচু ডেউ-খেলানো দেশের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম পেলুম। মাথায় নীল চোকো-কাটা কাপড়ের শিরদ্বার বেঁধে, নীল লুঙ্গি-মতন কাপড় পরে, গায়ে সাফা কুছই পর্যায় ছিলে হাতার জামা, খালি প্যা— রোক্কা মেয়েরা গৃহকার্যে নিযুক্ত দেখলুম। চারি দিকে উল্লস শব্দের বেলা। এদের প্রায় সকলেরই ঘোরতর ক্লকবর্ণ দেহবস্ত্র খাওয়ার আভাষ উজ্জ্বল। পথে Abeokuta আবেওকুতা শহর ছুঁবে গেলুম। এইভাবে বেলা ১২টার সময় আমরা ইকো শহরে পৌঁছলুম। চার দিকে গাছপালায় ঢাকা স্বন্দর দেশের মধ্যে দিয়ে দুপুর বেলায় এই বাজা মোটেই কষ্টকর হয় নি।

আমরা Alia-oni আকিন-ওনি অর্থাৎ স্থানীয় রাজা, ঝার পদবী হচ্ছে Omi ওনি, তাঁর প্রাসাদে এসে পৌঁছলুম। আমার সঙ্গে যে দুজন আফ্রিকান বুক ফোটোগ্রাফার আর রিপোর্টার ছিল, তারা ওনির কর্মচারীদের সঙ্গে কথা কইলে। আমি যে আসুবো সে খবর আগেই পাঠানো হয়েছিল, আমাকে এরা বাড়ির ক'রে সোতলায় একটি ঘরে নিয়ে বসালে। আমাকে ব'ললে যে, ওনি এখন তাঁর রাজ্য-সংক্রান্ত একটি কাজে নিযুক্ত, এখনই আসবেন। ওনির বাড়ি আধুনিক যুরোপীয় কঠিতে তৈরী— এইরকম বাড়ি রোক্কা দেশে স্থানীয় মলবাহু আর লোকদের স্বধ-স্ববিধা আর কচি অহুসায়ে একটু বৈশিষ্ট্য পাচ্ছে। ভারতে যুরোপীয় কঠিতে তৈরী বাড়ি, তার বাইরের দু-একটা অলংকরণ বা রেখাসমাবেশে একটা ভারতীয় ছাপ এধর ক'রছে,— আধুনিক ভারতীয় বাস্তবীতিরই পর্যায়ের এইসব বাড়ি এসে যাচ্ছে। পোর্টগীজ, কবাসী আর ইংরেজদের দ্বারা আনীত যুরোপীয় বাড়ি-তৈরীর পদ্ধতি তেমনি রোক্কা দেশে একটা নিজস্ব প্রকৃতি গড়ে তুলছে, এইমত অনেক এইসব বাড়িকে “আধুনিক রোক্কা বাস্তবীতি”র পর্যায়ের ফেলছে। লেগন্ শহরের আর অন্ত নানা শহরের আর গ্রামের এইসব নোতুন বাড়ি নিয়ে সচিত্র গ্রন্থে আলোচনা দেখছি, ও দেশে প্রকাশিত ইংরেজী পত্র-পত্রিকায। এইসব বাড়ি গরম আর বর্ষার দেশের উপযোগী ক'রে তৈরী। দু-একটা কংক্রিটের জালীতে ঢেকেলে আফ্রিকান নকশার নকল দেখা যায়, আর একটু অভিজাত শ্রেণীর লোকের বাড়িতে বহু যুরোপীয় টুকটাকি curio বা মণিহারি বিনিসের সঙ্গে দু-চারটে খাস আফ্রিকার শিল্পের নিদর্শনও থাকে— যেমন কাঠখোদাই, হাতির দাঁতের মূর্তি, লাউয়ের উপর কাটা নকশা, কোথাও বা দু-একটা পিতলের মূর্তি, পুরোনো আফ্রিকান রীতির কাঠাসন, আফ্রিকান রঙিন ছাপা কাপড়, ইত্যাদি। যে বসবার ঘরে আমাকে নিয়ে বসানো হ'ল সে ঘরটি কিন্তু পুরো যুরোপীয় ধরণে চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো। ঘেরালে নানা ফোটোগ্রাফ।

Sir Adesole Aderemi স্যার অ্যাসেসোলে আদেরেমি পরে তাঁর কতকগুলি অহুচরের সঙ্গে ঘরে এসে আনাঘ সেবা দিলেন। দেখে মনে হ'ল, বছর ঘাট বয়স হবে, বেশ দীর্ঘকায় চেহারা, হাত বাড়িয়ে আহার সঙ্গে কনবর্ণন ক'রে খাগত ক'রলেন। ইনি রোক্কা দেশের একজন বিশিষ্ট জননেতা।

সরকার বা রাজ্য হিসাবে এর প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য নানা প্রতিষ্ঠা বা সম্মান এর আছে। ইনি হুশিঙ্গিত, যুরোপে অনেকবার গিয়েছেন, আর স্থানীয় দক্ষশীল-প্রকৃতির উদারমৈত্রিক নেতা রূপেও এর সম্মান আছে। ইংরেজ সরকারের কাছেও ইনি সম্মানিত, এবং অনেক বিষয়ে এর পরামর্শ সরকার নেন। এখন ইনি নাইজিরিয়া—সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের—একজন সম্ভ্র। ইনি বাইরে যেখানিও নতের খীঠান ব'লে পরিচিত হ'লেও গোন্ধাবাদের প্রাচীন ধর্মের একজন গুরু এবং নেতা। এইরকম অদ্ভুত ব্যাপার এসেছে খুবই সাধারণ, পরে এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ আরও দু-একটি কথা ব'ল্বে।

ওনি খুব চমৎকার ইংরেজি বলেন। ইনি গোন্ধাবাদের মধ্যে প্রচলিত আফ্রিকান পোশাক প'রেই ছিলেন—একটা নীল সাধা জোয়া টিলা আলখান্না তার মধ্যে প্রধান, মাথায় একটি গোল কাপড়ের টুপি, পায়ে চম্প। এর একটি শিক্ষিতা মেয়ে এদেশের অভিজাত সমাজে স্থপরিচিত। মেয়েটিকে নিয়ে বছর-কয়েক আগে ইনি যুরোপে গান, আর লওনে এই আফ্রিকান রাজকন্ডার রঙচঙে' আফ্রিকান পোশাক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই মেয়েটি এখন বিবাহিত এবং বাসিন্দা হ'লে গিয়েছে। লওনের সচিত্র পত্র-পত্রিকার কন্ডার সহিত ওনির ছবি দেখেছিলুম, সে কথা ওনিকে বলায় তার মেয়ের লম্বা এই খবর তিনিই দিলেন। আমি ওনির সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রলুম—ব'ললুম যে আমি এসেছি ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম-আফ্রিকার প্রাচীন ধর্ম আর তার শিল্প-সংস্কৃতি আর তার জনসাধারণের জীবনযাত্রা একটু—আমি কয়দিনে বঁটলু পাখা ধায়—ভাণ্ডা-ভাণ্ডা অবলোকন ক'রতে। ওনি হচ্ছেন গোন্ধা সমাজের আর ধর্মের একজন নেতা—বংশাঙ্কনে তার সমাজগত ধর্মের পরিপোষক আর পরিচালক। তিনি-নিজের জাতির ইতিহাস আর ঐতিহাসিক ধর্মাদি লম্বা লম্বা করে বলেন। তার পুরোনো প্রাসাদ নোভুন ক'রে তৈরী করবার জন্যে খুঁড়তে খুঁড়তে অনেকগুলি ব্রতের নুও প্যাওয়া গিয়েছে—সেগুলির বিশেষ-ভাবে আলোচনা ইংরেজী কাগজে ও বইয়ে আমি পড়েছি, সেগুলোর শৌখিন পৃথিবীর লব্ধ কলায়সিক সমাজকে মুগ্ধ ক'রেছে। তা ছাড়া সেগুলির নৃত্যবিষয়ক মূল্যও অসাধারণ। ওনি এই ব্রহ্মজ্ঞানগুলি আর অন্য পশ্চিম-আফ্রিকার শিল্পের নির্দর্শন একটি সংগ্রহশালা তৈরী করে রক্ষা ক'রছেন, তাও পড়েছি। সেইসব বিশেষ ক'রে দেখবার জন্যে আমি ইচ্ছা করে এসেছি।

ওনি বেশ হাসিমুখে আমার কথা শুনছিলেন। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের ব্রিটিশ District Officer বা কোলো-নাসক Col. G. D. A. Brett কর্নেল ব্রেট ব'লে একজন উল্লোক এসে প'ড়লেন। আমি আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই একে টেলিফোন ক'রে খবর দেওয়া হয়। বোধ হয়, ভারতবর্ষ থেকে আগত এই অধ্যাপকের সঙ্গে স্থানীয় জননেতা ও রাজা ওনির প্রথম আলাপ ম্যাগিষ্ট্রেটের মাধ্যমেই হওয়া বাহনীয় ছিল; আর তা ছাড়া, ইচ্ছাতে বিদেশী উল্লোকের থাকবার মতো কোনো হোটেল নেই, সেইজন্য আমার থাকবার ব্যবস্থা ওনির প্রাসাদে না হ'লে কর্নেল ব্রেটের গৃহেই হয়েছিল। কর্নেল ব্রেট দেখলুম চমৎকার মানুষ। বেশ লম্বাওড়া চেহারা, বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর হবে। ইনি ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত—ভারত স্বাধীন হবার কিছুকাল পর পর্যন্ত ভারতের সেনাবিভাগে অফিসার ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি একটা বনের টান অহুজ করেন বৃষ্টিতে পাখা গেল, যদিও 'আর বহু বহু ইংরেজের নতন আমাদের স্বাধীনতা-লাভের পরে ভবিষ্যতে ইংরেজের কী অবস্থা হবে, সে বিষয়ে সংশয় বা সোটাটায় প'ড়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন ক'রে এসে চাকরি নিয়েছেন। ইনি 18th Royal Garhwal

Rifles নামে ভারতীয় পণ্যত্বিক সৈনিক-বলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এই রেজিমেন্টের গাড়োয়ালী সেপাইদের বীরত্ব প্রথম মহাযুদ্ধে বিশেষভাবে যুদ্ধের দুই আকর্ষণ করে, আর এর গাড়োয়ালী সেপাইদের শৌর্ভের খ্যাতি এত দৃঢ়ভাবে প্রচারিত হয় যে, এটিকে একটি spear-head regiment অর্থাৎ আক্রমণ-কালে বর্ষার ফলার মতো লক্ষ্যবাহু-চেনকারী পণ্যত্বিকবল বলে এর নাম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে অন্ততম ভারতীয় V. C. বা ডিস্ট্রিবিউশন-গ্রাণ্ড সিপাহিসের মধ্যে ছিলেন এই রেজিমেন্টের Dharwan Singh Negi ধরুওয়ান সিং নেগি। এই রেজিমেন্ট তখন 39th Garhwal Rifles নামে পরিচিত ছিল, পরে Royal শব্দ যোগ করে এর সম্মান বাড়িয়ে দেওয়া হয় আর নোতুন নাম দেওয়া হয় 18th Royal Garhwal Rifles. পরে কথাশ্রুত্রে এর এই রেজিমেন্টের নাম স্তন্যে, আমি ঠেকে জানিয়ে' বিই বে আমার এক স্ত্রাণক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ওই 18th Garhwal Rifles-এর অধিকার ছিল। তখন ছিল লেফ্টেন্যান্ট, এখন মেজর কর্ণালশব্দ যুগোপাধ্যায়; উত্তর-আফ্রিকা, সিসিলি-দ্বীপ ও ইতালীতে এই রেজিমেন্টের সঙ্গে তাকে বরাবরই যুদ্ধকাণ্ডে অংশগ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল। Lieutenant Mukherji বলে নাম বলতে কর্নেল হ্রেই তাকে চিনতে পারলেন আর বললেন যে ভারতবর্ষের ল্যান্সডাউন শহরে যখন ঐ রেজিমেন্টের একটি বাটালিয়ান বা পট্টন ছিল তখন তিনি' তাকে জানতেন। এইভাবে কর্নেল ব্রেটের সঙ্গে, একটু দূরের হ'লেও, আমার একটা যোগসূত্রে বেরিয়ে' গেল। এতে আমার দুজনেই হুশি হসুহ। কর্নেল ব্রেই সৌমন্ত্রের অবতার। আমার বানিকস্বপ্ন শিষ্টালাপে ও আলোচনায কাটিয়ে' কর্নেল ব্রেটের কাছ থেকে ইচ্ছাতে আমার যে কার্যক্রম ঠিক হয়েছে তার সংবাদ পেলুম। আমার সুবিধে-মতো যা যা আমি দেখতে চাই সেই অঙ্গুসারে এই কার্যক্রম বললে' নেওয়া গেল। বেলা একটার সময়ে সেই সময়ের মতো গুনির কাছ থেকে বিনাশ নিয়ে চেলারায়ের গাড়ি ক'রে কর্নেল ব্রেটের বাংলায় জলুম। ঠিক ছিল যে গুয় ওখানে আমার জিনিষপত্র রেখে, হাতমুখ ধুয়ে, মধ্যাহ্নভোজন সেয়ে, সাড়ে তিনটের দিকে গুনির প্রাঙ্গণে আমার ফিরে আসবো, আর তখন তিনি প্রাচীন যোকবা ব্রহ্মভূতি, বা তাঁর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হ'বে আছে, সেগুলি দেখাবেন। তার পরে বিকেলবেলায় কর্নেল ব্রেটের সঙ্গে ইকে শহরের প্রাচ্যে অবস্থিত একটি বন বা উপবনের মধ্যে একটি যোকবা সেবভাণ্ডের আত্মনা—বন্দির ঠিক বলা চলে না—দেখতে বাবো। আমার সঙ্গে যে ছুটি সরকারি কোটোগ্রাফার আর রিপোর্টার ইবাদান থেকে এসেছিল, তারাও সঙ্গে থাকবে।

কর্নেল ব্রেটের গৃহে তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে দেখা হ'ল। কর্নেল ব্রেই নিজেকে আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর বয়স ৪৫, তিনি আর কিছুদিন হ'ল বিবাহ করেছেন। তিনি আইরিশ-ভাষীয়া মাহুয, রোমান-কাথলিক, গুলায় লক সোনার হারে লটকানো সোনার জুশচিক প'রে থাকেন। বেশ লাদালিখে মাহুযটি, আর অতি ভয় হুঅন। আমি ভারতীয় অভিব্রি, আমার সঙ্গে যে সহস্র সজলভতা দেখিয়ে' তাঁর আতিথা পালন ক'রলেন তা আমাকে বিশেষ হুশি ক'রেছিল। মিলেগ ব্রেইও একটি সুরল প্রকৃতির মহিলা, আর বিশেষ আতিথ্যপন্থায়ণ। এদের বাড়ির মধ্যেই একটি অংশ আমার জন্তে ঘর নির্মিত ছিল, আমি যুদ্ধভাঙে ঘুয়ে ভৈরী হ'য়ে নিলুম।" মিলেগ ব্রেটের সঙ্গে একটু আলাপ করা গেল। এদের বাড়ি একটি টিলার উপরে। বাড়ির পিছন দিকের বারান্দা থেকে আশপাশের দেশের একটি চমৎকার দৃষ্ট পাত্তা যায়।



৩

পশ্চিম-আফ্রিকার বস্তুশিল্প

১. মাস্ক-হেড : মাথার পল্লব খুঁট, গলার পল্লব কটি। বেনিন নগর। খ্রিঃ ১০০০ খ্রিঃ পূর্বে

২. আটান ব্রেনের দেহতা : মাথার-বেধতা ওলোফুন ?। ইকো। আধুনিক খ্রিঃ ১০০০

৩. মাস্ক : বেনিন নগর। খ্রিঃ ১০০০ খ্রিঃ পূর্বে



পৌনে-তিনটের মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে আমি স্বাপেড় বসলে' নিদ্রা— ধূতি, গামা রেশমের শেরওয়ানি আর চম্বল, আর মাথার রেশমের গোল টুপি প'রে, আধুনিক ভারতীয় ভদ্রলোক সাক্ষ্য। ওনির প্রাশ্যে তিনটের পরেই উপস্থিত হ'লুম। সন্ধ্যের আফ্রিকান যুবক দুজন Bernard Akenabor বানর্ডি আকেনাবোর আর Mac Pepple মাক পেপ্পল ঘাবের কথা আগে বলেছি, তারাও সঙ্গে এল, ছবি নিতে। এরা, ওনির সঙ্গে আমার, আর ওনি, কর্ভেল ব্রুই আর আমার একদিকে, কতকগুলি ছবি নিলে। তার পরে ওনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়মে আনাঘের নিয়ে গেলেন। মিউজিয়মটি বড় নয়, কেননা সেখানে কেবল বাড়ির নোচে থেকে পাওয়া যৌক্রবা শিল্পবোয় লংগ্রহ মাত্র আছে, অত্র কোনো ভিনিগ নহ। বোধ হয়, ১৯৪৫-এর দিকে তাঁর পুরাতন রাসপ্রাসাদ কতকটা ভেঙে আধুনিক ভাবে আবার তৈরী করার উদ্দেশ্যে ভিত কাটাতে আরম্ভ করেন। এঁদের পুরাতন প্রাসাদ মানে, খোদাই-করা কাঠের খুঁটি-খুঁক বড়ো-বড়ো চালাঘর। বাড়ির দেয়াল দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের আলাদা ক'রে রাখা হয়। রাজারা বহুপত্নীক ছিলেন, প্রত্যেক রাণীর জন্য আলাদা পাতাল-ছাওয়া গোল ফুঁড়-ঘর থাকত। রাজার দরবারের জন্য বড়ো হল-ঘর থাকত— এই চালাঘরের আকারে। পরে যুরোপীয় পদ্ধতিতে এসব বদলে', হল-ঘর আর অত্র থাকবার ঘর তৈরী করার রেওয়াজ এলে গিয়েছে। ওনির প্রাশ্যে দু-একটি এইরকম চালাঘর ছাড়া প্রাচীন আর কিছুই নেই। ভিত খোঁড়ার সময়ে বাড়ির বেশ নোচে গুটি ধল-বায়ো ব্রুইর প্রমাণ আকারের নুও পাওয়া যায়। যে পদ্ধতিতে প্রাচীন গ্রীসে, ভারতবর্ষে, চীনে, মধ্যযুগের ইতালীতে আর অন্যান্য দেশে ব্রুই আর অত্র ধাতুর মূর্তি ঢালা হ'ত— সেই *cire perdue* অর্থাৎ মোম-গালানো পদ্ধতিতে এইসব নুও ঢালা হয়েছিল। এগুলি সম্ভবতঃ প্রাচীন যৌক্রবা দেশের রাজারাণী বা দেবদেবীর মূর্তি। মূর্তিগুলি আগে মোম তৈরী ক'রে নিয়ে তার উপরে বাড়ির প্রলেপ দিয়ে একটা পুরু আবরণ ক'রে মোমের মূর্তিটিকে ঢেকে ফেলা হ'ত। তার পরে এই আবরণের মাধ্যমে একটি ছোটো ক'রে, সেই ছোটোর মধ্যে দিয়ে উপর থেকে মূর্তি গলা ধাতু ঢেলে দেওয়া হ'ত। ধাতুর তাপে ভিতরের মোমের মূর্তি গ'লে বেরিয়ে যায় এবং ধাতু মোমের স্থান নিয়ে নেয়, আর এইভাবে ধাতুর মূর্তি ঢালা হয়। পরে উপরের বাড়ির তৈরী মূর্তি বা ঢাকনা ভেঙে ফেলে ধাতুর মূর্তি বার করা হয়, আর তার পরে ডাকে ঘবে' বেছে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয়। ইক্বেতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি বেশির ভাগই পুরুবের। গৌক-লাড়ির দ্বারগার কতকগুলি করে ছোঁা আছে, তাতে বুঝতে পারা যায় যে এই ছোঁাগুলির ভিতর দিয়ে নকল দাড়িগৌক— বাহুঘের মাথার চুলই হ'ক বা কালো হুতোই হ'ক— লাগিয়ে মূর্তিগুলিকে একটু বেশি ক'রে বাস্তবায়ন করা হ'ত। এই মূর্তিগুলি, আফ্রিকার প্রায় বিঘরে ধারা বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতে, এখন থেকে এক হাজার বছরের উপর হ'ল তৈরী হয়েছিল। এ ধরনের মূর্তি ওনির প্রাসাদ খোঁড়ার পূর্বে মাত্র ২১টি আবিষ্কৃত হয়েছিল— বিখ্যাত জার্মান আফ্রিকা-জরবিৎ Leo Frobenius লেও ফ্রোবেনিউস তার ছবি আর বর্ণনা প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। ইক্বে ছাড়া এ ধরনের ব্রুইর কাজ ইতিপূর্বে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে নাইজিরিয়ার Benin বেনিন নগরে। বেনিনে এখনও এই প্রাচীন পদ্ধতির ব্রুই-ঢালাই শিল্প প্রচলিত আছে, যা ঘর শিল্পী এখনও সেখানে মূর্তি ঢালাই করে। বেনিন শহর ১৮২৭ সালে ইংরেজরা দখল করে। বেনিনের আফ্রিকানরা তাদের রাষ্ট্রের আর সভ্যতার পতনের যুগে ভীষণভাবে দরবলি দিত, এবং নানা বিষয়ে তাদের ধর্ম-অনুষ্ঠান চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার আকর হ'য়ে থাকিয়েছিল। এরা কতকগুলি ইংরেজ প্রজাকে হত্যা করার জন্য ইংরেজ সরকার লেগল থেকে এক

শান্তিদুলক অভিজান পাঠায়, তাহা বেনিন শহর দখল করে, অপরাধীদের শাস্তি দেয় আর অমানবধনে শহর লুণ্ঠ করে। লুণ্ঠের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় জিনিস ছিল, বেনিনের অদ্বুত ব্রত আর হাতিয়ার গাঁতের শিল্পকলা। বড়ো-বড়ো আত্ম হাতিয়ার গাঁতের গায়ে নানা মূর্তি আর অস্ত্র অলংকরণ খোঁদা হ'ত। মাদ্রাসের মাশার প্রতিষ্ঠাতার ব্রতের বৈঠকের' বক্তন ক'রে, তার উপরে এইসব খোদাই-করা লম্বা হাতিয়ার গাঁত বসানো হ'ত, আর এইভাবে এই হাতিয়ার গাঁত বাড়ির দরজার দুইপাশে আর বাইরে অস্ত্র সামগ্রি রাখা হ'ত। ব্রতের ছোটো-বড়ো বহু মূর্তি আর মাদ্রাসের দুই—যেয়ে আর পুরুষ উভয়ের—আর ব্রতের ফলকে ঢালা জীবনের নানা দৃশ্য—এগুলি বেশির ভাগ বেনিনের রাজা রাগী, সেপাই-সাহী, রাজার অস্ত্রের প্রভুক্তির নিয়ে, আর তা ছাড়া এখন থেকে চারশো সাড়ে-চারশো বছর পূর্বকাল যুগের পোশাক-পরা পোতুগীস সৈন্য আর অস্ত্র মাদ্রাসের মূর্তি নিয়ে। দু-একটি পশুপক্ষীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, বেনন যুগি আর চিতাবাঘ, সেগুলিও ব্রতের ভাব্য হিসেবে অপূর্ব। শিকারী পাখি শিকার ক'রছে, রাজা বা সেপাইরা খোদাই করে খাড়া ক'রছে, দরবারের বালক ভৃত্যের কাঁখে হাত দিয়ে দণ্ডায়মান রাজা, এইসব নিয়েই ফলক বেশি। তা ছাড়া খোদাই করে মাদ্রাসের রাজা, নৃত্যের ভবিষ্যে বেনিনের কুমারী, কস্তীবাদনরত তরুণ প্রকৃতি অস্ত্র ছোটো ব্রত-ঢালা মূর্তি বা মূর্তি-সমূহও অনেক পাওয়া গিয়েছে। এই ব্রত-ঢালা শিল্পকলার দ্বন্দ্ব যুরোপে এল' তখন তা নৃত্যবিন্ আর অঙ্গসংখ্যক কলারসিকদের আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু জনসমাজে তার তেমন প্রচার হয়নি। আফ্রিকা তখনও অস্বাচ্ছন্দ ছিল এবং তখনও আফ্রিকার শিল্প আর সংস্কৃতি লক্ষ্যে যুরোপে কোনো চেতনা জাগে নি। লুণ্ঠের মাল ব'লে এইসব ব্রতের অপূর্ব শিল্পত্ব ইংরেজ সেনানীদের হাত ঘুরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে জমা হয়, আর এর অনেকগুলি জিনিস, বালিনের নৃত্যবিনয়ের সংগ্রহশালার পরিচালকের চেঁচা দেখানেও কিছু কিছু গিয়ে পৌঁছয় আর যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এমন এই শিল্পের কল নৃত্যবিন্ আর শিল্পরসিক ছাড়া সাধারণ শিল্পচেতনামুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিও ক'রতে শিখেছেন—এইসব ব্রত আর হাতিয়ার গাঁতের শিল্পের চর্চা আরম্ভ হয়েছে, এর লক্ষ্যে বড়ো-বড়ো বই লেখা হয়েছে আর হ'চ্ছে। বেনিনের প্রাচীন ব্রত মূর্তি বা ফলক, এখন বহু মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করার বস্ত্র হ'য়ে বাড়িয়েছে। প্রাচীন পদ্ধতিতে বেনিনের দু-চার ঘর শিল্পী যেসব মূর্তি এখন তৈরী ক'রছে, তারও চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত হ'চ্ছে যে, এইসব মূর্তি এখন থেকে চার-শো পাঁচ-শো বছর পূর্বে বেনিনে তৈরী হ'য়েছিল। আর সেই সময় থেকে বা তার আগে থেকে এতরূপ ব্রত-ঢালা মূর্তি বানাবার হেতু আর পন্থা বেনিনে চলে এগেছে। এইসব মূর্তি-৪৫নাপদ্ধতি এমনিই বস্ত্র এবং বিশিষ্ট, এমনিই পুরোপুরি আফ্রিকান শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত যে, একে বিশিষ্ট আফ্রিকান শিল্পী ব'লেতে হয়—যুরোপীয় শিল্পের কোনো প্রভাব এতে নেই—বরিও ১৪৭০-৮০ খ্রীস্টাব্দে মিকে বুদ্ধের মাত্র পরা পোতুগীস সেপাইয়ের ছবিও এইসব মূর্তি ও ফলকে পাওয়া গিয়েছে। এই পুরোনো পোতুগীস পোশাক থেকে এইসব ব্রত ফলক আর মূর্তির একটা লম্বা অনুমান করা যায়। মূর্তিগুলি যে পদ্ধতিতে তৈরী সেটি একেবারে পুরোপুরি realistic বা বাস্তবাত্মক নহ—এগুলি একটু বিশেষ রকম stylised অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পদ্ধতির অনুসারী। কিন্তু তা হ'লেও, দু-একটি মূর্তির রচনা অনবদ্য। আমি বসন প্রথম ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্র-হিসাবে লওনে গাই, তখন আমার পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা—ব্রিটিশ মিউজিয়মে আফ্রিকার নৃত্যবিনয়ক সংগ্রহের মধ্যে বেনিন থেকে আনীত এইসব ব্রতের ফলক আর মূর্তি আর হাতিয়ার গাঁতের কাছের মধ্যে

একটি ত্রৈ-চালা কস্তা-মূর্তির বর্ণন-লাভ। মূর্তিটি কঠ পর্ধ্যন্ত, গলায় প্রচুরপরিমাণ মালা পরা, মাথায় একটি মুকুট—এই মালা আর মুকুট সবই প্রখাল বা পলাকাটির দানায় তৈরী হ'ত। মূর্তির মধ্যে কানজুটি stylised অর্থাৎ বাস্তবাহকারী নয়। মূর্তের গড়নের মধ্যে ছাঁচে-চালা মূর্তের একটি। কৃত্রিম ছাঁদ দেখা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে একটা অপূর্ব কমনীয়তা, একটা আত্মসমাহিত তত্ত্বমুতা আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা কান্ধা বা বিবাসের ভাব দেখা যায়, সেটি আবার কাছে অপূর্ব লেগেছিল। এই মূর্তির অন্তর্নিহিত ভাব আমাদের আফ্রিকার সংস্কৃতিকে জানবার ও বোঝবার ক্ষত্র আগ্রহইল ক'রে তুলেছিল। এই মূর্তির আর একটি নকল বাপিন মিউজিয়মের যোক্কা-সংগ্রহের মধ্যে আছে। বহরিন পরে আমি ১৯৩৮ সালে এই মূর্তির একটি প্রাস্টারে নকল ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে ক'লকাতার আনি, পরে ১৯৪৫ সালে 'সেটিকে ক'লকাতার ত্রৈ চালিয়ে' নিই; এখন এটিকে আমার শিল্পসংগ্রহে সংরখে রেখে দিয়েছি।

বেনিন শহর হ'চ্ছে Edo এখানে জাতির আফ্রিকানদের দেশ। এরা যোক্কাবাসেরই জাতি। যোক্কাবাসের মধ্যে কিন্তু কাঠের আর হাতির দাঁতের লক্ষণীয় মূর্তি পাওয়া গেলেও, ত্রৈয়ের তেমন কিছু এতাবৎ মেলে নি। সেও ফ্রোবেনিউপ-এর আবিষ্কৃত মূর্তিটি একটি সমস্তাব বিষয় হয়ে গাড়িয়েছিল। এটি যোক্কাবাসের দ্বারা পূজিত হ'ত—দাগরদেবার মূর্তি হিসাবে। কিন্তু এই মূর্তিটির অন্তর্নিহিত ভাব ছিল পুরোপুরি realistic, অর্থাৎ বাস্তবাহকারী। বেনিনের মূর্তিশিল্পের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য হ'চ্ছিল না। তার পরে, ইঠাং বছর বারো-তেরো পূর্বে ইচ্ছা শহরে ওনির রাজপ্রাসাদের মাটির নীচে খেঁচে এই যোক্কা জাতির মধ্যে এই ত্রৈ মূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হ'ল। এগুলি ইংলণ্ডে আর ঘুরোপের অন্তর প্রদর্শিত হ'ল, এবং তাতে নৃত্যবিন্দু আর শিল্পবিন্দুর মধ্যে বিশেষ চাকল্যের সৃষ্টি হ'ল। এই মূর্তিগুলি বাস্তবাহকারিতায় যে-কোনো দেশের বাস্তবাহকারী মূর্তিশিল্পের সমকক্ষ—কি প্রাচীন গ্রীসের, কি ভাংডের, কি চানের, কি রেনেসাঁসে যুগের ঘুরোপের। এই মূর্তিগুলিতে আফ্রিকান জাতীয়তার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য মেন নিখুঁত কোটোগ্রাফের মতন ধ'রে নেওয়া আছে; একটুখানি idealism বা ভাবুকতা যে নেই তা ব'লবো না, আর তার দ্বারা বাস্তবাহকারিতাকে আরও বহনীয়, আরও গভীর-প্রকৃতিক ক'রে তুলেছে। দু-চারটি মূর্তি দেখলে প্রাচীন গ্রীসের কতগুলি ত্রৈ মূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়—যেমন সেলুসি নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত বিখ্যাত রথচালক বা সারথির মূর্তি। এগুলি আলোচনা ক'রে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই বাস্তবাহকারী মূর্তিগুলি বেনিনের stylistic মূর্তির পূর্বকার যুগের—খ্রীঃ ১০০০ খ্রীঃাব্দ বা তার পূর্বে এগুলি তৈরী হয়; আর এগুলির অন্তর্নিহিত বস্তুনিষ্ঠতা পরে ধীরে ধীরে বেনিনের অলংকরণ-নিষ্ঠতা আর ভাবুকতার পরিবর্তিত হয়েছে,—আর সেটা ঘ'টেছে আফ্রিকান ধর্মের অনুপ্রেরণায়।

ইকের ওনি এই মূর্তিগুলির মূল্য বোঝেন এবং সেইজন্য তিনি ধরত ক'রে মূর্তিগুলি রক্ষা করবার জন্যে শৃংখলা রাখতেন। মূর্তিগুলি এখন সময় পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের কাছে জাতীয় সম্পদ হ'য়ে গাড়িয়েছে। নাইজিরিয়ার একটি স্থান্য ডাক-টিকিটে এই ইকের একটি ত্রৈ মূর্তি চিত্রিত হয়েছে—বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর প্রতি আকর্ষণ হয়, নাইজিরিয়ার অধিবাসীদের তো কথাই নেই। ওনি নিয়ে আমাদের কাছে মিউজিয়ম দেখাতে লাগলেন, সঙ্গে ক'র্নেল ব্রাইও ছিলেন। এই মূর্তিগুলি চাক্ষু ক'রে বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রলুম। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ জাতির মানুষ, দ্বারা স্বেতকায় জাতির দ্বারা অগত্য বর্বর আর বর ব'লে উপেক্ষিত, তারা হাজার বৎসর পূর্বে কোন সভ্যতার অনুপ্রেরণায় এই সমস্ত অতুল্য স্থান্য

মূর্তি গড়েছিল তার কোনো হসিগ এখন আর পাওয়া যায় না। কেবল এই ত্রয়ের মূর্তি নয়—এদের হাতের গাতের আর কাঠের কাণ্ড আর নাড়ির মূর্তি প্রভৃতি বা প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে, তাতে একটা লক্ষণীয় বস্তু শিল্পাচার্য দেখতে পাই, যে শিল্পাচার্য একেবারে এদের নিজস্ব। এদের অনেক মূর্তির মুখে গায়ে পশ্চিম-আফ্রিকার অতি সাধারণ cicatrice উদ্ভির দাগ দেখা যায়—এই উদ্ভিতে দেহের কোনো কোনো অংশে রেখার আকারে চামড়া তুলে নেওয়া হয়, ও পরে নোতুন চামড়া পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখে দাগ পড়ে, এবং সেইরূপ দাগই এদের tribal বা কৌলিক একটা চিহ্ন বা পরিচয় বলে বিবেচিত হত। এইসব শিল্পরূপ দেবে আর অল্প প্রমাণ থেকে, পশ্চিম-আফ্রিকায় অস্তিত্ব ছুই হাজার বছর ধরে একটা আফ্রিকান কৃষ্ণকায় জাতির স্বকীয় সভ্যতা যে গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। স্থবির বিদগ্ধ, আফ্রিকার শিক্ত লোকেরা এ বিষয়ে এখন একটু সচেতন হচ্ছে, আর তাতে ক’রে তাদের আত্মমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, একটা সপ্ন বশেষবোধও যোগে উঠছে—যার ফলে এদের মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের প্রয়াস সর্বত্র দেখা যাচ্ছে; আর গোল্ডকোস্ট বা Ghana গানা রাষ্ট্রে, আর আংশিকভাবে নাইজিরিয়াতে সে প্রয়াস সাক্ষ্যমণ্ডিত হয়েছে।

ত্রয়ের নৃমুণ্ডলি এখন সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক নতুন শিল্পদৃশ্য হ’য়ে বাড়িয়েছে। এই পশ্চিম-আফ্রিকার ত্রয় মূর্তির পরিচয় পাওয়া যাবে Leon Underwood-এর লেখা একখানি অতি চমৎকার বই থেকে—*Bronzes of West Africa*; এই বইখানিতে এইসব মূর্তি ও কলকের অনেকগুলি ছবি আছে আর সুন্দর বর্ণনা আছে। বইখানি লন্ডনের Alec Tiranti কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য মাত্র ছয় শিলিং। ঐ লেখকের অল্পরূপ আর দুখানি বইও ত্রয়—*Figures in Wood of West Africa* এবং *Masks of West Africa*। ইকে মিউজিয়মে, আগে কখনও বা দেখি নি এমন কতকগুলি মৃৎশিল্পের, terra-cotta বা পোড়ামাটির মূর্তির ভগ্নাংশ দেখলুম। কতকগুলি অতি সুন্দর মাটির মৃৎ আর মাটির রেহাংশ—মাস্কের পা— এগুলি প্রমাণ-আকারের মাটির মূর্তির ভগ্নাংশ, ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে।

বেলা সাড়ে-তিনটের সময়ে মিউজিয়ম দেখে আমরা যোক্তবাদের জাতীয় ধর্মের এক সেবতার স্থান দেখতে গেলুম। কর্নেল ব্রেই সঙ্গে চললেন, আর যোক্তাবী হিসাবে চলল কর্নেল ব্রেইটের একজন আর্থালি—যোক্তাবী জাতির পাহারাওয়ালা, ইংরেজী বেশ বলতে পারে। ওনি সৌভাগ্য ক’রে তাঁর গ্রামাবাসের একজন অছত্রকে এই সমস্ত সেবতার স্থান দেখাবার জন্তে আমাদের সঙ্গে পাঠালেন। ইংরেজিতে এইসব সেবতার আশ্রানকে Juju-House বলে। এই Juju আশ্রানের ছেলেদের ভয়-দেখানো ‘ছদ্ম’ নয়। আমাদের ‘ছদ্ম’ শব্দ যদি ইংরেজী থেকে এসে থাকে, তা হ’লে এটি মূল আফ্রিকা মহাদেশের। পশ্চিম-আফ্রিকায় কতকগুলি জাতির মধ্যে তাদের ঘরোয়া অতি সেবতার কাঠের মূর্তি অথবা মাস্কি তাবিজ প্রভৃতি, ফেলব জিনিসের একটা দৈব বা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে বলে লোকে বিশ্বাস করে, সেগুলিকে Gru-Gru গুগু বলে। মূল এটি পশ্চিম-আফ্রিকার কোন্ ভাষার কথা তা এখন ধরা যায় না। এই গুগু শব্দই সম্ভবতঃ Gyu-gyu গ্যুগ্যু রূপের কথা দিয়ে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি জাতির কাছে Juju রূপ নিয়েছে; এবং বিশেষতঃ সেখানকার আফ্রিকানরাও অনেকে Juju-House বলে। চীনদেশে যেমন যৌজ বা তাও-ধর্মের বা কনফুসীয় মন্দিরকে ওয়েশে প্রচলিত ইংরেজীতে Joss House বলে—এই Joss শব্দ ইন্দ্র-বাচক পোতুগীজ Deos শব্দের উচ্চারণ-বিকারে হ’য়েছে। সাধারণতঃ এইসব Juju-

House বা সেবতার আত্মনা, পথের ধারে গাছপালার মধ্যে একটু খোলা ভাঙাঘরে একটা পাতার-ঢাকা কুঁড়ে বাড়ি। হয়তো সেটা একটা চামড়ি-খোলা ঢালাঘর; আবার হয়তো তিনদিকে মাটির বা পাতার দেয়াল, সামনের দিকটা খোলা। ভিতরে এক বা একাধিক সেবতার কাঠের মূর্তি বা অল্প কোনো প্রতীক থাকে—ধেমন, ছোটো মাটির ঢিবি। কখনও-কখনও বা বেশ বানিকট্টা জায়গা জুড়ে একটা অশ্ল-মত স্থান, তার ভিতরে মাঝে-মাঝে একটু ক'রে খোলা ভাঙাঘর। আর সেই ভাঙাঘর এদের এই ধরনের Juju-House বা ঠাকুর-ঘর। আগে ধন এই ধর্ম বেশ প্রাণবন্ত ছিল, রনসানারও এই ধর্ম আস্থা আর নির্ভর সঙ্গে মানত, তখন এসব ভাঙাঘর লোক-সমাগম খুবই হ'ত, আর এই সব Sacred Grove বা পবিত্র উপবনকে সেবতার স্থান ব'লে লোকলই প্রচার সঙ্গে দেখত। ইফে শহরের উপকণ্ঠে এইরূপ একটি উপবন আছে। এদেশের প্রাচীন ধর্মের এখন ভাঙন-মশ। 'ভাঙা মেউলের সেবতা'-র অবস্থা দেখে মনে একটু দুঃখও হ'ল। এই ধর্ম এখন মরে' বাচ্ছে, আর এই ধর্মের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে একটা অবহেলার ভাব—অজ্ঞত: বাইরে-বাইরে, ভিতরে কিন্তু এদের মনে একটা। স্থল বিশাগ এখনও খুবই আছে, এক ঝাঁচচেই বা একটু যা গেলেই সেই বিবাস মাথা তুলে ওঠে। এই ধর্ম মানা এখন আর fashionable বা শিক্ষিত লোকের উপযুক্ত নয়—নিরক্ষর চাষী লোকেরই উপযুক্ত, এইরকম একটা মনোভাব এসে যাওয়ার ফলে, বাইরে-বাইরে এই অনাথা, এই অনাথর। সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে সেবতাদের সম্বন্ধে বা তাঁদের পুরোহিতদের সম্বন্ধে, পূজা-অর্চনার সম্বন্ধে বিশেষ ধরনের পাওয়া যায় না। সেবতার কিভাবে মানুষের জীবনের আশা-আশঙ্কা, ভয়-ভালোবাসা, পার্থিব উন্নতি-অবনতি আর আধ্যাত্মিক অসুস্থতি প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে লোকের মধ্যে কেমন যেন আগ্রহ নেই। নিজস্বই একদিনের যাত্রী আমরা নতুন লোকের কাছে, এত সম্বন্ধে এসব বিষয়ে দিশা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার; আর খুব সম্ভব, এরা পথ-চলতি বিদেশীর নিষ্কল কোঁহুগলে আকর্ষণ অস্বস্তি করে না। গনির গ্রামদের যে লোকটি আমাদের সঙ্গে এল' সে ইংরেজি জানে না; ক'র্নেল ব্রিটের আর্দালির মারফত তাকে প্রশ্ন ক'রে যা অল্প-সল্প কিছু ধরনের পাওয়া গেল। আর্দালিটি ছিল একটি বেশ বুদ্ধিমান ছোকরা—সে-ও যথাস্থান কিছু-কিছু ধরনের দিলে। এরা দুজনেই আমাদের আনালে যে, সেবতার উপবনের Juju Houseগুলি বেশির ভাগ সময়ে অনাদৃত হ'য়ে প'ড়ে থাকলেও, চুপে-শাড়ে অনেকেরই এসে সেবতারের পূজা ক'রে যায়—কান্না কল পাবার আশায়। আবার বছরে কতকগুলি বড়ো-বড়ো উৎসবও হয়; তাতে বহু লোকের সমাবেশ হয়, পুরোহিতেরা তখন প্রকট হন, তাদেরও তখন কিছু আর হয়। এদেশে পূজায় উপকরণ হচ্ছে Kola nut—একরকম তপাঙ্গি-স্নাতীর ফল—বোতলে ক'রে মদ বা তড়ি, আর বলির অস্ত্রে দুর্গি বা অস্ত্র পাখি—আর কুসুম। এদেশে tsetse fly ব'লে একরকম মশার উৎপাতে গোক ডেড়া ছাগল বাঁচতে পারে না—মূলমানবের সেখায়ে পূজায় কখনও ডেড়া গোক জবাই ক'রলেও সেটা সাধারণ নয়। আঙন ছেলে হোম করার মতন অচ্ছান অজ্ঞাত, আবার হিন্দু বৌদ্ধ পূজায় যেমন ফুল দেওয়া হয়, তাও অজ্ঞাত। প্রার্থনা আর মন্ত্র পড়া হয়, গানও হয়, নাচও হয়, আর সেবতার মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতও ক'রে থাকে।

আমরা রাত্তার ধারে মোটর থেকে নেমে জানহাতি একটা পথ দিয়ে এই উপবনের মধ্যে প্রবেশ ক'রলাম। ঢুকেই কিছুদূরে একটি শিবলিঙ্গের মতো স্তম্ভের আকারে একটি বাড়ী পাথর—সেখানে একটু

খাসে-ভরা পরিভাষা-করা মনি। এইটাই প্রথম নম্বরে প'ড়ল। শুনলুম, এটি হচ্ছে প্রাচীনকালের একজন ওনি বা স্থানীয় রাজার মূর্তিচিহ্ন। তার পরে আশরা গল্পের মধ্যে আরও এগিয়ে' এখানকার প্রধান Juju House-এর দিকে অগ্রসর হ'লুম। শুনলুম যে, সাতদিন আগে একটা বড়ো উৎসব হ'য়ে গিয়েছে, তাতে ধার্যীতি অনেক লোক এসেছিল। উৎসবের মন্ত্র মন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই আত্মানার পৌছবার যে শর পথ আছে, সেই পথের উপরে চার দ্বারবার ডেল-ওপারি গাছের বাগুনো বা শাখা দিয়ে পর পর চারটে ভোরবের মতো করা হয়েছিল, তা হয়েছে। মন্দিরে দিয়ে দেখলুম, একটি জরাজীর্ণ পোকা-বাগড়া গাছের সামনে শিরলিঙ্গাকার তিনটি পাথরের স্ক স্ক থাম; এগুলির অর্থ কেউ ব'লতে পারলে না। তার পরে একটু দূর গিয়ে একটি কল্লাপাতায় ছাওয়া ঢালায় নীচে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু একটি পাথরের মূর্তি দেখলুম। মূর্তিটি খুবই পুরাতন, আর অনেক মাথপাথ খ'য়ে গিয়েছে। শুনলুম, এটি হচ্ছে Edena গ্রন্থা অর্থাৎ দেবতাদের দ্বতের মূর্তি, ইনিও একজন দেবতা। পরে আর একটি দেবতার মূর্তি দেখলুম; এটি হচ্ছে Ololefunra গুলোকেজুনরা; ইনি হচ্ছেন দেবদূত Rere রেহের এক ভূতা, এর মূর্তিও পাথরের, এটি বেশ ভালো অবস্থায় আছে, মুখখানা বেশ ভালোই লাগল। মন্ত্র দেবতাদের মধ্যে দেখা গেল, শিরলিঙ্গাকৃতি Ogua ওজন দেবতার প্রতীক—ইনি হচ্ছেন লোহা আর অস্ত্রপন্থের দেবতা। শেষ দেবস্থান হচ্ছে, একটি কল্লাপাতায় ঢাকা কুঁড়েঘর, পেছনে একটি বাড়ির টিবি, আর তার পাশেই পাথরের তৈরি তিনটি অতি মোটা হাতের কাল কুমিরের মূর্তি। এ বাড়ির টিপি হচ্ছে প্রাচীনকালের এক বার পুরুষ, যিনি দেবতা হ'য়ে গিয়েছেন, তাঁর প্রতীক—তাঁর নাম হচ্ছে Isuobasim এরুবাদিন। এই উপবনে মন্দির ব'ললে আশরা বা মূর্তি সে ধরনের কিছু নয়—আবাসের ভারতবর্ষে আদিবাসীদের মধ্যে এইরকম নানা দেবতার আত্মনা আছে, সবই পাতায়-ঢাকা কুঁড়ের ব্যাপার। নহলে অবশ্য হু-এক দ্বারবার কাঠের বা বাড়ির থান-ওয়ালা বড়ো-বড়ো আটগালায় আকারের মন্দির দেখা যায়, কিন্তু উপবনের দেবতার স্থান এই ধরনেরই হ'য়ে থাকে। কর্নেল ব্রেটের আশরাশি আশানের সঙ্গে লোকটির সঙ্গে কথা ক'রে পূজার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রভৃতি আশানের ইংরেজিতে বৃষ্টি'র বোঝা চেষ্টা ক'রলে, কিন্তু তার সব কথা ধরা গেল না।

এখানে এক অদ্ভুত অবস্থা দেখলুম। সেনের লোকে প্রায়ই, বিশেষতঃ ঘর। একটু শিক্ষিত ব'লে পরিচিত হ'তে চায়, নিজেদের ঐগান ব'লে অভিহিত করে, আর কোন্ সম্প্রদায়ের ঐগান, রোমান ক্যাথলিক কি মেথডিস্ট কি চার্চ-অফ-ইংল্যান্ডের, সেটা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করে। একটা করে ঐগান নামও নেয়, ভক্তি করে গীর্জাতেও যায়; আবার আবশ্যক-নতন এই সব মন্দিরে আর দেবতার আত্মানার পুরোহিতদের দিয়ে দেবতার পূজাও করায়, দেবতার উদ্দেশ্যে ঘর, Kola nut মৃগি প্রভৃতির ভোগ দেয়, সাঠোনে প্রণামও করে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, দেবতাদের পুরোহিতরাও কেউ-কেউ মন্ত্র নব্বয়ে নিজেদের ঐগান ব'লে পরিচয় দেয়, ঐগান বা হুরোপীয় নামও নিয়ে থাকে—এটা পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আনি জানতে পারি। কর্নেল ব্রেটের কাছে শুনলুম, ওনি-ও এক দিকে ঐগান, আর এক দিকে যোকবা ঘরোয় সংরক্ষক—Defender of the (Yoruba) Faith; ঐগদর্মবলী এই যোকবা রাজ্য কতকগুলি বিশেষ ধর্মিক অধিকার ও সন্মান পেয়ে থাকেন, তেমনি এই ধর্ম পালনের মন্ত্র তাঁর বিশেষ কতকগুলি কর্তব্যও আছে। ধর্মগুরু ওনি হিলাবে তাঁর কর্তব্য হ'চ্ছে যে, তিনি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন মন্দিরে বংগয়ে কয়েকবার ক'রে নিয়ে গিয়ে দেবতাদের অর্চনা

ক'রবেন। কিন্তু তিনি এখন আর নিজে যান না, তবে পূজার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নৈবেদ্য আর বলি পাঠিয়ে' সেন, এবং পুরোহিতরা তাঁর প্রতীক্ হয়ে দ্বারীতি দেবার্চনা সম্পন্ন ক'রে থাকেন। এই বন্দোবস্ত এখন বেশ চলছে। আমি পরে ওরিকে যোকবা ধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুম— তাঁর নিজের ধর্মত নিয়ে অবস্ত আলোচনা করা ভয়ঙ্কর-বিরুদ্ধ হয় ব'লে ক'রি নি। এর পরের দিন, ওঁরিন অদীনস একজন পুরোহিতের বাড়িতে গিয়ে একটি অস্থগান দেখি। পুরোহিতের নামটি হচ্ছে, James Awosope ভেম্‌স্‌ অগোসোপো। এই নাম থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এই ধর্ম কি কৃষ্ণতকিমাকার গতি নিচ্ছে। আমার প্রশ্নে, ওনি উত্তর সেন যে, এখন যে দিকে হাওয়া বইছে তাতে মনে হয়, যোকবা ধর্ম আর নিঃশব্দি রেখে টিকতে পারবে না, খ্রীষ্টান ধর্মের অনেক বিনিস এর মধ্যে ঢুকে যাবে। কিন্তু যোকবা ধর্মের অস্থমিহিত যে কতকগুলি সত্য দর্শন আছে, জাতির পক্ষে হিতকর অনেক বিষয় আছে, সেগুলি মরবে' না, রাজ্যত্বভাবোদ্দেশ্যে প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে যুরে-কিরে সেগুলি আবার এসে যোকবা জীবনে আর ধর্মহাহুতিতে নিজের দখাযোগ্য স্থান ক'রে নেবে। এ বিষয়ে বহু পূর্বে Nigeria নামে ইংরেজী পত্রিকায তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটির কথা আমায় ব'ললেন, কিন্তু সে প্রবন্ধটি আমি সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারি নি।

এইভাবে দেবতার আস্তানা দেখা হ'ল। তখন কর্নেল ব্রেই ব'ললেন, তিনি আমার সঙ্গে প্রথম এই Juju Houseএ এলেন, এর আগে কখনও আসেন নি। তার পরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন Odudua গুহুয়া দেবীর এক মন্দিরে। যোকবা ধর্মেরতে আমাদের শিব আর উমার নত্যা সমগ্র বিশ্বপ্রপকের পিতা আর মাতার স্থানীয় দুই দেবতা আছেন—Obatala ওবাতাল্লা এবং Odudua; ইনি আমাদের উমার মত্যা। এই মন্দির অর্বে, একটু উঁচু ভায়গায় স্থাপিত একটি কুঁড়েঘর। এখানে দেবীর একটি অতি পুণ্ডান পাথরের মূর্তি রক্ষিত আছে। পাশেই পুরোহিতের বাড়ি। আমাদের কিছু মন্দির-ঘরের ভিতরে ঢুকতে বিলে না। এখানেও সবই ভয়ঙ্কর প'ড়ে। পুরোহিত ছিলেন না, কতকগুলি স্ত্রীলোককে সেখানে দেখশুন, আর পুরোহিতের এক ছেলে ছিল, আমরা জিজ্ঞেস করার সেই ছেলেটি আমাদের আনিয়ে বিলে যে সে নিয়ে খ্রীষ্টান—অর্থাৎ, সে সত্য বাস্তব, প্রবলী নয়।

এর পরে কর্নেল ব্রেই আমাদের নিয়ে গেলেন ইফে শহরের একটি ব্রটবা স্থানে—সেটি হ'চ্ছে, আমেরিকায় Saturday Adventist সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত একটি হাসপাতাল। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত গোড়া প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান, আর এরা বাইবেলের প্রত্যেক কথাটির আক্ষরিক অর্থে আস্থা রাখে, সমগ্র বাইবেলকে একবারে ষ্ট্রবর-ব্যাক্য ব'লে বিশ্বাস করে। এদের মতে, বরিধায় খ্রীষ্টানদের পক্ষে বিশ্রামের দিন হওয়া অপরোক্ত—পরমপিতা পরমেশ্বর ছয় দিন ধ'রে পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে স্রাস্ত হ'য়ে যে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেদিনটি ছিল শনিবার, রবিবার নয়। এই গভীর ভাবকাটি হ'চ্ছে এঁদের ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, রিহদিয়া এই শনিবারই বিশ্রাম আর পুণ্ডার দিন ব'লে পালন করে। এঁরাও রবিবার দ্বারীতি কাছ ক'রে যান, আর শনিবারটি বিশ্রামের দিন ব'লে কোনো কাজকর্ম করেন না, কেবল উপাসনাদি করেন। Dr. S. A. Nagel ডক্টর এন্‌. এ. নাগেল ব'লে একজন আমেরিকান ভ্রমলোক এই হাসপাতাল চালাচ্ছেন। ইনি নিজেই সম্প্রদায়ের ধর্মত অধ্যাপ্ত ব'লে বিশ্বাস পোষণ করেন। এঁর আস্থা দেখে দুঃখও হয়, হাসিও পায়—ছোটো-খাটো শিশুটি মতগুলিকে ইনি কি রকম নিবিড়ভাবে পরম সত্য ব'লে আঁকড়ে ধ'রে আছেন। একেলে ধরনের বিশ্বাসী ব্যক্তি,

আবার বাইবেলকে অস্বীকার বই বলে মনে করেন, তার বাইবে আর লভ্য নেই; তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, এক সময়ে তিনি এই সম্প্রদায়ের মতের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, কিন্তু এটা ঠাণ্ডা পৈতৃক সম্প্রদায়, ঠাণ্ডা বাবার উপদেশে আবার তিনি এই সম্প্রদায়ের মতের উপরে আস্থা ফিরে পেয়েছেন, এবং এইভাবে পুনরায় সত্য প্রাপ্ত হ'তে পেরে তিনি ঈশ্বরের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ভ্রমশোকটি কমাও ঘটেন। তিনি, আর একটি আমেরিকান ডাক্তার, আর দুটি সিগার বা উচ্চশিক্ষিত নার্স, এরা বিলে ১২০ জন রোগীর স্বস্থানের উপযোগী এই হাসপাতাল চালাচ্ছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত দেখালেন—কর্নেল ব্রেই ঠাণ্ডা বাড়িতে ফিরে গেলেন। হাসপাতালে সব শ্রেণীর রোগী আছে, গ্রন্থি-বিভাগও আছে—একবারে দু' পল্লী থেকে আনকোরা মাল্টি মাস্থও চিকিৎসার জন্য এসেছে। এই হাসপাতালে আফ্রিকান মেয়ে-নার্স আছে, এবং অনেকে এখানে শিক্ষা পাচ্ছে। ডাক্তার নাগেল আমাকে এঁদের হাসপাতালের অনেকগুলি ছবিওগুলো পোস্ট-কার্ড দিলেন, এঁদের ধর্মমতের কতকগুলি বই দিলেন, আর পরে এঁদের ধর্মবিচার নিয়ে অল্প বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠাবেন বলে গেলেন। পরে পাঠিয়েও ছিলেন, ক'লকাতার আমার টিকানা; তার প্রতিদানে আমি ঐকো ডাক্তার রাফার্কনের ২১১ খানি বই আর খানী বিবেকানন্দের ২১১ খানি বই পাঠাই। কিছু সেমথ বই যে তিনি বুঝে উঠতে পারবেন সে বিষয়ে আমার মনে খেতে সম্ভব হবে' গিয়েছে।

এইভাবে বিকেল এবং সন্ধ্যা কাটাতে 'কর্নেল ব্রেই'র বাড়ি থেকে এসেছি। ইবানান থেকে যে দুটি ছোকরা আমার সঙ্গে এসেছিল, আকোনাথার আর পেশু, তারা আমার কাছ থেকে বিদায় নিলে, আমায় রাস্তা ত্যাগ ইবানান করে যাবে। আকোনাথার আমার কাছ থেকে একটা লম্বা interview অর্থাৎ এই বেশে এসে কি কি দেখেছেন আর সব কেমন লাগল, এ বিষয়ে আমার মন্তব্য লিখে নিলে। পরে নাকি এ থেকে কিছু-কিছু অংশ সরকারি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ক'রবে। এরা যে-সব ছবি নিয়েছে তাও সরকারের তরফ থেকে আমাকে পাঠানো হবে, একথা আমার জানালে। এই ছোকরা দুজন বেশ কর্তব্য আর বিশেষ ভ্রম, এঁদের সঙ্গে পরিচয়ে বেশ খুশি হয়েছিলুম।

সন্ধ্যা সাড়ে আটটা 'কর্নেল ব্রেই' আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ইকো শহরের কতকগুলি উচ্চ পদবীর ভদ্র লোককে আহ্বান করেন। এঁদের মত নানাধর্ম পানীদের ব্যবস্থা ছিল। এতদূর সম্মেলনকে আমেরিকায় আর ইংল্যান্ডে cocktail party বলে—আমাদের বেশেও এই ইংরেজি শব্দ চলে যাচ্ছে। পশ্চিম-আফ্রিকায় একে বলে sherry party। ঝায়া এগেছিলেন, তাঁদের যথো ছিলেন একজন বৃদ্ধ সরদার বা সিনিয়র, একজন অবলম্বিত ভদ্র, আর একজন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এঁর নাম ছিল Mr. A. C. Willoughby উইলোবি—ইনি সন্ত্রাস এসেছিলেন। এঁরা সকলেই বিত্তময় আফ্রিকান। আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি দেখে আমার সম্বন্ধে এঁদের বেশ একটু আত্মীয়তার ভাব প্রকাশ পেল। তবে এঁরা নিজেদের জাতি আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো খোঁজববর রাখেন না, আর একটু খেন উদাসীন—এঁরা হচ্ছেন বিপদ মুগের আফ্রিকান, ঝায়া ইংরেজদের প্রদানের বাইরে আফ্রিকার সমস্ত অস্ত্র অথবা সাংস্কৃতিক জাগরণের কথা মনে ক'রতেই পারেন না। শ্রীকৃত উইলোবি আমার পূর্ব-পরিচিত Leon Underwood-এর সেখা পশ্চিম-আফ্রিকার ব্রহ্ম-মূর্তির সম্বন্ধে বই আমাকে দেখবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন—এই বইয়ের সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছুই জানতেন না আর ঠাণ্ডা কোনো বিশেষ আগ্রহও ছিল না, যদিও বইখানা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

গোরাবী দেশে

হাত্রে নৈশ জোজবের লম্বা কর্নেল ব্রেই আর একটি ভদ্রলোককে নিয়ন্ত্রণ করেন— ইনি হচ্ছেন একজন স্ট্রট রোমান ক্যাথলিক পাদরি, এঁর নাম Father Kane ফাদার কেন, ইনি কতকটা মেসুইট-সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত। এখানে ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে আছেন। লোকটিকে আবার খুবই ভালো লাগল— বেশ সাদাসিধে, স্বস্ততা আছে, রসজ্ঞান আছে। এঁর সঙ্গে নানা গল্প আদ্যাপ আলোচনা হ'ল— ব্রেই-কেশভিও কথারীতি যোগ দিলেন।

যাত্রি লাড়ে ন'টার পরে বিজ্ঞান ক'রতে এসুহ— গার। রিবের পরিগ্রহে আর অশুধ-পরিচিত নুতন অগন্তের অভিজ্ঞতা-গ্রহণে শরীর আর মন বেশ একটু ক্লান্ত।

শেষ দ্বাহের শিখায় একটি বিদ্বতগ্রাম নাম সাহিত্যের অগতে কণিকের অন্তে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

কিছু কালের মধ্যেই তা হয়তো আবার তমসাবিলীন হয়ে যাবে।

সে নাম জগদীশ গুপ্তের।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনকালেই শ্রীমদ্ভাগবত রামণথ থেকে দীপ্ত হয়ে দীপ্ত হয়ে গিয়ে প্রায় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। গুণগ্রাহী সন্ধানী রসিকের দূরবীক্ষণে ছাড়া সর্বাধারণের দুল দৃষ্টির তিনি প্রায় অগোচর ছিলেন বললেই হয়। ছিলেন, তাঁর নিজের স্বভাবে কতকটা, আর কতকটা সাহিত্য-লোকের দুজ্ঞেয় নিহতিতে।

সাহিত্যের এই নিয়তির রহস্য সত্যিই বোকা কঠিন। সুবিচার অন্ততঃ যে তার ধর্ম নয় তার দৃষ্টান্ত অজ্ঞ। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো সে অহরহই আমাদের দেওঘায়।

জগদীশ গুপ্তের বেলায় এই নিয়তির একটি নির্বন ঐশ্বর্যের উদাহরণ আমরা দেখলাম।

অস্মিয় বহিরীশ তাঁর নাম আবার যদি অন্ধকারে মুছে যায়, সত্যি কথা বলতে গেলে তাতে দুঃখের এমন কিছু নেই। সব নামই তাই যায়, কিছু আগে বা পরে। দু-একটি যা থাকে তা শুধু আক্ষরিক পরিচয় নয়, বাক্যে, চিরন্তন জীবনপ্রবাহের সঙ্গে এমন-একটি বেগ হয়ে গিয়ে, যার নাম অবাস্তব। আক্ষরিক নাম যাদের মুছে যায়, তারাও সেই প্রবাহে নিজেদের অস্বাভাবিক দানে অমর।

জগদীশ গুপ্তের মত লেখকের ভারী বিশ্বাস-সম্ভাবনায় দুঃখ তাই নেই। জীবনকালেই সে বিদ্বতির ফুটকি। যেমন করে তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিল, বিশ্বর শুধু তাইতে।

প্রথম বিশ্বদুঃখের পর বাংলা সাহিত্যে যে একটা স্বাভাবিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার প্রবর্তনায় থারা ছিলেন তাঁদের ঠিক পুরোবর্তী না হলেও জগদীশ গুপ্ত নগণ্য ছিলেন না।

দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক দীর্ঘমেয়াদে দেশবিশেষ আত্মপ্রকাশ সাম্প্রতিক ইতিহাস, বিশেষ শতাব্দীর সেই তৃতীয় দশকে তারই নাস্তিস্থ দৃঢ়তা। তখন দেখা দিয়েছে। ভাঙন যে ধরেছে নানা মিকের চিহ্ন-বাগ্ম্য চিত্তপ্রসাদে তারই আভাস। এ যুগে থারা লিখতে শুরু করেছিলেন, অসামান্য কিছু তাঁরা হয়তো তখন না করলেও তাঁদের ঈশ্বর উল্লেখ্য আত্মসম্মাননের অস্থিরতার মধ্যে সত্যতার অভাব ছিল না। কি যে বুঝছেন সব সময়ে তার দৃষ্টি ধারণা না থাকলেও নিবিচারে যেনে বেওঘার নিশ্চিত নিবিচারে তাঁরা অকাতরে বর্জন করেছেন। ভালোমন্দ সত্যমিথ্যা কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতির প্রায় দ্বিধার নেবার যে দুঃসাহস তাঁরা দেখিয়েছেন অপরিত্রয় মনের রাজ্যহীনতার তা দৃষ্টান্ত সীমার কখনো হয়তো পৌছলেও তাঁদের আত্মবিকৃত্য কলঙ্কপাত করেনি।

বয়সের পার্থক্য সবেও অন্তরের তাকোণে জগদীশ গুপ্ত এই বলের দলী ছিলেন। তাঁর কলমে যে স্বাভাবিক শক্তি ছিল তাতে তখনকার নামস্কাটারের দলে না ভিড়ে সমবয়সীদের শনাতনী আসরে তিনি সহজেই স্থান্য কিনতে পারতেন। কিন্তু সে স্থান্য তাঁকে দূর করে নি। তার বললে শিখরে যার ব্যর্থতার অভিশাপ সেই বিপার বিশ্বাস যুগের অর্থ তিনি বুঝতে চেয়েছেন।

অত্যন্ত সাম্প্রতিক হলেও সে যুগের মোটামুটি চেহারাটা হয়তো একবার স্মৃতি ক'রে ভোলাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে অশিক্ষিত, ইংরেজি-শিক্ষিত, দুলভ শহরে লম্বা তখনকার সংস্কৃতির ধারক তার পায়ের তলায় মাটি তখনই বেশ টপকে শুরু করেছে। অসিয়ারী প্রথা শোপ পাও নি, কিন্তু তার শুদ্ধপ্রায় মধু ভাঙালো হয়ে এসেছে, পরাধীনতার মানি ডে। আছেই তার সঙ্গে নিকপায় নিফলতার হতাশার অধিকাংশ জীবনের সিংহ পর্বত আচ্ছন্ন। ইতিহাসের মানে 'অর্থনৈতিক'-এর 'মতো' নিহিত বলে ধরার রেওয়াজ শুরু না হলেও অসামান্য নিয়ে একটা মোহাটে বিক্ষোভ সেবতাবের ও নিয়তিক ছেড়ে অল্প লক্ষ্য সম্মান করেছে। সামাজিক রীতি ও নীতির প্রতি অল্প আস্থগত। আর নেই, কিন্তু পুনবিচার তীক্ষ্ণ হলেও পরিবর্তনের ধারা তখনও স্তব্ধ বলা যায়। মেয়েদের স্বাধীনতা ও সমানঅধিকার প্রায় স্বীকৃত কিন্তু তার প্রকাশ অস্পষ্ট। বহিঃসংস্রের দাম্পত্য বদলে গোড়শী বা বড়জোর অর্ধদাম্পত্যই নাথিক। তাঁরা পুরুষের সঙ্গে জীবিকাকর্মের প্রতিযোগিতায় এমনভাবে তখনো নামেন নি যে ট্রায়ে-বাসে তাঁদের জন্ত নিরিঙের বেশি জায়গা ছাড়তে বিরক্তির স্তম্ভ ওঠে। ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে লব্ধতার কাটা তখনও অনেক, কিন্তু বিশেষ শাসনের ক্ষতটাই প্রধান হয়ে আর-সব জালা কিছুটা ছুলিয়েও রেখেছে।

সবমুখ জড়িয়ে, চিত্তার ডাবনায়, আশায় আকাঙ্ক্ষায়, আদর্শে উদ্বেগে এমন-একটা অস্থির ঘোলাটে বিশৃঙ্খলা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে ঘায় আকস্মিক প্রকাশ সেইসব সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিক্ষোভের বালক কোণায় যে গোপনে লুক্কিত হচ্ছিল কেউই ঠিকমত বুঝতে পারেন নি। বৃহত্তে না পারলেও বাকদের অস্পষ্ট ভ্রাণুধূনের লুক্কিত লুক্কিত করে তুলেছিল, শুধু আশায়ের বেগে নয় লব্ধবাদের সাহিত্যেই তাঁরা তাঁদের ক্ষুদ্র চাকল্যের ছাপ রেখে গেছেন।

এই ক্ষুদ্র অস্থিরতাতেই অগদীশ গুপ্ত 'লঘুগুরু'র নতুন মানব ও খুঁজেছেন, রোমন্থন, রত্নবিবর্তিত, স্তম্ভিনী, অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদি নানা রচনায় জীবনের মূল্য ও মর্যাদা গাঢ় বেদনাময় সংশয়ের কষ্টপাথরে নতুন করে ঘাটাই করবার চেষ্টা করেছেন।

এই বেদনাময় সংশয়ই, অগদীশ গুপ্ত শুধু নয়, সেকালের অনেক লেখকেরই রচনার মূল স্রব। মানুষি অনেক ধারণায় তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছেন কিন্তু নতুন কোনো ধ্রুবজিন্তিও খুঁজে পান নি। জলন্ত তাঁদের জীবন-জিজ্ঞাসা শেষ পর্বত তাই অনেক ক্ষেত্রেই তিক্ত নৈরাশ্রে ভয়-ধূসর। তবু মিথ্যা বোহের আবহংগে জ্বলন্ত আত্মপ্রত্যয়বা যথাসম্ভব পরিহার করবার চেষ্টা যে তাঁদের ছিল, লঘুগুরুর মত কে-কোনো একটি কাহিনী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

লঘুগুরু পতিভাসের জীবন নিয়ে লেখা গল্প। পতিভাসের নিয়ে অনেক গল্প আশায়ের ও অল্প দেশের সাহিত্যে লেখা হয়েছে। নির্বোধ সমাজের অজ্ঞার কৃপার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক লেখকের কলম এমন বিপরীত দিকে ফুঁকেছে যে ভাবানুভূতির হৃদয়বাহ বাস্তবতা সেখানেও সমান বিরুদ্ধ। অগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু এই দুই সীমাত্তের কোনো দিকেই সত্যাত্ত হয় নি। পতিভা সেখানে ঘেঁষাও হয় নি, শিশুটিও নয়। সমাজের যে অস্থূল মানি থেকে তার সৃষ্টি, সেই অস্বাভাবিকতার বহুপ-জিজ্ঞাসা লঘুগুরুতে তাই এত মর্যাদাত্তভাবে করণ।

লঘুগুরু অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদির মত রচনা থাকা সত্ত্বেও অগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনকালেই যে বিশ্বস্ত হয়ে এসেছিলেন তার কারণ খুঁজে বার করা সত্যিই কঠিন। তবে তাঁর কাহিনীর লগ্নাগমিতে বোহের

অজনের অভাব হয়তো তার একটি হেতু হতে পারে। তাঁর কলম হয়তো সর্বত্র সমান স্পন্দ নয়, উদ্ভাস্ত যুগের প্রেরণায় তা হয়তো নিরর্থক পৌলকধাঁধার কখনো ঘুরে মরছে, ভুলো ভব্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তা হয়তো সৌষ্ঠব-সংযমের সীমা কোথাও অতিক্রম করে গেছে, তবু পাঠকের মন ভোলাতে জীবনের উপর মিথো রং চড়িয়েছে এ অশব্দ তার নামে বোধ হয় নেওড়া থাকবে না।

একাত্তর বঙ্গের বঙ্গল অগ্নীশ গুপ্তের মৃত্যু হয়েছে। সাংসারীজন সাহিত্যের নিষ্ঠুর সাধনাই তিনি করে এসেছেন। এই নির্লজ্জ আশুপ্রচারের যুগে সাধনার এমন নিষ্ঠার নিষ্ঠাও বিরল। বর্তমানের নগণ মূল্য দ্ব্যবোগ্যভাবে তিনি পান নি; ভাবীকাল তার অভিপূরণ করবে অল্পশোচনীয়, এমন আশা দেবার সাহসও আমাদের নেই, তবু অগ্নীশ গুপ্তের মৃত স্মরণ্য বার্থ হতে পারেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সময়ের জোতে সব কিছুই হারায়, তবু জীবনকে নির্ভীক নিলিখ দৃষ্টিতে দেখবার ও বোঝবার চেষ্টায় অসাধু সিদ্ধার্থের মত বই লেখবার ক্ষেত্রে সাংসারীজন রোগ শোক অভাব সারিত্বের সঙ্গে অমানবমনে ধীন হয়ে এসেছেন, প্রত্যক্ষভাবে না হোক, তাঁর সাহিত্যিক সাধুতা পরোক্ষভাবে ভাবী কালের অহুপ্রাণনা হয়ে থাকবেই।

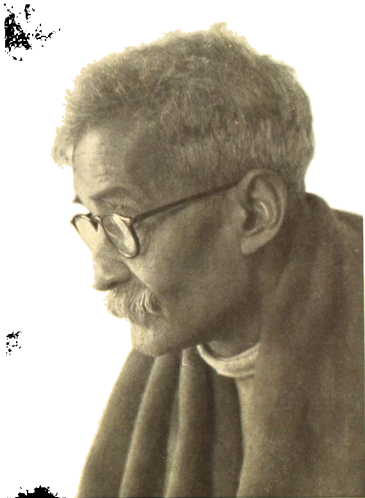
প্রেমেন্দ্র মিত্র

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

ভটিকতক পাণ্ডনাচার্যের কাছে আত্মীয় কই হয়ে থাকাকে পরম গোঁড়বের বিষয় বলে মনে করি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার তাঁদের মধ্যে প্রথম।

গরু মনে করেন ছোটদের ঘিনগুলি বুদ্ধি শুধু বাঙরাবাওয়া হাসিবেলা দিয়েই ভরা থাকে, কুখাত্তলোকে বুদ্ধি তাদের সবই বাস্তবজগতের, শিশুমনস্তত্বের আন্তর্য্যও তাঁদের চেনা হয় নি। আমার মনে আছে সে সময়ে ব্যাচ পশ্চি মিক্, তিনিটি প্রণাম, আর চক্চকিট দক্টি দিয়ে কুলানো বেত'না। ফলের মধ্যে অষ্টপ্রহর বে অহুত্বিগুলো আত্মলি-বিকুলি করতে থাকত, ভাষার বাসের ব্যক্ত করা বেত না, কাছে ঘাসের প্রকাশ করা বেত না, বক্কা ছিল বাসের মুখ্য, হাত ছিল আনাড়ি, নাকি ছিল দুর্বল, গুরুজনরা বাসের প্রতিকূল, পরিবেশ বাসের বাধা, অথচ বাসের অবিরাম কলরোলে কান ঝালা-পালা হয়ে উঠত, নিশাস বহু হয়ে আসত, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সেইসব আত্মল অহুত্বিগুলোকে মহাসাগরে মূক্তি দিচ্ছেলেন। সে মহাসাগরের বর্ণনা নেওড়া যায় না, স্থানীয় তার জলরাশি; উত্তাল তার ঢেউ; উদ্ভাস তার কোড়ো হাওয়া; বসে তার ঢুবে-বাওয়া লাহাঙ্গের ধনরাশি, আর মুক্তাভরা কিছুক আর আদখানা নাছের মতো দেখতে হুম্মরী ছুবিনী মেয়ে; মাঝে মাঝে দুর্বল বীণ, যেখানে পৌছতে পারলে সব জালা জুড়িয়ে থাকে।

কে বলেছে শিশুমনে জালা নেই? ছোটবেলাকার সে রাজাহীন মূক্তিহীন অসহ বাধাগুলোয় কথা যায় মনে নেই, তাকে আর কি বোঝাব? সে বঙ্গবার তীর্থ অবর্ণনীয় আনন্দের কথাই বা কি করে বলব? কথা বহু হয়ে বেত; গলার শিঙ্কনে, ডাক্তার-বড়ির নাগালের বাইরের গোপন একটি কোণ বেদনার টুন্টু করে উঠত। স্বপ্নজুখ বলে একাকার হয়ে বেত, দুইয়েতে বে কোনো তফাত নেই



অগস্টীণ গুপ্ত
খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর চিত্র



ପ୍ରତିନିଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତସମ୍ପାଦକ



ପ୍ରତିନିଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ

সে কথা শ্যুট হয়ে উঠত। দক্ষিণারজন মিত্রমজুমদারের নামও তখন শুনি নি, কিন্তু নাম দিয়ে কি-ই বা এসে যেত? আধারের কি কোনো দাম ছিল তখন? পক্ষরসের ধারা আকর্ষণ পান করেছিলাম, ঝড়ের মতো ভরে গ্রহণ করেছিলাম। অপর থেকে আজও তার স্বাদ ঘাব নি, জীবনের ধারে ধারে আজও সোনালি পাঁচটুকু লেগে আছে। এ কথা কি শোধ করবার মতো?

কাগজে গড়াম দক্ষিণারজনের আশি বছর বয়স হয়েছিল, দুটি নেদে বেগে গেছেন, কুড়ি পঁচিশ খানি বই রেখে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভাকঘরে” ঠাকুরদা সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন, গত বছর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।

এই দিয়েই কি দক্ষিণারজনের হিগাব কথা হয়ে গেল?

দানকে যদি সীয়ার মধ্যে বেঁধে ফেলা যায় তা হলে সে হল ছোট দান। দক্ষিণারজন বাঁ দিয়েছেন সে সময় থেকে কলকাতার পুঁজিহীনদের প্রবাহিত হবার মতো জিনিস। মানবজীবনের চিরন্তন যুগ্মপের উপর সে গড়া, কাহিনীর মধ্যে রাক্ষস খোঁজ দৈত্য দান। দত্তই-না! অবশ্যে বিচরণ করে বেড়াক। অসম্ভব ঘটনাবলীর জালে ভড়িয়েও সৈন্যসিন্দুরে কলকাতা-বিশ্ববিশ্বকোষে। বিন্দুমাত্র মটল হয়ে ওঠে নি, বরং আয়নার ছবির মতো চোখের সামনে পরিষ্কৃত হয়েছে। ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই কখনো আমাদের জীবনে ঘটে উঠবে না, কিন্তু যদি হত, কোনো এক ইজ্ঞাজালের ছোঁয়া লেগে তাই যদি হত, তবে আনন্দের ঠিক ঐকমই করতাম। এইখানেই গল্পের অপকল্প। অসম্ভব হলেও কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়।

আর সে কি রোমাঞ্চকর অসম্ভব! তার বয়সে সব সম্ভাবনা, সব শাক্ষ্য অকল্পিতভাবে বিলিয়ে দেওয়া যায়। কুগড়া করতে গিয়ে, ঘন ঘন পথ হারিয়ে লম্বাঘোলায় কাল পেয়ে, হতাশ হয়ে চোখে পড়ে গাছডালার বঁসে কে একজন রূপালী মেয়ে আকুলমনে কাঁদছে। ঘোড়ার উপর তুলে নিয়ে রাজ্য তাকে ঘরে এনে বিয়ে করে ফেললেন। তার পর রোজ রাতে হাতীশালা থেকে হাতী যায়, ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া। এই পর্যন্ত এসে, মধুর রসের পালা ফুরিয়ে বীভৎশের অবতারণা হয়। সময় ভোলাপাড় করে দেয়। পরিশেষে গরিব গুণী ছেলে রাক্ষসীরানীকে ধরিয়ে দিয়ে, রাজার মেয়েকে বিয়ে করে, পরমসুখে দিনশাত করে। গল্প এখানে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার স্বরটি বৃকের মধ্যে গুমরোতে থাকে, তার পর রাজার কি হল, বৃক ভেঙে গেল না? মানবজীবনের চিরন্তন বিফলতার বেবনায় চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে।

গল্পগুলি পুরোনো, ছাঁচটি কিন্তু দক্ষিণারজনের, ইজ্ঞাজালটি ঊঁঠ। নিজে কোথাও রসমকে নেমে আসেন না, রূপকথার বোঁহ-বনিকা কোথাও ছিঁড়ে যায় না। কিন্তু অসত্যকে বাছন করে যে নিগূঢ় সত্যগুলি মনকে নিরস্তর নাড়া দিতে থাকে, সেগুলিই হোল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের চিরন্তন সাহচর্য।

আদিকেরও লালিত্য আছে, গল্প বেখানেই পঙ্খ হয়ে আসে, দু লাইন ছড়া দিয়ে দক্ষিণারজন তাকে উদ্ধার করে দেন। আর ছবি? সে সব ছবি কে একেছে জানি না, কিন্তু এমন শিল্পী আর ভেঁা দেখি না, রাক্ষসের বে এমন রাক্ষুসে রূপ দিতে পারে। ‘জিভ লঙ্ককের’ মৃতিবানি চিরদিন আমাদের চিত্তে অবিস্ত হয়ে থাকবে।

সেই দক্ষিণারজন মিত্রমজুমদার চলে গেছেন এ কথাই বা কেমন করে বলা যায়। বাংলা দেশে কতদিন ছেলেমেয়ে আছে দক্ষিণারজনও ততদিন আছে।

হুনির্মল বহু

আকাশে তো কত তারা থাকে, কিন্তু ঐ অল্প আশোর বিন্দুসমষ্টির মধ্যে থেকে যে তারাটি বেশি উজ্জ্বল আশো ছড়ায় তার উপরেই আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আকাশের মিকে তাকিয়েই প্রথমে খুঁজতে ইচ্ছে হয় সেই তারাটি।

কিশোরসের আকাশের সেই অতিপ্রিয় তারাটি নিবে গেছে। এতে আকাশ হয়তো নিবে যায় নি একেবারে, কিন্তু আকাশের মোহ এতে একটু কমেছে স্বীকার করতেই হবে।

হুমায়ূন কাল, প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্টি বছর, হুনির্মল বহু তাঁর ছন্দের বোলা দিয়ে বাংলা দেশের কিশোরসের সঙ্গে খেলা করেছেন। কিশোররা তাই তাঁকে তাদেরই একজন সহচর ও সঙ্গী বলে ঘেঁষে এসেছে। ছোটরা কি চায়, তাদের মনের পরিধির বাপ কত, তাদের কল্পনার পরিমাণ কতবানি—এ সব জানা না থাকলে ছোটদের বন্ধু হওয়া মুশকিল।

হুনির্মল বহু এগব আনন্ডেন, তাই ছোটদের বন্ধু হতে তাঁর কোনো অস্ববিধে হয় নি; কেবল বন্ধুই না, তিনি তাদের মনের মালিকই ছিলেন বলা যায়। এইজন্যে তাদের চাহিবার ভোগান দিতে তিনি পেরেছেন অন্যায়সেই।

পূর্ববাংলার ঢাকা জেলার তাঁর দেশ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতার কর্মস্থলে— গিরিজিতে। এখানেই তাঁর বালাকাল কাটে। কাঁচা মাটিতেই পুতুল গড়া সম্ভব, বাসোর সেই কাঁচা মনের উপর যে ছাপ পড়ে হুনির্মল বহুর রচনায় তার চিহ্ন প্রায় সর্বত্র ছড়ানো। গিরিজির সেই পাহাড়তলী, পাহাড়ি নদীর সেই মলকরোল, উষ্মপ্রপাতের সেই জলোজ্জ্বল, মহার বন, মাদলের ধনি, ঋগুতাল বরনারীর প্রাণপ্ৰসঙ্গী নৃত্যছন্দ— কিশোর হুনির্মলের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তার সাক্ষ্য-গ্রন্থ তিনি রেখে গেছেন তাঁর অল্প রচনায়।

ক্রমে তাঁর বয়স বেড়েছে, একের পর এক তিনি নানা বিষয়ে তাঁর লেখনী চালনা করেছেন। কখনো গল্প, কখনো কাহিনী, কখনো উপন্যাস, কখনো ভ্রমণবৃত্তান্ত— এইভাবে প্রায় দুই শ বছরের গ্রন্থকার তিনি হয়েছেন। কিন্তু এ সব সবেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় রয়ে গেছে তাঁর ছড়ায় এবং কবিতায়। কেননা, শারীরিক বয়স তাঁর বেড়েছে বটে, কিন্তু তাঁর মনের বয়স বাড়তে তিনি যেন নি, সেই মনটিকে রেখেছিলেন কিশোর করেই। এবং সেই কিশোর মনের অকৃত্রিম আনন্দ তিনি নানা ছন্দের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে বিতরণ করেছেন কিশোরদের মধ্যে। কিশোরদের আকাশে এইজন্যেই তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল তারা। আশোর কাপন দিয়ে প্রিয় তারাটি যেমন আমাদের মনকে পেশা দেয়, হুনির্মল বহু অবিকল সেইভাবে ছন্দের কল্পন দিয়ে খেলা দিয়েছেন কিশোরদের।

হুনির্মল বহু নানা রকম ছন্দের কারিকুরি দেখিয়ে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় তো দিয়েছেনই, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। তিনি কিশোরদের কান তৈরি করে দিয়েছেন বলা যায়। তাঁর কবিতার বা ছড়ার সঙ্গে বাবের ঘনিষ্ঠপরিচয় আছে, তারাই অন্ত-কারো কবিতায় একটু ছন্দের ভুল হলেই চমকে তাকায়। ক্রটিটা কোথায়, অটুট! বলতে না পারলেও ক্রটি যে আছে তা দরতে কোনো কষ্ট তাদের হয় না। ছন্দের

সুনির্মল বহু

দৈনুণা তিনি অর্জন করেছিলেন সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা থেকে এবং ছন্দের বৈচিত্র্য হুঁয়ার সাহেব কাছ থেকে।

কেবল ছন্দের সোল দিখে বেলা দেওয়া নয়, সেই বেলার লুকে ছোটদের শিক্ষা দেওয়াও ছিল সুনির্মল বহুর ধর্ম। সেইজন্তে তাঁকে কিশোরদের সহচরই শুধু নয়, তাঁকে আদর। কিশোরদের শিক্ষক বলেও স্বীকার করে নেব।

বাহুবলকে শ্রদ্ধা করতে না জানলে কারো শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না। কেউ কেউ বাহুবলকে অশ্রদ্ধা করে ও অস্বীকার করে নিয়ে শ্রদ্ধের হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। সে স্বার্থ পূরণের পথিক সুনির্মল বহু ছিলেন না। তিনি মহুয়াবের ও মহুয়ের উপর গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর মনের এই শ্রদ্ধাশীলতা তাঁর রচনায় নম্রো প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলনের প্রতিমানও তিনি পেয়েছেন, তিনি অকল্পিত শ্রদ্ধা পেয়েছেন সকলের। তাঁর তিরোধানের তাই কেবল একটি তারার-বলার আক্ষেপই শুধু নয়, একজন বহুবিরোধের বেনাও অহুত্ব করেছে সকলে।

তিনি আজ নেই বটে, কিন্তু তাঁর কর্তব্য তিনি যেন রেখে গেছেন আমাদের মধ্যে। আজও তাই আমরা যেন স্মৃতি স্নেহে পাই তাঁর গলা—

বাস কোথা তুই গোবর্ধন,
একটা মজার খবর শোনি—
বুধস্মৃতির বারবেলায়
ডোবার জলে চার ফেলায়
উঠল কুমির ঝড়শিতে,
দেবল পাড়াগড়শিতে।
সাবধানেতে কালকে তার
পাঠিয়ে দিলাম বলকাঁড়ায়।

তার পর কুমিরের কি হল, সে কথা জানার ইচ্ছে আমাদেরও নেই, গোবর্ধনেরও নেই। যে খবরটুকু পাওয়া গেল বার বার ঐ খবরটা আবৃত্তি করতে পারলেই হল। তার মধ্যেই মজাটা আছে হয়।

মামল আর বাঁশ নিয়ে চলেছে দুই পাঁওতাল বহু একটা মস্ত জলজেলের এলাকা পেরিয়ে। তাদের চলার গতি এবং তাদের মামলের ধনি ও বাঁশির স্বর বেগে উঠেছে মাত্র কয়েকটি ছত্রের মধ্যেই—

মংলা-ভায়া জলবি চল
জংলা সেনের ঠিক কী বল

চলেছে তার। চলকি চলে। দুই পাঁওতালে বাজাতে বাজাতে চলেছে—

মামল—মিপিং মিপিং মিপিং মিপিং মিপিং মিপিং ত্যাং

বাঁশি—তুতু তুতু তুতু তুতু তুতু তুতু তু।

এই ধনি পাঁওতালপত্রীর প্রান্তরেই মিগিয়ে যায় নি, এ ধনি ছড়িয়ে আছে সারা বাংলা দেশের কিশোর-মনের প্রান্তরে-প্রান্তরে।

সুশীল রায়

দেবজ্ঞান ও এসকিলস্

ত্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

গ্রীক পুরাণে একটা বিচিত্র ঘটনা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে— দেবতাদের সিংহাসনচ্যুতি ও প্রাণান্তপনশয়া। শেবদার যিনি দেবরাজ হলেন, তিনি স্বনামবিখ্যাত জিউন্ বা জুপিটার। কিন্তু তিনি সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তাঁর পিতা ক্রনস্কে বিতাড়িত করে; এই ক্রনস্ ও আবার রাজপদে উঠেছিলেন তাঁর পিতা ইউরেনস্কে বিচ্যুত করে। এবেন রাজত্বের অন্ত উত্তরাধিকারীদের বংশানুক্রমিক যুদ্ধ (war of succession) — হানব ইতিহাসে এ ব্যাপারটি একান্ত পরিচিত, প্রাচ্যে হোক আর পাশ্চাত্যে হোক।

অনেকে বলবেন— পুরাতত্ত্ববিদেরা বলে থাকেন— এর মধ্যে আশ্চর্যের বা রহস্যের কিছু নাই। ভগবানকে, দেবতাকে হান্ধব গড়েছে নিজের আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে— স্বর্ণ পৃথিবীরই প্রতিচ্ছবি। স্বতরাং স্বর্ণে দেবতাদের মধ্যে যা ঘটে তা মানবীয় ইতিবৃত্তেরই আলোচ্য বা অন্তর্ভুক্ত। হান্ধবের কল্পনা হান্ধবের স্বভাবকে ত ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কথাটি কি তবে এই শুধু?

কারণ, আর-একটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। একটু অভিনিবেশ করে দেখলে, ধরা যাব না কি শুধু পারস্পর্য নহ, কিন্তু পরিণামে একটা ক্রমোন্নতি? ঐতিহ্যে স্পষ্টই বলা হয়েছে 'টাইটান' (দানব বা অহুর) -দের দলে দেবতাদের যুদ্ধ। আহিসেবতাদের অন্ত নামই ছিল বৈদিক ভাবায় অহুর অর্থাৎ শক্তিদান। কিন্তু গ্রীকেরা যে সব শক্তিদানদের কথা বলেছেন তাঁরা পৌরাণিক অর্থে অহুর— ভাবা হল 'কাম এবং ক্রোধ এবং রমোক্ত-সমুদ্ভব', এই বৃত্তির প্রতিফলিত। এদের পড়াতে চরিত্রে যে কতটা যে ক্রুরতা তা স্পষ্ট। ক্রনস্ এবং তাঁর স্নাতকুল হলেন এইসব টাইটান। একদিকে তাঁরা স্বর্গের (ইউরেনস্) সন্তান, তাঁদের মা হলেন কিন্তু পৃথিবী ('গেয়া' বা 'গে')— মাটির, জড়ের চেতনায় বা অবচেতনায় তাঁরা ঢালাই হয়েছেন বলেই তাঁরা হলেন একটা অধঃপতনের প্রতীক। ঐহা, তাঁরা সংখ্যায় বারো, ছয়টি পুত্র, ছয়টি কন্যা— যষ্টির ছয়টি প্রয়ের বা পোকের সত্তা ও শক্তি অর্থাৎ সত্তা ও শক্তির অপজ্জারা? স্বর্গ হতে যে তাঁদের বিদায় হয়েছিল, ইউরেনস্ যে তাঁদের নিবাসিত করে দিয়েছিলেন রণাভয়ের গর্ভে, তাঁর হেতু তাঁদের অস্বাভী প্রকৃতি।

আহিসেবতার তিরোভাব, অহুরের দানবের আবির্ভাব, অমৃতত্বের পরিবর্তে মৃত্যু-বিষের জারণ যষ্টির মূলে একটা গৃহ ইতিহাস—ইউরেনস্-এর পরিবর্তে ক্রনস্। কিন্তু অহুরের গর্ভে জন্ম আলো— তাঁর প্রথম শিখা নিয়ে ঝাঁপাল জিউন্ অলিম্পস্-পাহাড়ের চূড়ায়। জিউন্দের স্নাতকুল যে দেবগোষ্ঠী গঠন করেছে তা স্ফোতির্ময় হস্তময়; তাঁদের পূর্ববর্তীদের তামসী প্রকৃতি কাটিয়ে তাঁরা পেয়েছে এবেনকে একটা জ্ঞানের সৌন্দর্যের স্বয়মশক্তির প্রভাব, যা হ'ল গ্রীক বা হেলেনিক শিক্ষাদীকার দান।

দেবতার নবজন্ম— এই রহস্যটি গ্রীক নাট্যকার এসকিলস্ তাঁর নাটকের ভিতর দিয়ে কথঞ্চিৎ উন্মোচিত করবার চেষ্টা করেছেন। এসকিলস্ নাট্যাবলির মূল পুত্র যদি বলি জিউন্-রহস্ত অর্থাৎ দেবরাজ জিউন্

হলেন তাঁর নাট্যরঙ্গতে প্রধান ব্যক্তি বা নায়ক— তাঁরই প্রভাব বা ছায়া ছেয়ে আছে সেকিণীয় রসাতলেন (যেমন বলা হয়ে থাকে, অন্তরীকী সীতার ছেয়ে আছে সেকিণীদেবের সীতার নাটক), তবে তা অত্যাধিক হবে না। কথাটি এখন একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন।

গ্রীক চেতনার একটা মূল বৈশিষ্ট্য হল নিয়তির, একটা অকাটা নিয়তির বোধ— যাবৎ যেমন বলে থাকি—‘নিয়তি কেন বাধ্যতে’। সৃষ্টির একটা ধারা আছে, গতি আছে, নিয়ম আছে (nomoi); সেই নিয়মই হল নিয়তি (Moirae)। অর্থাৎ মানুষকে জীবকে সেই নিয়ম পালন করতে হয়, সেই ধর্ম অঙ্গশরণ করতে হয়, পুণ্যপুণ্যভাবে; এ হল দিব্যবিধি, মানুষের গড়া তা নয়, চিরকাল তা ছিল, আছে, থাকবে— এই তো সনাতন ধর্ম। একে যে পালন করে সে পুণ্যবান, স্বর্গে তার স্থান; যে পালন করে না সে ব্যভিচারী পাপী। পাপের ফল জীবনে দুঃখষ্ট নির্যাতন, পরিণামে নরক-ভোগ। এইই নাম কর্মফল (anagke, Atē)। কর্মফলের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না— কর্মের ফলীপাকে পুরোপুরি ব্রহ্মতেই হবে। গ্রীক নাট্যকার এসকিলস্ তাঁর ইডিপাস-কাহিনীতে নিকর কর্মগতির আলোচনা দিয়েছেন, ট্রাজেডির চরম কাহণ্য দেখিয়েছেন।

কর্মবদ্ধ, কঠোর নিয়তি একদিকে নিকর কর্ম নির্মম—পৃথিবীর তুচ্ছ আত্মতা তাকে স্পর্শ করে না— আধুনিক এক কবির কথায়— Beyond the little voice that prays; আকস্মিক কণ্যা তার বিধানকে ভেঙে দিতে, টলাতে পারে না, হিউগো বলেছেন। কারণ অস্ত্র দিকে, তাই তো হল নিরপেক্ষতা, ন্যায়, উচিত্য, ন্যায় (Dike, Justice)। এখানে এই স্রাবের তত্ত্ব, আমরা পূর্বতন মনোভাব থেকে একটা ভিন্ন উচ্চতর চেতনায় বেন উঠে গিয়েছি। অহর বা টাইটানদের— জিউসের পিতৃপুত্রদের — ছিল বৈরোদ্ধার বেজ্ঞাচার অর্থাৎ অনিষ্টের স্রব। বলেছি যে প্রকৃতির পরিচয় ‘কামদামিতা হুস্র’— কিংবা ‘অহরার বলং কর্ম’— তাই হল এই রাজত্বের বা শাসনের প্রতিষ্ঠা। এই স্বাধিক স্বৈরাচারের (Turannis, tyranny) পরিবর্তে এখন এল নিয়তির বা কর্মের নৃত্যবন্দন— শুধু মানুষ কেন দেবতাদের (অম্বরদের) পর্বত মানতে হয়, ভোগ করতে হয় কর্মফল। কারণ তাই হল স্বাধিবান, তাই স্রাব্যতা। আর জিউসই এই বিধানের খর্ভা, তিনিই স্রাব্যবান।

এর পরে, এবং উপরেও কথা আছে অবশ্য। কর্মবদ্ধের নিয়তির স্রাব্যতার বাইরে, তার উর্ধ্বে হল যে তত্ত্ব ও সত্য তার নাম ভগবৎস্রাব্য বা কণ্যা। তার সঙ্গে মানুষী চেতনার পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। কর্মজ্ঞকে কেটে দিতে পারে এমন রহস্যময়ী শক্তি আছে, তাকে আবাহন করা যেতে পারে, কর্মজ্ঞানের মধ্যে তাকে নানিয়ে আনা যেতে পারে এবং তার আশ্রয়ে জীব মুক্ত হয়ে উদ্ধার হয়ে যেতে অর্থাৎ উন্নীত হতে পারে উর্ধ্বতর বৃহত্তর স্বাক্ষরার লোকে। এই যে কাহণ্যশক্তি বা ভগবৎপ্রদা এক হিগাবে তা আবার অহেতুক— বেহু হযতো আছে, কিন্তু সে তার নিজের মধ্যে, তার নিজের অগ্নী শাস্ত গতির ছন্দে। তবে জীব সে অনিষ্টময়ীর পথ স্থগন করতে পারে তার দিক থেকে প্রবিপাত, প্রণতি, শরণাগতির সহায়ে।

প্রথম পর্বে হল তবে পাপকর্মের ফল হওভোগ। ব্যভিচার বা নিয়নভবের পরিণাম শাস্তি অব্যর্থভাবে (গ্রীকরা এই প্রকৃতি বা দুঃখতির স্বরূপ দেখাতে গিয়ে তার নাম দিয়েছে হুস্রি, Hubris)। এনেথেন্স পাহাড়ের উপরে গাঁথা পড়লেন, এসেলাজেস্ এটনা-আয়েগিরির তলে চাপা পড়লেন। কিন্তু প্রশান্ত মনে,

বিস্ত্রাহ ঘোষণা না করে যদি দণ্ড গ্রহণ করা যায়, যদি তাকে স্বীকার করা যায়, সহ্য করা যায়— ছাড়ের দাবী ব'লে, যেমন রাজা ইতিপূর্ব করেছিলেন— তবে তার স্বরূপ বদলে যায়, তার নাম হয় প্রায়শ্চিত্ত এবং তা সংশোধনের বা পরিত্রাণের পর্দায়ে উঠে দাঁড়ায়। কঠোর কর্মবন্ধনের ফলে— এমন কি যাকে বলে 'উৎকট কর্ম', যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই এবং যার ফল আশু এবং অবশ্রম্ভাবী, তার নির্মল্লেহ, শান্তিতোগকে যদি প্রায়শ্চিত্তে পরিণত করা যায়, তবে পুণ্ডর্য কর্মধারার প্রতিবেশ, এমন কি বিশোধ পণ্ডিত করা যায়— নরক হয়ে ওঠে Purgatory, অর্থাৎ পৌছে যাই স্বর্গের দুয়ারে। তখন যদি ভগবৎকল্পণ এসে দেখা দেয় (যেমন বেয়াত্রিশ এসেছিলেন লাতের কাছে) তবে পুণ্ডর্য কর্ম, নরক লতাই অবলুপ্ত হয়ে যায়, দেখা দেয় নন্দনের পরিত্রাণ ও আনন্দ। গ্রীক পুণ্যে কর্মফলের প্রেক্ষৃতি, পাণের শান্তিনুত হল বিকটবর্ণনা Erinyes— তারা অপকর্মের প্রতিক্রিয়া— এ হল justice without mercy; কিন্তু অপকর্ম প্রায়শ্চিত্তে বা চেতনা-পরিবর্তনে বা ভগবৎকল্পণার রূপান্তরিত হয় যদি স্বকর্মে তবে তারাই হয়ে ওঠে স্ববর্ণনা Eumenides.

এককিলসের বৈশিষ্ট্য এই যে জিউসকে তিনি কেবল দণ্ডবিধাতা নয়, স্নান্যাবীশরণে অধিষ্ঠিত করেছেন— এবং ষাণ্ডসম্বৎ ত্রায়ের সঙ্গে করুণারও স্থান করে দিয়েছেন। আমি যে দ্বিতীয় পর্দায়ের কথা বলেছি সেই চেতনা তাঁর আবহাওয়া— তৃতীয় পর্দায়ের মধ্যে উঠে যান নি, তবে সেমিকের একটা দরজা বা জানালা খোলা এরকম অদ্ভুত করি। পুণ্ডর্য করুণা তাঁর মধ্যে আমরা আশা করি না, সোক্রাডেস বা স্রেটোর স্নিহ সোনার কিছু পাই বই কি।

আমি বলেছি অমিথুগের যেবতা (বা অহর, টাইটান) ছিল শক্তি বা বলের প্রেক্ষৃতি, অবিমিশ্র কেবল বল— ঘোরকর্মী তারা, অবাধ 'অদম্যং ভোঃ' এই তাদের মন্ত্র। তামস প্রাণপ্রবেগের মধ্যে এসে দেখা দিল একটু আলো, একটু জ্ঞান, একটু প্রীতি— জিউস এলেন সেই চেতনার প্রতিচ্ছ হতে, তাঁর অনিশীল সাহোপাশ নিয়ে।

এককিলসের জিউস তাই শুধু বহুদারী দণ্ডবিধাতা নয়— তিনি আবার পরিত্রাতা, সহস্র অতিথি-বৎসল। তাঁর সান্ন্যামারী স্পর্শের ঘাৎ এককিলস বলছেন কি অপরূপ :

'যে হাতের শক্তি দুঃখের অতীত, যে স্পর্শ তুরীরের নিঃশাস হতে, তাই দিয়ে তিনি মুছে দিলেন আর্ড বেয়েট্রি সব ঘরগা।'^১

এই কোরাসটিতেই জিউসের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি বা বলেছেন তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে কি নতুন একটা জিনিস 'এককিলস' এনে দিয়েছে তাঁর জিউসের পরিকল্পনা— তা হল বিস্টিকনের, ভারতীয় কবি বা অধ্যাপনাধিকারেরই মূল ভাষা : এককিলসের এই বিখ্যাত কোরাস বলছে :

'কোন সেবতাকে আবাহন করব আমি' (গ্রীক 'Tin' an Theon...Kekloiman স্বপ্ন করিয়ে

১ By the painless strength of His hand, by the touch of His Breath Supernal, the pangs of her sickness ceased. 'The Suppliants', মেহদি ইবান-কৃত অনুবাদ

যে বৈদিক ‘কশ্যে দেবার হবিষা বিধেয়’— ‘জিউন্ জনয়িতা’— আপন হস্তে এই বিশ্বকানন রোপণ করেছেন যিনি— মানবজাতির নেতা— পুরানী প্রজা— যহান শিরী— বিশ্ব শিল্প-বর্গের জিউস :
 তাঁর উপরে আর কারো আপন নাই— নীচেকার কাহো হস্তের দণ্ড তাঁর উপরে অধিকার রাখে না।
 তাঁর বাক্যই কর্ম, অবিলম্বে সম্পাদন করে চলে তাঁর মানসে যা রয়েছে।’

এসকিলস্ বাস্তবিকই দিয়েছেন বৈদাত্তিক ভগবানের চিত্র। পরে বলছি আরো। জিউসের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন— তৎকালে প্রচলিত ধারণা ছিল তাঁর সম্বন্ধে যে, তিনি শুধু কবি অর্থাৎ কাব্য-রচয়িতা নন, তিনি ছিলেন আবার প্রজাবান হই। এখানে কবি দেখিয়েছেন যে, জিউস আর আত্মহৃতিক দেবরাজ মাত্র নন— তাঁর বিধান তাঁর কেবল অহংকৃত-বেদান্ত-প্রসূত নয়। প্রথমতঃ তিনি বিধানমাত্র নন, কেবল অকাটা নিয়তি তিনি নন— পঞ্চভূতের ণ্ডে পড়ে যে ভগবান কানেন তা তিনি নন। বিধানমুক্ত, বিধানের উপরে তিনি স্বরাট; আমাদের বেশে যেমন বলা হয় ব্রহ্ম হলেন নিত্যমুক্ত চৈতন্য। এই ব্যতীত কেবল জিউসেরই আছে— কারণ তাঁর আছে সেই জ্ঞান, সেই চেতনা, পুরাণী প্রজা (palaiphrón)— আর কারো নাই। আর কারো থাকলে তা হবে পড়ে আত্মর-বৈরাচার। জিউসের বৈরোজা ব্যক্তিগত অনিয়মিত বৃদ্ধা নয়, পরাক্রম্য কমতাপ্রাণ্য নয়— যেমন তাঁর পূর্বগামী পিতৃপুরুষদের ছিল; এর প্রতিষ্ঠা বা প্রকৃতি হল EUNOMIA (ইংরাজীতে বলে good will, kindness— কিন্তু গ্রিক হল সংস্কৃত থাকে বলা হয় সৌম্যন্য) এবং Dike (ক্রোধ বা justice—এর চেয়ে কিছু বেশি)। জিউসের একটা দিক বিধান বাটে, কিন্তু তা একান্ত ঘরব্যং নির্মম বিধান নয় স্বর্জনীয়তির হতে। তাই বলা হয় তাঁর রাজ্য নৈরাজ্য (অরাজকতা) যেমন নয়, তেমনি আবার বৈরোজাও (despotism) নয়— তা হল ধর্মরাজ্য (eunomia)। তিনি বিধানের উপরে, মুক্ত তিনি, এক তিনিই^২। এমন কি জন্মেও তিনি মুক্ত, কেউ তাঁকে হয় বেষ নি, তিনি স্বয়ং; আপনায় জনক আপনি তিনি, নিজেই স্বষ্টী করলেন— তাঁর স্বর্ষ জগৎও সৃষ্টি হয়ে গেল সেই সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই মুক্ত নন কেবল, তিনি আবার মুক্তিনাতা— তাঁর পথে তাঁর চেতনার ধারায় চলে ধারা তারারও মুক্ত হয়ে যায়— তিনি সকলের সকল বন্ধন খুলে দেন^৩।

জিউসের মধ্যে তাঁর শক্তি ও তাঁর জ্ঞান কি রকবে একীভূত একাধ্ব তা লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথমে জ্ঞানের মধ্যে কর্তব্য উল্লসিত হয়, তার পর তিনি তাকে কৃতকর্মে পরিণত করেন, তা গ্রিক নয়— তাঁর জ্ঞানের স্বভাবই কর্মে পরিণত হওয়া তৎক্ষণাৎ, জ্ঞান কর্মশক্তিই, আশ্রয় থাকে বলি চিন্তাশক্তি প্রায় সেই বস্তু। তিনি স্বরাট এবং সরাট।

Zeus এর শত নাম। একদিকে তিনি যেমন বজ্রধারী শত্রু-নিব্বন বা সর্বকর্তা সর্বসাধয়িতা (Zeus panteleis, pankrateis), অত্রদিকে তিনি পরিব্রাতা, সমাপহর্তা, আনন্দনাতা, তিনি খুলে দেন আমাদের বিবাচক। একটা অরাজকতার শাসনের পরে তিনি এনে দিয়েছেন স্বনিয়মের শাসন, ক্রূরতার বিধানের পরিবর্তে এনে দিলেন একটা সৌম্যন্য, রাজ্যবিক্রয় উৎকটতার পরিবর্তে ধরে দিলেন নিত্যচার, সামন্ততন্ত্রের আদর্শ। মানুষের উপকার করেছে বলে প্রমোদিতগকে যে জিউস নির্মম শান্তি বিতে চেয়েছেন

২ Since none but Zeus is free—‘Prometheus Bound’ (Murray).

৩ The liberating ways that are God’s—‘The Suppliants’.

তানয়, তার মূল কারণ এ কার্য সে করেছে বিহ্বাহের অর্থ হিগাবে, আত্মহনিক মনোভাবে প্রবৃত্ত হয়ে। এখানে তাই জিউসের কৃত্যমূর্তি। কিন্তু তাঁর গন্ধিপ্যমূর্তি তিনি দেখিয়েছেন যখন প্রমেথিউস নতি স্বীকার করেছে— দুঃখের বিষয় এগকিলসের সে নাটকখানি আমাদের কাছে পৌছয় নি (Prometheus Unbound)।

আমরা Zeus-এর যে চিত্র বিলম্ব সে হল তাঁর অলঙ্কা অধ্যাত্মমূর্তি, যাকে বলা হয়েছে স্বর্গীয় জিউস (Ourios Zeus)। কারণ কবি নিজেই বলেছেন জিউসের দুই মূর্তি— তার একটি হল সাধারণ লৌকিক বা মাহুতী মূর্তি— যেটা গল্পে কাহিনীতে লোক সমাজে প্রচলিত। ফলতঃ সব দেবতারই আছে এই দুই রূপ। বাস্তবপক্ষে মাহুত গড়েছে যতখানি সম্ভব মাহুতভাবে, পার্থিব করে— কিন্তু আত্মর রূপ হল দেবতার দ্বিতীয় স্বরূপ। মনে হয় এগকিলস কথঞ্চিৎ তার সন্ধান পেয়েছিলেন।

৪

দেবতার ক্রমপরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছি গোড়ায়। গ্রীসীয় দেবতারের বংশপরম্পরা তারাই। ইতিহাস কিছু সের বলেছি। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, হেলেনিক শিক্ষা দীক্ষা মানবচেতনার যে পরম পরিণতি প্রকাশ করে ধরেছে, তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হয়ে থাকিয়েছেন এই অলিম্পীয় অধিরাজ জিউস। কিন্তু মানবচেতনার শেষ চরম পরিণামে আমরা তো এখনো পৌছাই নি। জিউসই যে শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ অধিরাজ নন গ্রীক ইতিবৃত্ত, স্বয়ং এগকিলসই এ তথ্য এনে দিয়েছেন। জিউস একটা পরম্পরায় এসেছেন যেমন, তেমনই চলেও যাবেন আর একজন বৃহত্তর বা মহত্তর দেবতারের স্থান করে দিয়ে। ভাবী মানব-চেতনার প্রতীক হয়ে উঠবেন আর এক ইন্দ্র। এ সম্বন্ধে ইংরেজ কবি শেলীর কি স্বপ্ন তা আমি অন্তর আলোচনা করেছি।

প্রাচীনতমেরাও নবীনতমের মতোই একই স্বপ্ন বেঁধেছিলেন। আজকার উষা অতীতের উষা-পরম্পরায় শেষ উষা, কিন্তু আজকার উষাই আবার ভবিষ্যৎপরম্পরায় প্রথম।

অশোকলিপি। ঐশ্বর্যচন্দ্র সেন। ছয় টাকা

EDICTS OF ASOKA। ঐশ্বর্যচন্দ্র সেন। পনেরো টাকা

ইতিহাস পাথলিগিট সোসাইটি, ২১ বলদান ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৪ *

বহু সাধকের বহু প্রচেষ্টার পর ১৮৩৭ সালে জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ্‌ অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে সফল হন। তার পর থেকে উইলসন, বাহুফ, লাসেন, কার্ন, কানিংহাম, সেনার-গ্রন্থ বহু পাশ্চাত্য মনসী নূতন নূতন লিপি আবিষ্কার, লিপিসমূহের পাঠনির্ণয়, তাই আসল অর্থনিষ্কাশন ও অশোকের প্রকৃত ইতিহাস-উদ্ধার কার্যে ব্রতী হন। কিন্তু অশোকের আলোচনার প্রথম পকাশ বঙ্গের মধ্যে কোনো ভারতীয় এই কার্যে উল্লেখযোগ্যরূপে যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। অতঃপর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর *History of Civilisation in Ancient India* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৮২) চোদ্দটি শৈলাস্থাপন ও সাতটি স্তম্ভস্থাপনের অস্থান সহ অশোকের ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করেন। বাংলা ভাষার অশোকবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ হিসাবে কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোক-চরিত' (১৮৯২) বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এই বইখানি অশোকচরিতবিষয়ক প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ ভিন্সেন্ট্‌ স্মিথ-কৃত *Asoka, The Buddhist Emperor of India* (১৮৯১, তৃতীয় সং ১৯২০) পুস্তকেরও পূর্ববর্তী। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের (১৯০১) একটি অধ্যায়ে অশোকের ইতিহাস আলোচনা করেন। এই সময় থেকেই অশোকচরিত্রের মহত্বের প্রতি বাঙালি পাঠকসমাজের উৎসাহক নৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হতে থাকে। সে উৎসাহ ও শ্রদ্ধা প্রবলতর হয় ১৯১০ সালে কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ও ১৯১১ সালে চারুচন্দ্র বসুর 'অশোক বা প্রিয়দর্শী' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর থেকে। অতঃপর অরবীন্দ্র চক্রবর্তী বহু ও ললিতমোহন কর-প্রণীত 'অশোক-অস্থাপন' গ্রন্থখানি (১৯১৫)। এটি বস্তুতঃ পূর্বোক্ত 'অশোক বা প্রিয়দর্শী' বইয়েরই পুরক গ্রন্থ। ভারতীয় ভাষার অশোকাস্থাপনের প্রথম প্রকাশ ঘটে এই গ্রন্থেই। এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই বইটির একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই পুস্তকে বাংলা অক্ষরে অশোকাস্থাপনের মূলপাঠের পরে দ্ব্যাক্রমে সংস্কৃত ও বাংলা অস্থাপন, বিবিধ টীকা, ভৌগোলিক বিবরণ প্রভৃতি আছে, আর আছে একটি মূল্যবান 'উপক্রমণিকা'। তা ছাড়া প্রাক্তী বর্ষমালা ও চারুচন্দ্র অস্থাপনের চিত্রলিপিও আছে এই পুস্তকটিতে। এইসব বিশিষ্টতার ফলে বর্তমানের ব্যবধানের পরে আজও এটির ব্যবহার্যতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অতঃপর উল্লেখযোগ্য স্বরেন্দ্রনাথ সেন-প্রণীত 'অশোক' (১৯৪০, দ্বিতীয় সং ১৯৪৮) এবং বর্তমান লেখকের 'ধর্মবিষয়ী অশোক' (১৯৪৭), এই পুস্তক-দ্বিটি।

বাংলাভাষার অশোকবিষয়ক সর্বশেষ গ্রন্থ ডক্টর অম্বাচন্দ্র সেন-প্রণীত 'অশোকলিপি' (১৯৪০)। শুধু সর্বশেষ নয়, সর্বশ্রেষ্ঠও বটে। বস্তুতঃ বাংলাভাষার অশোকজ্ঞের আলোচনা খুব কমই হয়েছে এবং অশোকের অস্থাপনাবলী সম্বন্ধে বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দুখানি, পূর্বোক্ত 'অশোক-অস্থাপন' এবং আলোচ্যমান 'অশোকলিপি'। এই দুই গ্রন্থের মধ্যে কালের ব্যবধান যেমন বৃহৎ, তাদের আলোচনার

নানের ব্যবধানও তেমনি বৃহৎ। তার কারণ ওই কালের মধ্যে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত, বেশে বিশেষ অশোকরহস্য অনেকাংশে আলোকিত এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদের আরম্ভ থেকে অশোকবিশয়ক গবেষণার নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে বলা যায়। তার কারণ ওই সময়ে A. C. Wooluer-প্রণীত *Asoka Text and Glossary* (১৯২৪) এবং E. Hultzsch-প্রণীত *Inscriptions of Asoka* (১৯২৫)-নামক দুখানি অতি মূল্যবান ও প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশের ফলে অশোকগবেষণা নতুন প্রেরণা লাভ করে। তার পরেও নতুন অশোকানুশাসনের আবিষ্কার ঘটেছে এবং নতুন আলোচনা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এমত প্রযোজ্যে মধ্যে সেবন্ত রামকৃষ্ণ ভাটরকার-প্রণীত *Asoka* (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৫, দ্বিতীয় সং. ১৯২৮), রাধাকৃষ্ণ মূখোপাধ্যায়-কৃত *Asoka* (১৯২৮), বৈদ্যনাথ বড়ুয়া-প্রণীত *Inscriptions of Asoka* (১৯৩০) ও *Asoka and His Inscriptions* (১৯৩৬) এবং জি. ত্রিনিবাস মূর্তি ও এ. এন. কৃষ্ণ আয়ার-প্রণীত *The Edicts of Asoka* (১৯৫০, দ্বিতীয় সং. ১৯৫১), এই পাঁচখানি ইংরেজি বই এবং W. Schumacher-প্রণীত একখানি জার্মান বই (১৯৪৮) ও J. Bloch-প্রণীত একখানি ফরাসি বই (১৯৫০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমূল্যবানু তাঁর ‘অশোকলিপি’ গ্রন্থে এই সমস্ত নতুন তথ্য ও আলোচনার সম্বোধন করেছেন অতি নিপুণভাবে।

তদুপাতাই নয়, অমূল্যবানু তাঁর এই গ্রন্থে যথেষ্ট স্বকীয়তা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও দিয়েছেন। মাত্র ১৬৮ পৃষ্ঠার এই স্বল্পায়তন পুস্তকের মধ্যে তিনি অশোকত্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েরই পরিচয় দিয়েছেন অতি সরল ও প্রাচল ভাষায়। তা ছাড়া তিনি এ বিষয়ের সমস্ত তত্ত্ববিতর্ক অতি সতর্ক পরিহার করেছেন। তাই নতুন শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে অশোকত্বের সামগ্রিক জ্ঞান লাভ অতি সহজসাধ্য হয়েছে। জটিল বিষয়কে সর্বসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য করার ক্ষমতা অতি দুর্লভ। অমূল্যবানুর কাছে এই দুর্লভ ক্ষমতা অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর বুদ্ধবোধ, রাজগৃহ ও নালন্দা, জৈনধর্ম প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেই সেই অসাধারণ শক্তির পরিচয় আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, তাঁর ‘বুদ্ধবোধ’ গ্রন্থে গবেষণাজাত গভীর জ্ঞান এবং সরল অথচ সরল রচনাশৈলীর বিরল সমন্বয় ঘটেছে। বস্তুতঃ বাংলা ভাষার বুদ্ধবিষয়ে আশ্রয় পর্বত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (সেগুলির সংখ্যাও কম নয়), বুদ্ধবোধ সে সবেরই শীর্ষস্থানীয়, একথা বললে অশা করি অত্যাতি হবে না। তাই বলছিলেন অমূল্যবানুর লেখনীপ্রসূত ‘অশোকলিপি’ গ্রন্থে গভীর জ্ঞান ও প্রাচলতার সমাবেশ অপ্রত্যাশিত নয়।

‘অশোকলিপি’ গ্রন্থখানির তিনটি বিভাগ। ‘সিংহাবলোকন’-নামক প্রথম অংশের (পৃ ৫-৫০) সামান্য পরিধির মধ্যে অশোকানুশাসনের প্রাতিষ্ঠান, শ্রেণীবিভাগ, লিপি, ভাষা, পাঠান্তর ও প্রকাশের কালক্রম, রাজ্য অশোকের চরিত্র এবং ধর্ম ও রাজনীতি, আর শেষের তৎকালীন ধর্ম, শাসনব্যবস্থা, শিল্পকলা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বিবরণ আছে। ইংরেজি বা বাংলা অল্প কোনো গ্রন্থেই এমন সুসংক্ষিপ্ত ও সুস্বভাব্যে অশোকের লিপিসাধা, তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব এবং তৎকালীন ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যায় না। এই হিসাবে এই গ্রন্থের উপযোগিতা অল্প সব গ্রন্থকেই ছাড়িয়ে গেছে, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। অন্তঃপর গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগে (পৃ ৫০-১০৭) অশোকের সাতাশটি অনুশাসন ও পাঁচটি লেখ মোট বত্রিশটি লিপিকে বিভিন্ন পর্বায়ে বিভক্ত করে যথাক্রমে এগুলির

গ্রন্থপরিচয়

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সটীক বাংলা অহুবাস আছে। প্রত্যেক পর্বাঙ্কের পরিচয়-অংশগুলি ইতিহাসমিষ্টাঙ্গের পক্ষে খুবই সহায়ক; অহুবাসে ধ্যানসম্বন্ধে মূল্যগ্রন্থ, বস্তুতঃ এই অহুবাসের ভাষার মণোই মূল অশোকবাণীর স্বাদ পাওয়া যায়, এটা কন কৃত্তিদের কথা নয়; আর টীকাগুলিও অহুশাসনের ভাষা ও অর্থবোধের খুবই উপযোগী। অন্তঃপর তৃতীয় বিভাগে (পৃ ১৪৮-১৭১) অশোকের মূল প্রাকৃত লিপিগুলি সংগৃহীত হয়েছে। অশোকলিপির মূলপাঠ নির্ণয় সহজসাধ্য নয়; বহু বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে অশোকতত্ত্ববিৎরা অশোকলিপির যে স্বাক্ষরপাঠ নির্ণয় করেছেন এই বিভাগে সেই পাঠই সংকলিত হয়েছে; এবং এই পাঠ বিভাগে নির্ণীত হয়েছে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে ধারা বাংলা অহুবাস পড়ে মূল দেখতে উৎসুক হবেন তাঁদের খুবই সহায়তা হবে অথচ বিভিন্ন পাঠের অটলতার জড়িয়ে তাঁদের বুদ্ধিভেদ ঘটবে না; পক্ষান্তরে ধারা অশোকলিপির বিভিন্ন পাঠের সঙ্গেই পরিচিত হতে চাইবেন তাঁরাও গ্রন্থকারের নির্দেশ অনুসরণ করে অন্যভাবেই কোমল হৃদয় করতে পারবেন। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি আগাগোড়াই স্থপতিকল্পিত ও সুশীলিত।

কিছুকাল পূর্বে (১৯৬৬ জুলাই) অমূল্যবাহু এই বইখানির একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণে বাংলা গ্রন্থখানির তুলনায় নানাবিধ উন্নতি-বিধান করা হয়েছে। তার মধ্যে অশোকের লিপি ও শিল্পকলার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্রের সমাবেশ এবং বাংলা গ্রন্থটি প্রকাশের পরে তিনটি বিভিন্ন স্থানে (গুপ্তধারা, রত্নমল-মণিরি ও জুইগান) আবিস্কৃত অহুশাসনের পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া আরও দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই। প্রথমতঃ, বাংলা গ্রন্থে অহুশাসনগুলিকে কালানুক্রমে না সাজিয়ে পূর্বাভাসিত রীতিতেই সাজানো হয়েছে; কিন্তু ইংরেজি সংস্করণে কালক্রমে সাজানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অহুশাসনের গোড়াত্তই গুটির প্রকাশকাল তথ্য বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে, তাতে পাঠকের পক্ষে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা সহজতর হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, অশোকবাণীর মূলপাঠ গ্রন্থের শেষে সরিষিট না হয়ে ইংরেজি অহুবাসের গ্রিক সম্মুখে উপটে। পৃষ্ঠার স্থাপিত হয়েছে আর তার নীচে সংস্কৃত অহুবাসও দেওয়া হয়েছে, ফলে অশোকবাণীর সঙ্গে প্রত্যেক পরিচয় সাধনের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। তা ছাড়া, অশোকবাণীর ভাষা ও বিষয়বস্তু সযত্নে গ্রন্থকারের টীকাভাষ্যও পরিমার্জিত এবং স্বীয় অভিনতও সুচিন্তিতর হয়েছে। আশা করি দেশের ইমানীন্দ্রন অশোকগণ্ডেভনতার ফলে অতিগ্রেই ‘অশোকলিপি’ গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হবে এবং তখন এটিতেও ইংরেজি সংস্করণের পদ্ধতি অহুসৃত হবে। অবশেষে একথাও বলা প্রয়োজন যে, বিখ্যাত মনসী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান ভূমিকাটিও অশোকাহুশাসনের নানা দিকে নতুন আলোকপাত করেছে ও গ্রন্থের মূল্যবত্তা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণেই একটি অভাব বিশেষভাবে অহুভব করেছে। গ্রন্থের শেষে একটি বিশেষ বিভাগে একটি সংক্ষিপ্ত পরিভাষাপরিচয় (glossary) ও একটি সামুদ্রিকপরিচয় (concordance) এবং সর্বশেষে একটি নির্দেশিকা (index) থাকলে বইটির উপযোগিতা ও ব্যবহারিতা অনেকখানি বেড়ে যেত বলে মনে করি। আশা করি পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় গ্রন্থকার এই কথা বিবেচনা করে দেখবেন।

অশোক যে দুগুণ আবিস্কৃত হয়েছিলেন তা ছিল প্রবল ধর্মগণ্ডর্বে মগ্ন। ভ্রামণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, আত্মবিক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের কলহকোলাহলে তখনকার সাহিত্য মুগ্ধিত। অথচ বুদ্ধদেব ও তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অশোক সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শিতা ও সমানবোধের নিরপেক্ষতার

নীতিতে অটল ছিলেন। তার একটি প্রমাণ এই। আত্মবিক সম্ভ্রমারের প্রতি বোধদের গভীর দৃশ্য ও বিবেকের কথা হৃদয়িত। তথাপি রাজ্য অশোক অম্লশ অর্থ ব্যয় করে বলভিক (আধুনিক 'বরাবর') পর্বতে আত্মবিক সম্ভ্রমারের কল্প দ্রুত গুণাবাস নির্মাণ করিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।^১ বৌদ্ধ-আত্মবিক কলহের চেয়ে বৌদ্ধব্রাহ্মণ কলহ ছিল তীব্রতর। কিন্তু অশোক পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মণের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং প্রজাসেবক অতুহণ অন্ধা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। তথাপি ইতিহাসের পরিহাসে অশোক কালক্রমে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়ের দৃষ্টিতেই একান্তিক বৌদ্ধ বলেই গণ্য হয়েছেন। কলে ব্রাহ্মণগণতে অশোকনহিনা একেবারেই বিশ্বৃত এবং বৌদ্ধগণতে অত্যন্ত শোচনীয় রূপে অতিরিক্ত ও বিরূত হয়েছে।

সৌভাগ্যবশত: অশোক তাঁর রাজত্বের ইতিহাস ভারতবর্ষের সর্বত্র পর্বতপূর্বে, স্তম্ভগাত্রে বা শিলাফলকে দুরপনয় রূপে উৎকীর্ণ করিয়ে পেছেন অতি সচেতনভাবে। তিনি তাঁর রাজত্বের সমগ্রবিং বর্ষে যে শেখ লিপিত খোদাই করিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট করেই বলেছেন—

'আমার মনে হয়, আমি যে ধর্মবিশ্বাস শোনাই, যে ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ করি তাতে লোক অত্মমত্ত হবে, তাদের ধর্মবুদ্ধি হবে।...এইরূপে লোকের দয়া দান সত্য শৌচ মর্দব ও সাধুতা বর্ধিত হবে।...যেখানে শিলাস্তম্ভ বা শিলাফলক আছে সেখানে এই ধর্মলিপি উৎকীর্ণ হবে যাতে এটি চিরস্থিতিক হয়।' অশোকের এই উক্তিটিকে লক্ষ্য করে মনমোহী ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থে অশোকপ্রদর্শ সমাপ্ত করেছেন এই অভিমত দিয়ে—

The Edict has endured unto remote ages; and within the two thousand years which have succeeded, mankind has discovered no nobler religion than to promote in this earth "mercy and charity, truth and purity, kindness and goodness." —*Civilisation in Ancient India*, Book IV, ch. VII

অশোকের 'চিরস্থিতিক' লিপিমালার পাঠোদ্ধার ও প্রচারের কলে আম ওই মহানুপতির অপরূপ যত্না বহুদৃশ্যাপী বিশ্বস্তির অবদানে বিশ্বমানবের সজ্জ বিশ্বব্রহ্মের মধ্যে পুনরুদ্ভূতি হতে পেরেছে। তাতে ভারতবর্ষের নহিনা যেমন বৃদ্ধি পেরেছে, আমাদের বহুদৃশ্যও তেমন পুনরুদ্ধৃত হবার সুযোগ লাভ করেছে। তাই বুদ্ধসেবের প্রতি কবি যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, প্রিয়বর্শী অশোকের প্রতিও আমরা সেই ভাষা প্রয়োগ করতে পারি।—

আমার মার্ধক হোক, বুদ্ধ হোক বোধ-আবরণ,

বিশ্বস্তির রাজিশেবে এ ভারতে তোমায়ে স্বরণ

নবগ্রাতে উঠুক কুহুমি।

অমূল্যাবুর 'অশোকলিপি' গ্রন্থ ও তার ইংরেজি সংস্করণ আমাদের বোধ-আবরণ সোচন করতে প্রবৃত্ত পরিমানেই সহায়তা করবে।

পরিশেবে বক্তব্য এই যে, 'ভারতবিশ্ভাবিহার' অমূল্যাবুর বুদ্ধকথা, জৈনধর্ম, রাজগৃহ ও নানন্দা,

অশোকলিপি প্রত্নতত্ত্ব সংস্থাপ্রদ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার প্রকাশ করে সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতার বিষয় এই যে, এই প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষা পোষণ করে না। বর্ধমান মহাবীর, পৌত্তম বুদ্ধ ও প্রথমশ্রী অশোক নকলেই প্রাকৃতভাষার প্রচোদনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের নহং দৃষ্টান্তের অহুর্ভবন করে 'ভারতবিশ্বাবিদ্যালয়' যে আধুনিক প্রাকৃত ভাষার প্রতি সমানর প্রকাশ করতে দৃষ্টা বোধ করে না, এটা বিশেষ আশঙ্ক ও আশার বিষয়।

প্রবোধচন্দ্র সেন

শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়। শ্রীনন্দী সাধনা কর। হুপ্রকাশন, ৩ সার্কাস রোড, কলিকাতা ১২। মূল্য আট আনা।

শিক্ষাসমস্তার কয়েকটি দিক। শ্রীবিদ্যচন্দ্র সিংহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৭ বক্সিং চার্জিং স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য বায়ো আনা।

শিক্ষার ভিত্তি। বনমূল। ইণ্ডিয়ান অ্যাপোসিথেটেড পাবলিশিং কম্পানি, ২৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ১। মূল্য আড়াই টাকা।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঠ। শ্রীবিদ্যরতন গুহ ও শ্রীনন্দী শান্তি কর। নলেম হোম ৫২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট টাকা।

শ্রীনন্দী সাধনা করের রচিত ছোট কয়েক পৃষ্ঠার বইটিতে ভাবকথা নেই, ভাবেরও অভিব্যক্তি নেই; সহস্র সরল ভাষা, অনেকদিনের পুরানো শান্তিনিকেতনের কতকগুলি টুকরো টুকরো ছবির সমাবেশ এতে আছে। হয়তো 'ছবি' বললে ভুল বলা হয়, ধারা শান্তিনিকেতনে নতুন এসেছেন বা নতুন পরিচয়ের অতিরিক্ত কিছু এখনও পান নি তাঁদের কাছে এই ছোট বইটিতে লেখা ঘটনাবলীর কোনোটিই ছবি হয়ে ফুটে উঠবে না। কিন্তু ধারা শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদিত্যের লগ্নে পরিচিত তাঁদের মনে এই পুস্তিকার সামান্য সামান্য ঘটনার উল্লেখ অবলম্বন করে বেদনামধুর ছবির সৃষ্টি হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবর্ণন ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের ঐচ্ছিক আছে তাঁদের পক্ষেও পুস্তিকাটি কম মূল্যবান নয়। একাধিক প্রবন্ধে গল্পে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবর্ণনের ঘটনটুকু সাধারণভাবে প্রকাশ করে গেছেন তার পরিপূরক হিগাবে এ পুস্তিকার ব্যবহার হতে পারে। তাঁর চোঁটার বিকটি তখনকার ছাত্রদের লেখা নানা নামের পত্রিকার মধ্যে নানা ভাবে ফুটে উঠেছিল; চিন্তার রূপগ্রহণ চলেছিল কত ছোটখাট বৃষ্টিমাটির ভিতর দিয়ে তার আভাস হয়ে গেছে তখনকার আশ্রমবাসকদের সাহিত্যসৃষ্টিতে। সেইগুলি অমুদ্রাবন করলে অনেক মূল্যবান ভর লাভ হতে পারে।

আজকাল পঠন-পাঠন বিষয়ে নানা মনের নানা পদ্ধতির কথা শুনেতে পাওয়া যায়, সেইসব কোলাহলের মধ্যে একটি অতি লজ্জা অথচ অতি সোচ্চার উপদেশ চাপা পড়ে যায়। ছাত্রদের কাছে পড়াশেখার তাগিদা দেওয়াটা শিক্ষকদের একটি বিশেষ দায়িত্ব হলেও তার চেয়ে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে অন্য দিকে। ছাত্রদের বড় করে তুলতে হলে তাঁদের কাছে বড় করে দাবি করতে হয়, তাদের প্রাণের ধারে ধারে ধারে বড় হবার আহ্বান জানাতে হয়। এই আহ্বান যেন কখনো ছোট সংকীর্ণ না হয়, কখনো যেন কীর্ণ হয়ে

না পড়ে। কিন্তু এ দাবি জানানোর কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এটা নিভাত্তই শিক্ষকের, গুরু প্রাণের দাবি। গুরুর প্রাণের এই আত্মান ছায়ে প্রাণে আগায় প্রবল আশার আলোড়ন। কেমন করে কোথায় যেন গুরুর প্রাণের স্পর্শ ঘটে যায় ছাত্রদের প্রাণে-মনে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যেন একটা আত্মিক যোগ ঘটে। এই যোগ সম্ভব হতে দেখা যায় বড়-র কৃষিকার, ছোট দাবির দুর্বল টান হুকুমার প্রাণে মোহনার সৃষ্টি করতে পারে না। 'তাই যেবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরটি মনের ছুঁবার শক্তিতে ছাত্রদের কাছে আত্মান আনিচ্ছেন, বড় ছুঁবার দাবি করছেন— তাদের ভালোতে তাঁর কত আনন্দ, তাদের দুর্বলতার তাঁর প্রাণে দুঃখ কত সহজভাবেই গভীর হয়ে ওঠে। ছাত্রদের একটি পত্রিকাও আছে, 'আচার্যদেব বলিষ্ঠাছেন, "সমস্ত পুণ্ডরীর গোথ আশাদের এই আশ্রমের উপর পড়িয়েছে। যেটি সবচেয়ে বড় জিনিষ সেটি আশাদের লাভ করিতে হইবে। এই আশ্রমে এমন একটি জিনিষ আছে বাহ্য বাহ্য বিশ্বের হসল করা যায়। তোমাদের এখন জিনিষটি কালে লাগাইতে হইবে। সেইটি লাভ করিতে হইবে।'" বিশ্বের মঙ্গলসাধনের আত্মান, এইই রবীন্দ্রনাথের আত্মান, রবীন্দ্রনাথের আশা। লকল পঠন-পাঠন নিয়ম-কানুন তেজ করে এই ডাক, সূত্র প্রাণের এতটুকু শক্তির নিকট বিশ্বের ডাক, বিশ্বের আশা। এমনি করেই বড়র আত্মানে সূত্র বড় হয়ে ওঠে। তবেই মতো দু-এক আশপায় রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের বিজ্ঞানকে তাঁরই আচরিত ধর্ম এবং তাঁর তত্ত্ব যে একই সে কথা অপ্রকৃতিতই তো রয়েছে।

আর-একটি পত্রিকাও গুরুদেব প্রাণের দুঃখ প্রকাশ করেছেন— "আমি তুমিতে পাই যে তোমরা বগড়া করিয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বল না, তোমাদের এই শিশুদের মতি, কত অসরলতা, কত অজ্ঞা— সমস্ত আছে এখন সে সব তুমি তখন আমার মনে অভ্যন্ত আঘাত লাগে।" একাধিক শোক যে-মনকে আঘাত করেও বিচলিত করতে পারে নি শিশুদের ত্রুটি শিশুদের অজ্ঞা সেই মনকে আহত করেছে। এ যে তাঁরই সাধনার ব্যর্থতা, শিশুদের মধ্যেই যে তাঁরই প্রাণ বিকাশশীল। মনোবিজ্ঞানে এর যে নামই থাকে— Identification, Suggestion— এর কার্যকারিতা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

শান্তিনিকেতনে এই মহান্ একাত্মতার আবহাওয়া বর্তমান ছিল। অধ্যাপকরা তাঁদের চিন্তা জ্ঞান অনেক সনকেই ছাত্রদের পত্রিকাও প্রকাশ করতেন, কৃপা করে নয়, আভাবিক সংগত বলেই। ছাত্ররা তাঁদের শিশুহুলত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে-পত্রিকাও, শিক্ষকরাও তাঁদের জ্ঞানচর্চা করবেন সেই পত্রিকাতে, এইটাই গুরুশিষ্যের সম্মিলিত সাধনার পরিবেশে আভাবিক ছিল। বিলাতে ভ্রমণ করার সময় অধ্যাপকের নব নব অভিজ্ঞতা এই সূত্র আশ্রমটির শিশুদের কাছে পৌঁছত, প্রকাশিত হত তাঁদের কোনো-না-কোনো পত্রিকা।

'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়' অনেকটা বাস্তবতার মতো, বড়টুকু তাঁর আদর্শের তাঁর শতশত প্রকাশ করে দেয়। হয়তো এর মূলে আছে পুরাতন দিনের অলস্রাস্ত শ্রুতি, অল্পের স্পর্শেই যা বড় হয়ে ওঠে, ছবি হয়ে ওঠে। তবু এ কথা টুক, শ্রুতিপীড়িত মন ধানের নয় তাঁরাও এর ভিতর রবীন্দ্রনাথ আভ-শিক্ষকের কথা যা বলেছেন, শৈশবের পরিবেশের যে spirit এর ইঙ্গিত আত্মাধন দিয়ে এগেছেন তাঁর আভাস পাবেন।

তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে ত্রিমুখ বিবলচন্দ্র সিংহের পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ তিনটি ঘোঁটামুটি এক বংশের ভিতরই লেখা এবং বোধ হয় সেইজন্য এদের মধ্যে চিন্তার একটা ঐক্য রয়েছে দেখা যাচ্ছে। প্রবন্ধগুলি অসংস্পর্শ হলেও একসঙ্গে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার কোনো অসংগতি ঘটে নি।

শিক্ষা সম্বন্ধে আরম্ভকাল অনেকেরই ভাবছেন। ধারা শিক্ষাক্রান্তি শিক্ষাবিদ্ গুরা তে। চিন্তা করছেনই, 'শিক্ষা' পেয়ে বা শিক্ষার খরচ বহন করে ছাপিয়ে উঠেছেন ধারা-উদ্যোগ ভাবনা দেখা নিয়েছে। জনসাধারণ বলতে যে বিরাট জনসংখ্যা আমাদের মনে আসে তার তুলনায় অবশ্য চিন্তিতের সংখ্যা অল্প। তবু এ কথা এখন স্বীকার করতে হবে যে, শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে অনেকেরই ভাবনা সম্ভব নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে এবং প্রতি বংশেরই এই শিক্ষা-নৈরাশ্য বেড়ে চলেছে।^১ বিবলবানু চিন্তাশীল, তাঁর চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই গভীর। গভীর আলোচনা সাধারণ ব্যক্তির নিত্যন্ত 'কাছে'র সমস্যা অনেক সময়েই স্থান পায় না, বৈশিষ্ট্য অতিবাস্তব প্রবন্ধ উল্লেখ্য চলে চলে চিন্তা-সম্পন্ন নেতৃত্বের ভাব ও ভাষা। বর্তমান পুস্তিকায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, সাধারণ ব্যক্তির শিক্ষাপীড়িত মনের প্রশ্ন ও দায়ণ্য প্রতিফলিত হয়েছে এই কয়টি প্রবন্ধে। স্বল্পপ্রণালী কোনো পরিকল্পনার বা আশা ফলশাভেদে পথ নির্দেশের চেষ্টা প্রবন্ধ-তিনটিতে প্রাথমিক পায় নি বটে, কিন্তু চারি দিকে বহু প্রকার মতামতের গোলাবলে যে-চিন্তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে তাকে গুছিয়ে সাহিত্যে সহজ ভাষায় সহজভাবে সাধারণের কাছে উপস্থিত করার কৃতিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই।

স্বাধীনভাষাতত্ত্বের পর ভারতের চিন্তাধারাতে দুটো ভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক পক্ষের গতি অতীতের দিকে, ভারতের প্রাচীন মানন-ঐশ্বর্যকে চরম জান করে তাকেই বংশাধার বর্তমানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই এর আশ্রয়। অপর পক্ষের ধারণা পাকাতা সভ্যতার কাছে সকল প্রগতিরই চাবিকাঠি গচ্ছিত আছে। এই দুটি বিপরীতমুখী চিন্তার মধ্যে একসাধনের কোনো স্পষ্ট আশা লেখক দেখতে পান নি। শিক্ষার ব্যবস্থায় (বা অব্যবস্থায়) এরই দ্বৈতত্ব স্বয়ং প্রতিফলিত হচ্ছে বলে লেখকের মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাকাত্যের স্বয়ংক সাময়িক বলেই ভরসা দিয়েছিলেন; তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্ততঃ ভারতের সাধনায় প্রাচ্য ও পাকাত্য মূলতঃ বিলবে, তিনি তাঁর সাধনার আলম ও পেতেছিলেন ভারতের এক কোণে এবং তাঁকে তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে দেখে দিলে। স্বেচ্ছা বলেছিলেন—এখানে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রকৃত বিলন ঘটেছে। শোনা যায় যে, সর্বভারতে এখন রবীন্দ্রনাথের সাধনার অগ্ন্যুজ্জ্বল প্রভাব অক্ষুণ্ণ হচ্ছে, নিত্যন্ত প্রাচ্য ও নিত্যন্ত পাকাত্য বলে কোনো শিক্ষাকে ভারতবর্ষ সভ্য বলে স্বীকার করতে চায় না। লেখক এতখানি এখনো বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন, তাঁর চোখে কোনো সুরক্ষিত সমাজ-সম্পদের লক্ষণ এখনো ধরা পড়ে নি। এইটাই তাঁর আক্ষেপ যে, সমাজের রূপ ও প্রয়োজন উপলব্ধি করার পূর্বেই শিক্ষার রূপান্তরের চেষ্টা চলেছে দেশে, কগনো প্রাচ্যের প্রভাব কখনো পাকাত্যের অক্ষরণে। এরই ফলে 'কেজো' শিক্ষার হেঁচটে। হচ্ছে বেশি, শিক্ষার আলল ব্যাপারটা যাচ্ছে তলিয়ে। কেজো শিক্ষা না পারছে বেকারের সংখ্যা কমাতে, না পারছে বেশ 'মাহুত'ের সংখ্যা বাড়াতে। ধারা সাহিত্যচর্চা করেছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পেয়েছেন তাঁদেরও হচ্ছে 'কেজো' শিক্ষা, সাহিত্যের হল অগ্ন্যুজ্জ্বল হচ্ছে মনোবুদ্ধি থেকে। লেখকের এই আক্ষেপে ভাষা পেয়েছে বহুমানের অক্ষুণ্ণ।

শিক্ষার মান অনেকটা নেমে গেছে আবারের বেশে। প্রত্যেক অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর এ ধারণা হয়েছে। থালা শিক্ষাধানের কারণে কয়েক বৎসর ঘাবৎ নিম্নস্তর আছেন তাঁদেরও অধিকাংশ, সংস্কারপন্থে মাঝে মাঝে প্রকাশিত অভিযোগ না পড়েও, লেখকের ধারণাটিকে সত্য বলেই মনে করবেন। শিক্ষামানের অবনতি কতখানি ঘটেছে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে লণ্ডনের পাঠ্যক্রমের তুলনা দিয়ে। পাঠ্যক্রম সব সময়ে মানের নির্দেশক না হলেও বা লণ্ডনের তুলনায় আমেরিকার কয়েক স্থানের শিক্ষামান কোনো কোনো পর্গামে নিচু হলেও কোনো পাঠ্যক্রমের অধিকার সত্যই আবারের বেশের নেই।

অবনতি ঘটেছে কেন? ঘটছে কেন?—লেখক বিশেষজ্ঞের মতো গুরুগম্ভীরভাবে কিছু বলেন নি। তবে তাঁর মতটি যদি শিক্ষাবিসার, বিশেষতঃ সরকারের, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তাহলে উপকার হবে। সংখ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে মানকে অবনত করা হচ্ছে এ কথাটাতে নুতনই নেই বলে সকলেই উপেক্ষা করে অবস্থাকে আরো মন্দের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আবারের মনে হয়, অবনতির গভীরতর কারণটি লেখকের আলোচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে, ব্যাখ্যা করে শোত করে বলা হয় নি। শিক্ষাকে ঘোষানে সর্বদাই সর্বস্বত্বই প্রয়োজনের অল্পবর্তী হতে হয় সেখানে দৃষ্টিভ্রমের অবকাশ থাকে না, সেখানে জ্ঞান হয়ে পড়ে কতকগুলি তথ্যের ও তথ্যের বোকা, শিল্প নেমে আসে মিস্ত্রিগিরিতে। এর ইঙ্গিত লেখকের প্রবন্ধেই আছে, অল্প সব ‘এছ বাছ’। ম্যানেজিং কমিটি, রাজনীতি প্রভৃতির প্রভাব কিতাবে কতখানি শিক্ষার মানকে অবনত করে তুলছে তারও খুঁটিনাটির উল্লেখ হয়েছে বইটিতে। প্রবন্ধে বা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এবং বা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, একত্র অনেকখানি চিন্তার পরিচয় বহন করেছে এই ক্ষুদ্রায়তন বইটি।

লেখক বলছেন, ‘আমি শিক্ষাবিদ নই, শিক্ষণ-শাস্ত্রের তবু আমার জ্ঞান নেই-’ তবুজ্ঞানী বলে প্রত্যেক কথাটি হয়তো আরো গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করতেন, ‘শিক্ষা’ কথাটির একটিনাও অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে বইটি নিশ্চিত করে তুলতেন, ক্রটিযোচনের পথনির্দেশে ভারী ভারী হুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন। তাতে বইটির ভার বাড়ত, হয়তো মানও বাড়ত, কিন্তু ঘাসের ভগ্ন লেখা বলে মনে হচ্ছে তাঁদের মনের কথা বলা হত না, তাঁদের চিন্তাকে সাহায্য করা হত না।

বনফুল রচিত এক শো বাথট পৃষ্ঠার এই বইখানি শিক্ষার ভিত্তি, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, কাব্যগ্রন্থ, ত্রিরাবক্ষ-গ্রন্থ, বৃহৎসেবের জীবনে নারী—এই কয়টি প্রবন্ধ নিয়ে সম্পূর্ণ। ‘শিক্ষার ভিত্তি’ প্রবন্ধটিই বড় এবং প্রথমে আছে, বইটির নাব্যবহন হয়েছে প্রথম প্রবন্ধ অল্পসারে, বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় এই প্রবন্ধে। বিষয়গুলি অনেকটা ঘুরে ঘুরে পাঠকের মনকে মূলবক্তব্যের কাছে এনে দিয়েছে, কখনো ঘুর থেকেই ছেড়ে দিয়েছে মূলকে অহলক্ষ্য করে নিতে। ‘শিক্ষার ভিত্তি’তে আছেন মহাত্মা গান্ধী, প্রবীক্ষনাথ, বিবেকানন্দ, অহরলাল নেহেরু; আছে বুনিসাঙ্গি শিক্ষা, বিশ্বভারতীর ‘পাঠ্যক্রম পেশের অল্পকরণ’, আর্দ্র-অনার্জ, জাতিভেদ, ব্রহ্মবিদ্যা, ক্রমচর্চ, বহু-সত্যতা, grades, ব্যক্তিগত—আরো অনেক বিষয় ভাগ উপভাগে এই প্রবন্ধটিকে বিচিত্র ও সারবান্ শাহিত্য করে তুলেছে। বুনিসাঙ্গিক বনফুল নারী মতো বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবন্ধকে বিস্তৃত করেছেন, সহজ সরল এই বিস্তার।

গ্রন্থপরিচয়

'শিক্ষার ভিত্তি'তে তাঁর মূল বক্তব্য বোধ হয় 'আমরাও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বেশবাসীদের চরিত্রগান কর্মনিষ্ঠ করিতে চাই তাহা হইলে ধর্মবৈধ শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে।' 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য', 'কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সত্যধর্মের প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা: আমাদের যনে এখনও লাগে নাই।' 'আমি অবশ্য ইহা দাবি করিতেছি না যে আমাদের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিবার বিন-এ বাবস্থা করিলে যে রাতারাতি আমরা সকলে দাম্ভিক হইয়া উঠিব এ অশস্তব কল্পনা আমার নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের আছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতের কোনো ছাপ নাই', 'বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আমাদের ধর্মশিক্ষা দিতে অপারগ, নানা কারণে সে সামর্থ্য তাহার নাই।' তবে 'ঈশ্বরাত্মক বলিদাচ্ছেন—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবানি যুগে যুগে।'

গ্রন্থটির নানা অংশে যে-সব মতামত প্রকাশ করা হয়েছে তার অনেকগুলিই অনেক ব্যক্তিকে চিত্তিত করে তুলতে পারে। বিশ্বভারতী এখন যে 'পাকিস্তান দেশের অধিকরণ মাত্র' এ কথা বিশ্বভারতীর কোনো কর্মীই জানেন না, হলুপ করে বলতে পারে। বুদ্ধিমান শিক্ষার ব্যাপ্যটিও বিশেষজ্ঞদের কাছে নূতন ঠেকতে পারে। 'ভিক্ষা'র দ্বারা যে ছাত্ররা নিরহংকার হতেন এবং তাঁদের সমাজবোধ বাড়ত সেখকের এ মতটোও শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে নিশ্চয়ই। এ ছাড়াও অনেক কথা আছে যা চলাতি দায়ণ্য ও বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে আলাদা।

'শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা' আমাদের আলোচ্য শেষ গ্রন্থ।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে গেলে মনোবিজ্ঞানের কিছু দায়ণ্য থাকা পরকার, কিছু কিছু মূল জয়গণন করা ভালো। বর্তমান যুগে শিক্ষাঙ্গণতে এই বিষয়টি দৃঢ় হয়ে গেছে। ভারতবর্ষও এই বিশ্বাসে এখন বিশ্বাসী। সেগের বহু স্থানে তাই ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এখনো নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এইসব ট্রেনিং কলেজে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীরা যেসব বই পড়েন তা প্রায় সবগুলিই ইংরেজিতে লেখা, থাকে ইংরেজিতে প্রকাশকমতা দুর্বল 'অথচ বিষয়টা বুঝে নেবার মতো। দীর্ঘকি আছে, তাঁদের জন্যই এই ধরনের বই দরকার। কোনো বিজ্ঞানকে বাড়তিদায় প্রকাশ করে তার সংকীর্ণ পাঠক-পর্যায় বাহিরে বহুতর অনেক মতো বহু অনেক মতো উপস্থিত করা এই বইটির কাজ নয়। বইটির লক্ষ্য পরীক্ষার্থী পাঠক-পাঠিকা বললে বোধহয় অস্তাব হবে না। ট্রেনিং কলেজের বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে ইংরেজি বই পড়ে বাংলায় উত্তর দিতে অসুবিধা না ভোগ করে প্রধানত: তারই মূল বাংলা ভাষায় লেখা এই বইখানি। মাঝে মাঝে ইংরেজি বই থেকে উদ্ধৃতি দিলে নবর বেশি পাওয়া যায় নিশ্চয়ই। এই বইখানিতে ছাত্রছাত্রীরা ভাঙ পাবেন যথেষ্ট। এদের 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ'এ লেখা রয়েছে 'পরীক্ষার খাতায়ও কোনো ইংরেজি বই হইতে কোনো লেখা উদ্ধৃত করিলে তাহা মূল ভাষায়ই হওয়া আবশ্যিক তাহার বাংলা অনুবাদ না দিলে ক্ষতি নাই।' এ ছাড়া এই বইটিতে প্রচুর ইংরেজি শব্দ থাকা আর-একটি কারণ গ্রন্থকারের দিচ্ছেন। সেটি হচ্ছে, গ্রন্থপত্র এখনও ইংরেজিতেই হ'য়ে থাকে, কাজেই ইংরেজি শব্দগুলির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় অপরিহার্য।

পরীক্ষার সুবিধার জন্য বইটি লেখা হয়ে থাকলেও যেমন-তেমন করে অতি সংক্ষেপে বা গোঁজামিল দিয়ে পাঠ্য বিষয়কে উপস্থিত করা হয় নি। মনোবিজ্ঞানের বহু দিক এবং একাধিক মতামত আলোচনা করা হয়েছে, পাঠক-পাঠিকার্য্য একটু খোলা মন নিয়ে পড়লে ব্যাপকতার একটি আভাস পাবেন এবং কয়েকটি বিষয়ে অল্পাধিক নিতুল ধারণাও পাবেন। এর চেয়ে বেশি এই ধরনের বইয়ের থাক। সম্ভবও নয়। ভাষা সত্যই সোহা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলতা বজায় আছে।

লেখক-লেখিকার কাছে একটু নিবেদন আছে। দু-একটা ভাবগম্য আরো একটু বিষয় করে লিখলে ভালো হবে বলে মনে হয়েছে। ছয়তো কিছু পূর্ণা-সংখ্যা বাড়তে পারে। তবে, সরলতার জন্য এবং সাহিত্যভাসের অল্প মাঝে মাঝে ফেলব কবিতা, কথোপকথন, চাকুরের কথাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন সেগুলি না দিলেও চলবে। বইটির instinct-এর পরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে আর-একটু দিশলে কেমন হয়? modes, forms -এর পরিবর্তন এবং এদের সামগ্রিক স্তম্ভগত পরিবর্তন (যেমন sublimation) যে পুণ্য ব্যাপার সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা থাকলে বোধ হয় উপকার হবে। sex ও intelligence -এর একটা প্রশ্ন থাকতে পারে। আর, intelligence-এর প্রকাশের উপর unconscious-এর প্রভাব যে অনেক সময়ে অন্ত্যস্ত স্পষ্ট, এ বিষয়ে আরো লেখা দরকার। বুদ্ধির মাপ নিয়ে যে মনোবিশ্লেষণে একটু কটাক্ষপাত করা আছে বলে মনে হয় সেটার আভাস দেওয়া যেতে পারে কি? শহর ও পল্লীর বালকবালিকাদের মধ্যে বুদ্ধিগত প্রভেদ সম্বন্ধে ভারতীয় অঙ্গগতানের ভিত্তি যেটুকু আছে (তা নির্ভরযোগ্য তো?) সেটুকু দিলে ভালো হয়। 'ঝোর' করে ভুলতে চেষ্টা করার সুফল প্রসঙ্গে যতটুকু বলা হয়েছে তাতে যথেষ্ট হবে না। ভোর করে ভুলতে চেষ্টা করার অর্থটা অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার কাছে কেবল conscious চেষ্টা বলেই মনে হবে; অথচ conscious-এর ঘুরে চেষ্টাটা বতঞ্চন থাকবে ততঞ্চন দৃষ্টিহানি পক্ষাঘাত প্রভৃতি না ঘটার কথা। এদিকে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলে ভালো হয়। অঙ্কুরণ-অধ্যায়ে Piaget-এর গবেষণার একটু দেওয়া যেতে পারে। (Piaget-এর কথা বলা হয়েছে অল্প প্রসঙ্গে)।

বইটি সত্যই ভালো। হয়েছে বলেই নানান প্রস্তাব করতে সাহস হল। গ্রন্থকারম্বর কেবল যে পড়াশোনা করেছেন তা নয়, তাঁরা গ্রন্থগনিকে তথ্যবহুল ও প্রামাণিক করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং পরিশ্রম তাঁদের সার্থক হয়েছে। অনেক দিকে অনেক গ্রন্থের সন্ধান এতে পাওয়া যাবে; থাথা একটু বেশি পড়তে চান তাঁদের সুবিধা হবে যে, এক জায়গাতেই অনেক পথনির্দেশ আছে। ছাত্রছাত্রীরা এ বই ব্যবহার করলে লাভবান হবেন।

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত-পরিচয়। নারায়ণ চৌধুরী। ইতিহাস অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড।
ডিন টাক। চার আনা।

'সঙ্গীত পরিচয়' বইটি সাতাশটি ছোট ছোট প্রবন্ধের সমষ্টি। সংগীতের ইতিহাস ও মার্গসংগীতের পরিচয় থেকে শুরু করে লেখক শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছেন বাংলার লোকসংগীতের আলোচনায়। তারও উপর পাঠকেরা যিনি উপহার দিয়েছেন তিনটি অতিরিক্ত প্রবন্ধ: 'ভারতীয় সঙ্গীতে প্রগতিশীলতা', 'দেওসঙ্গীত' ও 'সঙ্গীত ও রচি (উপগাহার)'। আবহুল করিম, কৈশাভ খাঁ, কেশববাবু ও হোরাবাবু—এই চারটি নাম বাদে নারায়ণবাবুর নির্বাচিত সংগীতনাথক সর্বশেষই বাঙালী। সুতরাং বইটির নাম 'বঙ্গসংগীত-পরিচয়' দিলেও যেমানান হত না।

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে বইটিতে চারটি প্রবন্ধ আছে, একটি শেষের দিকে আর তিনটি মাঝামাঝি। এই সমাবেশ ভাব্যপর্বেই নয়। কেননা লেখকের মতে (যদিও তাঁর ভাষায় নয়) সাংগীতিক উৎকর্ষের দুই বেল, মার্গসংগীত ও লোকসংগীত, এরই মাঝামাঝি একটি অনিদিষ্ট ভাবগায় রবীন্দ্রনাথের স্থান। একথা না বললে অন্তর্য হুবে যে, রবীন্দ্রসংগীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখক যথেষ্ট অবহিত। এক ভাবগায় তিনি লিখেছেন: "বাংলা গানের সামগ্রিক পরিধির ভিতর হরের সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে স্বচিন্তা রূপ তুলে ধরেছে যে গান তার নাম—রবীন্দ্রসঙ্গীত।" ঠিক এই কথার পরেই কিন্তু তিনি অভিযোগ করেছেন যে, গায়কের স্বাধীনতা রবীন্দ্রসংগীতে খণ্ডিত। রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে নারায়ণবাবুর চারটি প্রবন্ধের দুটিই হল এই কথা যে, রবীন্দ্রসংগীতে গায়কের হাত-পা বাঁধা। "রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য" প্রবন্ধে "রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আন্দোলন" মূলকণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করার পর তিনি আক্ষেপ করছেন যে, "এই আন্দোলনের প্রায় সবটুকু কৃত্রিম যিনি এই আন্দোলন প্রবর্তন করে গেছেন তাঁর; আন্দোলনকে ধারা ধারণ করে আছেন তাঁদের অন্তে কৃত্রিমের ছিটে-ফোটা পড়ে বইল না।" এর পর বলেছেন তিনি আরও সাংঘাতিক কথা: "ভারতীয় সঙ্গীতে শিল্পী স্বাধীনতা একটা। মন্ত বড় জিনিষ; সেই স্বাধীনতাকে আঘাত করা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণকে আঘাত করারই সমতুল।" এই মতের সমর্থনে তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন যে, "...ভারতীয় সঙ্গীতে হরের প্রাণের। রচনা এখানে একটা উপলক্ষ্যমাত্র, স্বরকে কণ্ঠে বা যন্ত্রে ছুটিয়ে তোলাটাই হল আসল।" কথাটা ঠা্ডা। এই, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের প্রাণকেই আঘাত করেছেন, যদিও "রবীন্দ্রসঙ্গীত" প্রবন্ধের একেবারে গোড়াতেই লেখক বলেছেন যে, "রবীন্দ্র প্রতিভা যা কিছু হৃদয় মহৎ বরগী ও স্বরগী তা সবই বিখ্যাত হয়েছে তাঁর গানে। -শিল্পমুঠে বিভিন্ন উপাঙ্গের এমন সুসমঞ্জস সমন্বয় বড় একটা চোখে পড়ে না।" একেই বলে কোথাকার মূল কোথায় ঠাড়া।

বাই হোক, সংগীত পরিবেশনে শিল্পী স্বাধীনতা কতটা আছে বা নেই, এই প্রশ্নটি একটু আলোচনা করা যেতে পারে। ইউরোপীয় সংগীতে এ প্রশ্ন ওঠে না, কেননা সেখানে রচয়িতার ও পরিবেশকের পার্থক্য বোঝা, তাদের য ব ক্ষয় নির্দিষ্ট। কিন্তু ভারতীয় মার্গসংগীতে শিল্পী মূলতঃ কি বোঝায় না একাধারে রচয়িতা ও পরিবেশক? সুতরাং এক্ষেত্রে স্বাধীনতা কথায় কোনো মানেই হয় না, কেননা রচনা ও পরিবেশন মার্গসংগীতে প্রায় একই প্রক্রিয়া। ব্যক্তিত্বের ও ধরনভেদে রাগবাগিনীর শুধু বাইরের রঙ নয়, তাদের ভিতরের রঙও যে বলে যায় সে তো জানা কথা। এই যে ধরন। থেকে ধরনায়

ছড়িয়ে পড়া ও এই ভাবে বিচিত্র রাগ-রাগিণীর উদ্ভব, এই হল ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাধীনতার মূল কথা। রবীন্দ্রসংস্কৃতিতেও বলা যেতে পারে বিশেষ একটি ঘটনা। স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে এই বিশেষ ঘটনাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে রবীন্দ্রসংস্কৃতিতে লেখক যে ‘স্বপ্নমগ্ন লবঙ্গ’-এর লঙ্ঘন পেরেছেন, তার কি পরিণতি ঘটবে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে দিলীপকুমার দায়ের কণ্ঠে। রবীন্দ্রনাথের কথা ও স্বরের উপর স্বাধীনতার প্রয়োগের ফলে যে রূপের ও রসের সৃষ্টি হয়েছে তা বসি কারো কানে অতি উপাস্যের লাগে তাতে আগন্তিক অধিকার হয়তো আনাদের নেই। কিন্তু এ কথা বলবার অধিকার নিশ্চয় আমাদের আছে যে ঐ ভাষায় গানের রস আর রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয় গান সৃষ্টি করে গেছেন তার রস একেবারে ভিন্ন গোত্রের।

শিল্পীর স্বাধীনতার স্বরূপ রকমের আছে। দিলীপীয় স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য স্বরবিস্তার ও তানদগ্ধাগণ। কেননা, তাঁর বিশাল রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন শুধু কাঠামো, শিল্পীর অর্থাৎ গায়কের কর্তব্য এই কাঠামোকে ভরাট করে রবীন্দ্রসংস্কৃতির নিহিতার্থ সৃষ্টিয়ে তোলা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু সূচক আর দিলীপকুমার বা দগ্ধগোত্রীয় শিল্পীরা ভাষ্যকার, আর ভাষ্যই শিল্পের প্রাণ। কিন্তু স্বাধীনতার আর-এক জাতীয় প্রয়োগও আমরা দেখছি— কোথাও বা সামান্য একটু মোচড়, কোথাও বা এক-আধ পরমা এদিক-ওদিক, অনিচ্ছায় নব, সম্পূর্ণ বৈকল্যকৃত। রবীন্দ্রসংস্কৃতির একাধিক প্রখ্যাত পরিবেশকের কণ্ঠে এই জাতীয় মাত্রাত্মক অন্তর-টিপুনির পরিচয় আমরা পেয়েছি। স্তবরাং দেখা যাচ্ছে, আর রবীন্দ্রসংস্কৃতির বৈত সংকট, বাহির থেকে ও ভিতর থেকে। এই হল শিল্পীর স্বাধীনতার পরিণাম। এই অবস্থার নারায়ণবাবু দায়ের বলেছেন রবীন্দ্রসংস্কৃতির ‘ভ্রাসবন্ধ’ এবং আমরা তাঁর মতে “শিল্পীর বৈকল্যের আরম্ভের সূচী দাবার দাবিল”, তাঁরা যদি সম্মত না হন তা হলে রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা করণ আছে।

আমি প্রশ্নমাত্রের রবীন্দ্রসংস্কৃতির সঙ্গে ঘটনা কবিতা বোঝা করেছি। এটি শুধু কথার কথা। প্রকৃত-পক্ষে রবীন্দ্রসংস্কৃতি এমন ঐকান্তিকভাবে ব্যক্তিগত সৃষ্টি যে, এই প্রশ্নকে ‘ঘটনা’ কথা ব্যবহার বোধ হয় অচল। ঠিক এই কারণেই স্বাধীনতা কবিতাও এখানে গুঠে না, অর্থাৎ গ্রন্থকারের অর্থে। বিশ্ববের ও আক্ষেপের কথা এই যে, নারায়ণবাবুর মতন ভ্রমগ্রাহী সাংস্কৃতিক, যিনি শুধু রবীন্দ্রসংস্কৃতির অপূর্ণ ঐশ্বর্য নয়, কী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এই ঐশ্বর্যের উদ্ভব হল এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, তিনি রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক সৃষ্টির ঠিকো থাকার অধিকার হরণ করতে চান শিল্পীর স্বাধীনতার নামে। বিশ্ববের কথা আরো এই স্মরণে যে, নারায়ণবাবুর বইর পাতায় পাতায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি শুধু সাংস্কৃতিক নন, তিনি সাহিত্যিকও, কাব্যে ও সংস্কৃতিতে তাঁর অস্বাভাবিক প্রাণ লম্বা, আর তিনি জানেন যে সাংস্কৃতিক ভগ্নতে মার্গ-সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি প্রায় ভুলানুশ্য। সংস্কৃতিতে ও সংস্কৃতিতে আর অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এত ব্যাপক, এই লক্ষ্য কথা কি তিনি বোঝেন না যে, মার্গসংস্কৃতির বৈশাখ বা খাটে লোকসংস্কৃতির বৈশাখ তা খাটে না, আর রবীন্দ্রসংস্কৃতি এই দুই স্বরের মাঝামাঝি বিশেষ স্বরের সৃষ্টি, যে সৃষ্টিকে তাঁরই ভাষায় বলা চলে “বিষম” সংস্কৃতি, যদিও তিনি এই কথাটির প্রকৃত সত্য বা সৌম্য নির্ধারণ করেন নি। Sophisticated আর বিদিত কি এক জিনিস? উনি বলছেন, “যাকে আমরা sophisticated বা বিষম বলাই বলি, বাংলা দেশে তা কোনো কালেই শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি; বাঙালী মনের সহজ হোক লোকসংস্কৃতির প্রতি।” ছুটি মূহুর্ত মনে পড়ছে, একটি কর্তব্য, আর-একটি নিম্নবাবুর টম্বা। এই দুটিকে গ্রন্থকার কোন্ পর্দায় ফেলবেন? এ কথা বলার বোধ হয় প্রয়োজন নেই বাঙালীর সাংস্কৃতিক মনের কতখানি আয়ত্তা ছুড়ে আছে টম্বা ও কর্তব্য।

বিদ্য সঙ্গীতের যে দ্বারা বাংলা দেশে বরাবরই প্রবল ছিল রবীন্দ্রনাথ তাকে করেছেন প্রবলতর, অর্থাৎ টম্রা ও কীর্তনের ঐতিহ্যকে তিনি নিয়ে গেছেন আর-এক দাপ এগিয়ে। তাঁর সাংগীতিক সৃষ্টিতে তিনি যেমন আত্মসাৎ করেছেন মার্গসংগীত তেমনি আকর্ষণ করেছেন লোকসংগীত। ফলে যে শিল্পসৃষ্টির উদ্ভব, তাই এ দু'গের স্বার্থ বিদ্য সঙ্গীত। রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্যই যে এই বৈদ্য, এ কথা ভালো করে বুঝলে নারায়ণবাবু লিপ্যন্তেন না: “রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার কি এক হুনিরীক্ষা কারণে সমাজের উচ্চ মহলে আবদ্ধ।” কথাটা পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি সত্য হত যদি ‘উচ্চ’ বলতে গ্রন্থকার বুঝতেন শুধু শিক্ষিত বা বিদ্বৎ, ধনী নয়। দু'গের কথা তিনি ‘উচ্চ’ কথাটি ব্যবহার করেছেন দ্বিতীয় অর্থে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় কি কোনো তফাত করা যায়? আমার অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে তাঁর গানের স্নায়ব অনেক ব্যাপক। নারায়ণবাবু এই প্রসঙ্গে অনস্বাধীন কথাটি ব্যবহার করেছেন বলেই আমি তাঁকে সন্দেহ করতে চাই, তাঁর কল্পিত অনস্বাধীনতায় বর্ণে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রচার তিনি কতটা লক্ষ্য করেছেন? আর কবিতার বেশোভেও কি তিনি মনে করেন যে, “একটি কায়েদী স্বার্থের চক্র”ই এই প্রচারের প্রতিফলিতা করছে? অনগণের শিক্ষার অভাব এই দ্বয়ে দাবী নয়? সম্ভব হয় যে, স্নায়বত্ব ও ইতিহাস সৃষ্টি গ্রন্থকার যথেষ্ট প্রাণী নয়।

আরও একটি প্রমাণ দিচ্ছি। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত “সংগীত ও সংস্কৃতি” গ্রন্থ উদ্বার ক’রে তিনি বলেছেন যে, বৈদিক যুগে মার্গসংগীতের পাশে পাশে লোকসংগীতেরও অস্তিত্ব ছিল, অতএব লোকসংগীত মার্গসংগীতের অঙ্গ বা অঙ্গ নয়, পক্ষান্তরে সহগ ও সমর্থনাদাম্পর।” স্বামীজীর বই আমি পড়িনি। কিন্তু এই তথ্যটি কি সর্বস্বীকৃত নয় যে, লোকসংগীতের উদ্ভব সভ্যতার প্রায় আদি পর্বাণে ও মার্গসংগীতের জন্ম বহুদিন পরে এই লোকসংগীত থেকেই? সংগীতের প্রাথমিক যুগের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, মূলতঃ আমলেও কী ভাবে লোকসংগীত থেকে মার্গসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিচয় আছে শ্রীকৃষ্ণদেবদাসের শাস্ত্রী রচিত “হিন্দু-মূলভাবের দৃষ্টিগোচর” (বিখ্যাতাংগ্রহ) বইতে। রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্যেরই বাহক। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে ইতিহাসের দ্বারা সৃষ্টি একটু সচেতন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

এই সব বৌদ্ধিক কথা বাস দিয়েও দেখা যায় যে, রবীন্দ্রসংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখক এমন অনেক কথা বলেছেন যা মনে নেওয়া কঠিন। দু-চারটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১. রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গানগুলো স্বরধর্মী এবং যথা ও শেষ বয়সের গান মূলত কাব্যধর্মী— এই শ্রেণীবিভাগ কি নিত্যমাত্র সত্যিক নয়? কোনো এক অনবহিত মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ যদি এই আভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করেও থাকেন, আমাদের পক্ষে তাই কি চিরকালের অর্পণ হয়ে থাকবে?

২. রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের প্রতি তেমন আস্থা হন নি ও কীর্তনার যুগের গানে অ-ভক্তিমূলক কথা বসাবার ‘কৌতুক চেষ্টা’ও নাকি এখন পর্যন্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যে কীর্তনের কী রকম ভক্ত ছিলেন তা তাঁর সংগীতবিষয়ক রচনায় ও আলোচনায় বা ভাষণে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্বৎ কীর্তনের ও কীর্তনভাড়া হয়ে তিনি বহু গান রচনা করেছিলেন। এই গানগুলির কথা অনেক ক্ষেত্রেই ভক্তিমূলক নয়। তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি: “তোমার গোপন কথাটি সবি রেখে না মনে” (এই গানটি কী ভাবে রচিত হয়েছিল “স্বীকৃত”-তে তার বিশদ বর্ণনা আছে), “তবু মনে রেখে, যদি নূরে ঘাই চলে” ও “যেও ও রৌদ্র” গল্পের

বিশ্বাত গান—‘এগো এগো কিংহ এগো, বধু হে কিংহ এগো’। তৃতীয় গানটি প্রধানত ভৈরবী হয়ে রচিত, কিন্তু কীর্তনের ঢঙে। এই জাতীয় আরও দুটো আছে, কিন্তু ‘কৌশল প্রচেষ্টা’র পক্ষে বোধ হয় এই তিনটি দুটোই যথেষ্ট। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বাড়িল হয়ে রচিত গানগুলির গায়ে গায়ে বড়িয়ে আছে যে কীর্তনের স্বর সেকথাও স্ববিধিত।

৩. ভাঙা গান, যেমন রবীন্দ্রনাথের একাধিক ব্রহ্মসংগীত, সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত : “এ-জাতীয় গানে বাগীন্দ্রি অবধারিত নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত...কথা ও স্বরের সঙ্গমস্থল মিলনে গানের যে পরিপূর্ণতা তা এই জাতীয় গানে কদাচ লুপ্ত।” ভাঙা গান প্রসঙ্গে শুধু একাধিক ব্রহ্মসংগীতের কথা কেন যে ন্যায়বোধবান্ধু মনে এল জানি না। বহু অ-ব্রহ্মসংগীতও রবীন্দ্রনাথ হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গান ভেঙে রচনা করেছেন। আর তাঁর ব্রহ্মসংগীতের বেশির ভাগই সম্পূর্ণ নিষ্কর সেওয়া হয়ে রচিত, যদিও সে-স্বর অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিক স্বষ্টি নয়। এ সব গানের বাগী ব্যাহত কি না তা শুধু মতের নয়, রচির কথা। ভাঙা গানের দুটো মিছি, পাঠকেরা বিচার করুন এগুলির বাগী ‘ব্যাহত’ কি না : ‘চরণধরনি তুনি তব নাথ’, ‘আজি নাহি নাহি নিম্না আশ্বিনপাতে’, ‘আজি কমল মুকুলদল স্থলিল’, ‘খেলায় গাথি, এবার বিলাসবার খোলো’। এই চারটি হিন্দী-ভাঙা গানের প্রথম ও দ্বিতীয়টি ব্রহ্মসংগীত; চতুর্থটিকে প্রেমের গান বলা যেতে পারে। কিন্তু স্রোতার মন এই গানগুলি শুনে আচ্ছন্ন হয় কথা ও স্বরের অপরূপ সম্মোহনে। এই রকম দুটো রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানে অল্প পাওয়া যায়। এত বেশি হে, এক-একসময় মনে হয় ভাঙা গানগুলিই তাঁর সাংগীতিক কীর্তির চরম নমুনা।

আর-একটি দুটো মিছি। ন্যায়বোধবান্ধু লেখা পড়ে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, তাঁর পক্ষপাত কবির প্রথম-কীবনের গান সম্বন্ধে। আত্মকালকার গাইয়েরের সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করেছেন, ‘এরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম-বয়সের গান সম্বন্ধে পরিহার করে থাকেন। অথচ কবির রচিত “উল্লেখযোগ্য” ভৈরবী যে-ছাটি নমুন। তিনি ঘিরেছেন প্রত্যেকটি তাঁর উত্তরকীবনের ও এর মধ্যে পাচটি তাঁর একবারে শেষ-বয়সের রচনা।

বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ এ-বইটিতে আছে চারটি, যদিও রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়িয়ে আছে পাতায় পাতায়। অবশ্য তা স্বাভাবিক এবং তাতে প্রমাণ হয় যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার সচেতন। অথচ তাঁর আপেক্ষিক মূল্যবিচারে রবীন্দ্রনাথ ও নবকল প্রায় তুলানো। কেননা তিনি লিখেছেন, “একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও কাকী নবকল ইসলামের সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা যায় তাঁদের স্বর ও বাগী দুইই ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং তাঁদের গান একটি সঙ্গমস্থল একেবারে মধ্য এসে পরিণতি লাভ করেছে।” (“কাকী নবকল ইসলাম—সঙ্গীতকার ও স্বরকার”)।

তিনি আরও বলেছেন যে, নবকল ‘বার্চ-সংগীতের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা। প্রমাণ, তাঁর ‘উর্দু গগনে বাজে মাদল’ ও ‘টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চল সমরে’। লেখক কি স্বপ্নে “একসঙ্গে বাধিরাছি সহস্রটি মন” কিংবা ‘চল রে চল গেবে ভারতগঙ্গান’ প্রকৃতি গান শোনে নি ?

গ্রন্থকার আক্ষেপ করেছেন যে বাংলা “যে সমস্ত কোরাণ গান তৈরি হয়েছে সেগুলির...স্বরের দিক দ্রিষ্ট...জাতীয়তার অহুপ্রেরণা থেকে তাদের জন্ম, তাই কথা তাদের ভিতর স্বভাবতই প্রধান বীজ লাভ করেছে।” এই “একসঙ্গে বাধিরাছি” গানটির প্রেরণা যে জাতীয়তাবোধ তা অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু এটির স্বর কি উপেক্ষীয়? অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার দুটো দিতে হচ্ছে। বিজ্ঞাননাথ ঠাকুরের “অবিল ব্রহ্মওপতি

প্রণমি চরণে তব", সত্যেন্দ্রনাথের "জয় দেব জয় দেব, জয় বঙ্গদাতা", রবীন্দ্রনাথের "পানপ্রান্তে রাখ লেপকে", "মোরা সত্যের পানে বন" প্রভৃতি ব্রহ্মসংগীতগুলির জন্য কি জাতীয়তার অহুপ্রেরণা থেকে? আর এই গানগুলির হৃদের দিক কি দরিদ্র? মাঝার খেলার অপূর্ব কোরাসগুলির কথাও কি উল্লেখযোগ্য নয়?

মূল্যবিচারের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থকারের আরো দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে: "স্বরকার হিমাংশু দত্ত" ও "গীতিকার অজ্ঞ ডট্টাচার্য"। এরা দুটোই ছিলেন গ্রন্থকারের অস্বস্তির বালাবন্ধু, অতএব তাঁদের সম্বন্ধে প্রকাশে উজ্জ্বল না করাই বোধ হয় তাঁর পক্ষে শোভন হত। হিমাংশু দত্ত অস্বস্ত হৃৎকার হিসাবে আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন। কিন্তু শুধু হৃৎ রচনা করেই তিনি কাব্য না হয়ে, কপার বরাত দিতেই বহু অজ্ঞ ডট্টাচার্যের উপর। এই ভাবে তৈরি হত যে গান, পটীন্দ্রবৈবৰ্বনের মতো। শিল্পীর মূগে ভ্রমতে না পেলে সেগুলির কোনো প্রতিষ্ঠা হত কি না সম্ভব। অতএব এই ধরনের ঘোড়াগুলি-সেওয়া গান সম্বন্ধে নারায়ণবাবু তাঁর নরকল ইঙ্গলম বিষয়ক প্রবন্ধে নিজেই নম্রতা করেছেন যে, "গাঙ্গা নিম্নেরা গান লেখেন কিন্তু অপরকে দিয়ে ভাঙে স্বরধোজন। করিয়ে নেন তাঁদের গানে কখনও সত্যিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আবার এর উটো পিঠে, ধানের স্বর বেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু নিজেরা গান রচনা করতে জানেন না, ... তাঁরাও হৃৎ কথাধা ভাবে ছুটিয়ে তুলতে পারেন কিনা সম্ভব..." এই ভাবে এক ঘায়ে "স্বরকার" ও "গীতিকার" বহুবাক্যে ঘায়েল করার পর তাঁদের সম্বন্ধে ঐ জাতীয় উক্তির সংগতি সম্বন্ধে স্বভাবতই একটু সম্মেহ হয়।

এ কথা মানতে হবে যে, নারায়ণবাবু দৃষ্টি কৃপনবুদ্ধের নয়। তাই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, বার্গসংগীতের ভবিষ্যৎ প্রসারের পথ কচ। "কারেই ভারতীয় সঙ্গীতের মোড় নতুন দিকে ফেরাতে হবে, ফেরার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আর সমস্তসঙ্গীতই হল সেই প্রত্যাপিত দিক।" ভাববার নতুন কথা। কিন্তু যিনি এই ভাবনার বরাত দিলেন আমাদের উপর এ বিষয়ে হৃৎই সত্য থাকলে এ কথাই উল্লেখ তিনি নিশ্চয়ই করতেন যে রবীন্দ্রনাথ বাসেও একাধিক ব্রহ্মসংগীত-রচয়িতা অনেক উল্লেখযোগ্য কোরাস গানের সৃষ্টি করেছেন। আর সম্ভাব্যমূল্য গান-রচয়িতাদের মধ্যে স্রোতিরিজ্ঞানাথ বৈদ্যের নামও তিনি একেবারে বাদ দিতেন না।

"সঙ্গীত পরিচর্যা"র সংগীত সম্বন্ধে লেখকের গভীর দরবের পরিচয় পাওয়া যায় নিঃসন্দেহ, কিন্তু বইটির বিভিন্ন নিবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের একান্ত অভাব। ইতিপূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, আরো দু-একটি দেওয়া যেতে পারে। বইটির প্রথম প্রবন্ধ ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক উপক্রমণিকাও লেখক বলেছেন: "বোগল মূগে ক্রপদের ঝাংগা ছুড়ে বসলো খাল।" বোগল আশলে গোয়ালিরে বে ক্রপদের জন্য এ কথা কি তিনি জানেন না? এই প্রশ্নে আরও উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত আশ্রা ঘরানার গুণের ফৈরজ খার পূর্বাচার্য আকবর শাহ অহুগত হুসন খাঁ প্রায় পাঁচ ন ক্রপদার গান রচনা করেছিলেন ও এই জাতীয় নরনারী ক্রপদের থেকেই পরে উদ্ভব হয় বেখালের। কিন্তু গ্রন্থকার এই পরিবর্তির যে কারণ নির্দেশ করেছেন তাতে ফুটেছে তাঁর মৌলিকতা: "বোগল বাঘশারা সঙ্গীতকে জাগতিক স্বভোগের অন্ততম উপকরণ মনে করতেন। স্বখ্যাতির সোপানরূপে ছিল তার ব্যবহার। কারেই সঙ্গীতের প্রাচীন মহিমা ও আধ্যাত্মিক গৌরব আর টিকল না, ধানের আগুন থেকে সঙ্গীতকে বেনে অসতে হল মালোকালাগচ্ছিত আভর-জ্বালিত আগরে।" এই বর্ণনার বর্ণিবারোহ ভেন করে লেখকের বক্তব্য অবশ্য পাড়ায় এই যে, একদা

ক্রম-ধারার-মন্ত্রিত অধ্যয়নশাখার কঠিন নার্গে ছিল ভারতীয় নার্গসংস্কারের কঠোর বিহার, তার পর মূল্যমান যুগে বইল আতর ও গোলাপনলের অব্যাহিত প্রবাহ, আর তাতে শৈবালনলের মতো। ভেসে এল বেহাল ও ঠুংরি। কিন্তু ক্ষতিমোহনবারু ঐ ছোট্ট বইটি থেকে জানা যায় যে, বিনয় ও দোকসংস্কারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে হয়েছিল বাৎশাহী দরবারে বেহাল ঠুংরির জয়। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই, শিল্প-ইতিহাসে দেখা যায় ঐ একই ধারা : শিল্পকর্মে সফলতা ও কঠোরতার পর আবির্ভাব হয় বৈচিত্র্যের ও অলংকরণের। ক্লাসিকাল-এর পর রোমান্টিক।

আরে! একটা কথা স্মরণ করা যেতে পারে। শিল্প-ইতিহাসের প্রাথমিক ও সব চেয়ে গৌরববহু যুগের শিল্পকর্ম ও শিল্প উপভোগ হয় সার্বজনীন, তাই বিশেষ বিশেষ স্থলিতে শিল্পীর হাতের ছাপ থাকলেও তার নামের সীলনোহর থাকে না। • অজস্র ছবিতে বা মহাবল্লীপুত্রের ডাঙরে কয়জন শিল্পীর নামের সন্ধান পাওয়া যায়? হুতরাং ঐ আক্ষেপ একেবারেই অপ্রযুক্ত যে, “এদেশের সুরকাররা কদাচি তাঁদের পরিপূর্ণ মর্যাদা পান নি।” হুতরাং ভিতর নিজের নাম ও ব্যক্তিত্বকে নিঃশেষে লুপ্ত করে দেওয়াই ছিল তাঁদের রীতি।” এর পর নারায়ণবাবু বলেছেন, “বর্তমানে ঐ নীতির পরিবর্তন আবশ্যিক। সর্বাঙ্গে সুরকারের মর্যাদা বীজিত হওয়া উচিত, তারপর গায়ক ও বাদক।” ঐ পরিবর্তন যাতে সহজসাধ্য হয় ঐ উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার বিশেষ এক সুরকারের নামও করেছেন। “তিনি সুরকারকে দিয়েই ঐ পরিবর্তনের হুচনা হোক।” আবার ধারণা ঐ যে, ঐ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দাবি বোধ হয় তিনি সুরকারের চেয়ে নিতান্ত কম নয়, অতএব আবারও কর্তব্য রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মে তাঁর বিশিষ্ট স্বাক্ষর যাতে বিন্দুমাত্র স্মরণ না হয়, ঐ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা।

হিরণকুমার সান্যাল

ঐক্যরোদচন্দ্র মাইতি

শব্দেতে ও দ্ব্যর্থক পদ

পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীর শেষ অধ্যায়ে প্রথম পাদের দ্ব্যর্থকতা হ্রস্ব দ্বারা লক্ষিত স্বীকার করিয়াছেন এবং সেগুলিকে শিষ্টাশ্রমকৌম্বীকার ভট্টোক্তি দীক্ষিত তদ্বিত প্রকরণের শেখাংশে “অথ দ্বিকল্প প্রক্রিয়া” নাম দিয়া স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত দ্ব্যর্থকতা হ্রস্বের মধ্যে দ্ব্যর্থকতা তিনটি হ্রস্ব— নিত্য বীপ্যোঃ ; পা ৮।১।৭, প্রকারে ওপবচনস্ত ; পা ৮।১।১২ ও দ্ব্যর্থকতা দ্ব্যর্থকত্ব ; পা ৮।১।১৩—বাংলায় প্রযোজ্য।

পাক্কাভা ভাষাতত্ত্ব আলোচনার শব্দেতে অর্থাৎ Reduplications দ্বারা বিশেষ কোনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। Otto Jespersen তাঁহার Language গ্রন্থের ৭২ অধ্যায়ে ৭ম প্রকরণে ইহাঙ্গন দ্বারা অত্যন্ত মত সমালোচনার পর এইমাত্র বলিয়াছেন যে—It is simpler and more natural to refer these reduplications to the pleasure always felt in repeating the same muscular action until one is tired (1947 e., p., 109) উক্ত উক্তির সারাংশ পাণিনি হ্রস্ব— যক্ষ্মে প্রিহস্বখ্যোরক্তরক্তত্ব ; পা ৮।১।১০—সহিত অতিরিক্ত হইলেও ব্যাকরণের সাধারণ আলোচনার যে গঠনভেদে কোনও দ্ব্যর্থকতা আছে তাহা এখনও পাক্কাভা ভাষাতত্ত্ববিদগণের দ্বারা পড়ে নাই।

বাংলায় বহুবচন স্বর্গপ্রকাশ করিবার জন্য ওপবাচক অর্থাৎ বিশেষণের দ্বিগুণ করিবার নিয়ম আছে। “লাল লালা কাপড়” বলিলে এই বর্ণের কাপড়ের বহু জ্ঞান মাইতে। অতএব এখানে “প্রকারে ওপবচনস্ত” হ্রস্বের প্রয়োগ পাওয়া যায়। লক্ষ্যকেন্দ্রের টীকাতে—“প্রকার” শব্দ “সাদৃশ্যবোধ”। সেইজন্য বিশেষণ দ্বারা প্রকাশিত ওপের অল্পমাত্র তারতম্য ঘটিলেও বহুবচন অর্থ অটুট থাকে। উক্ত ৮।১।১২ হ্রস্বটি পূর্ববর্তী “কর্মধারকবহুবচনস্ত ; পা ৮।১।১১” হ্রস্বের অর্থবোধ হেতু শব্দান্বয়িকরণবলে বাংলায়ও এই শ্রেণীর শব্দেতে কর্মধার (পা ২।১।৭২) নিয়মে উক্তপদার্থের প্রাপ্য স্বীকৃত হইয়া পরবর্তী বিশেষণ পদ পুনরাবৃত্ত বহুবচন বিভক্তি গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগে দেখিতে পাই যে—“ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি, তাইবোম করি গলাগলি, অবশেষে নাচিতেছে এই”—অথবা “গঙ্গার জীৱ, স্নিগ্ধ সর্পীর ছোট ছোট গ্রামগুলি”।

দ্ব্যর্থকতা দ্ব্যর্থকত্ব ; পা ৮।১।১৩ হ্রস্ব নিয়মে গঠিত “দ্ব্যর্থকতা” পর বিশেষণ হইলেও ইহার মধ্যে বহুবচন অর্থ নাই। পদটি “দ্ব্যর্থক” শব্দের দ্বারা বিশেষণ ; যদিও “দ্ব্যর্থক” শব্দকে অব্যয়ীভাব দ্বারা প্রয়োগে অব্যয়রূপেও গণ্য করিতে হয়। “পর” এই বিশেষণ বা সর্বনামসিদ্ধ “পরস্পর” পদে বহুবচন অর্থ আছে বটে কিন্তু এই পরসিদ্ধ “পরস্পর” পদ বিশেষত্ব এবং একবচন মাত্র। মূল “পর” শব্দ সংস্কৃত হুণ প্রাপ্তিতে লিনভেন পাইলেও উক্ত “পরস্পর” শব্দ Russian বাতিহারিক সর্বনামের দ্বারা পুং স্ত্রী লিঙ্গে একই রূপ পায়।

সাদৃশ্য অর্থ দ্ব্যর্থকতা হ্রস্ব বাংলায় অত্র প্রকারের শব্দেতে আধৈক্যবোধে অর্থাৎ বিভীষিকা-শব্দের পরিবর্তন করিয়া বহুবচন অর্থ ঘটানো হইয়া থাকে। “কলটল বা কাপড়চোপড়” বলিলে সাদৃশ্য অর্থের প্রাপ্য আদিয়া বহুবচন সূচিত হয়। পাণিনি দ্বিকল্প প্রক্রিয়ার মধ্যে একপদ অক্ষরের (syllable) পরিবর্তন

সুস্থাপি স্বীকৃত না হইলেও ৮:১৫ শ্রেণীর বীজ্য হইতে এখন বটে স্বীকৃত হইতে পারে; কারণ “গ্রৌচ ননোরম” উপাধি ভৌতিক নীতিত বলিয়াছেন— ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তি প্রতি সিদ্ধান্তবিশেষিত বাবৎ । ১:৫ প্রত্যেকপূর্ণঃ । স্বতন্ত্র ব্যাপ্তির সমস্ত অংশের সহিত সর্বলোকসিদ্ধি (law of the uniformity of nature) বা প্রকৃতির একরূপতার সম্বন্ধ না থাকায় এই সকল শব্দবৈত পুনরায় বহুবচন বিভক্তি পাইতে পারে; যথা— কাপড়চোপড়গুলি গুল্মইহাঃ গ্রাম ইত্যাদি । এইপ্রকার শব্দবৈতকে বাংলা ব্যাকরণ মতে ক্ষত্রধর্ম পর্ব বলা উচিত । কারণ আয়েড়িতাংশ শুধু যে ধনি হইতঃ করে তাহা নহে, বচন অর্থও স্থচনা করে ।

শব্দবৈত ধারা বাংলায় বচন “অর্থ প্রকাশ করা ছাড়া দু-একটি অল্প দৃষ্টান্তও মিলে । “সপে” এই শব্দজনীয় পর্ব দ্বিত্বপ্ৰ গ্রহণ করিয়া বচন “ইবার” প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবিশেষের (Gerund) অর্থঃ ইঙ্গম-এ-মঙ্গলক (যথা—ইবার সপে সপে) এর সহিত যুক্ত হয় তখন ঐ বিধপদ আর শব্দজনীয় থাকে না ; তৎপরিবর্তে কাশ্যার্থক সংযোগক স্বাধার বিশেষণ (Relative adverb)এ পরিণত হয় এবং এরূপ পদ, যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করে ।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ ক্ষত্রাস্বক (Onomatopoeia) শব্দ সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই । বাংলায় এখন শব্দের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ইহাদেরও আবার নিয়মতান্ত্রিক বিধিক্তি হইতে দেখা যায় । কচ, কট, খট খপ্পু প্রভৃতি ক্ষত্রাস্বক শব্দ শব্দবৈতে পরিণত হইলে প্রথমাংশের শেষে আ-কার যুক্ত হয় ; যথা— কচাকচ, কটাকট, খপ্পাখপ্প (প্রয়োগ যথা— তাক খপ্পাখপ্প বাড়ি বাড়ে ; ভালিগ গাছে পরত্ন নাচে— গ্রাম্য ছড়া) ইত্যাদি । এরূপ স্থলে ওং বা বচন কোনও অর্থ না থাকিলেও নিত্য অর্থঃ আভ্যন্তরীণ বা পৌনঃপুনঃ (নিত্যঃ—আভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যানঃ) তত্ৰ পৌনঃপুনঃ— লক্ষ্যলক্ষণেশ্বর) অর্থ পাওয়া যায় । এতদ্ব্যতীত “নাগ” প্রভৃতি ধাতুর দ্বিৎ এবং আ-কার স্থলে ও-কার করিয়া এক রকম শব্দবৈত পাওয়া যায় ; যথা— নাগনাগ, বহুবোহ, ধারণার ইত্যাদি । তদ্ব্যতীত উভয় অক্ষরে আ-কার যুক্ত ধাতু বা শব্দের বিশেষ আয়েড়িতাংশের প্রথম আ-কার স্থলে উ-কার এবং শেষে আ-কার স্থলে ই-কার করিয়াও অল্প একপ্রকারের শব্দবৈত মিলে ; যথা— ঢাকঢাকি, ডাঙাডাঙি, কাটাকাটি, ধাকঢাকি, ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যেও পৌনঃপুনঃ অর্থঃ নিত্যার্থপ্রধান ।

ক্ষত্রাস্বক শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ কর্তৃক স্বীকৃত না হইলেও প্রাচীন মীমাংসাকগণ বিশেষতঃ ভট্ট কুমারিল উপাধি গুণপদার্থের চক্ষিণ বিভাগের মধ্যে ইহাকে অন্তর্ভুক্তপদ স্বীকার করিয়াছেন । কুমারিলের গুণবিভাগ ত্রয় ও বৈশেষিকের মত হইলেও সেধোক্ত দার্শনিকগণ কেবলমাত্র শব্দ স্বীকার করিয়াছেন । কুমারিল ও পরে প্রজাকর ঐ শব্দস্থলে ক্ষত্রাস্বক শব্দ স্বীকার এবং ফোটিবাদের স্বীকার করিয়াছেন । আলম্ভারিকগণও ক্ষত্রাস্বক শব্দের মূল্যকৃত ধনি স্বীকার করিয়াছেন । ভট্টনারায়ণ, আনন্দবর্দন এবং কৃষ্ণক প্রভোক্তের কাব্যালোচনায যে লাবণ্যের উল্লেখ আছে তাহাতে ধনির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে । আনন্দবর্দনের ত্রয় কৃষ্ণকও ধনিকে উপাধি আলোচিত বহুভাব অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । কৃষ্ণকের উপকার বহুভাব আনন্দবর্দনের লক্ষণাবলি ধনির অন্তর্ভুক্ত । ইহাদের মতে ধনি প্রধান নয় বটে, ধনি গৌণ বা তাত্কা এবং বহুভাবিত প্রধান হইলেও ধনি তাহার অঙ্গীভূত ।

ধনি ক্ষত্রাস্বক শব্দের মূল উপাধান বলিয়াই অধিকাংশ স্থলে প্রাপ্তি বা দৈর্ঘ্যগত ব্যাখ্যার শব্দ বা ধনি

বিশেষকে অনুলরণ করিয়াই এই ধস্তায়ক শব্দের উৎপত্তি। এই সম্বন্ধে Otto Jespersen তাঁহার *Language* গ্রন্থে ইহাদিগকে Echo-words নামেও অভিহিত করিয়াছেন (chap. xvi Section 7)। ইহাদিগের সীমা নির্দেশ করিতে গিয়া ফ্রেডারিক ডায়জের (Diez) যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই যে—One can easily go too far in supposing onomatopoeia, as a rule it is more advisable to build on existing words. ফ্রেডারিক ডায়জের এই মত উক্ত যতাবলম্বী বীণাসংকগণের শিখাশ্বের সমপর্মাণবৃত্ত এবং সেইমতই “পিপীলিকা” শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থলে যে যৎসুগত “পীল” ধাতু রহিয়াছে তাহাও ধস্তায়ক। বাঙ্গালিকবি ইহা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন—

পিপীলিকা পিপীলিকা মলবদ ছাড়ি একা
কোথা ঘাবে ঘাও ভাই বলি,
ঈদের সন্ধ্যা চাই, পাত খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায় পীল পীল চলি।

সংস্কৃত আরও দুই-এক ধাতুর এইরূপ ধস্তায়ক অর্থ বাহির করা যায় এবং সেই অর্থ দিয়া ব্যুৎপন্ন শব্দেরও ব্যাখ্যা করা যায়।

উপরে দেখানো গিয়াছে যে ধস্তায়ক শব্দও শব্দযোজনে পরিবর্ত হইতে পারে। বাস্তবিক শব্দ একবার গড়িয়া উঠিলে তাহা যে অন্তরূপেও শব্দ গঠিত করিতে পারে তাহা Otto Jespersen-ও স্বীকার করিয়াছেন। Onomatopoeia-র আলোচনা প্রসঙ্গে *Language* গ্রন্থের ৮ম অধ্যায় ৩র্থ প্রকরণে বলিয়াছেন—When once formed, such words may be transferred to other things where the sound plays no longer any role. Jespersen-এর এই মত উর্জুহরির শব্দের নিত্যতাবাদের প্রতিপত্তি যাহা (ব্যাকপদীয় ব্রহ্মকাণ্ড নামক প্রথম কাণ্ডের প্রথম স্লোক হইবে)।

উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের ঐ প্রকরণের আলোচনা হইতে হুঁ। যাহা যে যে ভাষা হইত বেশি শিশুর কাকলির সমপর্মাণে রহিয়াছে সে ভাষায় তত বেশি ধস্তায়ক শব্দ রহিয়াছে। বাংলা ভাষায় ধস্তায়ক শব্দের বাহুলাহেতু এই সভ্য কিন্তু প্রচাণিত হয় না বরং ববীক্ষনাধের নতঃ ইহাঙ্গের অনির্ধনীয়তা বাংলা ভাষার লম্পদ বুদ্ধি করিয়াছে (শব্দভর্য ঐষ্টব্য)।

Otto Jespersen পুনরায় বলিয়াছেন— But as our speech organs are not capable of giving a perfect imitation of all unarticulated sounds, the choice of speech sounds is to a certain extent accidental and different nations have chosen different combinations more or less conventionalized for the same sounds. (*Language* chap. XX, sec. 3)। স্পেন্সারের এই মতও উর্জুহরির ব্যাকপদীয় প্রথম কাণ্ডের বিত্তীয় স্লোকের ভাবার্থ যাহা।

অন্য

অধীচীন সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ হুপ্রচলিত কারিক। যাহা। অধ্যায়ঃজ্ঞা নির্দেশ কবিলেও বৃহৎব্যাকরণ পাবিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় প্রথম পাত্রে— ১. স্বরান্বিনিপাতমবায়ম্; ২. তদ্বিত্য-

স্ববিভক্তিক; ৩. ক্রমবন্ধ; ৪. কুতোহ্মক্ৰম; ৫. অব্যয়ীভাবক (৩৭-৪১) এই পাঁচটি স্বতন্ত্র ধারা এই অব্যয়লক্ষ্য বিধান করিয়াছেন। “পূৰ্ণঃ স্মিহু সিন্ধেৰু সগাশ্চবিভক্তিন্। বচনেৰু চ সৰ্বেষু বহুব্যক্তিভদ-
বাহু” —প্রণীত কারিকার দ্বারা আমরা যে সংজ্ঞা পাই তাহা উল্লিখিত বিতীয় স্বতন্ত্র (পাণিনি—১।১।৩৮) হইতে পাওয়া যায় এবং অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম অর্থাৎ ১।১।৩৭ স্বতন্ত্র দ্বারা আমরা যাহা পাই তাহা একপ্রকার গণবিভাগ মাত্র। বাংলায় সংস্কৃতের অহু্যকরণে যে অব্যয়-সংজ্ঞা তাহার স্বতন্ত্র আলোচনার অন্তর্গত এই শ্রমগণ পরীক্ষা করা উচিত। এ সম্বন্ধে পানিনীয় গণপাঠ, শিদ্ধান্তকৌমুদীর গণপাঠ হইতে কিছু স্বতন্ত্র বলিয়া মূল পানিনীয় গণপাঠ দ্বিধা আলোচনা করা যাইতেছে।

উক্তগণপাঠ “কমা, সাক্ষাৎ, উবাৎ ও উপধা” পদ বাংলায় বিশেষরূপেই ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদের বিভক্তিক্রমে রূপ অপ্রণীত; যথা—“কমার সমান গুণ নাহিক কৃতলে।” “তাহার সহিত সাক্ষাতের এখন প্রয়োজন নাই।” “নিড়িয়া ধাচিল নিশার প্রদীপ উবার বাতাস লাগি।” উপধায় ব্রহ্মবর থাকিলে তৎপ্রত্যয় পরে তাহার গুণ হয়।” কোনো কোনো বাংলা বৈজ্ঞানিক “সাক্ষাৎ” প্রভৃতি পদের অব্যয় বন্ধার অন্তর্গত ইহাকে “সাক্ষাৎকার” রূপে বিশেষত্রে প্রয়োগ নির্দেশ দেন; কিন্তু ইহাও যে অদৃষ্ট তাহা “সাক্ষাৎ প্রকৃতিনিচ; পা ১।৪।৭৩” স্বতন্ত্র দ্বারা বুঝা যায়; কেননা ঐ স্বতন্ত্র অংশে “সাক্ষাৎকার” পদও গতি অর্থাৎ অব্যয় থাকে, বিশেষত পদ হয় না।

উক্তগণপাঠ “নানা, পৃথক, হই, মিথ্যা, সত্য” পদ বাংলায় বিশেষরূপেই ব্যবহার পায়। ইহাদের প্রথমটি ছাড়া অন্তর্গত পদগুলি গণপাঠক বিশেষণ এবং প্রথমটি সংখ্যাব্যয়ক বিশেষণ। বাংলায় যদিও বিশেষণ পদ বিশেষ্যের বচন ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয় না তথাপি ইহারা অন্তর্গত বিশেষ্যের মত আরোপ্য (attributive) ও বিশেষ্য (predicative) ব্যবহার পায় এবং প্রত্যয় বোলে বিশেষত পদ (যথা—পার্থক্য, সৌভব, মিথ্যাক, সত্যতা) সৃষ্টি করে। একত্বাতীত “দ্বয়, পূরন” দুইটি বিশেষ্যের বিশেষণ দেখিতে পাই। ইহারাও আরোপ্য ও বিশেষ্য ব্যবহার পায়। কাহেই সংস্কৃত মতে ইহারা অব্যয়গণ কৃত হইলেও বাংলায় ইহারা অব্যয় নহে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ‘ক্রিয়ায় বিশেষণ’ দ্বিতীয়া বিভক্তিক্রমে হয়। বাংলায় ইহাদের কোনও বিভক্তি প্রাপ্তি নাই। এই অব্যয় গণপাঠ “গদা, তুখা, কচিৎ, অবস্ত্র, নিত্য, লহগা” পদগুলি সংস্কৃত ভাষাতে ক্রিয়ায় বিশেষণ হইয়াও দ্বিতীয়া বিভক্তি পায় না; এবং বাংলায়ও ইহাদের ঐরূপ ব্যবহার আছে। ইহাদের মধ্যে “অবস্ত্র” পর হইতে “আবস্ত্রিক” বিশেষণ এবং “নিত্য” পদ হইতে “নিত্যতা” বিশেষত উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। অবশিষ্ট পদগুলির মধ্যে “বিনা, যাবৎ” প্রকৃতি সম্বন্ধেই মহাত্মা রামা রামবাহনের নির্দেশ অংশে “সম্বন্ধনীয় পদ” আর “বা, এবং, বহু, স্বতন্ত্রাৎ” প্রকৃতি পদগুলিকে ঐ নির্দেশে সম্বন্ধার্থপদ বলা যায়।

প্রথম স্বতন্ত্রের গণ আলোচনা ছাড়াই এইবার দ্বিতীয় স্বতন্ত্রী পরা দ্যাক। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই স্বতন্ত্রীর অর্থই বর্তমানে অব্যয়লক্ষণ বিচারের কারিকার মূল ভিত্তি; এবং এই অন্তর্গত অর্থাচীন ব্যাকরণে যে স্বতন্ত্র অব্যয়-তালিকা মিলে তাহা এই স্বতন্ত্র স্বীকারের ফল। ইহাদের প্রায় সমস্ত না হইলেও অধিকাংশই ক্রিয়ায় বিশেষণ শ্রেণীভুক্ত, অতএব বিস্তৃত আলোচনা ছাড়াই অষ্টাধ্যায়ীর একটি ভিত্তি স্বতন্ত্র দ্বিধা একটি নাম বিশিষ্ট পদের আলোচনা করিব।

এখানে এই হ্রস্ব সংশ্লিষ্ট “অবিভক্ত্যন্তরেভ্যঃপ্রসঙ্গপ্রসিদ্ধিঃ” কাত্যায়ন ব্যাক্তিকীর আলোচনা করা কর্তব্য। ইহার ভায়ে পতন্তলি বলিয়াছেন— সত্য বিভক্তিতে সংজ্ঞা ভবিষ্যৎ সংজ্ঞা চাঃবিভক্তিব্য-ভাব্যতে, তদেভ্যন্তরেভ্যঃপ্রসঙ্গঃ ভবতি। ইতরেভ্যঃপ্রসঙ্গিণি চ কাংখি ন প্রকল্পন্তে।” ইতরেভ্যঃ প্রসঙ্গ শব্দে নিশ্চয় পদের সহিত পার্থক্য। বলা করিয়া এক প্রকারের পদ সংসর্গে দ্বন্দ্ব পূর্বপদ ও বিভক্তিকৃত থাকে এবং অন্তপদ সংস্কৃত হয় তখন উভয় পদের ইতরেভ্যঃ প্রসঙ্গ হয়। এক্ষণে “যমতা পদ” থাকিলেও ভাষ্যকার এই ব্যাক্তিক আলোচনায় কোনোও দৃষ্টান্ত সেন নাই এবং এই পদটির তা প্রত্যয় তদ্বিত কিন্তু কোনোও পদ নহে বলিয়া কোনোও প্রসঙ্গ নথ্যে দৃষ্ট নহে। কিন্তু বাংলায় “কাহাকেও” এবং “কাহারও” পদব্যাং “কাহা” সর্বনামের বিভক্তান্ত রূপের সহিত ও—সর্বনামের ইতরেভ্যঃপ্রসঙ্গ পাইতেছি। সংস্কৃতে এরূপ পদের অগ্রসিদ্ধি থাকিলেও বাংলায় পূর্বেল্লিখিত “ইহা” পদের জায় উক্ত পদ দুইটীর সর্বনাম প্রয়োগ আছে। তবে উভয়ের অর্থে অর্থাৎ উভয় অংশে সর্বনাম-সংসর্গহেতু পদ দুইটীতে সংস্কৃত মতে অভ্যন্তঃসংসর্গ বা ইংরাজী মতে Agglutination স্বীকার করা হয়। লক্ষ্য করিবার এই যে উক্তরূপ সংসর্গ-কালেও পদদ্বয়ে বিভক্তির অর্থ অবিকৃত থাকে এবং পদদ্বয়ের পূর্বপদ, প্রশ্নবচক (Interrogative) অর্থ ও পদপদ, নির্দেশক (Demonstrative) অর্থ হওয়াই সম্মিলিতরূপে অনিদিষ্ট (Indefinite) অর্থ প্রকাশ করে। কেহই অব্যয় হয় না।

পা; ৪৩১-২৬ হ্রস্ব ছান্ধিগীতকে বিভক্তিশব্দক তদ্বিত প্রত্যয় বলা হয়, কারণ এই হ্রস্ব কর্তী নির্ধারিত প্রত্যয় পাইলে শব্দ আর কোনও বিভক্তি গ্রহণ করে না; অর্থাৎ (বধা—ক্রমণঃ, সর্ববা ইত্যাদি) তাহার অব্যয় পদ। এই আদিক অধ্যায় ১১ম হ্রস্ব “ইবোহঃ” হ্রস্বমতে “ইবম্” শব্দ হইতে “ইহ” পদ শিষ্ট হয়। সংস্কৃতে হউক আর বাংলায় হউক পদটী বিশেষণরূপেই ব্যবহার পায়; বধা— ইহলোক, ইহলোক, ইহধাম, ইহজীবন ইত্যাদি। কেবল সংস্কৃতে “মহ” অর্থে “ইহ” শব্দের প্রয়োগ আছে; বধা— ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, এবং এই অর্থে ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ। বাংলায় বিশেষণরূপে প্রয়োগের অর্থ ধরিলে আমরা ইহাকে নির্দেশক বিশেষণ (Demonstrative Adjective) বলিতে পারি। পদটী কিন্তু অ-প্রত্যয়ান্ত হইবা “ইহা” রূপে বাংলায় নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun) হইয়া যায় এবং সকলপ্রকার বিভক্তি বোলে রূপগ্রাণ হয়। ইহা ছাড়া “যঃ” এই অব্যয় পদটীও বাংলায় প্রত্যাবৃত্ত সর্বনাম (Reciprocal Pronoun) ব্যবহার পায় এবং “সদ্যত” শব্দ হু বিভক্তি বোলে “সদ্যক্” রূপে অব্যয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা অব্যয় হইতে বাংলা সর্বনামও গঠিত হইতে দেখিতেছি; কায়েই কারিকার অর্থ টকিতেছে না।

চতুর্থহ্রস্বনিদিষ্ট কোনও পদের নৌকিক সংস্কৃতে প্রয়োগ নাই, সেজন্য কোনও তৎসমপদ বাংলায় পাওয়া যায় না। বাংলার নিজস্ব শব্দ হিসাবে “নিকটে, সন্নিবে, পরিবর্তে, পানে” প্রভৃতি পদ গণ্য হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সবগুলিকে আমরা বাংলা কর্মপ্রবচনীয় বা অস্থগণ্যরূপে ব্যবহার করি।

এইবার চতুর্থহ্রস্বনিদিষ্ট “তোহন” ও “কল্পন” প্রত্যয় বাদ দিয়া “জু” প্রত্যয়ান্ত পদ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য হইতেছে। এই শব্দে ‘জুন’ সম্বন্ধেও বলা হইবে। বাংলায় যদ্বি এই দুই প্রত্যয়ান্ত তৎসম শব্দ নাই তথাপি ‘ইহা’ ‘ইতে’ প্রত্যয়ান্ত থাকুক এই শ্রেণীর গণ্য করা হয়। ‘জা’ ও ‘জুন’

উক্ত প্রত্যয়ে 'সমানকর্তৃকেষু' বিধান থাকিলেও 'রথে তু বাহনঃ পৃষ্টা পুনর্জগ্ন ন বিভক্তে' এবং "প্রবাহ কৃত্তিঃ যম্যুক্ত বেদিতুম্ (কিরাতে)" যুগে পূরক কর্তৃকেও প্রয়োগ যোকার করা হইয়াছে। কাষেই বাংলায় আনন্দা যখন 'ইহা' 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার ডিরকর্তৃক (যবা—থেষ্টে থেষ্টে থেষ্টে, জগ্ন গেল কেটে বা কীপলে মুক্তো করে, হাণলে বাণিক পড়ে) পাই তখন তাহা অযোকারে কোনও কার্য থাকিতে পারে না। কিন্তু অনাপসিকারে এই লক্ষ্য ছাড়া বেদী বিশেষ প্রভা পেদী এই যে সংস্কৃতে 'কৃ' ও 'ভূম্ব' প্রত্যয় থাকুর অবয়ব নহে, কৃৎ-প্রত্যয় মাত্র। বাংলায় "ইহা", "ইতে", ও "ইলে" ইহার। দ্যববয়ব অর্থাৎ ইয়া—দ্যববয়ব ক্রিয়ার তিনটি কাল গঠনে, ইতে—দ্যববয়ব বর্তমান ও অতীত গঠনে এবং ইলে—দ্যববয়ব অতীত কাল গঠনে ব্যবহৃত হয়। দ্যববয়ব ছাড়া বরসংগতি প্রাপ্ত 'ইহা'-প্রত্যয়ান্ত পদের বিশেষরূপেও প্রয়োগ আছে; যবা—নাচিধে, গাইধে, বলিধে, কইধে। কাষেই বাংলায় এই তিন প্রত্যয়ান্ত পদকে অব্যয় বলা চলে না।

পঞ্চমদূরনির্দিষ্ট অব্যয়ীভাব সমাল-নিশার যে সকল শব্দ বাংলায় চলে তাহাদের বিবেচনা করার সঙ্গে বাংলায় নিম্ন অব্যয়ীভাব সমাল নিশার শব্দেরও বিবেচনা করা যাইতেছে। বাংলায় প্রচলিত তৎসম শব্দগুলির মধ্যে "প্রতিদিন, প্রত্যহ, অগ্রদিন, সমুদ্র, সম্প্রতি, আজীবন, আনন্দ" ও "সমীপ, সমক, অভিন্ন, সমুখ" এবং বাংলায় নিম্ন "আচমকা, বেবালু, বেহুয়া" শব্দ ছাড়া অল্প সমুদ্রই বিশেষ বা বিশেষণ। উল্লিখিত শব্দের "সমীপ, সমক, অভিন্ন ও সমুখ" পদ এ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া পূর্বোক্তিত সম্বন্ধীয় পদ হই এবং অবশিষ্ট সমুদ্রই ক্রিয়ার বিশেষণ। "পরোক্ষ" পদ বিশেষণ এবং বাংলায় অজ্ঞাত বিশেষণ (যবা—ধীর, আচম্বিত, চরম, অবাধ, লজ্জ, অচির, চকিত, প্রকাশ ইত্যাদি) এ-প্রত্যয় যোগে যেমন ক্রিাবিশেষণ হয়, এই পরীও সেইরূপ পদান্তর পায়। অতএব বাংলায় অব্যয়ীভাবসমাল-নিশার পদের অব্যয় কোথায় তাহা চিত্তনীয়।

অব্যয়ীভাব সমাল আলোচনা প্রথমে প্রাদি নিপাতে অর্থাৎ উপসর্গগুলির কথাও আসিয়া পড়ে। যময় প্রথমে অষ্টাধ্যায়ীর যে বৃত্ত আলোচনা করিয়াছি তাহাতেও এই নিপাতের কথা উল্লেখ ছিল। অব্যয়ীভাব সমাসে এই উপসর্গগুলিই (এক 'যবা' শব্দ) পূর্বপদরূপে থাকে এবং বিজক্তি, বীপা প্রকৃতি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। "সিনকেবিন" পদে বিজক্তি বৃত্ত পদের অর্থ প্রধান বলিয়া ইহা সমার্থক "প্রতিদিন" পদের জায় অব্যয়ীভাব সমাল নিশার পদ। এই "প্রতিদিন" পদের অল্পকরণে অব্যয় "প্রতিদিবস" পদ গঠন করিতে পারি না, কেননা 'প্রতিদিন' পদে যে syncretism বা coalescence আসিয়া গিয়াছে তাহা "প্রতিদিবস" পদে সম্ভব নহে এবং সেমন্ত শব্দোক্ত পরস্পর পূর্বে নিপাত থাকে। তবেও ইহাতে পরপদের অর্থই প্রধান আছে; আর সেই অর্থই বঙ্গদেশে ঠাহর প্রকৃতির হই প্রয়োগে (যবা—বৌদ্ধ মন্যাসীরা বগিরির শিবরসে হইতে প্রতিদিন চাহিয়া দেখিতেন এক একখানি ক্রিয়া পাথরের পর পাথর উঠিয়া তাহাদের প্রতিদিবসকে নিরুল করিতেছে—"উড়িয়ার দেবকেন্দ্র") 'প্রতিদিন' শব্দের ক্রিাবিশেষণ রূপ প্রয়োগের পাশে পাশে পরী বিশেষরূপে প্রয়োগ পাইতেছে অর্থাৎ এখানে "প্রতি" পদ আর অব্যয় নহে; 'দিবস' শব্দের বিশেষণ (Distributive adjective বা বিভাগকারী বিশেষণ) মাত্র।

অতএব "প্রতি" এই প্রাদি নিপাতটির পূর্বাধানে বিশেষণ অর্থাৎ সমার্থ (ভাবপ্রধানমাত্যাত্ম সমপ্রধানানি বাহানি; যাব-নিকট—১১০) ও অসমার্থ ভেদে দুইপ্রকার প্রয়োগ পাইতেছি। পতঞ্জলি

“প্রাথম উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে ; পা। ১।৪।৭৮-৭৯” দ্বয়ের মহাভাষ্যে বলিতেছেন— “প্রাথমোঃসববচনা নিপাত সঃজ্ঞাভবতি”। কিন্তু এই অসংখ্য নিপাত সংজ্ঞায়ও দুই প্রকার ভেদ পাণিনি পদ্যসরায় স্বীকৃত ; একটী হইতেছে যথ ও যথ নিবেশে গতি সংজ্ঞক অবস্থা। (যেন :— ‘প্রমত্ত বিলম্বক’ প্রকৃতি পদে) এবং অক্টী স্বক-পথ স্বীকৃত অবস্থা। এই অবস্থার কি নাম হইবে। পাণিনি বলেন— উপসর্গ ক্রিয়াযোগে (১।৪।২২) কিন্তু বাংলা ক্রিয়ায় উপসর্গের ব্যবহার নাই। অতএব উপসর্গ এই সংজ্ঞা বাংলায় অদৃশ্য। আবার কর্ত্ত্বপ্রবচনীয় সংজ্ঞাও এই পূর্বাৱস্থানে অচল ; কারণ বাংলায় এখন স্থলে ইহাদের পরাবস্থান প্রদর্শিত। এই “প্রতি” শব্দটিরই “পিচু” এই শব্দচর্চায় অর্থে যে প্রয়োগ হয় তাহা “স্বক্বেশবৃত্তান্তান্যভাবীপাশ্বপ্রতি-পদনবঃ (পা ; ১।৪।২০)” দ্ব্যাহ্বায়ী ভাগ্যার্থক হেতু কর্ত্ত্বপ্রবচনীয় হইলেও পরাবস্থানকেই স্বীকার করায় ; কেননা, প্রতি টাকায় = টাকায় = টাকাপিচু = টাকাপ্রতি (যথা—টাকাপ্রতি অষ্টপদ্য শের প্রতি ধর)। “বীর শক্রয় প্রতি দ্যবিত হইলেন” বাক্যে যে কর্ত্ত্বপ্রবচনীয় প্রয়োগ পাইতেছি তাহা “প্রতিঃ প্রতিনিধি প্রতিভানমোঃ [পাঃ— ১।৪।২২]” দ্ব্যাহ্বাসারে হইলেও বাংলায় পরাবস্থানেই সম্ভব। “অতিরিক্তক্রমণে চ ; পা। ১।৪।২১” দ্ব্যাহ্বাসারে “অতি” শব্দের যে প্রয়োগের কথা উল্লেখ আছে বাংলার তাহা পাই বটে ; এখনস্থলে “অতি” শব্দ বিশেষণের বিশেষণ মাত্র এবং পূর্বাৱস্থানই প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহাও সর্বাধিক হেতু নিপাত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

অব্যয়ের সর্বার্থ ও অসংখ্য বিবেচনার আবশ্যকতা অন্তর্নিক দ্বিবাৎ বাংলায় অস্বীকৃত হয়। “চানয়েহিষে ; পা। ১।৪।৭৭” দ্বয়গণপদ্য “চ” শব্দের স্বতন্ত্র ব্যবহার নাই। পদটী “তথা, তত্” প্রকৃতি নির্দেশক সর্বনাম এবং “বত্” বিশেষণের প্রথমার একবচন রূপের উক্তয় প্রযুক্ত হইয়া (যথা—তথাচ, তত্চাচ, বত্চক) সমুচ্চারণ (অব্যয়) পদ সৃষ্টি করে। অস্বত্বপ ঐ গণের “ত্” পদটীও “পত্” ও “কি” সর্বনামের সমরূপের সহিত যুক্ত হইয়া (পত্চক, কিত্চক) সমশ্রেণীর পদ গঠন করে। ঐ গণত্বক “বা” পদটির ব্যবহার বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে থাকিলেও “অথ” অব্যয়ের সহিত এবং “কি” সর্বনামের রূপের সহিত যুক্ত হইয়া সমশ্রেণীর পদ (যথা—অথবা, অথচ, কিংবা) সৃষ্টি করে। অতশ্রেণীর শব্দের সহিত যুক্ত হইলেও উক্ত গণত্বক এই তিনটী পদ নিজ সর্বার্থ অঙ্গ্য রাশিরা (সমুচ্চারণ) একই শ্রেণীর পদ সৃষ্টি করে এবং এই গণত্বক “নচৎ” শব্দের দ্বারা বাক্য স্যোজননের কাহ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই গণত্বক “দিক্” পদটী অন্ত (অন্তর্ভাবার্থক) শ্রেণী যুক্ত হইলেও নিজস্ব সত্যায় প্রতিষ্ঠিত।

অতএব অসংখ্যক প্রাণিগুলির বাংলা বাক্যরূপ বর্ণনা কি ? ইহা বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমে “বরাহি নিপাতমবাসম্” যে দ্ব্যটী লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন আশাদিগকে সেখানে ফিরিয়া আনিতে হয় ; কেননা এই গণগত কয়েকটি শব্দের আলোচনা বাকি রাশিরা গিয়াছি। এই গণে দ্বত “স্বব, নত, স্ব, ইত, তত, কৃত, উপরি, প্রাক, সনা, পূবা, কু, বহিঃ, নমঃ, পদ্য, তিরস, অবিস, নোঃ, উইচ্চস, শনৈঃ, চিরন্, অতল, পুনঃ, প্রাতঃ, অথন্, প্রাতন্, গায়ন্, প্রায়ন্, অতঃ, পুদন্, অলন্, যথা, ক্লে, ও কুবন্” শব্দগুলি ক্লে প্রকৃতি প্রকরণে পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব অসংখ্যক প্রাণিগুলি এই গণের সমপার্থক্যকৃত। পাণিনি পুস্তকযতে প্রথমোক্তগুলি অব্যয়। কাণ্টে বাংলায় যদি অব্যয় বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা এই পূর্বপদ ও প্রাণি সমষ্টির একত্র নাম এবং ইহা ছাড়া অন্তর এই সংজ্ঞার প্রয়োগ অসংগত।

স্বরলিপি

কথা ও সূত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস

II গা -ক্ষপা পক্ষা ^১পক্ষা -পা
কী . . . ধ . . . নি .

গপা -ৱা -ক্ষপা -ধধা -পক্ষা -^১ক্ষা
বা

গা -ৱা -ৱা } গক্ষা গক্ষা কা -সা -না -ৱা -ৱা
কে গ . হ . ন

গা -ক্ষা সা -ৱা গক্ষপা -ধধা পা -ৱা ধধা -পপা -ক্ষা -^১ক্ষা
বা কে কী আ ন

গা -ক্ষা -ৱা গক্ষা -ক্ষগা গা -ক্ষা অগা -ক্ষা
নে উ ছ সি

সা অসা -না গা কা পা -না ^১পা -ক্ষা -^১ক্ষা
ম ত হ বা

গক্ষা গক্ষা কা -সা -না অগা -ৱা -ৱা গা -ক্ষা
গ হ ন না

সা গা গা ক্ষধা ^১সী ^১সী ^১সী
কে ন ঞা ণ হ

-ৱা -ৱা ^১সী ^১সী ^১সী গা গা ^১পধা -নসী ^১সী ^১সী ^১সী
 অ রা ণ হ

-ৱা ^১সী ^১সী ^১সী -ৱা -ৱা ^১সী ^১সী ^১সী না ^১সী ^১সী
হ ধা ঞা ণ হ

-ৱা -ৱা ^১সী ^১সী ^১সী না না ^১ধনা -^১নসী ^১সী ^১সী
 ভা ব না উ

ମା -ି -ଧା ଧା -ର୍ମା ନା -ଧା ପକ୍ଷା -ଧମା -କ୍ଷା -କ୍ଷା ଗା
କୌ . . କ୍ଷ ନି . ବା . ଶେ

ଗକ୍ଷା ଗକ୍ଷା ଥା -ମା -ନା -ି -ି ଗା -କ୍ଷା
ଗ . ହ . ନ . . ବା

ମା ଗା ଗା କ୍ଷା ଧର୍ମା ଧର୍ମା -ି ଧର୍ମା ଧର୍ମା
କ୍ଷେ . . ଧା . ଧା . ହ ଧା .

-ି -ି ଧର୍ମା ଧର୍ମା ନା -ଧା -ଧା -କ୍ଷା -ଧା -ଧା -ଧା -ନା
କ୍ଷେ . . ଧା . ହା .

-ଧା -ଧନା -ଧର୍ମନା -ଧମକ୍ଷା -ଗା ଗା ଗା କ୍ଷା ଧର୍ମା
କ୍ଷେ . . ଧା . ଧା .

-ି ଧର୍ମା ଧର୍ମା -ି -ି ଧର୍ମା ଧର୍ମା ନା ଧର୍ମା ନା
କ୍ଷେ . . ଧା . ପ ଧେ

-ି ଧର୍ମା ଧର୍ମା ଧା ମା ନା ନା -ଧନା -ଧର୍ମା ନଧା -କ୍ଷା -ମା
କ୍ଷେ . . ଧା . ଧା . ନା . ନା .

-ି ମା -ି -ଧା ଧା -ଧା ନା -ଧା ପକ୍ଷା -ଧମା -କ୍ଷା -କ୍ଷା ଗା
କୌ . . କ୍ଷ ନି . ବା . ଶେ

ଗକ୍ଷା ଗକ୍ଷା ଥା -ମା -ନା ଗା -ି -ି ଗା -କ୍ଷା
ଗ . ହ . ନ . . ବା

ମା -ି -ି -ି ଗା -କ୍ଷମା ପକ୍ଷା ଧର୍ମା -ମା ଗମା -ି ଧର୍ମା -ମା
କ୍ଷେ . . କ୍ଷ ନି . ବା . ଶେ .

-ି -ି କ୍ଷମା -କ୍ଷମା -କ୍ଷମା -କ୍ଷମା -କ୍ଷମା -କ୍ଷମା -କ୍ଷମା -କ୍ଷମା
କ୍ଷେ

-গন্ধপা -বনঝাঁ -সর্নধা -পনন। -ধপা -গন্ধপা -১ -১ গা -পা পক্ষা ^১পক্ষা -পা
কো . ধ . নি .

-ধপা -ঝা -পা -না -নধা -পা -ঝা -^১ঝা ধা
...

গন্ধা গন্ধা ঝা -সা -না
গ . হ . ন . .

গা -১ -১ -১^১ গা -ঝা
না

সা গন্ধপা -ধধা পা -১ ধধা -পপা -ঝা -^১ঝা গা -ঝা
ঝে কো . আ . ন . ন . সে .

গন্ধা -গন্ধপা গা -ঝা ঝগা -ঝা সা ঝসা -না
উ . . হ . হ . নি

গা ঝা পা -না ^১পা -ঝা -^১ঝা -গা গন্ধা গন্ধা ঝা -সা
ত হ বী . গা

-না -১ না ঝা -১ -১^১ গা -ঝা -^১ঝা -১ সা -১ -১ -১^১ II II
 . চে ত . মা . ৮ ঝে

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত বীণাবাদিনী চিত্রের ব্রহ্ম ভারত-সরকারের প্রকাশন-
বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পশ্চিম-আফ্রিকার ব্রহ্মভূমি। দৃতিগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।
চিত্রগুলি Leon Underwood দ্বারা *Bronzes of West Africa*
(Alec Tiranti) এর হইতে প্রকাশকের অস্বত্বাধীন অঙ্গারে গৃহীত।

প্রকাশকগণ বিদ্রোহবাহারের চিত্র প্রদর্শন যোগে সৌজন্যে প্রাপ্ত।